হৃষীকেশ-সিরিজ, নং ১২

বিচিত্র প্রসঙ্গ

(তৃতীয় পর্য্যায়)

শ্রীবিপিনবিহারী গুপ্ত

মূল্য ২৷৷৹

১০৭নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীটস্থ কলিকাতা ওরিয়েণ্টাল প্রেসে
শ্রীযুক্ত নলিনচন্দ্র পাল বি-এ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

নিবেদন

বিচিত্র প্রসঙ্গের সহিত ৺আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর নাম বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট। ভারতবর্ষের ইতিহাস সম্বন্ধে তাঁহার অনেক কথা বলিবার ইচ্ছা ছিল; কিন্তু ঘটনাচক্রে সে প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইবার পূর্ব্বেই তাঁহার তিরোভাব হইল। ভনিতা স্বরূপ যে কয়টি বিষয়ের অবতারণা হইয়াছিল, সেগুলি এই পুস্তকের প্রথম স্তবকে সন্নিবেশিত হইয়াছে। দ্বিতীয় স্তবকে আমার যে কয়টি রাষ্ট্রীয় সন্দর্ভ স্থান পাইয়াছে, তন্মধ্যে গীজোর ইতিহাসের একটি পরিচ্ছেদের অনুবাদ রামেন্দ্র বাবুর অনুরোধে সম্পন্ন হইয়াছিল। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের হাতে কয়েক সহস্র মুদ্রা দেন; তাঁহার ইচ্ছা ছিল ঐ টাকায় একখানি পাশ্চাত্য ইতিহাস গ্রন্থ ও একখানি দার্শনিক গ্রন্থ বাঙ্গালায় অনুবাদ করাইয়া মুদ্রিত করা হয়। ইতিহাসের ভার আমার উপর অর্পিত হইল। আমি কিন্তু শারীরিক অসুস্থতা নিবন্ধন বেশীদূর অগ্রসর হইতে পারিলাম না। সুখের বিষয়, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ ঐ অনুবাদ কার্য্য অতি নিপুণভাবে সুসম্পন্ন করিয়াছেন। তৃতীয় স্তবকের শেষ প্রবন্ধ রামেন্দ্রসুন্দর। শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত ঐ নিবন্ধ-গুচ্ছ তাঁহার পুস্তকে প্রকাশিত করিবার জন্য আমার অনুমতি লইয়াছিলেন; কিন্তু তিনি আমাকে না জানাইয়া খানিক্‌টা বাদ দিয়া মুদ্রিত করিলেন। বিচিত্র প্রসঙ্গের সম্পূর্ণতা খণ্ডিত হইত, যদি আমার শ্রদ্ধার পুষ্পাঞ্জলির কিছুমাত্র অপচয় ঘটিত।

এই দ্বিতীয় পর্য্যায় 'বিচিত্র প্রসঙ্গ' পাঠকের সম্মুখে উপস্থাপিত করিতে পারিলাম ডক্টর নরেন্দ্রনাথ লাহার সাহায্যে। তিনি অগ্রসর না হইলে আমার চেষ্টা এত সহজে ফলবতী হইত না। ক্রটি বিচ্যুতি ভ্রমপ্রমাদ কিছু কিছু রহিয়া গেল। সে দোষ আমার।

রামকৃষ্ণপুর, হাওড়া
১লা আষাঢ়, ১৩৩৪

শ্রীবিপিনবিহারী গুপ্ত

সূচীপত্র

প্রথম স্তবক ঃ

দ্বিতীয় স্তবক ঃ

তৃতীয় স্তবক ঃ

প্রথম স্তবক

বিচিত্র প্রসঙ্গ।

(দ্বিতীয় পর্য্যায়)

১

জীব বিজ্ঞান

শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এখন* অনেকটা সুস্থ হইয়াছেন। আজ কথায় কথায় তাঁহাকে বলিলাম, "সম্প্রতি ডাক্তার কর্ণেল ইউ, এন, মুখার্জ্জি (উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়) মহাশয়ের সহিত সমাজ ও সাহিত্য সম্বন্ধে আলাপ করিতেছিলাম। কর্ণেল মুখার্জ্জি বলেন, "সমস্ত ঊনবিংশ শতাব্দীর বঙ্গসাহিত্যের আলোচনা করিয়া দেখিলে একটা বিষয় বেশ বুঝা যায়, পাশ্চাত্য ভাববন্যায় আমাদের সাহিত্য আমাদের সমাজ হইতে বহুদূরে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িয়াছে; সমাজ রহিল একদিকে, সাহিত্য গড়িয়া উঠিল আর একদিকে; উভয়ের মধ্যে একটা নাড়ীর যোগ নাই। সাহিত্যের মধ্যে যে সকল ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে, সে সকল কোনও কাজেই আসিল না; বিপুল হিন্দু সমাজের প্রান্তস্থ বেলাভূমিতে আছাড় খাইয়া যেখান হইতে উদ্ভব সেই খানেই ফিরিয়া গেল; কএকটি মুষ্টিমেয় শিক্ষিতাভিমানী বাঙ্গালীকে ঘিরিয়া ফেনিল হইয়া আবর্ত্তিত হইতে লাগিল মাত্র; কেবলই উচ্ছ্বাস, কেবলই ফেনা, কেবলই আলোড়ন, কেবলই গর্জ্জন। বাঙ্গালার লক্ষ পল্লী স্তব্ধ হইয়া রহিল; রামমোহন রায়, বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্র-

---

* অগ্রহায়ণ, ১৩২০।

নাথ কি কথা বলিতে চাহিলেন, কি গান শুনাইলেন, তাহা তাহারা বুঝিতে পারিল না। এ ভাব যেন তাহাদের নয়, এ ভাষা যেন তাহাদের নিজের সুরে বাঁধা নয়; তাহাদের মর্ম্মকথা, তাহাদের কর্ম্মক্ষেত্র, তাহাদের কর্ম্মজীবন এ সাহিত্যের মধ্যে ফুটিয়া উঠিল না। মহাকাল নির্ণিমেষ নেত্রে গত শতবর্ষের এই করুণ ট্র্যাজেডির অভিনয় দেখিলেন; দেখিলেন, বাঙ্গালী সন্তান Zeit Geistএর সম্মুখে, Time Spirit এর সম্মুখে, যুগধর্ম্মের সম্মুখে মাথা হেঁট করিয়াছেন; ভুলিয়া গিয়াছেন যে Zeit Geist ছাড়া আর একটা জিনিষ আছে,—Folk Geist, নারায়ণী শক্তি। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগ পর্য্যন্ত সমস্ত বাঙ্গালী সাহিত্য এই Folk Geist হইতে উদ্ভূত। উদ্যতফণা ভুজঙ্গের সম্মুখে নীড়স্থ পক্ষিশাবকের যে অবস্থা, প্রতীচ্য সভ্যতার সম্মুখে বাঙ্গালী হিন্দুরও সেই অবস্থা; সে ছট্‌ফট্ করিতেছে, কিন্তু পলাইতে পারে না।" মুখার্জ্জি সাহেব চুপ করিলেন। আমি বলিলাম,—"সুখের বিষয় এই যে, আমাদের অনেকের এখন এ বিষয়ে চোখ ফুটিয়াছে; পাশ্চাত্য ভাববন্যার প্রথম ধাক্কাটা সাম্‌লাইতে আমাদের এক শত বৎসর লাগিল বটে, কিন্তু এই শতবর্ষও বোধ হয় ব্যর্থ যায় নাই; আমাদের সমাজের প্রান্তস্থ বেলাভূমিতে একটা পলি পড়িয়াছে। যুগধর্ম্মের সম্মুখে কে না মাথা হেঁট করে? কিন্তু—

The moving finger writes, and having writ moves on.

এই চেতনা, এই জাগরণই আমাদের নবজীবন, আমাদের Renaissance।"

রামেন্দ্র বাবু বলিলেন, "কএক বৎসর পূর্ব্বে আমি যখন "মানসী" ও "প্রবাসী পত্রিকায় আজকালকার বিদেশীয় শিক্ষাপ্রণালীর আলোচনাপ্রসঙ্গে দেশের কথা তুলিয়াছিলাম, তখন কেহই আমার কথায় সায় দিলেন না;

বরং কেহ কেহ আমার মস্তিষ্কবিকৃতির আশঙ্কায় আক্ষেপ করিয়াছিলেন। আজ দেখিতেছি আপনারা অনেকেই বলিতেছেন, 'এবার ফিরাও মোরে'।"

আমি বলিলাম, "কাল রবিবাবুর সঙ্গে দেখা করিতে গিয়াছিলাম। অন্যান্য অনেক কথার পর বিলাতের সাহিত্য ও সামাজের কথা তুলিলাম। বলিলাম, 'আমাদের সাহিত্য ও আমাদের সমাজ ত আপনি বরাবরই দেখিতেছেন; বিরাট সমাজদেহটা কোথায় পড়িয়া রহিল, আর হাওয়ার উপরে রামধনুর মত একটা সাতরঙা সাহিত্য গড়িয়া উঠিল। আচ্ছা, বলুন দেখি, আজ্‌কালকার বিলাতের সাহিত্য ও সমাজ আপনার কেমন লাগিল? সেখানে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ভাবতরঙ্গ সাহিত্যের মধ্যে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছে, এই রকমই ত আমার মনে হয়। সেখানকার সাহিত্য Folk Geist হইতে উদ্ভূত; দেশের লোক যাহা চায়, দেশের সাহিত্যের মধ্যে ভেরী বাজাইয়া তাহা ঘোষিত হইতেছে; নারীবিদ্রোহই বলুন, আর ধনি-নির্ধনের দ্বন্দ্বই বলুন, তাহাদের সাহিত্যে তাহার ছাপ পড়িতেছে। ব্যাভার্ষ্টক্ (Baverstock), এইচ, জি, ওয়েল্‌স (H. G. Wells), চেষ্টার্টণ (G. K. Chesterton), হিলেয়ার বেলক্ (Hillaire Belloc) বার্ণার্ড্ শ (Bernard Shaw), ক্যাথ্‌রিণ টাইনান (Catherine Tynan) প্রভৃতি লেখক লেখিকারা যে সকল কথা ছোট গল্পে, উপন্যাসে, কবিতায়, সন্দর্ভে বলিতেছেন, সে সকল তাঁহাদের নিজের দেশের কথা, নিজের সমাজের কথা। এই যে সাময়িক উত্তেজনায় সংক্ষুব্ধ সমাজের সহিত সাহিত্যের নিবিড় সংস্রব, ইহা কি সাহিত্যকে খর্ব্ব করিতেছে না?' রবি বাবু বলিলেন,—'ইহার মধ্যেও একটা নিত্য, শাশ্বত, সনাতন সামগ্রী আছে। এদের সমাজ জাগ্রত, সাহিত্য জাগ্রত; সাহিত্যের উপর সমাজ যে রেখাপাত করিয়া যাইতেছে, সেইটাই আজ কালকার এ দেশের ইতিহাসকে জীবন্ত করিয়া রাখিবে।'

রামেন্দ্র বাবু বলিলেন, "এই বিষয়টা বেশ ভাল করিয়া আলোচনা করিবার সময় আসিয়াছে। ইংলণ্ডে উপন্যাসসাহিত্য এখন আসর জমাইয়া বসিয়া আছে, সমাজিক ভাব পুষ্টির যথেষ্ট সাহায্য করিতেছে। ডিস্রেলি (Disraeli) যখন উপন্যাসকে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় শক্তির অনুকূল করিয়া কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন, তখন আর কেহ সে পথ অবলম্বন করিতে বড় সাহস করে নাই। এখন দেখুন সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় সমস্ত কথাই উপন্যাসের ভিতর দিয়া আলোচিত হইতেছে; দেশের লোককে শিক্ষা দিবার, প্রবুদ্ধ করিবার, ইহা একটি প্রকৃষ্ট উপায়। সোশ্যালিজম্, হোমরুল, নারীজাতির সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় অধিকার, এ সমস্তই উপন্যাসে প্রতিফলিত হইতেছে। আমাদের দেশেও উপন্যাস অনেকখানি স্থান অধিকার করিয়া বসিয়া আছে। এখন দেখিতে হইবে, সেই উপন্যাসের ভিতর কি কি সমস্যার সমাধানের চেষ্টা হইয়াছে। আদৌ কোনও সমস্যা উপস্থিত হইয়াছে কি না, বিবেচনা করিয়া দেখা আবশ্যক।

"ছেলেবেলায় অনেক বাঙ্গালা উপন্যাস পড়িয়াছিলাম। ইদানীং রবিবাবুর রচিত উপন্যাস ব্যতীত আর কিছু পড়ি না। তাহার "গোরাকে" অবলম্বন করিয়া আমার বক্তব্য আরম্ভ করিতে চাহি। "গোরায়" বরাবর আনন্দ পাইয়াছি; শেষটায় কিন্তু সে আনন্দ হঠাৎ নষ্ট হইয়া গেল। গোরা একজন আইরিশম্যানের ছেলে। ঘটনাচক্রে সে একজন নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণের ঘরে প্রতিপালিত হইয়া আপনাকে ব্রাহ্মণ বলিয়াই জানিত। ভারতবর্ষের হিন্দু সমাজতন্ত্রে যাহা কিছু আছে, তাহার প্রতি গোরার একটা উৎকট ভক্তি জন্মিয়াছিল; এমন কি, আমাদের ধর্ম্মে, সমাজে আচারে যে কিছু সঙ্কীর্ণতা ও অনুদারতা আছে, গোরা সেগুলিকেই আঁকড়িয়া ধরিয়াছিল; যেন ভারতের, এবং ভারতের হিন্দুসমাজের সেই গুলোই বিশিষ্ট ভাব; যেন সে গুলো না থাকিলে সমাজ টিকিবে

না। গোরার এই ভাবটা এত উৎকট ও উগ্র যে, বোধ হয় খাঁটি ব্রাহ্মণের ছেলে হইলে অত উৎকট হইত না। আইরিশম্যানের ছেলে বলিয়াই তাহার এই ভাবটা অত উৎকট হইয়াছিল। হিন্দুসমাজের এই বিশিষ্টতার সম্বন্ধে, এই সঙ্কীর্ণতার পক্ষে সে যেমন ওকালতী করিয়াছে, অথবা তাহার মুখ দিয়া উপন্যাসের লেখক যেরূপ ওকালতী করিয়াছেন, সে রকম বোধ হয় আর কাহারও পক্ষে সম্ভবপর নহে। হঠাৎ একদিন সে দেখিল যে, সে হিন্দুর ছেলে নহে, হিন্দু সমাজে তাহার কোনও স্থানই নাই; যে আশ্রয় সে সম্পূর্ণভাবে আঁকড়িয়া ধরিয়াছিল, সেখানে তাহার দাঁড়াইবার স্থান নাই; তাহার সমস্ত জীবনটা যেন ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে; যেন আর তাহার কোনও কর্ম্মই নাই; সে জগতের মধ্যে নিরাশ্রয়, একাকী; যতদিন বাঁচিবে, উদ্দেশ্যহীন ও কর্ম্মহীন জীবনের বোঝা লইয়া একাকী মৃত্যুর জন্য প্রতীক্ষা করিয়া বসিয়া থাকিতে হইবে। একটা অত্যন্ত করুণ ট্র্যাজেডি সংঘটিত হইয়া গেল; অথচ সমাজতন্ত্রের যে সঙ্কীর্ণতার দরুণ এত বড় কাণ্ডটা ঘটিল, তাহার বিরুদ্ধে একটিও কথা বলিবার রহিল না; সে চিরজীবন ধরিয়া এইটাকেই সমর্থন করিয়া আসিয়াছে। ইটের পর ইট দিয়া, চুণ সুরকী, মসলা দিয়া যেদিন সুরম্য হর্ম্যটি গড়িয়া উঠিল, হঠাৎ ভূমিকম্পে সমস্তটা চুরমার হইয়া গেল। উপন্যাসের নায়কের পঞ্জরাস্থি চূর্ণ হইয়া গেল; পাঠকেরও বুক ধসিয়া গেল; স্বয়ং লেখকেরও সেই দশা হয় নাই কি?

"গোরার এই করুণ ট্র্যাজেডি আধুনিক হিন্দু সমাজের একটা বড় সমস্যা নহে কি? ভগিনী নিবেদিতাও ত এক দিন বাহির হইতে আসিয়া কায়মনোবাক্যে হিন্দু হইয়াছিলেন; একান্তভাবে সম্পূর্ণভাবে আপনাকে এই হিন্দুসমাজের কার্য্যে নিবেদন করিয়াছিলেন। সমাজ কিন্তু তাঁহাকে সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করিতে পারে নাই। লোকবিশ্রুত

ডাক্তার কুমারস্বামীকেও আমরা সম্পূর্ণ আমাদের লোক বলিয়া পরিচয় দিতে পারি কি? যে জাপানী ভদ্রলোক শ্রীযুক্ত কিমুরা এখানকার সংস্কৃত কলেজে অধ্যয়ন করিতেছেন, তিনিও বহু চেষ্টায় কোনও হিন্দুর গৃহে থাকিবার স্থান পান নাই। হিন্দুসমাজে এই ট্র্যাজেডি বোধ হয় এখন নিত্য অভিনীত হইতে চলিল। যতদিন ভারতবর্ষের চতুঃসীমার মধ্যেই আমরা আবদ্ধ ছিলাম, ততদিন এ সমস্যাটি তত উগ্র হয় নাই। কিন্তু যে দিন হইতে বিশ্বের সঙ্গে সম্পর্ক পাতাইতে হইয়াছে, সেইদিন হইতেই এই ব্যাপার চলিতেছে, পরকে আপন করিয়া লইতে পারিতেছি না; সমাজের মধ্যে এবং বাহিরে যাঁহারা আমাদের কল্যাণকামী আছেন, তাঁহাদের পক্ষে এই ব্যাপারটি যে খুব ক্ষোভের কারণ হইয়া পড়িয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। যে ব্যক্তি বাহির হইতে আসিয়া আমাদের একান্ত আপনার হইতে চায়, ব্যক্তিগতভাবে তাহাকে আমার নিজের ঘরের ভিতর আনিয়া নিঃসঙ্কোচে তাহার সহিত একত্র বসিয়া আহার পর্য্যন্ত করিতে পারি না। ইহাতে যে ব্যথা উপস্থিত হয় না, এমন কথা বলি না। সমাজ-সংস্কারক ব্যথিত হন, এবং এই ব্যবস্থার উচ্ছেদ-সাধনে যত্নবান হন; ইহা বুঝিতে পারি। আমি কিন্তু আমাদের দেশের প্রাচীন ইতিহাসে ইহার কারণ অন্বেষণ করিয়া মনকে যেন তেন প্রবোধ দিবার চেষ্টা করি।

"এই যে স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিবার প্রবল চেষ্টা, এই যে সামাজিক exclusiveness আমাদের আছে, ইহা অস্বীকার করিবার আবশ্যকতা নাই। কিন্তু কেন এমন হইল, তাহা বুঝিবার চেষ্টা করা যাউক; সমাজ কেমন করিয়া গড়িয়া উঠিল, তাহার অতীত ইতিহাসটা কি, কি কি কারণে এই সকল আচার বিচার সমাজের অঙ্গীভূত হইয়াছে, সে সম্বন্ধে ঐতিহাসিক বিচার দরকার বোধ করি। বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে সেই বিচার করিতে

হইবে, Scientific study of history আবশ্যক। আবার সেই সঙ্গে আপেক্ষিকভাবে অর্থাৎ তুলনামূলক আলোচনাও করিতে হইবে। অন্যান্য সমাজে এ রকম ঘটনা ঘটিয়াছে কি না, তাহার comparative study আবশ্যক। যদি দেখি যে, অন্যত্রও এইরূপ ঘটিয়াছে, তাহা হইলে আমাদের মনকে কতকটা প্রবোধ দিতে পারিব; এ রকম ঘটনা সত্ত্বেও যদি অন্যান্য জাতি নষ্ট না হইয়া থাকে বা উন্নতি করিয়া থাকে, তাহা হইলে আমাদের আশা আছে। ব্যক্তিগতভাবে আমিও বলিতে চাহি যে, এই রকম করিয়া আমি মনকে প্রবোধ দিয়া থাকি। আমার নিজের এইরূপ স্বভাব দাঁড়াইয়া গিয়াছে। কিঞ্চিৎ বিজ্ঞানচর্চ্চার ফলেই হউক, অথবা আর কিছু হউক, আমার ব্যক্তিগত ঝোঁক এইরূপ দাঁড়াইয়া গিয়াছে। বিজ্ঞানচর্চ্চায় রাগক্ষোভের স্থান নাই; মঙ্গল অমঙ্গল, ভাল মন্দ, উচিত অনুচিত না দেখিয়া Science অন্বেষণ করিয়া কারণ-নির্দ্দেশে রত থাকে। সমাজ ব্যবস্থাপক বা সমাজসংস্কারক মঙ্গল অমঙ্গল, ভাল মন্দ, উচিত অনুচিত, তুলাদণ্ডে ওজন করিয়া দেখুন; science, যাহা আছে তাহা কিরূপে হইল তাহা দেখিবে, পৌর্ব্বাপর্য্য নির্ণয় দ্বারা কার্য্যকারণ সম্পর্ক নিরূপণ করিতে চেষ্টা করিবে, এই মাত্র। সামাজিক আচার অনুষ্ঠান জটিল না হইয়া সরল হইলে ভাল হইত, এরূপ ক্ষোভ প্রকাশের সময় scienceর নাই। এই প্রসঙ্গে একটি গল্প মনে পড়িয়া গেল।

"স্পেনের এক রাজা জ্যোতিষ অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করিলেন। সৌরজগতের অন্তর্গত সূর্য্য চন্দ্র এবং গ্রহগণের গতিবিধি অত্যন্ত জটিল বলিয়া বোধ হয়; বিজ্ঞান এই জটিলতার গ্রন্থিগুলি উন্মোচন করিতে চাহে, এবং ইহার মধ্যে সরল শৃঙ্খলা আবিষ্কার করিতে চেষ্টা করে। গ্রীসদেশে টলেমি নামক এক পণ্ডিত এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়া অনেকটা কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। তাঁহার বহু শত বৎসর পরে টাইকো ব্রাহি আরও

একটু সরল করিয়া যে ব্যাখ্যা দিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন তাহা এইরূপে বুঝাইতে পারি। তিনি কল্পনা করিলেন যে, পৃথিবীকে কেন্দ্র করিয়া সূর্য্য তাহার চারিদিকে চক্রাকারে প্রদক্ষিণ করিতেছে। যেন একখানি বৃহৎ অদৃশ্য চক্র আছে, তাহার নাভি হইল পৃথিবী, আর তাহার নেমিতে অর্থাৎ পরিধিতে সূর্য্য বেড়াইতেছে। আবার সেই সূর্য্যকে কেন্দ্র অথবা নাভি করিয়া ছোট বড় আরও অনেকগুলি অদৃশ্য চাকা আছে। সেই এক একখানি চক্রের পরিধিতে বুধ, শুক্র, মঙ্গল, বৃহস্পতি প্রভৃতি এক একটি গ্রহ ঘুরিতেছে। পৃথিবী এবং সূর্য্য উভয়েই যদি স্থির থাকিত, তাহা হইলে বুধাদি গ্রহের আপনাপন চক্রোপরি গতি তত জটিল দেখাইত না। কিন্তু বুধাদি গ্রহ যে সকল চক্রে ঘুরিতেছে তাহাদের নাভিস্থিত সূর্য্য স্থির না থাকিয়া নিজেও এক বৃহৎ চক্রোপরি ঘুরিতেছেন। ঘুরন্ত চাকার উপরে চাকা ঘুরিতেছে; পৃথিবী স্বস্থানে স্থির থাকিয়া গ্রহগণের এই গতিবিধি দেখিতেছে; কাজেই পৃথিবীর চোখে গ্রহগণের গতিবিধি অত্যন্ত জটিল হইয়া পড়িয়াছে। টলেমি (এবং তাঁহার পরবর্ত্তী জ্যোতিষীরা) এইরূপ কল্পনা করিয়া গ্রহগণের গতিবিধির মধ্যে কতকটা শৃঙ্খলা আনয়ন করিয়াছিলেন; কিন্তু কার্য্যতঃ দেখা গেল যে গতিবিধির জটিলতার সব কথা ইহাতেও পরিষ্কার হয় না। গ্রহগুলি যে সূর্য্যকেন্দ্রকচক্রে ঘুরিতেছে, সেই চাকার উপরে আরও ছোট ছোট চাকা কল্পনা করিতে হয়; তাহাতেও যদি না কুলায়, তাহা হইলে আরও ছোট চাকার কল্পনা করিতে হয়। পরবর্ত্তী পণ্ডিতেরা তাহাই করিয়াছেন।...এই পর্য্যন্ত শুনিয়া রাজা বলিলেন যে, বড় চাকার (cycle) উপরে ছোট চাকা (epicycle) বসাইয়া ভগবান্ জিনিষটাকে অত্যন্ত জটিল করিয়া ফেলিয়াছেন; সৃষ্টির সময় তিনি উপস্থিত থাকিলে সৃষ্টিকর্ত্তাকে সৎপরামর্শ দিতে পারিতেন।

"বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি সর্ব্বত্রই চাকার উপর চাকা বসাইয়া শৃঙ্খলা ব্যাখ্যা

করিতে চেষ্টা করে। বৈজ্ঞানিক বিধাতাপুরুষকে পরামর্শ দেন না, কেমন করিয়া জটিল না করিয়া সরল করা যাইত। পদে পদে বাধা পাইতে হয়, প্রতিহত হইতে হয়; কিন্তু বৈজ্ঞানিক ক্ষোভ প্রকাশ করেন না, বিধাতা পুরুষের জবাবদিহি চাহেন না। বস্তুতঃ এরূপ না হইলে ভাল হইত, এরূপ নির্দ্দেশ বিজ্ঞানবিদ্যার কাজ নহে; উহা বলিবার তাহার অধিকার পর্য্যন্ত নাই।

"আজকাল বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত মনুষ্যসমাজকে যন্ত্রহিসাবে দেখিতেছেন; জড়যন্ত্র নহে, জীবন্ত যন্ত্র হিসাবে দেখাই এখন রীতি। ঘড়ি, এঞ্জিন, সৌর-জগৎ প্রভৃতি জড়যন্ত্র; গাছ, লতা জন্তুদেহ প্রভৃতি জীবন্ত যন্ত্র। পিপীলিকার বা জীবাণুর শরীরের মধ্যে যে জটিলতা আছে, তাহা অত বড় সৌরজগৎটায় নাই। জীবদেহের সহিত তুলনা করিয়া মনুষ্যসমাজ-দেহকেও যন্ত্রবদ্ধ organised structure বলা হয়। জীবের যেমন জ্ঞানেন্দ্রিয়, কর্ম্মেন্দ্রিয়, অস্থি মজ্জা প্লীহা যকৃৎ প্রভৃতি আছে, সমাজদেহেরও সেই রকম আছে। জীবদেহের প্রত্যেক অঙ্গের যেমন এক একটা কাজ বা function আছে, সমাজদেহেরও তাই। জীবদেহের মত সমাজেরও জন্ম, বৃদ্ধি, জরা মরণ প্রভৃতি কল্পনা করা হয়। জীবন জিনিষটা কি, তাহা বলা কঠিন। হার্ব্বার্ট স্পেন্সরের definitionএ কাজ চলিতে পারে। তিনি বলেন, জীবনটা আর কিছু নহে, a continuous adjustment of internal relations to external relations, পারিপার্শ্বিক অবস্থার সহিত দেহের আভ্যন্তরীণ অবস্থার সামঞ্জস্য রক্ষা করিবার অবিরাম চেষ্টা। এই যে external relations বাহিরের পারিপার্শ্বিক অবস্থা, আজকাল ইহাকে environment বলে। জীব অবিরত আপনাকে সেই পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে সমঞ্জস করিবার জন্য ব্যস্ত। এই অবিরাম, ধারাবাহিক চেষ্টার পরম্পরাই জীবন; এই চেষ্টার একমাত্র উদ্দেশ্য, জীবনটাকে যতদিন পারে

রক্ষা করা। যে দিন এই চেষ্টার আরম্ভ, সেই দিন জীবের জন্ম হয়; যে দিন এই চেষ্টার অবসান, সেই দিন তাহার মৃত্যু। জীবনের রক্ষা, পুষ্টি, বৃদ্ধি ও উন্নতির জন্য যাহা কিছু আবশ্যক, সে সমস্তই বাহিরের পারিপার্শ্বিক জগৎ হইতে আহরণ করিয়া লইতে হয়; জল, বায়ু, খাদ্য সামগ্রী প্রভৃতি সমস্ত উপকরণই বাহ্য জগৎ হইতে গ্রহণ করা হইতেছে। অন্যদিকে জীবের environment কিন্তু ক্রমাগতই জীবকে নষ্ট করিবার চেষ্টা করিতেছে; রৌদ্র, বৃষ্টি, শীতাতপ, অগ্নিদাহ, ভূমিকম্প, স্বজাতীয় বিজাতীয় নানা শত্রু জীবনটাকে নষ্ট করিতে চাহে। ইহাদিগের মধ্যে কতকগুলি শত্রু জড়, আর কতকগুলি জীব। জড় শত্রু ও জীব শত্রু হইতে আত্মরক্ষা আবশ্যক। শুধু তাহাই নহে; আপনাকে শত্রুর হাত হইতে রক্ষা করিয়া, যতটা পারা যায় সেই সব শত্রুকে মিত্র রূপে পরিণত করিতে হইবে। জীবদেহের সমস্ত যন্ত্রগুলি এই উদ্দেশ্যের অনুযায়ী হইয়া গঠিত হইয়াছে; তাহা না হইলে তাহাদের কোনও সার্থকতা নাই। দুঃখের বিষয় এই যে, এই সামঞ্জস্য কোনও কালেই সম্পূর্ণ হয় না; যদি হইত, তাহা হইলে বোধ হয় জরা, মরণ, দুঃখের কোনও কারণই থাকিত না। সামঞ্জস্য নাই বলিয়াই উন্নত জীবের যত কিছু ক্লেশ; এবং বার্দ্ধক্যপ্রাপ্তি ও মরণ। আবহমান কাল ধরিয়া এই সামঞ্জস্য সাধনের দিকে একটা গতি আছে, চেষ্টা আছে; কিন্তু পুরা সামঞ্জস্য হয় না। এই ষোল আনা সামঞ্জস্য কখনও ঘটে না অথচ ক্রমাগত একটা চেষ্টা আছে; এইটাকেই জীবনের প্রধান লক্ষণ বলিয়া ধরিতে পারা যায়। জড়যন্ত্রের সামঞ্জস্য প্রায় ষোল আনাই দেওয়া হইতে পারে; এমন কি সৌরজগতের এত জটিলতা সত্ত্বেও প্রায় ষোল আনা সামঞ্জস্য আছে: লাপ্লাস প্রতিপন্ন করেন যে, এত জটিলতা সত্ত্বেও সৌরজগৎ কখনও ভাঙ্গিয়া পড়িবে না। আজকালকার পণ্ডিতেরা এতটা সাহস করেন না; তাঁহারা বলেন যে,

অন্যান্য জড়যন্ত্রের মত সৌরজগৎটাও কালক্রমে একদিন অকর্ম্মণ্য হইয়া যাইতে পারে।

"জীবদেহের সামঞ্জস্যের অভাব খুব বেশী। দেহযন্ত্রের গঠনপ্রণালীর ও কার্য্যপ্রণালীর পর্য্যালোচনা করিলে বিস্মিত হইতে হয়। কিন্তু যাঁহারা শরীর-বিদ্যা আলোচনা করেন, তাঁহারা জানেন যে, এই দেহযন্ত্রের মধ্যে কোনও যন্ত্রই সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ নহে। Optical যন্ত্র হিসাবে চক্ষুতে নানা দোষ বর্ত্তমান। হেলম্ হোলজ্ তন্ন তন্ন করিয়া আলোচনা করিয়া বলিয়াছেন যে, যন্ত্র হিসাবে মানুষের চোখে এত দোষ বর্ত্তমান আছে যে, যদি কোনও যন্ত্রনির্ম্মাতা এই রকম একটা যন্ত্র তৈয়ার করিয়া তাঁহার নিকট লইয়া আসিত, তাহা হইলে তিনি সেটাকে কখনই গ্রহণ করিতেন না; স্পেনের সেই রাজার মত বলিতে পারিতেন যে, সৃষ্টিকালে উপস্থিত থাকিলে এ রকম যন্ত্র হইতে দিতেন না। চক্ষুর মত অন্যান্য যন্ত্রগুলাও সামান্য কারণে বিকৃত হয়, অনেক সময়ে ডাক্তার কিছুই করিতে পারেন না। পারিপার্শ্বিক অবস্থার, Environmentএর পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে জীবের দেহযন্ত্র সমঞ্জস রাখিতে পারা যায় না। এই যে mal-adjustment অসামঞ্জস্য, ইহাই সমস্ত ব্যাধির, সমস্ত ক্লেশের, সমস্ত দুঃখের অমঙ্গলের এবং শেষ পর্য্যন্ত মরণের হেতু।

"পারিসের পাস্তুর ইনষ্টিটিউটের অধ্যক্ষ প্রসিদ্ধ জীববিদ্যাবিৎ মেচ্নিকফ (Metchnikoff) জীবদেহে নানা ব্যাধির উৎপত্তি সম্বন্ধে নূতন নূতন তথ্য আবিষ্কার করিয়া চিকিৎসাশাস্ত্রে যুগান্তর আনিয়াছেন। Bactriology জীবাণু বিদ্যায় তাঁহার সমকক্ষ আর কেহ নাই। তাঁহার Nature of man পুস্তকখানি সরল সুবোধ্য ভাষায় লিখিত; সকলেরই উহা পাঠ করা উচিত। ঐ পুস্তকের প্রতিপাদ্য বিষয় হইল Origin of Evil, অমঙ্গলের হেতু কি? তিনি দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন

যে, মানুষের যাবতীয় অমঙ্গল বাহ্যজগতের সঙ্গে মানবদেহের পূর্ণ সামঞ্জস্যের অভাব হইতে উদ্ভূত; এই অসামঞ্জস্যই সমস্ত অমঙ্গলের, ক্লেশের, দুঃখের হেতু। দেহের সকল অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নিজ নিজ কর্ত্তব্যের কতকটা উপযোগী বটে, কিন্তু সম্পূর্ণ নহে; বাহ্যজগতে কোনও রকম পরিবর্ত্তন উপস্থিত হইলে আপনাদিগকে তাহার অনুযায়ী করিয়া লইবার ক্ষমতা কতকটা আছে, কতকটা নাই; বহিঃশত্রুর আক্রমণ নিরাকরণের ক্ষমতা কতকটা আছে, কতকটা নাই। আবার শরীরের মধ্যে এমন যন্ত্র আছে, যাহাদের অস্তিত্ব অনাবশ্যক; শুধু যে অনাবশ্যক তাহা নহে, অনেক সময়ে তাহারা অনিষ্ট করিয়া বসে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যাইতে পারে,—Vermiform appendix। ইহার কোনও কাজ (function) নাই, অথচ ইহা মারাত্মক ব্যাধির স্থান; পেটের মধ্যে মোটা অন্ত্রের (large intestines) সহিত সরু অন্ত্রের (small intestines) সংযোগস্থলে ওটা আছে, জোঁকের মত ঝুলিয়া আছে; তাই উহার ঐ রকম নামকরণ হইয়াছে। খাদ্য দ্রব্য পরিপাকের পর তাহার বর্জ্জনীয় অংশ মোটা অন্ত্রের মধ্যে যাইবার সময় কখনও কখনও ঐ appendixএর মধ্যে প্রবেশ করে; তাহার ফলে মারাত্মক appendicitis ব্যারাম হয়। এইরূপ যন্ত্র আরও আছে। এই অনাবশ্যক যন্ত্রটির সম্বন্ধে পূর্ব্বোক্ত স্পেনের রাজা কি বলিতেন?

"মানুষের সকল ভয়ের মধ্যে প্রধান ভয়—জরা ও মরণ; এই দুইটা তাহাকে যতটা অভিভূত করিয়া রাখিয়াছে, ততটা আর কিছুতে নহে। রাজপথে ভ্রমণ করিবার সময় বুদ্ধদেব জরা-মরণ দেখিতে পান; মানুষকে এই জরা-মরণের হাত হইতে রক্ষা করিবার জন্য তাঁহার মহাভিনিষ্ক্রমণ হইল। এই মরণটা কিরূপে এবং কেন পৃথিবীতে আসিল, এই প্রশ্নই ইহুদি ধর্ম্ম-শাস্ত্রের গোড়ার কথা। এই মরণভয়ের হাত

হইতে মানুষকে রক্ষা করিবার জন্য যীশুখৃষ্ট অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। মেচ্‌নিকফ্ ঐ পুস্তকে যাবতীয় ধর্ম্মশাস্ত্রও আলোচনা করিয়াছেন; বেদান্ত, বৌদ্ধ, খৃষ্টীয়, ইস্‌লাম ধর্ম্ম Theism, pantheism; এবং প্লেটো হইতে আরম্ভ করিয়া কাণ্ট্, হেগেল প্রভৃতি যাবতীয় দর্শন-শাস্ত্রও আলোচনা করিয়াছেন: তিনি বলেন যে, সমস্ত ধর্ম্ম এবং সমস্ত দর্শনশাস্ত্র এই মরণের ভয় নিবারণের জন্য ব্যর্থ চেষ্টা করিয়াছে। মরণভয় হইতে কিছুতেই নিষ্কৃতি নাই দেখিয়া এই সকল ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক ও দর্শনপ্রবর্ত্তক কল্পনা করিয়া লইয়াছেন যে, মানুষ মরিয়াও মরে না; দেহ নষ্ট হয় বটে, কিন্তু মানুষটা কোনও রকমে চিরকালের জন্য টিকে যায়, কিংবা জন্মান্তর পরিগ্রহ করে। তাঁহার মতে ইঁহারা সকলেই আত্ম-প্রতারণা করিয়াছেন। ধর্ম্ম বা দর্শনশাস্ত্র মানুষকে অভয় দিতে পারে না; বিজ্ঞান বরং কিছু অভয় দিতে পারে। প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক ওয়াইজ্‌মান মরণ হইতে নিষ্কৃতির আশা জীবকে দেন না; অতি নিম্ন পর্য্যায়ের জীব, যাহাদের শরীর কেবল একটি মাত্র কোষে (cell) নির্ম্মিত, তাহারা মরিতে বাধ্য নয়। কিন্তু একটু উচ্চ স্তরের জীব (যাহাদের দেহ বহু কোষে নির্ম্মিত) মরিতে বাধ্য। তাহারা মৃত্যু-রূপ মূল্য স্বীকার করিয়া এই উচ্চ পদবী লাভ করিয়াছে। মেচনি-কফ্ কিন্তু এতটা স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহেন। তবে তিনিও এখন পর্য্যন্ত মৃত্যুর হাত এড়াইবার উপায় আবিষ্কার করিতে পারেন নাই, কিংবা কোনও আশা দিতেও পারেন নাই। তিনি বলেন যে, মরণটা তত ভয়ের জিনিষ নহে; কাল পূর্ণ হইলে ক্লেশহীন মরণ ভয়ঙ্কর নহে। মানুষ মরণকে ভয় করে না; জরা ও অকাল-মরণকে ভয় করে। এ দুইটা অনেকটা নিবারণ করা যাইতে পারে। এখনই কিছু কিছু সাধ্য হইয়াছে; ভবিষ্যতে আরও হইবে। মানুষের রক্তে-

কতকগুলা লাল ও শ্বেত কণিকা সঞ্চরণ করে; লাল কণিকা বাতাসের Oxygen লইয়া শরীরকে শোধন করে, শ্বেত কণিকা দেহকে রক্ষা করে; বাহির হইতে কোনও অনিষ্টকর দ্রব্য বা রোগের বীজ শরীরে প্রবেশ করিলেই ঝাঁকে ঝাঁকে শ্বেত কণিকা সেখানে আসিয়া সেটাকে নষ্ট ও জীর্ণ করিতে চায়। সমাজ দেহের তুলনায় ইহারা পুলিশ ও সৈনিকের কাজ করে। ইহাদের স্বভাব কতকটা রাক্ষসের মত। ইহারা রোগের বীজকে খাইয়া ফেলে ও জীর্ণ করিবার চেষ্টা করে। জীব যখন যৌবন অতিক্রম করে, তখন এই সকল রক্ষকেরাই ভক্ষক হইয়া দাঁড়ায়; বাহিরের শত্রু ধ্বংস করার সঙ্গে শরীরের tissueও ধ্বংস করে। বার্দ্ধক্যে যে শরীর ক্রমশঃ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, ও দৌর্ব্বল্যের লক্ষণ উপস্থিত হয়, ইহাই তাহার একটা কারণ। দেহযন্ত্রের সামঞ্জস্যের এই এক গোলযোগ যে, যন্ত্রের এক অংশ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া আর এক অংশকে নষ্ট করিতে চায়।

"জরার আর একটা কারণেরও নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে,—উল্লিখিত মোটা অন্ত্রটা। এটা অনাবশ্যক পরিমাণে দীর্ঘ। খাদ্য পরিপাকের পর বর্জ্জনীয় অংশ এইখানে সঞ্চিত থাকে। খাদ্য দুই রকম,—জন্তুজ ও উদ্ভিজ্জ। মাংসাদি জন্তুজ খাদ্য সহজে হজম হয়, বর্জ্জনীয় অংশও অল্প; কাজেই অল্প পরিমাণ হইলেও দেহরক্ষায় সমর্থ; উদ্ভিজ্জ খাদ্য সহজে হজম হয় না, বর্জ্জনীয় ভাগও বেশী; তাই বেশী পরিমাণে খাইতেও হয়। মানুষের পূর্ব্বপুরুষ বানর বা বনমানুষ জাতীয় ছিল; তাহারা মুখ্যতঃ উদ্ভিজ্জভোজী ছিল; তাহাদের অন্ত্রটাকে বোঝাই করিবার জন্য ও শরীর রক্ষার জন্য বেশী খাদ্য আবশ্যক ছিল; কাজেই অন্ত্র সেই পরিমাণে দীর্ঘ ছিল। মানুষ উত্তরাধিকারসূত্রে সেই দীর্ঘ অন্ত্র লাভ করিয়াছে; অথচ মানুষ জন্তুজ খাদ্য হজম করিতে পারে; কাজেই মানুষের পক্ষে অত লম্বা অন্ত্র অনাবশ্যক।

মাংস সহজে হজম হয়, অল্প মাত্রায় চলে, উদ্ভিজ্জের চেয়ে পুষ্টিকর; এসকল সত্ত্বেও কেবল অন্ত্রটাকে বোঝাই করিবার জন্য মানুষকে বহুপরিমাণে উদ্ভিজ্জ খাদ্য খাইতে হয়। কেবল যে চাল, গম, যব প্রভৃতি উদ্ভিজ্জের মধ্যে সার পদার্থ খাইতে আরম্ভ করা হয়, তাহা নহে; শাক পাতা তরকারি প্রভৃতি জিনিষ, যাহার অধিকাংশই বর্জ্জনীয়, শরীর পুষ্টির পক্ষে যাহা প্রায় কোনও কাজেই লাগে না, তদ্দ্বারা মোটা অন্ত্রকে বোঝাই করিতে হয়। অন্ত্রমধ্যে এই আবশ্যক আবর্জ্জনা-বহন যে কেবলমাত্র ভার বহন তাহা নহে; ইহা নানাবিধ রোগেরও নিদান; জরার ইহা একটা প্রধান হেতু। অন্ত্রনাড়ীর ভিতরে নানা জীবই বাস করে। ইহাদিগের অধিকাংশই উদ্ভিজ্জ শ্রেণীভুক্ত; ইহারা সঞ্চিত আবর্জ্জনা পাইলেই একটা যেন মহোৎসবে মাতিয়া যায়। প্রচুর খাদ্য পাইয়া একটা জীবাণু হইতে কোটি জীবাণু উৎপন্ন হয়। যত সংখ্যায় বাড়িতে থাকে, ততই তাহারা একটা বিষময় পদার্থ উদগীরণ করিতে থাকে; বিষটা উগ্র না হইলেও অতি ধীরে ধীরে সমস্ত শরীরে বিস্তার লাভ করিয়া শরীরের অন্যান্য tissueকে ও ধাতুকে আক্রমণ করিতে থাকে। প্রধানতঃ এই সমস্ত বিষাক্ত পদার্থেরই বহুদিনের ক্রিয়ার ফলে বার্দ্ধক্যের নানাপ্রকার বিকার আসিয়া উপস্থিত হয়। যে সকল নাড়ীর ভিতর দিয়া রক্ত সঞ্চালিত হয়, সেগুলি ক্রমশঃ কাঠিন্যপ্রাপ্ত হয়; রক্ত তাহার ভিতর দিয়া জোর করিয়া ঠেলিয়া প্রবাহিত হইতে চেষ্টা করে; খুব বেশী টান পড়িলে নাড়ী ছিঁড়িয়া পক্ষাঘাত হয়; ক্রমশঃ স্নায়ুযন্ত্রের তারেরও স্থিতিস্থাপকতা নষ্ট হইয়া যায়। এইগুলি বার্দ্ধক্যের বিশেষতঃ অকাল বার্দ্ধক্যের, সাধারণ লক্ষণ; বার্দ্ধক্যের, জরার ও অকালমৃত্যুর সাধারণ কারণ। যতদিন না ঐ অনাবশ্যক বড় অন্ত্রটা ছোট হইয়া যায়, ততদিন উহা রোগের আকর হইয়া থাকিবে। আপাততঃ এই ব্যাধির হাত এড়াইবার জন্য মেচ্‌নিকফ একটা ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন।

রীতিমত দধি সেবন করিলে ঐ দুষ্ট জীবাণুগুলি মরিয়া যায়; অতএব বাল্যকাল হইতে দই খাইলে বার্দ্ধক্যের ও অকালমৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা পাওয়া যাইতে পারে। অতএব যদি মৃত্যুভয় হইতে মুক্তি চাও, তবে বুদ্ধ, প্লেটো, খৃষ্টের বুজরুকির দরকার নাই; দই খাও।"

* * * *

রামেন্দ্রবাবু চুপ করিলেন। কোথায় রবি বাবুর 'গোরা', আর কোথায় Metchnicoffএর দই খাওয়ার ব্যবস্থা! কিন্তু বিচিত্র প্রসঙ্গে কোনও কিছুরই অসামঞ্জস্য নাই। আমি মন্ত্রমুগ্ধের মত শুনিতেছিলাম। চমক ভাঙ্গিয়া গেলে দেখিলাম সম্মুখে এক বাটী—দই নহে, চা। হায় মেচ্‌নিকফ্! তোমার বড় অন্ত্রের কথায় আমার অন্ত্রস্থ জীবাণুগুলি বিদ্রোহী হইয়া উঠিয়াছিল; রক্তবহ নাড়ী ক্রমশঃ কাঠিন্যপ্রাপ্ত হইতেছিল। অনাবশ্যক বড় অন্ত্রটাকে যখন বহন করিতেই হইবে, তখন দধি অভাবে অন্ততঃ চা খাওয়াটাই প্রশস্ত।

* * * *

রামেন্দ্র বাবু পুনরায় বলিতে আরম্ভ করিলেন,—"পারিপার্শ্বিক অবস্থার সহিত আভ্যন্তরীণ অবস্থার সামঞ্জস্য যদি একেবারেই না হয়, তাহা হইলে জীবের মৃত্যু। আবার পূরা ষোল আনা সামঞ্জস্য হইলে, সামঞ্জস্য-স্থাপনের চেষ্টা থাকে না; তাহারও ফল, মৃত্যুর তুল্য, জড়ত্ব; কারণ, পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, এই সামঞ্জস্যের চেষ্টার পরম্পরাই জীবনের নামান্তরমাত্র। এই ষোল আনা সামঞ্জস্য জড় পদার্থেই সম্ভব; জীবে নহে। জড়ও বোধ করি পূর্ণ সামঞ্জস্য লাভ করিতে পারে না।

"সামঞ্জস্য স্থাপিত হইলেও তাহা বেশীদিন স্থায়ী হয় না; কারণ পারিপার্শ্বিক অবস্থাটা পরিবর্ত্তনশীল। একই দেশের নানা পরিবর্ত্তন; দেশ ভেদে পরিবর্ত্তন ত আছেই; তদ্ব্যতীত ভূমিকম্প, জলপ্লাবন প্রভৃতি

আকস্মিক পরিবর্ত্তনও আছে ; ভূপৃষ্ঠের যুগব্যাপী পরিবর্ত্তন আছে। এককালে মেরুপ্রদেশেও হয়ত মনুষ্য বাস করিত ; তখন য়ুরোপের উত্তর খণ্ডে সিংহ শার্দ্দুল বিচরণ করিত। Glacial Epoch বা হিমানীযুগ আসিল ; সমস্ত মহাদেশটা বরফে মণ্ডিত হইয়া গেল। আবার নূতন যুগ আসিল ; সেই বরফের আস্তরণ সরিয়া গেল। এই সকল আকস্মিক পরিবর্ত্তনের সঙ্গে জীবের পরিবর্ত্তন হয় ; নহিলে সামঞ্জস্য রক্ষা হয় না। যে সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে না পারে, সে লোপ পায় ; ম্যামথ্, ম্যাষ্টডন লোপ পাইয়াছে।

"কিন্তু জীবের প্রধান শত্রু জীব। খাবার কাড়াকাড় করিতে সকলেই ব্যস্ত। আবার জীবের মধ্যে খাদ্য-খাদক সম্বন্ধও রহিয়াছে। আবার নূতন জীবের আবির্ভাবে অন্যান্য জীবের জীবন-প্রণালী পরিবর্ত্তিত হয় ; প্রাণিবিদ্যার অনুশীলন করিলে ইহার দৃষ্টান্ত অনেক পাওয়া যায়। অষ্ট্রেলিয়ায় আগে খরগোস ছিল না। যখন উপনিবেশ স্থাপিত হয়, বিদেশী মানুষের সঙ্গে শশকও প্রবেশলাভ করে। এখন শশকের এত বংশবৃদ্ধি হইয়াছে যে, ক্ষেতের ফসল রক্ষা করা দায় হইয়া উঠিয়াছে ; অন্নের জন্য শশকের সহিত মানুষের বিরোধ উপস্থিত হইয়াছে।

"জীবের ব্যক্তিগত জীবনটা যেমন তাহার পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্য-স্থাপনের প্রয়াস, তাহার জাতিগত জীবনটাও সেইরূপ পরিবর্ত্তনশীল environmentএর সঙ্গে সামঞ্জস্য স্থাপনের প্রয়াস। যুগযুগান্তর ধরিয়া এইরূপ হইতেছে। ইহার ফলে নূতন নূতন জাতীর উদ্ভব হয়। যে জাতি অবস্থার পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে পরিবর্ত্তিত করিতে পারিল, সেই জাতিই টিকিয়া গেল ; যে পারিল না, যে মরিল। যে টিকিয়া গেল, সে হয়ত নূতন চেহারায় দেখা দিল, নূতন অবয়ব প্রাপ্ত হইল।

"তাহা হইলে দাঁড়াইল এই যে, বাহিরের পারিপার্শ্বিক অবস্থার পরিবর্ত্তন না হইলে, জীবের আভ্যন্তরীণ অবস্থার পরিবর্ত্তন আবশ্যক নহে; জীব তখন রক্ষণশীল, Conservative। বাহিরের পরিবর্ত্তন হইলে এই রক্ষণশীলতার ব্যতিক্রম আবশ্যক হয়, Variation আসিয়া পড়ে; নহিলে সামঞ্জস্য-রক্ষা হয় না। প্রথমটাকে বলা যাইতে পারে—স্থিতিশীলতা, Principle of stability; অপরটাকে বলা যাইতে পারে—সামঞ্জস্যপ্রয়াস, liberalism, or principle of adaptability। জীববিদ্যায় (Biology) প্রথমটার নাম—Heredity বংশানুক্রম; অপরটার নাম Variation, ব্যতিক্রম। Heredityর ফলে ছেলে ঠিক বাপের মত হইত, যদি Variation ব্যতিক্রম না ঘটিত। এই দুইটি principleকে সত্য বলিয়া মানিয়া লইয়া assume করিয়া ইদানীং জীবতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতমণ্ডলী অভিব্যক্তিবাদের (Evolution) ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা করেন। এই Variation কেন হয়, সে সম্বন্ধে তাঁহাদিগের মধ্যে যথেষ্ট মতভেদ আছে। এখানে জীববিদ্যা-সংক্রান্ত কএকটি মতের উল্লেখ করা যাইতে পারে—তাহাতে বিচিত্র-প্রসঙ্গের বৈচিত্র্য বর্দ্ধিতই হইবে।

লামার্ক্

"প্রথমেই লামার্ক্‌কে লইয়া আরম্ভ করিতে হয়। তিনি গোড়া হইতে ধরিয়া লইলেন যে, জীব আপনার চেষ্টা ও অভ্যাসের দ্বারা আপনার আভ্যন্তরীণ অবস্থা পরিবর্ত্তিত করিতে পারে; এবং সেই চেষ্টার দ্বারা যে পরিবর্ত্তন হয়, তাহা পুরুষানুক্রমে সংক্রামিত হয়। বহুযুগব্যাপী পুরুষপরম্পরাগত পরিবর্ত্তনের ফলে সেই জীবের আগাগোড়া বদলাইয়া যাইতে পারে; সে একটা নূতন জীব দাঁড়াইয়া যায়। কর্ম্মকার

আজীবন হাতুড়ি পিটিয়া গেল; তাহার পুত্র-পৌত্রাদিও হাতুড়ি পিটিয়া জীবন কাটাইল; পরে ক্রমশঃ তাহার বংশধর শক্ত পেশী লইয়া জন্মগ্রহণ করিবে। এই রকমে মানুষের মধ্যে একটা শক্ত পেশীওয়ালা কামার জাতির উদ্ভব হইতে পারে। জিরাফ্ Giraffe দেখিতে এককালে হরিণের মতই ছিল; হয় ত কোন বিস্মৃত Geologic যুগে বনের গাছগুলা ক্রমশঃ কিছু লম্বা হওয়ায় Giraffe গলা বাড়াইয়া গাছের পাতা খাইতে চেষ্টা করিল। প্রত্যেক/পুরুষের চেষ্টার ফল পরপুরুষে সংক্রান্ত হইয়া পুরুষপরম্পরাক্রমে গলা লম্বা হইয়া গিয়াছে। যে গলা লম্বা ছিল না, বহুপুরুষের চেষ্টায় তাহা অত্যন্ত লম্বা হইয়া হরিণ জিরাফে পরিণত হইল।

২। ডারুইন্

সমস্যাটা এই যে, জীবের যে আভ্যন্তরীণ পরিবর্ত্তন হইল, সেটা পুরুষানুক্রমে সংক্রামিত হয় কি না? কামারের শক্ত পেশী তাহার ছেলে পায় কিনা? ডারুইন্ তাহা অস্বীকার করিতেন না; কিন্তু ডারুইন্ বলিলেন, জীবদেহের পরিবর্ত্তনের আরও প্রবল হেতু বিদ্যমান আছে। অন্নের জন্য জীবের মধ্যে কাড়াকাড়ি ব্যাপার চলিয়াছে, কারণ অন্নের পরিমাণের চেয়ে জীবের সংখ্যাই বেশী। যে সমর্থ, তারই অন্ন জুটিবে; অসমর্থের জুটিবে না। প্রকৃতি যেন চালুনি হাতে করিয়া বসিয়া আছেন; যে সমর্থ সেই ছিদ্রের ভিতর দিয়া অবাধে চলিয়া যাইতেছে, যে অসমর্থ তাহাকে ঝাড়িয়া ফেলিয়া নষ্ট করা হইতেছে; প্রকৃতির এই বাছাই কাজের নাম দেওয়া হইয়াছে Natural Selection বা প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন; এবং প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের হেতুর নাম দেওয়া হইয়াছে Struggle for existence বা জীবন-সংগ্রাম। যে বেশী

সমর্থ সেই টিকিয়া যায়,—গায়ের জোরেই হউক, বুদ্ধির জোরেই হউক, কৌশলের জোরেই হউক, অথবা ভীরুতার দরুণই হউক। যে Variation গুলি এই প্রবল জীবনসংগ্রামে জীবের অনুকূল, সেইগুলিই টিকিয়া যায়; নূতন জাতির (Species) সৃষ্টি হয়। বহুযুগ ধরিয়া বংশানুক্রমে নানা ব্যতিক্রম হওয়ায় এক পূর্ব্বপুরুষ হইতে বাঘ ও বিড়াল দুইটা স্বতন্ত্র জাতি উৎপন্ন হইয়াছে। হয় ত, অন্য Variationগুলিও হইয়াছিল; কিন্তু তাহারা প্রতিকূল অবস্থার সহিত সংগ্রামে টিকিল না। যে আদিম জন্তু হইতে ইহারা উদ্ভূত, সেও লুপ্ত হইয়াছে। এখনকার বানর, বনমানুষ ও মানুষ এখনকার environmentএর উপযোগী হইয়া আছে; যে আদিম ape হইতে ইহারা উৎপন্ন, সে লোপ পাইয়াছে; হয় ত অন্যান্য শাখা-প্রশাখাও হইয়াছিল, তাহারও টিকিল না; মাঝে মাঝে সেই সকল জন্তুর কিছু কিছু চিহ্ন মাটির ভিতর হইতে বাহির হইয়া পড়ে। প্রকৃতির এই ভাঙ্গাগড়ার কথা ভাবিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যায় যে ভাঙ্গে বেশী, গড়িয়া উঠে অতি অল্প। এই উগ্র জীবন-সংগ্রামে অধিকাংশই নষ্ট হইয়া যায়। শতকরা একটা হয় ত কোনও রকমে টিকিয়া যায় বা যায় না। জীবের উন্নতি লাভের একটা প্রধান উপায়—একটা কাড়াকাড়ি মারামারি রক্তারক্তি ব্যাপার; এবং ইহার মত wasteful বা অপব্যয়াত্মক ব্যাপার জগতে নাই। একটা জীবের একটুকু উন্নতি সাধনের জন্য লক্ষ লক্ষ জীবকে সংহার করিয়া ফেলিতে হয়! সৃষ্টিকালে উপস্থিত থাকিলে ডারুইন্ বিধাতাপুরুষকে সৎপরামর্শ দিতেন কি না, তাহা কোথাও বলেন নাই।

"কেন এই বংশানুক্রমের Variation হয়, ডারুইন্ সে সম্বন্ধে বড় একটা আলোচনা করেন নাই; তিনি গোড়া হইতে ধরিয়া লইয়াছেন যে, অল্পে অল্পে ধীরে ধীরে ব্যতিক্রম হইতে থাকে; ইহারই ফলে বহুযুগ

পরে, বহু ধ্বংসকার্য্য সমাধানের পরে একটা নূতন জাতি (Species) গড়িয়া উঠিতে পারে। উচ্চশ্রেণীর জীবের মধ্যে Variation অবশ্যম্ভাবী, কারণ তাহারা স্ত্রীপুরুষ-সংসর্গজনিত। এই Variationএর একটা কারণ চোখের উপর দেখা যায়। পুংবীজ ও স্ত্রীবীজ একযোগে সন্তান উৎপাদন করে; কিন্তু পিতা ও মাতা যখন সর্ব্বাংশে একপ্রকৃতির নহে, তখন পিতা মাতা উভয়েরই ভিন্ন ভিন্ন বিশিষ্ট ধর্ম্ম সন্তানে সংক্রান্ত হইয়া সন্তানকেও পিতা ও মাতা হইতে কিছু না কিছু ভিন্নরূপ করিবে।

৩। গ্যাল্‌টন

"আরও সূক্ষ্ম করিয়া বলিলেন যে, সন্তান যে শুধু নিজের বাপ মায়ের 'ধাত' (character) পায়, তাহা নহে, সে তাহার পিতামহ, প্রপিতামহ মাতামহ, প্রমাতামহ প্রভৃতি যাবতীয় পুর্ব্বপুরুষেরও 'ধাত' পায়; সুতরাং এতগুলি পূর্ব্বপুরুষের বিশিষ্ট ভাব পরপুরুষে সংক্রামিত হইয়া একটা নূতন পরিবর্ত্তন ঘটাইবে তাহাতে বিচিত্র কি?

৪। ওয়াইজমান

"লামার্ককে তুড়ি দিয়া উড়াইয়া দিলেন। তিনি বলেন, পিতার স্বোপার্জ্জিত 'ধাত' সন্তানে সংক্রামিত হয়, তাহার কোনও প্রমাণ নাই। ডারুইনেরপ্রাকৃতিক নির্ব্বাচনই জীবের উন্নতির কারণ। জীবের সমস্ত দেহটা বিশেষ কিছু নহে; সন্তানোৎপাদক বীজটাই দেহের সারভাগ। সমস্ত দেহ ঐ বীজটুকুকে রক্ষা করিবার জন্য ঐ বীজ কর্ত্তৃকই নির্ম্মিত হইয়াছে। উহা যেন একটা কৌটা; উহার অভ্যন্তরে বীজরূপ নিধিটুকু সযত্নে রক্ষিত আছে। মৃত্যু হয় দেহের, বীজের নহে। এই বীজ (germ

plasm) আপনাকে রক্ষা করিবার জন্য আপনা হইতে আপনার দেহ নির্ম্মাণ করিয়া লয়। এই দেহের একমাত্র কাজ, সেই বীজকে রক্ষা করা। জীব সেই germ-plasm মাত্র; সে অবিনশ্বর। যথাকালে জীবের বীজ (germ-plasm) আপনার কিয়দংশ বাহিরে ছুড়িয়া ফেলিয়া দেয়; সেই নিক্ষিপ্ত অংশ আবার আপনার দেহ আপনি গঠন করিয়া সন্তানরূপে পরিণত হয়। পিতার দেহাংশ পুত্র পাইল না; বীজের (germ-plasm) অংশ পাইল। বাহ্য জগতের যত কিছু উপদ্রব, তাহা দেহাংশের উপর, বীজের উপর নহে; কেন না বীজ দেহের ভিতর গুপ্ত থাকে; কাজেই দেহের বিকারে বীজের বিকার হয় না।

সন্তান যখন পৈতৃক দেহাংশ পায় না, তখন সেই দেহের Variation তাহাতে সংক্রামিত হইতে পারে না। পিতার চেষ্টায় দেহের যে বিকার ঘটে, বীজ তাহাতেও বিকৃত হয় না। কাজেই লামার্কের সিদ্ধান্তে গোড়ায় গলদ। বাপের উপার্জ্জিত বা চেষ্টালব্ধ কোন গুণ সন্তান একেবারেই পায় না। এই Germ-plasm লইয়াই বংশানুক্রম, heredity; দেহ লইয়া নহে। তবে, Variationএর একটা কারণ আছে;—সেটা দেহ-ঘটিত নহে, germ-plasm ঘটিত। পিতামাতার germ-plasm বিভিন্ন; এই জন্য উভয়ের সংযোগে সন্তানের germ-plasmএ variation হইয়া থাকে; বিভিন্ন germ-plasmএ উভয় বীজের সংমিশ্রণ না হইলে বংশানুক্রমের ব্যতিক্রম হইত না। ওয়াইজমান বলেন, পিতামাতা একযোগে এক বা একাধিক সন্তানের জন্ম দিয়া নিজেরা মরিতে শিখিয়াছেন; সন্তানের সহিত জীবনযুদ্ধে নিযুক্ত হওয়া কর্ত্তব্য বোধ করেন না। সন্তানের ইহাতে জীবন যুদ্ধে লাভ হইয়াছে। পিতামাতা নিজে মরিয়া বংশধরের হিত করিয়াছেন; বংশরক্ষার উপায় করিয়াছেন; মৃত্যুরূপ মূল্য দিয়া বংশরক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছেন।

৫। ডি ভ্রিস্

এমন অনেক সময়ে হয় যে, সন্তানে হঠাৎ খুব বেশী Variation দেখা যায়। ডারুইন্ এটাকে বড় বেশী আমলে আনেন নাই; তিনি ইহাকে প্রকৃতির (sport) খেয়াল বলিয়াছেন; প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনে এই খেয়াল ডারুইনের মতে বড় বেশী কাজে আসে না। ডি ভ্রিস্ বলেন এগুলাকে ফেলিয়া দেওয়া চলে না; ইহারাই প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনে বেশী কাজ করে; ইহাদিগের mutations বলা যাউক। ডারুইন্ বলেন যে, Variation অতি ধীরে ধীরে হয়; ডি ভ্রিস্ বলেন,তা নহে, লাফিয়ে লাফিয়ে হয়। প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনে অনুকূল হইলে, এই সকল বড় Variation স্থায়ী হইয়া যায়। এ কালে এই মতটাই ক্রমে যেন দৃঢ় হইতেছে। জীবের উন্নতি যত ধীরে হইতেছে ডারুইন্ মনে করিতেন, উহা তত ধীর নহে; উহা বরং দ্রুতই হইতেছে।

৬। মেণ্ডেল

"মেণ্ডেল এই Variationএর প্রণালী সরল করিয়া দেখাইবার প্রয়াস পাইয়াছেন। একটা (species) জাতির অনেক (variety) 'জাত' থাকে; যেমন কুকুর জাতির মধ্যে নানা জাতের কুকুর আছে। দুই জাতের জন্তু কিংবা উদ্ভিদ যদি পরস্পর (Cross) সঙ্গত হয়, তাহা হইলে সন্তান কোন্ জাতের হইবে? যে সকল ধর্ম্ম লইয়া এই জাতের পার্থক্য, তাহার মধ্যে কোনও কোনও ধর্ম্ম প্রবল হইয়া আপনাকে প্রকাশিত করে। আর কোনও কোনও ধর্ম্ম দুর্ব্বল হইয়া, আপনাকে গোপন করে। যে পুংবীজ ও স্ত্রীবীজ মিলিত হইয়া সন্তান উৎপন্ন হয়, মনে করুন তাহার প্রত্যেকের মধ্যেই এই প্রবল ও দুর্ব্বল ধাতু একটি করিয়া

বর্ত্তমান আছে। প্রবলকে বলা হয়—dominant ; দুর্ব্বল আত্মগোপন করে, এই জন্য তাহার নাম হইয়াছে—recessive. এখন এই স্ত্রী ও পুংবীজের মিশ্রণে কি কি ফল পাওয়া যায় দেখা যাউক। দেখুন, এই স্ত্রী পুং বীজের মিশ্রণে চার প্রকারের সম্মিলন হইতে পারে; যথা প্রথম নিভাঁজ প্রবল; চতুর্থ নিভাঁজ দুর্ব্বল; দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রবল ও দুর্ব্বলের সঙ্কর। প্রথমটির সন্তান প্রবল ধর্ম্মান্বিত হইবে; চতুর্থটি দুর্ব্বল ধর্ম্মান্বিত; দ্বিতীয় ও তৃতীয় সঙ্কর হইলেও দেখিতে প্রবলের মত হইবে কারণ প্রবলধর্ম্মই আত্মপ্রকাশ করে, দুর্ব্বল আত্মগোপন করে। মনে করুন, লোমশতা কোনও জন্তুর প্রবল ধর্ম্ম, নির্লোমতা দুর্ব্বল-ধর্ম্ম। যদি তাহার চারিটা ছানা হয়, তাহা হইলে একটা লোমশ, একটা নির্লোম, বাকি দুইটা সঙ্কর হইলেও দেখিতে ঠিক লোমশই হইবে। ইহাদের সন্তান আবার কিরূপ হইবে? যদি সঙ্করের স্পর্শে থাকিতে দেওয়া না যায়, তাহা হইলে খাঁটি লোমশের পরবর্ত্তী পুরুষপরম্পরাও খাঁটি লোমশ, খাঁটি নির্লোমের পুরুষ পরম্পরা নির্লোম হইবে। কিন্তু সঙ্কর লোমশ পরস্পর সহযোগে কতক খাঁটি লোমশ, কতক নির্লোম ও কতক সঙ্কর লোমশ, এই ত্রিবিধ সন্তানের জন্ম দিবে। জনক জননী বাছাই করিয়া লইয়া জীব ও উদ্ভিদের মধ্যে আজকাল সন্তানোৎপাদনপরীক্ষা হইতেছে; তাহাতে মেণ্ডেলের তত্ত্ব ক্রমেই সমর্থিত হইতেছে।"

একটু চুপ করিয়া রামেন্দ্র বাবু বলিতে আরম্ভ করিলেন,—"যাহারা মানবজাতিতত্ত্ব (Ethnology) অনুশীলন করেন, তাঁহারা জীববিদ্যার (Biology) এই সকল নিয়ম প্রয়োগ করিবার লোভ সংবরণ করিতে পারেন না। কেহ কেহ মানুষকে কতিপয় Race এ বিভক্ত করিয়াছেন,—শ্বেত, পীত, লাল, কাল। কেহ কেহ মাথার

খুলি দেখিয়া মানুষকে দীর্ঘকপাল (Dolichocephallic) ও খর্ব্ব-কপাল (Brachycephallic) শ্রেণীভুক্ত করিয়াছেন। কেহ কেহ মুখের গঠন, চুলের রং, চুলের ধরণ, চোখের তারা ইত্যাদি দেখিয়া মানুষের নানা বিভাগ করিয়াছেন। এই সকল জাতির মিশ্রণে কি দাঁড়ায়, সে সম্বন্ধে নানা মুনির নানা মত দেখিতে পাওয়া যায়। আবার এক জাতির মধ্যেই বিভিন্ন বর্ণমিশ্রণের ফলাফল নির্ণয় করিতে অনেকে ব্যস্ত হইয়াছেন। আমাদের এই ভারতবর্ষে আর্য্য—কোলারীয়—দ্রাবিড়ীয় মিশ্রণ কিরূপে হইয়াছে তাহা দেখিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। হিন্দুর মধ্যে বিভিন্ন বর্ণের মিশ্রণে কি ফল হইতে পারে; একই বর্ণের মধ্যে নানা গোত্রের ও কুলের মিশ্রণে কি দাঁড়াইতে পারে; এসকল বিষয়ে বিস্তর আলোচনা হইয়াছে। কতক-গুলা স্থূলসিদ্ধান্ত প্রায় সর্ব্ববাদিসম্মত বলিয়া গৃহীত। পিতামাতার মধ্যে যদি রক্তসম্পর্ক খুব নিকট হয়, উভয়ের বীজ প্রায় সমানধর্ম্ম হওয়াতে Variation কম হয়; তাহার ফলে পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্যস্থাপনের সামর্থ্য কমিয়া যায়; সন্তানের পক্ষে ইহা মঙ্গলকর নহে। প্রায় সকল সভ্যজাতির মধ্যেই দেখিতে পাওয়া যায় যে, বৈজ্ঞানিক আলোচনার বহুপূর্ব্বে মানুষ আপন অভিজ্ঞতার ফলে অত্যন্ত নিকট সম্পর্কের মধ্যে বিবাহ যে অকল্যাণকর তাহা মানিয়া লইয়াছিল। আমাদের হিন্দু-সমাজ এ সম্বন্ধে যতটা সাবধান, ততটা বোধ হয় আর কোনও সমাজ নহে। এ দেশে সগোত্রে বিবাহ নিষিদ্ধ। অসভ্যদিগের মধ্যে exogamy প্রচলিত; তাহারা নিজের tribe বা কুলের বাহিরে অন্য কুল হইতে জোর করিয়া বা মূল্য দিয়া কন্যা লইয়া আসে। এই হইতে Marriage by Capture (হরণ করিয়া বিবাহ) এবং Marriage by Purchase (পণ দিয়া বধূলাভ)

প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। পণগ্রহণপ্রথা অনেক সভ্যসমাজে বর্ত্তমান। হরণ-ব্যাপরটা এখন আর নাই বটে; কিন্তু হাতী, ঘোড়া, ঢোল, লোক জন আশাশোটা লইয়া মহাসমারোহে আমাদের দেশে যে বরযাত্রপ্রথা প্রচলিত আছে, দেখিয়া মনে হয় যেন ইহা কোনও বিস্মৃতযুগের যুদ্ধযাত্রার শেষ স্মৃতি, (Survival) মাত্র। অন্য কুল হইতে কন্যা লইয়া আসিবার কালে উভয়ের মধ্যে বিরোধ ও সন্ধির কথা ইতিহাসে দেখিতে পাওয়া যায়। মানুষের ইতিহাসেও এই ভিন্ন ভিন্ন কুলের সম্মিলন একটা বড় কথা। স্বকুল হইতে কন্যাগ্রহণ ও (Endogamy) পাশাপাশি রহিয়াছে। এই উপলক্ষে কুলীনতা বিচার করিতে হয়। আমাদের কৌলীন্যপ্রথায় কতটুকু ভাল ও কতটা মন্দ হইয়াছে তাহা বিচার করিবার জন্য অনেক পণ্ডিত মাথা ঘামাইয়াছেন। ওয়াইজমান ও মেণ্ডেলের তথ্যাবিষ্কারের ফলে বুঝা যায় যে, এ সকল বিষয়ে এখন কোন স্থির সিদ্ধান্ত করা যায় না। কিছু দিন পূর্ব্বেও Ethnologist পণ্ডিতমণ্ডলী যতদূর বাড়াবাড়ি করিয়াছিলেন, এখন আর ততটা করেন না। মেণ্ডেলের পরে এখন জোর করিয়া বলা যাইতে পারে যে, Ethnologyর এখন সবেমাত্র ক খ আরম্ভ হইয়াছে। নিম্নশ্রেণীর জন্তু ও উদ্ভিদ লইয়া বহুকাল নাড়াচাড়া না করিলে প্রকৃত তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইবে না; তখন Biology জীববিদ্যা কি ফলিবে, এখন সে সম্বন্ধে কোনও ভবিষ্যদ্বাণী করা যায় না; এখন বহুদিন ধরিয়া মাল মসলা ও statistics সংগ্রহ করিতে হইবে। যখন তথ্যগুলি আবিষ্কৃত হইবে, তখন সরল সমস্যা ছাড়িয়া জটিলতর সমস্যার সমাধান করিবার চেষ্টা করিতে হইবে। যতদিন পর্য্যন্ত বংশানুক্রম (heredity) ও তাহার ব্যতিক্রমগুলার (variations) মূলতত্ত্বগুলি আরও সুস্পষ্ট না হইতেছে, ততদিন মানবজাতিতত্ত্ব (Ethnology) দুর্ব্বোধ থাকিবে। এখন যতটুকু জানা গিয়াছে, তাহার উপর নির্ভর করিয়া

সামাজিক ব্যবস্থাকে প্রশংসা বা নিন্দা করা চলে না। মানবজাতি-তত্ত্ববিদ্ পণ্ডিত আশা করেন যে, ভবিষ্যতে জীববিদ্যার সাহায্যে মনুষ্যজাতির উৎকর্ষসাধন করা যাইবে। আর যে একটা নূতন শাস্ত্র গঠিত হইয়া উঠিতেছে, গ্যাল্‌টনকে তাহার জন্মদাতা বলা যাইতে পারে। তিনি ইহার নাম দিয়াছেন Eugenics বা জাতীয় উৎকর্ষ সাধন বিদ্যা। ঘোড়া, গরু, ভেড়া প্রভৃতি জন্তুরও নানা উদ্ভিদের বিমিশ্রণে নানাপ্রকার জাতি তৈয়ার করিবার চেষ্টা হইয়াছে। গ্যাল্‌টনের শিষ্যগণ মানুষের মধ্যে বিভিন্ন জাতির, বিভিন্ন কুলের মিশ্রণে একটা উচ্চজাতীয় মানুষ করিতে চান; কিন্তু প্রকৃত বৈজ্ঞানিক সত্যের আবিষ্কার এখনও হয় নাই; যতদিন না হয়, ততদিন Ethnology কোনও স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারিবে না।

"জীববিদ্যাঘটিত এই সকল অসম্পূর্ণতত্ত্ব যে কেবল মানবজাতিতত্ত্বেই প্রয়োগ করা হইয়াছিল, এমন নহে; সমাজতত্ত্বেও (sociology) হইয়াছিল। মানুষের দেহ যে একটা যন্ত্র (organism) একথা বহুদিন হইতে শোনা যাইতেছে। তাহার সমাজ-দেহটাও একটা যন্ত্র organism; সে তাহার পারিপার্শ্বিক অবস্থার সহিত সামঞ্জস্য রাখিবার জন্য নানা প্রকার organ আপনা হইতে সৃষ্টি করিয়া লয়,—যথা শাসনযন্ত্র, শিক্ষাযন্ত্র ইত্যাদি। প্রত্যেক যন্ত্রেরই এক বা একাধিক function থাকে। এই স্থূল সূত্রটি মোটামুটি মানিয়া লওয়া যাইতে পারে। সমাজ-বিদ্যা (Sociology) গোড়া হইতেই এই কথাটি স্বীকার করিয়া লইয়াছে। অনেকে কোঁৎকে (Comte) সমাজবিদ্যার প্রতিষ্ঠাতা বলিয়া মনে করেন। বাক্‌ল্ (Buckle) তাঁহার 'সভ্যতার ইতিহাস' পুস্তকে (History of Civilization) এই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অব-লম্বন করিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহার পুস্তকে যতটা আস্ফালন ছিল, ফল

তদনুরূপ হয় নাই। Environment শব্দটা তিনি অতি সঙ্কীর্ণ অর্থে গ্রহণ করিয়াছিলেন; মুখ্যতঃ তিনি জড় ও অচেতন environmentই বুঝিয়াছিলেন; দেশের ভৌগোলিক অবস্থা, অর্থাৎ নদী পাহাড় জল বায়ু শস্যাদি দেখিয়া সেই দেশের মানব প্রকৃতি নির্ণয় করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। জড়ের চেয়ে চেতন environmentএর প্রভাব যে খুব বেশী, ইহা তিনি ধরেন নাই; অথচ Biology জীববিদ্যা এইটারই প্রাধান্য দেয়। সমাজকে শুধু ভৌগোলিক অবস্থার অনুযায়ী করিলে চলিবে না; পার্শ্বস্থ জাতির ও সমাজের ঘাত প্রতিঘাত ইতিহাসের প্রধান কথা। তিনি ভারতবর্ষের বড় বড় পর্ব্বত ও নদী দেখিয়া বলেন যে, এ দেশের লোক কল্পনাপ্রবণ হইবে, দার্শনিক তত্ত্ব লইয়া নাড়াচাড়া করিবে, তাহাতে আর বিচিত্র কি? এ দেশের লোক ভাত খায়, মাংস খায় না; অতএব ভীরু, দুর্ব্বল, পরাধীন হইবেই। স্কটল্যাণ্ডে অনেক পাহাড়; সেখানকার লোক অন্ধকুসংস্কারের বশীভূত হইতে বাধ্য। স্পেনের লোকে গোঁড়া ধর্ম্মান্ধ হইবেই ইত্যাদি। এ রকমে কোনও জাতির ইতিহাস অনুশীলন করা উচিত নহে। হার্ব্বার্ট স্পেন্সর সমাজ-তত্ত্বসম্বন্ধে বিস্তর আলোচনা করিয়াছেন; সমাজদেহ বিশ্লেষণ করিয়া তাহার কোন কোন অংশে জীবদেহের সহিত মিল আছে, অতিসূক্ষ্মভাবে বিচার করিয়া দেখিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার Study of Sociology এবং Principles of Sociology নামক গ্রন্থদ্বয় অত্যন্ত উপাদেয়। জীবধর্ম্মী সমাজদেহ কিরূপে আপনাকে আপনার পারিপার্শ্বিক অবস্থার উপযোগী করিবার চেষ্টা করে; এবং সেই উদ্দেশ্যে কেমন করিয়া বিভিন্ন ক্ষেত্রে, বিভিন্ন দেশে, বিভিন্ন কালে রাষ্ট্রীয়, সামাজিক ও আধ্যাত্মিক institutions গঠন করিয়া লয়, তাহার ধারাবাহিক আলোচনা করিয়াছেন; কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, তাঁহার সময়ে Biology

জীববিদ্যা যেরূপ অসম্পূর্ণ অবস্থায় ছিল, তাহার উপর নির্ভর করিয়া কোনও সিদ্ধান্ত করিতে গেলেই ভুলের সম্ভাবনা বেশী। ঘটিয়াছেও তাই। জীববিদ্যার তদানীন্তন অবস্থায় তাড়াতাড়ি তাহার উপর সমাজবিদ্যা প্রতিষ্ঠিত করিতে গিয়া অনেকে ব্যর্থ হইয়াছেন। একটা দৃষ্টান্ত দিতেছি।

"দুইটা সমাজের মধ্যে পার্থক্য অনেক সময়ে Racial type বা cultural type লইয়া হয়। এখন প্রশ্ন উঠে এই যে, এই রকম ভিন্ন ভিন্ন typeএর সম্মিলনে কি দাঁড়ায়? জীববিদ্যা (Biology) বলে যে, পিতা মাতা নিকট সম্পর্কের হইলে, সন্তান দুর্ব্বল হইবে; খুব তফাৎ হইলে, বিভিন্নজাতি (species) হইলে সঙ্কর সন্তান বন্ধ্যাত্বদোষ পায়। ঘোড়ায় গাধায় মিলিত হইয়া যে অশ্বতর হয়, তাহার সন্তান হয় না। সে বন্ধ্য। এই মোটা সূত্র অবলম্বন করিয়া হার্ব্বার্ট স্পেন্সর সিদ্ধান্ত করিলেন যে, দুটো প্রায় এক রকমের Racial type বা cultural type পরস্পর মিশ্রিত হইলে বড় বিশেষ লাভ নাই; অর্থাৎ পারিপার্শ্বিক অবস্থার সহিত সামঞ্জস্যবিধান বড় বেশী হয় না, উৎপাদিকা শক্তিও কমিয়া যায়। য়ুরোপের ইতিহাসে দেখা যায় যে, রোমক ও গ্রীসীয় cultureএর সংমিশ্রণে বড় বেশী সুবিধা হয় নাই; বর্ব্বরের আক্রমণ ইহার সহ্য হইল না। কিন্তু রোমক ও বর্ব্বর cultureএর মিশ্রণে প্রথমটা কিছু গোলমাল হইয়াছিল বটে; পরে দেখা গেল যে ফল শুভ হইয়াছে; নূতন জাতির শক্তি বাড়িয়াছে। উভয় জাতির পার্থক্য গ্রীক ও রোমানের পার্থক্য অপেক্ষা বেশী ছিল, তাই শক্তিবৃদ্ধি হইল। কিন্তু দক্ষিণ আমেরিকায় ও মেক্সিকোতে য়ুরোপের খৃষ্টীয় সভ্যতা প্রবেশ লাভ করিয়া বড় একটা সুবিধা করিতে পারিল না। যে সকল সঙ্করজাতি উৎপন্ন হইল, জগতের কোনও বিশেষ উপকারে তাহারা এ পর্য্যন্ত আসিল না। এ-

ক্ষেত্রে পার্থক্য এত অধিক, যে সম্মিলনের ফল বন্ধ্য হইল। স্পেন্সর যখন লিখিতেছিলেন, সেই সময়ে জাপান য়ুরোপের সভ্যতায় ওতপ্রোত; তিনি বলিলেন, ইহার ফল ভবিষ্যতে ভাল হইবে না; কিন্তু আপাততঃ ঠিক তাহার উল্টা দাঁড়াইয়াছে। তবে এই পর্য্যন্ত বলা যাইতে পারে যে সুদূর ভবিষ্যতে তাঁহার ভবিষ্যদ্বাণী সফল হইবে কি না বলা যায় না। যাহা হউক, তাড়াতাড়ি জীববিদ্যার অসম্পূর্ণ তত্ত্বগুলি সমাজতত্ত্বে প্রয়োগ করিতে চেষ্টা করিলে সে চেষ্টা ব্যর্থ হইবে।

"ব্যর্থ হইবে বটে, কিন্তু সমাজতত্ত্বের আলোচনায় জীববিদ্যার আশ্রয় না লইলে চলে না; অন্য কোনও সদুপায় এখনও উদ্ভাবিত হয় নাই। সমাজকে যন্ত্রবদ্ধ organised structure ধরিয়া না লইলে বৈজ্ঞানিক আলোচনা অসম্ভব; আর কিছু না হউক, সমাজ যে জীবন্ত, এটুকু গোড়া হইতে মানিয়া লইতে হইবে।

"জীবন্ত সমাজ? সে কাহাকে বলে? জীবনের কার্য্য, কি? একটু ভাবিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারা যাইবে যে, জীবের পারিপার্শ্বিক অবস্থা তাহাকে নষ্ট করিবার চেষ্টা করিতেছে, তাহার স্বাতন্ত্র্য লুপ্ত করিবার প্রয়াস পাইতেছে। জীব কথনও বা তাহার সহিত সন্ধি করিয়া, কথনও বা বিরোধ করিয়া সামঞ্জস্যের ভিতর দিয়া আপনার স্বাতন্ত্র্য রক্ষার চেষ্টা করিতেছে। এই অবিরাম চেষ্টাই জীবনের একটি প্রধান লক্ষণ। এই চেষ্টা যাহার যতটা সাফল্য লাভ করিয়াছে, জীবন-সংগ্রামে সেই ততটা জিতিয়াছে। সমাজ আপনার স্বাতন্ত্র্য রক্ষার জন্য, বাহিরের অবস্থার কতটুকু উপাদেয় বলিয়া গ্রহণ করিবে, কতটুকু হেয় বলিয়া দূরে রাখিবে, এই সমস্যার সমাধানের চেষ্টা করাই আমার উদ্দেশ্য। প্রত্যেক সমাজ স্বতন্ত্র থাকিবার চেষ্টা করে; কিন্তু কেবলমাত্র বিরোধে সে স্বাতন্ত্র্য রক্ষা হয় না, কারণ আমার প্রতিবেশী আমার চেয়ে প্রবলতর

হইলে আমাকে নষ্ট করিবে। কেবল মাত্র সন্ধিতেও হয় না; কারণ অন্যের সঙ্গে সম্পূর্ণ মিশিলে আমাদের জাতীয় প্রকৃতি সম্পূর্ণ অন্য রকম হইয়া যাইবে, স্বাতন্ত্র্য শব্দটাই অর্থহীন হইবে।

"এই স্বাতন্ত্র্য কথাটার অর্থ আরও পরিষ্কার হওয়া আবশ্যক; তাহাও জীববিদ্যার সাহায্যে করিতে হইবে। উচ্চশ্রেণীর জীবের পক্ষে, স্বাতন্ত্র্য কাহাকে বলে, বুঝিতে পারি; মাতৃজঠর হইতে ভূমিষ্ঠ হইবার পর আমরণ সে জীবহিসাবে স্বতন্ত্র। উচ্চশ্রেণীর জরায়ুজ বা অণ্ডজ জন্তুর সম্বন্ধে সহজেই এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারা যায়। গাছের বীজ হইতে স্বতন্ত্র গাছ জন্মায়, কিন্তু সেই গাছের ডালপালা তাহার Organ মাত্র; তাহারই অংশবিশেষ; তাহারই সহিত একাঙ্গীভূত; তাহাদের বিশিষ্ট স্বতন্ত্র সত্ত্বা আছে বলিয়া অনুমিত হয় না; বৃক্ষকাণ্ড হইতে বিচ্ছিন্ন হইলে তাহারা শুকাইয়া মরিয়া যাইবে; কিন্তু একটা ডাল কাটিয়া মাটিতে লাগাইয়া দিলে যদি সে শিকড় বাহির করিয়া মাটি হইতে রস লইয়া আত্মরক্ষার্থ পারিপার্শ্বিক অবস্থার সহিত সামঞ্জস্য-রক্ষা করিবার চেষ্টা করে, নূতন নূতন Organ এর সৃষ্টি করে, তাহা হইলে তাহার স্বতন্ত্র সত্ত্বা হইল না কি? কিন্তু তাহার এই স্বাতন্ত্র্যটা সম্পূর্ণ পরিস্ফুট হইল না। তাহাকে পূর্ব্ব বৃক্ষের শাখামাত্র বলিব না; সন্তান বলিব। কেননা দেখুন, এমন গাছ আছে যাহার শাখা লতাইয়া ভূপৃষ্ঠে বিলম্বিত হইয়া নূতন নূতন শিকড় জন্মাইয়া মাটিকে আঁকড়াইয়া ধরে; সেই শাখার উপকার হইল, বড় গাছটারও হইল। কিন্তু এখানে কি সেই শাখাকে স্বতন্ত্র বলা যায়? এখানেও ত সেই শাখা স্বাধীনভাবে জীবনের লক্ষণ প্রকাশ করিল, অথচ তাহাদিগকে স্বতন্ত্র মনে করা যায় না কেন? কুঠারাঘাতের মত একটা আকস্মিক ঘটনায় মূল কাণ্ড হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া এইরূপ লক্ষণাক্রান্ত হইলেই

বুঝি সেই শাখা স্বতন্ত্র হইবে ? আবার দেখুন, বটগাছ শত শাখা বিস্তার করিয়া দণ্ডায়মান ; একটি শাখাও ভূমিস্পর্শ করে না ; কিন্তু সেই ডালপালাগুলার মধ্য হইতে শিকড় বাহির হইয়া ভূমধ্যে প্রবেশ করে। এখানে কি ডালগুলা স্বতন্ত্র জীব ?

"একটা জীবের দেহও ত লক্ষ জীবের সমষ্টি বলিয়া মনে করা যাইতে পারে, কারণ তাহার মধ্যে অসংখ্য জীবকোষ (cell) আছে। একটা প্রবালকে এক বলিব, না বহু বলিব ? তাহার ক্ষুদ্র অংশ (coral polyp) কোনও কারণে বিচ্ছিন্ন হইয়া গেলেও তাহার স্বতন্ত্র জীবন আরম্ভ হয় ; আবার নূতন করিয়া তাহার গাছের মত ডাল পালা বাহির হয়। ইহার কোন্ খানে স্বাতন্ত্র্য ? জীবনের আরম্ভ ও শেষ কোথায় ? Hydraকে (চারুপাঠের পুরুভুজ) যত টুক্‌রা করা যায়, প্রত্যেক টুক্‌রাই নূতন করিয়া জীবনযাত্রা আরম্ভ করে। তবে কি এই টুক্‌রাগুলাকে স্বতন্ত্র জীব বলিব ?

"কিসে স্বাতন্ত্র্য হয় ? কখন্ স্বাতন্ত্র্য হয় ? কেনই বা হয় ? নিম্নতম এককোষক (unicellular) জীবের কথা ভাবিয়া দেখুন দেখি। একটি-মাত্র কোষের (cell) মধ্যে সমস্ত জীবটি সংহত। কোষের বহিরাবরণ অপেক্ষাকৃত শক্ত ; কোষের মধ্যে তরল Proto-plasm। Proto-plasmএর কেন্দ্রস্থ ক্ষুদ্র পদার্থটিকে nucleus বলা যায়। যেন ঐ তরল (Semi-fluid) প্রোটোপ্লাজম মাঝখানে একটু জমাট বাঁধিয়া nucleus করিয়াছে ও নিজের পিঠটাকেও জমাইয়া আপনার আবরণ করিয়া লইয়াছে। যেন একটা icebag, উহার ভিতর জলপূর্ণ ; মাঝে একটুকি বরফ ; আর ব্যাগটাও চামড়ার বা বরফের নহে ; উহাও যেন বরফেরই একটা আস্তরণ। Icebagটা বৃহৎ জিনিস ; আর এই জীবকোষ অতি ক্ষুদ্র ; চর্ম্মচক্ষুতে প্রায় অদৃশ্য। এই কোষ ক্রমশঃ

ডিম্বাকৃতি ধারণ করে; ক্রমে ক্ষীণকটি dumb-bellএর আকার প্রাপ্ত হয়; nucleusও সেই ক্ষীয়মান কটিদেশে একটু লম্বা হইতে থাকে; সহসা একদিন সেই কটিদেশে ছিঁড়িয়া যায় এবং সেই কোষ বিভক্ত হইয়া দুইটা স্বতন্ত্র কোষে পরিণত হয়; ভিতরে দুইটা স্বতন্ত্র nucleusও হইয়া যায়; কিন্তু proto-plasmএর পরিবর্ত্তন হইল না। ইহাদের মধ্যে জনকই বা কে, জন্ম হইলই বা কাহার? আবার কখনও জীবকোষের মধ্যে proto-plasm জমাট হইয়া স্থানে স্থানে দানা বাঁধিতে (Spore) থাকে; অনুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে দেখিলে আঁচড়ের (Specks) মত দেখায়; যখন দানা বাঁধা সম্পূর্ণ হয়; কোষের বহিরাবরণ ফাটিয়া যায়; একটি কোষ ফাটিয়া ভিতরের দানা (Spore) চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে। এক একটি দানা আবার এক এক কোষ গড়িয়া নবজীবন আরম্ভ করে। ইহাদের মধ্যে জনকই বা কে, জন্ম হইলই বা কাহার? জনকের মৃত্যুই বা হইল কখন? এই জন্যই ওয়াইজমান বলিয়াছেন যে, এককোষক (Uni-cellular) জীব মরিতে বাধ্য নহে। যাহারা উচ্চপর্য্যায়ের জীব, তাহারাই আপনাদিগের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিবার জন্য মৃত্যুরূপ মূল্য দিয়াছে। তাই, অত্যন্ত নিম্নশ্রেণীতে পিতা পুত্রের স্বাতন্ত্র্য, জন্ম মৃত্যুর সমস্যা বুঝিয়া উঠা দুষ্কর।

"বিভাগের দিক্ দিয়া যেমন দেখা গেল, সংযোগের দিক্ দিয়াও সেইরূপ দেখা যাইতে পারে। উচ্চশ্রেণীর জীবের মধ্যে একজনের একটা বিশিষ্ট দেহযন্ত্র আর একজনের শরীরে বসান যায় না; একজনের ধড়ে আর একজনের মাথা বসাইয়া দেওয়া যায় না। একজনের শরীরের একটু আধটু চামড়া আর একজনের দেহে ডাক্তাররা লাগাইয়া দেন; একজনের রক্তও অন্যের শরীরে প্রবেশ করাইয়া দেওয়া হয়; কিন্তু বিশিষ্ট দেহযন্ত্রের (highly differentiated organs) পক্ষে এরূপ

ব্যাপার অসম্ভব। দেহমধ্যস্থ এই সকল যন্ত্র (organs) আপনার কর্ম্মের উপযোগী হইয়া গড়িয়া উঠিয়াছে। যেখানে জীবের স্বাতন্ত্র্য খুব পরিস্ফুট, সেখানে এক জীবের উপযোগী অবয়বকে অন্য জীবের উপযোগী করিয়া লওয়া একপ্রকার অসম্ভব। গাছের গুঁড়ি অনেক সময় অন্য গাছের ডালকে আপনার করিয়া লইতে পারে; উৎকৃষ্ট আমগাছের ডাল নিকৃষ্ট গাছে লাগাইলে অনেক সময়ে শেষোক্ত গাছের উৎকর্ষ-সাধন হয়, কিন্তু গাছের পক্ষে ইহা উৎকর্ষের পরিচয় নহে। একটা কুকুরে অন্য কুকুরের কলম বাঁধা যায় না। খুব নিম্নশ্রেণীর দুইটা জীবকোষ মিলিয়া এক হইয়া যায়। উচ্চশ্রেণীতেও পুং-স্ত্রীবীজের সংযোগ ব্যতীত নূতন জীবের আবির্ভাব হয় না। এই যে নূতন জীব, ইহাকে এক হিসাবে স্বতন্ত্র বলা যাইতে পারে, এক হিসাবে বলা যাইতে পারে না; তাহাকে তাহার পিতা মাতার germ-plasm হইতে বিভিন্ন মনে করা যায় না।

"এইরূপে স্বাতন্ত্র্যের মাত্রাভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। কোনও জায়গায় স্বাতন্ত্র্যরক্ষা করাটাই জীবনের অনুকূল; কোনও জায়গায় পরের সঙ্গে মিশ্রণই জীবনের অনুকূল। মোটামুটি এই পর্য্যন্ত বলা যাইতে পারে যে, উচ্চপর্য্যায়ের জীবে স্বাতন্ত্র্য স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়; নিম্নপর্য্যায়ে সেটা অপরিস্ফুট। উচ্চশ্রেণীর জীব সহজে পরকে আপন করিতে পারে না; যদি আপন করিতে হয়, তাহা হইলে তাহাকে স্বতন্ত্র থাকিতে দিলে চলিবে না। বাঘের পক্ষে ছাগলকে আত্মসাৎ করা দরকার; কিন্তু তাহাকে মারিয়া, খাইয়া, নিজের পাকস্থলীতে পরিপাক করিয়া তাহাকে unorganised fluid-এ পরিণত করিয়া সে নিজদেহে সঞ্চারিত করে; নিজের উপযোগী গঠন দিয়া, নূতন জীবকোষ নির্ম্মাণ করিয়া আপনার শরীরের পুষ্টিসাধন করে।

"আরও একটু খোলসা করিয়া বলা আবশ্যক। প্রথমতঃ দেখা গেল যে কতকগুলা cell (জীবকোষ) একত্র জমাট বাঁধিয়া দেহ তৈয়ার করে। এই যে জমাট বাঁধা, এই যে কোষগুলির সংহতি, হার্ব্বার্ট স্পেন্সর ইহার নাম দিয়াছেন—Integration। যতদিন স্বাতন্ত্র্য স্পষ্ট না হয়, ততদিন এই জমাট বাঁধাও একটু আল্গা রকম থাকে; অল্পেই বিচ্ছিন্ন হইবার সম্ভাবনা থাকে। আবার দেখা যায় যে, সমপ্রকৃতিক দুইটা দেহ মিশিয়া গিয়া (fused) সমপ্রকৃতিক আর একটা দেহ নির্ম্মাণ করে। এ অবস্থায় জনক ও সন্তানের, এবং জন্মমৃত্যুর পার্থক্যবিচার করা কঠিন; কোন্‌টা দেহ, কোন্‌টা অঙ্গ, নিরূপণ করা কঠিন; সকল কোষই (cell) তখন সমাকার, একধর্ম্মী; অর্থাৎ প্রত্যেক অঙ্গই অন্য অঙ্গের কাজ করিতে পারে; কাহারও নির্দ্দিষ্ট function থাকে না; এমন কি, জননেন্দ্রিয়ও (reproductive organ) কিছু একটা নির্দ্দিষ্ট থাকে না,—যে কোনও অঙ্গ দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া আবার দেহটা reproduce করিতে পারে। স্বাতন্ত্র্যের সঙ্গে সংহতি (integration) যখন বেশী মাত্রায় হয়, তখন দেহের ভিতরের যন্ত্রগুলা (organs) পৃথক্ হইতে থাকে; প্রত্যেক অঙ্গ অন্য অঙ্গ হইতে পৃথক্ হইয়া স্বতন্ত্র (function) কাজ পায়, এবং সেই function অনুসারে আপনাদের আকৃতি পর্য্যন্ত পরিবর্ত্তন করে; স্পেন্সরের ভাষায় ইহাকে বলে—Differentiation। জীবের স্বাতন্ত্র্য যত ফুটিয়া উঠে, সে ততই বাহিরের পারিপার্শ্বিক অবস্থা হইতে আপনাকে পৃথক্ করিয়া যেমন জমাট বাঁধে, তেমনই ভিতরেও অবয়বগুলির শ্রমবিভাগ (division of labour) দ্বারা (differentiation) হয়। যুগপৎ এই সংহতি (integration) ও শ্রমবিভাগ (differentiation) হইতে জীবের উৎপত্তি হয়; স্পেন্স-

রের ভাষায় এইটাই Evolution (অভিব্যক্তি)। এই Evolution-তত্ত্ব বুঝাইবার জন্য তিনি গোটা Synthetic Philosophyর গ্রন্থগুলা লিখিয়াছেন।

"পূর্ব্বে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছি যে, নিম্নতম প্রাণীতে ও নিম্নতম উদ্ভিদে যন্ত্রের (organs) পার্থক্য ও ক্রিয়ার (function) পার্থক্য হয় না; কোনও একটা ব্যক্তির দেহের evolutionএও আমরা ইহার প্রমাণ পাই। জরায়ুর মধ্যে যখন প্রথম ভ্রূণের বিকাশ হয়, তখন কোনও রকম অঙ্গ প্রত্যঙ্গ পাওয়া যায় না, সকল কোষই দেখিতে এক রকম ও একধর্ম্মী; এমন কি ভ্রূণটা মানুষের কি কুকুরের বুঝা যায় না, তাহার স্বাতন্ত্র্য তখনও ফুটে নাই। ক্রমে যত উন্নতির সোপানে উঠে, ততই ক্রমশঃ সঙ্গে সঙ্গে integration ও differentiation হয়, অবয়ব (organs) গড়িয়া উঠে, তাহাদের functions নির্দ্দিষ্ট হয়, একটা অবয়ব আর একটার কাজ করিতে পারে না। কোনও একটা উন্নত জীবের দেহে একটা বিশিষ্ট অঙ্গের পরিবর্ত্তে অন্য জীবের সেই অঙ্গ দেওয়া যায় না; তেমনই দেহের ভিতরেও একটা যন্ত্রের কাজ আর একটা যন্ত্র করিতে পারে না। জীবের কোনও একটা বিশিষ্ট অঙ্গ ছিন্ন হইলে, সে আর সেটাকে গড়িয়া লইতে পারে না, সম্ভবতঃ তাহার মৃত্যু হইতে পারে। অবয়বগুলা নির্দ্দিষ্ট পৃথক্ কাজ পাইয়াছে বটে, কিন্তু সবগুলাকে একযোগে সবটার জন্য কাজ করিতে হয়; সকলে পরস্পর অবিরোধে কাজ করিবে। হাত, পা, চোখ, মুখ যদি পেটের উপর বিদ্রোহী হইয়া কাজ করে, তাহারাও মরিবে, সমস্ত individualটাও মরিবে; তাহাদের নিজের স্বতন্ত্র জীবন আছে বটে, কিন্তু তাহা সমগ্রটার জীবনের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে। উচ্চশ্রেণীর প্রাণী এই সমস্ত অবয়বকে অবিরোধে ও

একযোগে চালাইবার জন্য একটা যন্ত্রের বা অবয়বের সৃষ্টি করিয়াছে; সেটাকে শাসনযন্ত্র বলা যাইতে পারে; তাহার নাম—Nervous System.

"এই যে Nervous System, ইহার আর একটা কাজ আছে;—বাহিরের environment হইতে খাদ্যাদি সংগ্রহ করিয়া পুষ্টি-সাধনের জন্য, ও বাহিরের শত্রু হইতে আত্মরক্ষার জন্য যে সকল অবয়ব নির্দ্দিষ্ট আছে, এই স্নায়ুযন্ত্র সকলকে পরিচালিত ও স্বকর্ম্মে প্রেরিত করিতেছে। এই সকল কাজের জন্য বহির্জগতের সংবাদ আনিতে হয়, অতএব ইহাকে টেলিগ্রাফের, ডাকঘরের, spyএর কাজ করিতে হয়; সমস্ত জ্ঞানেন্দ্রিয়-গুলিকে এই সংবাদানয়নের কার্য্যে ব্যাপৃত রাখা হয়, সমস্ত কর্ম্মেন্দ্রিয়-গুলিকে আত্মরক্ষার ও আত্মপুষ্টির কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া রাখে। অতএব দেখা যাইতেছে যে, এই যন্ত্রটা শাসন ও রক্ষণ এই উভয়বিধ ব্যাপারের সম্পূর্ণ উপযোগী। ইহাই দেহের পক্ষে গভর্ণমেণ্ট।

"উচ্চশ্রেণীর জীবের মধ্যে এই যন্ত্রটা যখন গড়িয়া উঠে, তখন তাহার স্বাতন্ত্র্যটাও খুব ফুটিয়া উঠে। এই যন্ত্রটাকে অবলম্বন করিয়া জীবের আর একটা ধর্ম্ম ফুটিয়া উঠিয়াছে—consciousness বা চেতনা। এটি জীবের স্বাতন্ত্র্যের সর্ব্ব প্রধান লক্ষণ, ও স্বাতন্ত্র্যরক্ষার জন্য জীবের সর্ব্বপ্রধান অবলম্বন হইয়াছে। এই চেতনা জীবনকে আশ্রয় করিয়া আছে বটে, কিন্তু তথাপি ইহা জীবনের অতিরিক্ত একটা কিছু জিনিস। কেমন করিয়া ইহার উৎপত্তি হইল, বর্ত্তমান কালের বিজ্ঞানশাস্ত্র সে সম্বন্ধে একেবারে মূক। কেমন করিয়া ইহার উৎপত্তি হইল, science তাহা বলিতে পারে না বটে; কিন্তু কি উদ্দেশ্যে হইল, ডারুইনের শিষ্যেরা সে সম্বন্ধে আলোচনা করিতে পশ্চাৎপদ নহেন। দেহের ভিতরে কোনও গোলযোগ হইল কি না, বাহির হইতে শত্রুর আশঙ্কা

আছে কি না, ইহা জানিবার প্রধান উপায়,—চেতনা। এই চেতনার লক্ষণ,—সুখ ও দুঃখবুদ্ধি। ভিতরের ও বাহিরের ব্যাপার অনুকূল হইলে জীবের সুখবুদ্ধি হয়, প্রতিকূল হইলে দুঃখবুদ্ধি হয়। এই সুখবুদ্ধি ও দুঃখবুদ্ধিকে অবলম্বন করিয়া কোন্‌টা হেয় এবং কোন্‌টা উপাদেয় স্থির করিয়া কাজ করা হইয়া থাকে। ইহাতে জীবন-সংগ্রামের খুব লাভ; যে রকম করিয়াই হউক জীব চেতনালাভ করিলে তাহার টিকিয়া যাইবার সম্ভাবনা বাড়িয়া গেল। চেতনা জিনিসটা প্রত্যক্ষ নয়; অপরের চেতনা তাহার অঙ্গভঙ্গী ও আচরণ দেখিয়া অনুমান করিয়া লইতে হয়। তোমার আনন্দ আমি তোমার মুখের হাসি দেখিয়া অনুমান করি, তোমার মনের শোক তোমার কান্না দেখিয়া অনুমান করি; কোনটাই প্রত্যক্ষ অনুভব করিতে পারি না। কাজেই অন্য জীবের চেতনা আছে কি না, সেটা সকল সময়ে জোর করিয়া বলিতে পারি না; একটা মোটামুটি ঠিক করিয়া লই, কোন্ জীব চেতন, কে বা অচেতন, কে বা অস্ফুটচেতন। গাছ যখন কাটিয়া ফেলি, তাহার চেতনা নাই এইরূপ অনুমান করি; কিন্তু একটা পোকা যখন ধরিতে যাই, সে পলায়ন করে, বুঝিতে পারি যে তাহার চেতনা আছে। লজ্জাবতী লতার সঙ্কোচে হয় ত এইটুকু প্রমাণ হয় যে তাহার nervous system আছে; সে respond করে, কিন্তু সে সজ্ঞানে consciously করে কি না, বলা কঠিন। মাংসাশী গাছ পোকাকে ধরিয়া হজম করিয়া আত্মসাৎ করিয়া ফেলে। এ ক্ষেত্রে তাহার যন্ত্রগুলি প্রায় জন্তুর মত খুব জটিল উপায়ে আত্মপুষ্টির চেষ্টা করে, কিন্তু সমস্ত ব্যাপারটা কলের ব্যাপার হইতে পারে। ঘড়ির একটা কল নাড়িলেই টং টং করিয়া বাজিয়া উঠে। সে কি সচেতনভাবে বাজে? এই মাংসাশী গাছের প্রকৃতি হয় ত ইঁদুরকলের মত হইতে

পারে। ইঁদুরের প্রবেশমাত্রেই কল তাহাকে ধরিয়া ফেলে, চাপিয়া মারে ; কিন্তু কল তাহা জানিতে পারে কি ?

"নিম্নতম শ্রেণীর জীবের মধ্যে Nervous systemও নাই, চেতনাও নাই। উচ্চপর্য্যায়ে উঠিলে ঐ দুটোকে পাওয়া যায়। যেখানে Nervous system একটা মস্তিষ্ক গড়িয়া ফেলিয়াছে, সেইখানেই চেতনা খুব পরিস্ফুট। চেতনাকে মস্তিষ্কের ধর্ম্ম বলা ভুল। সে মস্তিষ্করূপ যন্ত্রটাকে আশ্রয় করিয়া আত্মপ্রকাশ করে মাত্র। চেতনার কাজ হইল জানা। ইহার চরম পরিণতি,—Self-Consciousness, অর্থাৎ আপনাকে জানা [দার্শনিক পরিভাষা—অহঙ্কার]।

"কেঁচো বা জোঁক আলো আঁধারের ভেদ বুঝিতে পারে, বাহিরের জিনিসের পার্থক্য অনুভব করিতে পারে, কিন্তু তাহার "আমি"-জ্ঞান হয় কি না, বলা শক্ত। আলো-আঁধার-বোধ, ঠাণ্ডা-গরম-বোধ, সুখ-দুঃখ-বোধ, শত্রু-মিত্র-বোধ, এগুলা সব থাকিতে পারে ; কিন্তু এ সকল বুদ্ধি যে আমার বুদ্ধি, এই "আমি" নামক একটা স্বতন্ত্র ও স্বাধীন অস্তিত্বের জ্ঞান, কেঁচো জোঁকের ত নাই ; হাতী ঘোড়া বাঘেরও যোল আনা জাগ্রত হয় কি না তাহা সন্দেহ করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। মানুষের মধ্যেই বোধ হয় এই অহং-জ্ঞানের বা "আমি"র পূর্ণ পরিণতি হইয়াছে। ইহারই বলে মানুষ সমস্ত জগৎ হইতে আপনাকে স্বতন্ত্র করিয়া সেই জগৎটাকে নিজেরই জ্ঞানের ও ভোগের বিষয় এবং কর্ম্মক্ষেত্র বলিয়া মনে করে। জীববিদ্যার হিসাবে বলিতে পারি যে, এই অহং-জ্ঞানটাই জীবের স্বাতন্ত্র্যের চরম পরিণতির পরিচায়ক। দার্শনিক ঠিক উল্টা পথে চলেন। তিনি এই 'আমি'টাকে গোড়ায় স্বীকার (Postulate) করিয়া লন ; এবং তাহা হইতে জগৎ-ব্যাপারের বৈচিত্র্য ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা করেন। আমরা দার্শনিক আলোচনা

করিতেছি না; সমাজতত্ত্বের জন্য আমাদিগকে জীববিদ্যাপ্রয়োগ করিতে হইবে।

"পূর্ব্বেই বলা গিয়াছে যে Heredity, Variation প্রভৃতি তত্ত্ব এখনও এত অপূর্ণ অবস্থায় আছে যে, তাহা সমাজ-বিদ্যায় প্রয়োগ করার সময় এখনও আসে নাই। তবে যেটা জীবনের সাধারণ লক্ষণ,—পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে নিজেকে সমঞ্জস করিয়া স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিবার চেষ্টা, এবং এই আত্মরক্ষার ও স্বাতন্ত্র্যরক্ষার উদ্দেশ্যে জীবনসংগ্রাম ও তদ্দ্বারা জীবনের ক্রমবিকাশ, ক্রমোন্নতি ও অভিব্যক্তি, সেটাকে আমরা নির্ভয়ে সহায়রূপে গ্রহণ করিয়া সমাজ-বিদ্যার আলোচনায় প্রয়োগ করিতে পারি। জীবনের স্বাতন্ত্র্য-লাভটাই উচ্চজীবের জীবনের লক্ষণ; ইহার সাহায্যে জীবনদ্বন্দ্বে সফলতা লাভ করা যায়।

"এই সফলতা কাহাকে বলে? কেবল কি জীবের স্থিতি (duration) দেখিয়া ইহার পরিমাপ করা যায়? তবে কি যে যত বেশী দিন বাঁচে, সেই তত বেশী উন্নত ও সফল-প্রযত্ন? পরমায়ু দেখিয়া যদি জীবের উৎকর্ষাপকর্ষ স্থির করিতে হয়, তাহা হইলে মানুষের চেয়ে হাতী শ্রেষ্ঠ। শুনিতে পাওয়া যায় যে, যে ওক্‌গাছের তলা দিয়া রোমের সেনাগণ গিয়াছিল, আজও না কি তাহার দু চারিটা জীবিত আছে। তবে কি Oak গাছ সর্ব্বাপেক্ষা উন্নত? শুধু পরমায়ু দেখিলে চলিবে না। এমন কি, বংশের পরমায়ু ধরিয়া পরিমাপ করিলেও চলিবে না। ভূপৃষ্ঠের স্তর উদ্‌ঘাটিত করিয়া না কি দেখা গিয়াছে যে অতি প্রাচীনকালে আরশোলা বর্ত্তমান ছিল; সে সময়ে মেরুদণ্ডী জীব, এমন কি মাছ পর্য্যন্ত ছিল না। কতকাল পরে মাছ ও সরীসৃপের উদ্ভব হইল; আরও কতযুগ পরে অতিকায় ম্যামথ্ ও ম্যাষ্টডনের জন্ম হইল। এই অতিকায় জীবগুলাও লুপ্ত হইয়া গেল, আরশোলা

এখনও বাঁচিয়া আছে। তবে কি আরশোলা এই সকল জীবের চেয়ে শ্রেষ্ঠ ?

"কেবল পরমায়ুর উপর নির্ভর করিলে চলিবে না, অন্যান্য বিষয়ও ভাবিয়া দেখিতে হইবে। জড় পদার্থের মধ্যে বড় ছোট বিচার করিতে হইলে যেমন শুধু তাহার দীর্ঘত্ব দেখিলে চলিবে না, তাহার দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতার হিসাব লইতে হইবে; তেমনই জীবনের উৎকর্ষাপকর্ষের বিচার করিতে হইলে Quantity of life বিবেচনা করিতে হয়। পরমায়ুটাকে জড়ের দৈর্ঘ্যের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে; কর্ম্ম-ক্ষেত্রের বিস্তারকে (range of activity) প্রস্থ বলা যাইতে পারে। Oak গাছের পরমায়ু খুব বেশী বটে, কিন্তু তাহার কার্য্যের ব্যাপকতা (range) কম; সে এক জায়গায় বসিয়া ডাল পালা ফল প্রসব করে মাত্র। একটা প্রজাপতির পরমায়ু কম, কিন্তু কর্ম্মক্ষেত্র গাছের চেয়ে ঢের বেশী। মানুষের ক্রিয়ার ব্যাপ্তি অপরিসীম। Intensity of Lifeকে কর্ম্মানুষ্ঠানে শ্রম, উগ্রতা ও তীব্রতাকে জড়পদার্থের উচ্চতার সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। পিপীলিকা ও মধুমক্ষিকা অল্প পরিসরের মধ্যে অল্প পরমায়ু লইয়া যে intensity of lifeএর, কর্ম্মপটুতার পরিচয় দেয়, তাহার নিকটে মানুষও হয় ত পরাস্ত হয়; অন্ততঃ শিশুপাঠ্য গ্রন্থে মানুষের পক্ষে মক্ষিকা আদর্শস্বরূপ বিবেচিত হইয়াছে,—

'মক্ষিকা সামান্য প্রাণী, কিন্তু তারে শ্রেষ্ঠ মানি
উপদেশ লও পরিশ্রমে।'

এই তিনটি ভিন্ন ভিন্ন factor একত্র যাচাই করিয়া জীবনের ফলতা স্থির করিতে হইবে।

"মানব-সমাজে দেখিতে পাই যে, আফ্রিকা ও প্রশান্ত মহাসাগরে যে সকল জাতি বাস করে, তাহারা বহুযুগ ধরিয়া বাঁচিয়া আছে;

সভ্যতর সমাজ অপেক্ষা ইহাদের পরমায়ু বেশী। কিন্তু ইহাদের কর্ম্মক্ষেত্র স্বল্পপরিসর, অর্থাৎ কাজের পরিসর (Variety) অল্প,—জীবনের কর্ম্মপটুতা উগ্রতাও অধিক নহে। গ্রীসের এক একটি নগরে অধিবাসী-দিগের range ও activity দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয়; তাহারা Science, Arts, Philosophy, Polity প্রভৃতিতে যেরূপ জীবনী-শক্তির ক্রিয়ার পরিচয় দিয়াছে, সেরূপ অন্যত্র দেখা যায় না; কিন্তু সেই নগরগুলির পরমায়ু অল্প ছিল। রোমের পরমায়ু গ্রীসীয় নগরের চেয়ে বেশী ছিল, কিন্তু গ্রীকদিগের তুলনায় তাহার কর্ম্মের ক্ষেত্র অল্প ছিল; সে শুধু শাসন ও ব্যবস্থা কার্য্যেই তাহার অধিকাংশ শক্তি ব্যয়িত করিয়াছিল, আর কিছু বড় একটা করিতে পারে নাই। ইহুদির জাতীয় জীবনের ইতিহাস হাজার খানেক বছরের মধ্যেই পর্য্যবসিত। তাহার চিন্তার rangeও যৎসামান্য; সে কেবল একটা ধর্ম্মকে অবলম্বন করিয়া নিজের স্বাতন্ত্র্যরক্ষার প্রয়াস পাইয়াছে; বেশী কিছু জগৎকে দিতে পারে নাই। কিন্তু জীবন-সংগ্রামে যে চেষ্টার, অবিশ্রান্ত কর্ম্ম-শীলতার intensity'র পরিচয় সে দিয়াছে, তাহার নিকট গ্রীককেও বোধ করি পরাস্ত হইতে হয়।

মানুষের ইতিহাস আলোচনা করিতে বসিয়া কেবল তাহার স্বাতন্ত্র্যের মাত্রা দেখিলেই চলিবে না; তাহার উৎকর্ষাপকর্ষের বিচার করিতে হইবে।"

রামেন্দ্রবাবু চুপ করিলেন। আমি বলিলাম, "বোধ হয় Scientific study of History সম্বন্ধে আর কিছু বলা আবশ্যক নাই।" তিনি বলিলেন, "না; এইবার আমি জীববিদ্যার উক্ত স্থূল তত্ত্বগুলি যথাসম্ভব আশ্রয় করিয়া য়ুডীয়, গ্রীক, রোমক, ও ইসলাম সভ্যতার আলোচনা করিয়া তৎপরে ভারতবর্ষের সভ্যতার তুলনামূলক আলোচনা করিব।

এ কথা এখানে স্পষ্ট করিয়া বলিয়া রাখি, এটা ভাল এটা মন্দ এটা উচিত এটা অনুচিত, এরূপ না হইয়া এরূপ হওয়া উচিত ছিল, এটাকে ভাঙ্গিয়া এটাকে গড়া উচিত, এই সকল বিচার আমার কাজ নহে। সে সাহস আমার নাই। জগৎব্যবস্থার অসম্পূর্ণতায় অন্যান্য জীবের মত ব্যথা পাইয়া থাকি; তবে সেই ব্যথার ঔচিত্য-বিচারে আমার সাহস নাই। কি করিলে কোন্ পথে গেলে সেই ব্যথা কমিবে, সে উপদেশ দিবার ধৃষ্টতাও আমার নাই। সৃষ্টিক্রিয়ার সময় উপস্থিত থাকিলে কাহাকেও কোন পরামর্শ দিতে আমি পারিতাম না।

হিব্রু।

আজ কোনও প্রকার ভণিতা না করিয়া কথোপকথন আরব্ধ হইল। অপরাহ্ণ-কাল। আকাশ অল্প মেঘাচ্ছন্ন।

আমি।—আসুন, আমরা ইহুদিজাতির ইতিহাসের আলোচনা করি। জগতের সমস্ত সভ্য জাতির মধ্যে হিব্রুদিগের মত করুণ tragedy আর কোথাও বোধ হয় সংঘটিত হয় নাই। অনেকগুলা স্বতন্ত্র দলবদ্ধ যাযাবরসম্প্রদায় কেমন করিয়া একটা জাতিতে পরিণত হইল, এবং সেই জাতি জগৎকে কিছু দিয়া গেল কি না, তাহা ভাবিয়া দেখিবার বিষয়। কেমন করিয়া সে নিজের স্বাতন্ত্র্যরক্ষা করিবার প্রয়াস পাইয়াছিল; কেমন করিয়া সে তাহার পারিপার্শ্বিক অবস্থার সহিত বিরোধ করিতে বাধ্য হইয়াও একটা সামঞ্জস্য-বিধানের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াছিল; কেমন করিয়া বিভিন্ন হিব্রু tribeগুলি সংহত হইয়া একটা নেশনে পরিণত হইতে গিয়া বিচ্ছিন্ন (disintegrated) হইয়া গেল; জীববিদ্যার (Biology) মৌলিক তত্ত্বগুলির সূত্র ধরিয়া আপনি এই কথার আলোচনা করুন

রামেন্দ্রবাবু।—জীববিদ্যার সাহায্যে আলোচনা করিতে গেলে প্রথমেই গোটা কতক সাধারণ সত্য ধরিয়া লইতে হইবে। সমাজদেহ ও জীবদেহ উভয়েই যন্ত্রবদ্ধ পদার্থ। উভয়েরই কতকটা স্বাতন্ত্র্য আছে। একটা সমাজদেহকে অন্যান্য সমাজদেহ হইতে এবং তাহার পারিপার্শ্বিক অবস্থা হইতে স্বতন্ত্র বিবেচনা করিতে হইবে; কারণ, জীবনের উদ্দেশ্য, ঐ পারিপার্শ্বিক অবস্থার উপযোগী করিয়া লইয়া সেই স্বাতন্ত্র্যকে পুষ্ট

করা; সেই স্বাতন্ত্র্যের উৎকর্ষ দেখিয়া আমরা জীবনের সফলতার পরিমাপ করি। সমাজদেহ কাহাকে বলিব? পাঁচজন লোক এক জায়গায় দল বাঁধিয়া বসিলেই কি তাহাকে সমাজ বলিব? গোটা সমাজটার সঙ্গে তার ব্যষ্টির কি সম্বন্ধ? Societyর জন্য Individual, না Individualএর জন্য Society? জীববিদ্যায় কি এ প্রশ্ন উঠে? দেহের অঙ্গগুলি (organs) তাহার কোনও না কোনও কাজে লাগে; নহিলে তাহাদের কোনও সার্থকতা নাই। কিন্তু সমাজে যে individual কোনও কাজে এল না, তাহাকে কি উচ্ছেদ করিতে হইবে? জীববিদ্যায় দয়ামায়ার স্থান নাই, সমাজ-বিদ্যায়ও কি অকেজো ব্যক্তির প্রতি দয়ামায়ার লেশ-মাত্র থাকিবে না? উন্নত সমাজে কি এরূপ মনে করা চলে? জীবদেহে প্রত্যেক কোষের স্বাতন্ত্র্য নাই; কিন্তু সমাজদেহের প্রত্যেক ব্যক্তিরও কি স্বাতন্ত্র্য থাকিবে না? সমাজবিদ্যার এত বড় কথাটা সম্বন্ধে জীববিদ্যা খাঁটি উত্তর দিতে পারিবে না। উত্তর পাইতে হইলে আরও অন্য scienceএর সাহায্য লইতে হইবে—যথা চারিত্রদর্শন (moral science); কিন্তু এই moral scienceএর সহিত biologyর কিছুমাত্র সম্পর্ক নাই। হক্‌স্‌লি এই প্রশ্ন উত্থাপিত করিয়া বলিয়াছেন যে, জীব-জগতে যে সকল ব্যাপার সংঘটিত হয়, সে সমুদয় সম্পূর্ণরূপে moral scienceএর বহির্ভূত;—moralও (সুনীতি-মূলক) নহে; immoralও (দুর্নীতি-মূলক) নহে; একেবারে unmoral (অনীতিমূলক)। তাই বলিতেছি, ঐতিহাসিক আলোচনায় জীববিদ্যার তত্ত্বগুলি একটু সতর্কতার সহিত গ্রহণ করিতে হইবে।

আরও অনেক প্রশ্ন উঠিতে পারে। মনে করুন মানিয়া লওয়া গেল যে, ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্য খর্ব্ব করিয়া সমাজরক্ষা করা সমাজবিদ্যার প্রতি-

পাদ্য বিষয়। তখনই প্রশ্ন উঠে সমাজের গোড়ায় unit কি,—Indviidual না Family ?

আমি।—Family, Tribe, Clan প্রভৃতি কএকটি শব্দের বাঙ্গালা পরিভাষা করিয়া লইতে পারিলে ভাল হয় না ?

রামেন্দ্রবাবু।—Family'র পরিবর্ত্তে আমি 'গৃহ' শব্দটি ব্যবহার করিতে চাই। 'পরিবার' শব্দটা আমাদের এই প্রসঙ্গে বোধ হয় ঠিক যে জিনিসটি আমরা চাই তাহা বুঝাইবে না। 'গৃহ' শব্দটা আমাদের নিজস্ব জিনিস। বৈদিক যুগে Head of the familyকে 'গৃহপতি' বলা হইত; যে অগ্নি তিনি জ্বালিয়া রাখিতেন, তাহাকে গার্হপত্য বলা যাইত। ব্রাহ্মণ যতদিন গুরুগৃহে থাকিতেন ততদিন তিনি গৃহী নহেন, ব্রহ্মচারী। গুরুগৃহপরিত্যাগের পর সমাবর্ত্তন অনুষ্ঠিত হইলে তিনি স্নাতক; তখন তাঁহার বিবাহে অধিকার জন্মিয়াছে; বিবাহান্তে সস্ত্রীক যে অগ্নিপ্রতিষ্ঠা করিতে হয় তাহাই গার্হপত্য অগ্নি; শ্রৌত অগ্নি স্থাপনের পর গার্হস্থ্য ধর্ম্ম আরব্ধ; তখন সেই ব্রাহ্মণ,—গৃহী বা গৃহস্থ, সেই গৃহের গৃহপতি; পত্নী হইলেন—গৃহিণী। গৃহিণী গৃহমুচ্যতে যখন বলা হইল, তখন পত্নী বড় হইয়া গেলেন। শ্রৌত, স্মার্ত্ত এবং communal বা Personal, যে কোনও কাজ করিতে হইবে, তাহা সস্ত্রীক করা চাই; শ্রীরামের স্বর্ণসীতা আবশ্যক হইয়াছিল। পতি ও পত্নী উভয়ে কর্ম্মফলে তুল্যরূপে ভাগী হইবেন।

Clanকে গোত্র বলিব, না গোষ্ঠী বলিব ? শব্দ দুইটির ব্যুৎপত্তিলব্ধ অর্থ কিন্তু বড় বেশী তফাৎ নহে। আদিম আর্য্যদিগের প্রধান সম্পত্তি ছিল গোধন; সেই গরুগুলিকে যতটা জায়গার মধ্যে বেড়া দিয়া রক্ষা করা হইত, সেই বেড়া বোধ করি গোত্র, এবং সেই জায়গায় যে কয়টি পরিবার থাকিতেন, তাঁহারা সগোত্র; একটি গোষ্ঠের

চারিদিকে যাঁহারা থাকিতেন, তাঁহারা একই গোষ্ঠীভুক্ত। হিন্দু-সমাজে গোত্র খুব বড় জিনিস। বেদের ব্রাহ্মণসাহিত্যে গোত্রপ্রবর্ত্তক কএকজন ঋষির নাম আছে; আধুনিক হিন্দুসমাজের সকলেই যে সেই কয়জন ঋষির বংশধর এরূপ মনে করা যায় না। কালক্রমে অনেক গোত্র-প্রবর্ত্তক ঋষিকে খাড়া করা হইয়াছে। কোনও কোনও যাজ্ঞিক অনুষ্ঠানে যজমানের গোত্রভেদে মন্ত্রের তারতম্য হইত। এখনও আমাদের কোনও অনুষ্ঠানেই নিজের গোত্রপরিচয় না দিলে চলে না। এক এক গোত্রের বংশগুলি চারিদিকে এত ছড়াইয়া পড়িয়াছে যে, গোত্র এখন Clan অপেক্ষা বড় জিনিস হইয়া দাঁড়াইয়াছে। গোষ্ঠী বরং অনেকটা সঙ্কীর্ণ-সীমাবদ্ধ। গোষ্ঠী শব্দটা গ্রহণ করিলে বোধ করি অন্যায় হইবে না।

Tribeএর ঠিক বাঙ্গালা পরিভাষা পাওয়া কঠিন। 'কুল' শব্দটি Tribe অর্থে এদেশে প্রচলিত আছে; ছত্রিশকুল রাজপুতের কথা শুনিতে পাই। আমাদের ঐতিহাসিক আলোচনায় Tribeএর পরিবর্ত্তে 'কুল' শব্দটি ব্যবহার করিলে যে বিশেষ সুবিধা হইবে এমন ত বোধ হয় না। হঠাৎ নূতন নূতন পরিভাষা চালাইতে চেষ্টা করিলে গোলযোগের সম্ভাবনা আছে। এখন আমরা ইহুদিদিগের ইতিবৃত্ত আলোচনা করিতে বসিয়া যদি আমরা হিব্রু tribeগুলাকে হিব্রুকুল বলিয়া অনুবাদ করিয়া চালাইতে চেষ্টা করি, তাহা হইলে আমাদের নিজেরই কেমন কেমন ঠেকিবে। অতএব পরিভাষা ব্যবহার সম্বন্ধে একটু স্বাধীন না থাকিলে চলিবে না।

এইবার আসুন, হিব্রুদিগের ইতিহাস আলোচনা করিয়া দেখি। প্রথমটা কি দেখিতে পাই? অনেকগুলি স্বতন্ত্র Tribe। কোথা হইতে তাহারা আসিল, কেহ তাহা বলিতে পারে না; আরবের

মরুভূমিতে বা মেসোপটেমিয়ার উর্ব্বর ভূমিতে তাহাদের জন্ম কি না, সে রহস্য এখনও উদ্‌ঘাটিত হয় নাই। সহসা কতকগুলি যাযাবর Tribe আমাদের নয়ন-গোচর হয়। তাঁহারা সকলই এব্রাহামের পুত্র, ইস্রায়েলের বংশধর বলিয়া পরিচিত ছিল; তাহাদের কৌলিক ইতিহাসের ধারা সমস্ত গোষ্ঠীর মধ্যে একইভাবে রক্ষিত হইয়া আসিয়াছে; সকলেই একভাষায় কথা কহিত; একই দেবতা এলোহিমকে পূজা করিত, অথচ প্রত্যেক tribeএর স্বতন্ত্র কৌলিক দেবতাও ছিল; কাহারও নির্দ্দিষ্ট আবাসভূমি ছিল না। এই সকল যাযাবর দল হয় ত মিশরদেশে গিয়াছিল; মূসার নেতৃত্বাধীনে হয় ত তাহারা ফিরিয়া আসিয়াছিল।

আমি।—হয়ত বলিতেছেন কেন? মূসা নামধেয় কোনও ব্যক্তি সম্বন্ধে সন্দেহ হইতে পারে; কিন্তু Exodus সম্বন্ধে সন্দেহ হইতে পারে কি?

রামেন্দ্র বাবু।—অনেকে ত সন্দেহ করিয়া থাকেন। আমরাই বা ঐ ব্যাপারটিকে অভ্রান্ত ঐতিহাসিক সত্য বলিয়া মানিয়া লইব কেন? তর্কের খাতিরে ধরিয়া লওয়া গেল যে হিব্রুদলগুলি মিসর দেশ হইতে পলাইয়া আসিল। প্রত্যাবর্ত্তনের পর সাইনে (Sinai) পাহাড়ের উপর মূসার ভগবদ্দর্শন ঘটে। কেনাইট (Kenite) নামক একটি নূতন tribeএর সহিত তাঁহারা মিলিত হইলেন; ইহারা জাভে (Jahve) নামক দেবতার পূজা করিত। মূসা এই (Jahve) দেবতাকে হিব্রুদিগের প্রাচীন দেবতা এলোহিমের স্থানে প্রতিষ্ঠিত করিলেন; Jahveর নিকট হিব্রুরা চুক্তিবদ্ধ (Covenant) হইল যে, তাহারা একমাত্র জাভের পূজা করিবে, এবং অন্য সমস্ত দেবতার উপাসকদিগকে সমূলে উচ্ছেদ করিবে। এই Jahve দেবতার পূজার বার্ত্তা বহন

করিয়া মূসা হিব্রুদিগকে প্যালেষ্টাইনে প্রেরণ করিলেন। 'জাহবে' সোজা করিয়া বলিলে জেহোবা হয়।

আমি।—হিব্রুদিগের প্রাচীনতম ধর্ম্মে ত আর একটা covenant ছিল?

রামেন্দ্র বাবু।—হাঁ, ছিল বটে, ভগবানের সঙ্গে Noahর Covenant। যাহাকে Ark of the Covenant বলা হইত, সেটি একটি বাক্সবিশেষ; হিব্রুরা মূসার অনুজ্ঞাক্রমে সেই বাক্সটি ঘাড়ে করিয়া ঘুরিত। এই Arkটিও একটি ঐতিহাসিক রহস্য; কখন ইহার প্রথম আবির্ভাব এবং কখন ইহার তিরোভাব হইল, কেহ তাহা ঠিক বলিতে পারে না। বাইবেলে আছে জেহোবার সহিত মূসার চুক্তিবন্ধনের পর এই বাক্স নির্ম্মিত হইয়াছিল। জেহোবা এই বাক্সের উপর আবিভূত হইয়া আদেশ দিতেন। সে যাহা হইক, মূসা তাঁহার নূতন দেবতাকে লইয়া নূতন দেশে আগমন করিলেন। কতকগুলি নূতন ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত করিতে হইয়াছিল।

১। একমাত্র Javehকে পূজা করিতে হইবে।

২। ছুন্নৎ (Circumcision) অনুষ্ঠিত হইল।

৩। পশুবলি প্রবর্ত্তিত হইল।

৪। Javehর পৌরোহিত্য মূসার ভাই Aaron এর বংশধর ভিন্ন আর কেহ করিতে পাইবে না। অন্য কেহ সেই পূজার বিধিব্যবস্থা অবগত ছিলেন না। এমনই করিয়া একটা স্বতন্ত্র পুরোহিত-বংশ সৃষ্ট হইল।

যখন তাঁহারা প্যালেষ্টাইনে প্রবেশ করিলেন, তখন তাঁহারা আর যাযাবর রহিলেন না; Canaanএ নির্দ্দিষ্ট জমি দখল করিয়া বসিলেন। আশে পাশে অনেক tribe ছিল,—Moabite, Philistine,

Amalekite ইত্যাদি। তাহাদের সহিত বিরোধ অবশ্যম্ভাবী; কারণ, তাহারা অন্যান্য দেবতার ভক্ত উপাসক ছিল; তাহাদিগের উচ্ছেদ-সাধন না করিলে হিব্রুদিগের সত্যরক্ষা হয় না।

Exodusএর কাল-নিরূপণ কঠিন; আন্দাজ খৃঃ পূঃ দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে এই ব্যাপার সংঘটিত হইয়াছিল।

আমি।—তাহা হইলে দাঁড়াইল এই যে, হিব্রুদিগের মধ্যে মুসাই সর্ব্বপ্রথম একেশ্বরবাদ প্রচারিত করিলেন?

রামেন্দ্রবাবু।—সাধারণতঃ এই রকমই বলা হয় বটে, কিন্তু ইহার মধ্যে একটু মজা আছে। মিশর হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পর যে দিন হইতে তাহাদিগের মধ্যে মূসা জাভেকে (Javeh) প্রতিষ্ঠিত করিতে প্রয়াস পাইলেন, সেই দিন হইতেই তাঁহার প্রধান চেষ্টা দাঁড়াইল যে সমগ্র দেশের মধ্যে একমাত্র Javeh-কেই সকলে যেন পূজা করেন। অন্যান্য tribeএর অন্যান্য দেবতা ছিলেন, তাহা অস্বীকার করা হইত না; সেই সকল দেবতার উপাসককে নির্ম্মূল করিতে হইবে; এই মর্ম্মে জাভের সঙ্গে গোড়া হইতে একটা সর্ত্ত করিয়া লওয়া হইয়াছে। অন্য tribe এর দেবতাকে নষ্ট করিয়া আমার tribeএর দেবতাকে উপাস্য করিতে হইবে,—ইহাকে monotheism বলিতে হয় বলুন। এ রকম monotheism ত আশে পাশের tribeগুলির মধ্যেও দৃষ্ট হয়; তাহাদেরও স্ব স্ব কৌলিক দেবতাকে সকলেরই উপাস্য করিবার প্রয়াস ছিল। তাহারা যদি বলবত্তর হইত, যদি তাহারা নেশন কিংবা রাষ্ট্র গঠিত করিতে পারিত, তাহা হইলে হিব্রুদিগের এই একেশ্বরবাদের কথা এমন ভাবে জাহির হইয়া পড়িত কি না বলা যায় না। কানানের (Canaan) আদিম অধিবাসী Moabite দিগের কথাই ধরুন। তাহাদের ত নিজের দেবতা ছিল,—চেমশ্।

হিব্রুদিগের প্রতি জাভের যেরূপ আদেশ, মোআবাইটদিগের প্রতি চেমশেরও আদেশ তদ্রূপ কঠোর ছিল হিব্রুজাতির সম্পর্কে একমাত্র উৎকীর্ণ লিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে ; উহাকে বলে Moabite Inscription ; প্যারিস নগরে উহা রক্ষিত হইতেছে। তাহাতে কি দেখিতে পাই ? Moab এর রাজা তাঁহার দেবতা চেমশের তুষ্টিসাধনের জন্য ইস্রায়েলের সন্তানদিগকে নিহত করিয়াছেন। মেশা নামে Moab এর এক রাজা ছিলেন ; তাঁহার প্রজাপুঞ্জের উপর দেবতা চেমশের কোপদৃষ্টি নিপতিত হইল ; সেই দেবরোষের ফল হইল এই যে, ইস্রায়েলের রাজা ওম্রি Moabiteদিগকে বিধ্বস্ত করিল ; ওম্রির পুত্রও ঐ পন্থা অবলম্বন করিবেন এইরূপ বুঝা গেল ; অমনই Moabite এর দেবতা চেমশ্, ইস্রায়েলের উপর রোষকষায়িত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন ; মোআবের রাজা সাত হাজার জেহোবাপূজককে নিহত করিয়া দেবতাকে পরিতুষ্ট করিলেন। উৎকীর্ণ-লিপির ইংরেজি অনুবাদ এই দেখুন ,—

Omri was king of Israel, and oppressed Moab for a long time because Chemosh was angered against his people. The son of Omri also wished to oppress Moab. Chemosh said to me 'I will cast my eyes on him and over his house, and Israel shall perish for ever'. I, Mesha, king of Moab, accordingly took the town of Ataroh and killed all the people in honour of Chemosh. I killed all, 7000 men, for they had been interdicted, in honour of Chemosh. I carried away the people of Javeh, and I dragged them along the ground before Chemosh.

এখন বলুন দেখি, ইস্রায়েলের দেবতা Javen আর মোআবাইটের চেমশ স্ব স্ব উপাসকদিগের প্রতি প্রায় একই প্রকার আদেশ জাহির করিয়াছিল কি না? মূসার হিব্রুদলগুলি কালক্রমে তাহাদের দেবতা জাভেকে কেন্দ্র করিয়া আপনাদিগকে একটা নেশনে পরিণত করিল, একটা State গাড়য়া তুলিল; মোআবাইটরা তাহা পারিল না। ইস্রায়েলের জয় হইল; সেই সঙ্গে ইস্রায়েলের দেবতাও সর্ব্বত্র আপনাকে জাহির করিবার অবসর পাইল। Javehর পসার প্রতিপত্তি বাড়িয়া গেল। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত বিভিন্ন হিব্রু tribeগুলা তাহাদের কৌলিক দেবতাগুলিকে সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করে নাই; বর্জ্জন করিতে পারে নাই বলিয়া তাহাদিগকে ভয় দেখাইয়া কৌলিক দেবতার পূজা হইতে নিরস্ত করিবার চেষ্টা করা হইত; এই প্রকার ভয় প্রদর্শনের জন্যই নবীদিগের (Prophets) আবির্ভাব। তাঁহারা কটূক্তি করিয়া, বিভীষিকা দেখাইয়া জনসাধারণের মন Javehর দিকে আকৃষ্ট করিবার চেষ্টা করিতেন। ইহুদির ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে বেশ বুঝা যায় যে, মূসা প্রবর্ত্তিত জেহোবা দেবতার পূজা ব্যতিরিকে অন্যান্য ছোট খাট দেবতাও হিব্রুদিগের পূজা পাইত।

সে যাহা হউক, তাঁহারা নূতন ধর্ম্মানুষ্ঠানের উপর তাঁহাদের জাতীয় জীবন সংহত করিবার জন্য যত্নবান্ হইলেন; ধীরে ধীরে বিভিন্ন tribe গুলি জমাট বাঁধিবার দিকে অগ্রসর হইল; প্রায় দুই শত বৎসর ধরিয়া সুফীদিগের (Judges) নেতৃত্বে কৌলিক স্বাতন্ত্র্য পরিহার করিয়া একটা বড় গোছ নেশনে সংহত হইবার চেষ্টা করা হইয়াছিল।

আমি।—Canaan এ মোটামোটি বারটা tribeই ত আসিয়া বসিল; তখনও তাহাদের নিজেদের স্বাতন্ত্র্য সর্ব্বতোভাবে পরিহৃত হয় নাই; আমি গোড়ায় যে tragedyর কথা বলিলাম, এইবার তাহার প্রথম অঙ্ক হইল।

রামেন্দ্রবাবু।—সুফীদিগের নেতৃত্বে এই ১২ টা tribe জমাট বাঁধিবার চেষ্টা করিতে লাগিল; সকলেই বাহিরের tribeগুলিকে ঘৃণা করিত; তাহাদের সহিত যুদ্ধ হইত; কখনও কিন্তু সব tribeগুলা এক জনের নেতৃত্বে চালিত হইতে রাজী হইত না। আবার নিজেদের স্বতন্ত্র কৌলিক দেবতাগুলিকে তাহারা সকলে ছাড়িতে পারে নাই; সুফীরা এই সকল দেবতা-পূজকদিগকে শাস্তি দিবার চেষ্টা করিত। এইরূপে দিন যায়। পরিশেষে একজন সুফীর আবির্ভাব হইল, তাঁহার নাম স্যামুয়েল(Samuel)। তিনি দেখিলেন যে, এরূপ বিচ্ছিন্নভাবে থাকিলে সফলতা লাভ করা যাইবে না। তথাপি একজন রাজা প্রতিষ্ঠিত করিতে তাঁহার বিশেষ ইচ্ছা ছিল না; জনসাধারণ বলিল,—আমাদের রাজা চাই। প্রথমে তিনি তাহাদের কথায় কর্ণপাত করেন নাই; কিন্তু শেষে ভাবিলেন, রাজা আবশ্যক। তিনি সল্‌কে (Saul) খুঁজিয়া বাহির করিয়া anoint করিয়া রাজা করিয়া দিলেন।

আমি।—দ্বিতীয় অঙ্ক আরম্ভ হইল। ইতিহাসের রঙ্গমঞ্চে দুইশত বৎসর কতটুকু! সুফী চলিয়া গেলেন; রাজা আসিলেন।

রামেন্দ্রবাবু।—রাজা আসিলেন; তিনি যে কার্য্যভার গ্রহণ করিয়া কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন, সে কার্য্যে তিনি prophet-দিগের নিকট যথেষ্ট সাহায্য পাইয়াছিলেন; এই prophet সম্প্রদায়কে স্যামুয়েল একটি যন্ত্রবদ্ধ সম্প্রদায়ে পরিণত করিয়াছিলেন। এই নবী সম্প্রদায় (prophetএর হিব্রু পরিভাষা—নবী) জাভের অনুগৃহীত; জাভের দিকে সমস্ত tribe গুলির মন আকৃষ্ট করিবার জন্য তাঁহারা বদ্ধপরিকর হইলেন।

সলের (Saul) পর দায়ুদ (David); দায়ুদের পর সলোমন (Solomon the magnificent) রাজা হইলেন। দায়ুদ রাষ্ট্রের

কেন্দ্র-স্বরূপ রাজধানী জেরুসালেম স্থাপিত করিলেন। সলোমন জাভের পূজার জন্য Mount Zionএর উপর দেবমন্দির গঠিত করিলেন। হিব্রুরা মন্দির নির্ম্মাণ করিতে জানিত না; টায়র (Tyre) হইতে মিস্ত্রী আনাইয়া লেবেননে (Lebanon) দেবদারু (cedar) বৃক্ষ কাটিয়া মন্দির তৈয়ারী করা হইল। তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল, যে, সকলে ছোট ছোট গ্রাম্য কৌলিক দেবতাকে পরিত্যাগ করিয়া এই বড় মন্দিরে আসিয়া পূজা করিবে। মন্দিরের মধ্যে বিগ্রহ ছিল না; মূসার সেই অতিপ্রাচীন সনাতন বাক্সটি (Ark of the Covenant) সযত্নে রক্ষিত হইল। পূজার জন্য নির্দ্দিষ্ট পুরোহিত-বংশ ছিল; নির্দ্দিষ্ট অনুষ্ঠান ছিল।

হিব্রুজাতি এখন একটা রাষ্ট্রে পরিণত হইল। রাজার একেশ্বরপ্রভুত্ব, অখণ্ড প্রতাপ। রাজ্যের বাহিরে Moabite প্রভৃতি দলগুলা তখনও কৌলিক অবস্থা (tribal stage) হইতে উন্নত হইতে পারে নাই। দূরে বড় বড় সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত ছিল,—আসিরিয়া, ব্যাবিলনিয়া, মিশর। আবার টায়র (Tyre) সিডন্ (Sidon)প্রভৃতি কএকটি প্রবল ফিনীসিয় নগর ছিল। ইহাদিগের মধ্যে আত্মরক্ষা করিতে হইবে; পারিপার্শ্বিক অবস্থার সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া নিজের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিবার চেষ্টা করিতে হইবে; সেই সঙ্গে জাভে-পূজাকে কেন্দ্রে রাখিয়া সমাজ-দেহে সংহতি রক্ষা করিতে হইবে। পারিপার্শ্বিক অবস্থার সহিত বিরোধ ও সন্ধি করিয়া চলিতে হইয়াছিল। ফিনীসিয়দিগের সহিত সন্ধি করিয়া ইহারা তাহাদের জাহাজে বাণিজ্য করিতে আরম্ভ করিল; রাজ্য বহুদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইল। সলোমনের অতুল ঐশ্বর্য্য; তিনি বিদেশের বহু রাজকন্যার পাণিগ্রহণ করিলেন; তাঁহার নাকি এক সহস্র মহিষী ছিল। সর্ব্বনাশের পথ প্রশস্ত হইল। সংহত সমাজ ভাঙিবার (disintegrated) লক্ষণ প্রকাশ পাইল।

সে পরে বলিতেছি। সল্, দায়ুদ ও সলোমন প্রায় শত বর্ষ রাজত্ব করিলেন। সলোমনের মৃত্যুর পর গোলযোগ বাধিয়া গেল। সমাজের প্রবীণ গৃহপতিরা মিলিয়া স্যামুয়েলকে সমস্বরে বলিয়াছিলেন,—আমাদের রাজা চাই, তাঁহারা রাজা পাইয়া আনন্দিত হইয়াছিলেন। সলের মৃত্যু হইলে তাঁহারা দায়ুদকে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করিলেন; রাষ্ট্র জমাট হইয়া বাঁধিয়া উঠিল; সমাজ উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে লাগিল। তাঁহারা যাহা চাহিয়াছিলেন, তাহা পাইলেন; কবিবর নবীন সেনের ভাষায় বলিতে গেলে, তাঁহাদের তখন "এক রাজ্য, এক ধর্ম্ম, এক নারায়ণ।" রাজা দায়ুদ জাভের উপাসনায় যে একাগ্রতার, তন্ময়তার, উন্মাদনার ভাব প্রকাশ করিতেন, তাহাতে প্রজাপুঞ্জের আনন্দের সীমা থাকিত না। মন্দিরের সম্মুখে তিনি নৃত্য করিতেন, ভূমিতে গড়াগড়ি দিতেন, গায়ে কাদা মাখিতেন। রাজা সলোমনের মতি গতি কিন্তু সম্পূর্ণ অন্যরূপ। বিদেশিনী রাজকন্যা সলোমনের অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন; সেই সঙ্গে টীরিয়, আসীরিয়, মিশরীয় দেবতারা Canaan এ শুভাগমন করিলেন। সহস্রমহিষীপরিবেষ্টিত রাজা সলোমন অনেকগুলি মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া নবাগত দেবতাদিগকে তন্মধ্যে স্থাপিত করিলেন। হয়ত ভারতবর্ষে আকবর শাহের মত সলোমন উদারধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক হইবার বাসনা করিয়াছিলেন। চেমশ্, আষ্টাট, মোলক প্রভৃতি দেবতা Canaan এ প্রতিষ্ঠিত হইলেন।

প্রবীণ গৃহপতিরা প্রমাদ গণিল। এ কি হইল? মুসা জাভের সহিত যে সর্ত্ত করিয়াছিলেন, তাহা রক্ষিত হইল না কেন? তিনি ত নিশ্চয় রুষ্ট হইবেন; তাঁহার কোপ হইতে হিব্রু-জাতিকে কে রক্ষা করিবে? এখনও মুসার Ark of the Covenant জাভের মন্দিরে রক্ষিত হইতেছে; রাজা কি তাহা ভুলিয়া গেলেন? অন্যজাতির

দেবতা আসিয়া আমাদের দেবতার পূজায় ভাগ বসাইতে আসিল কেন? জাভের পুরোহিতগণ বিচলিত হইলেন। তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষ Aaronএর কথা স্মরণ হইল। মনে পাড়ল সেই ধর্ম্মপ্রবর্ত্তনার প্রথম যুগের কথা, যখন মূসার সম্মুখে জাভে আবির্ভূত হইয়া মূসাকে আদেশ করিলেন,—"একমাত্র আমাকে পূজা করিতে হইবে; যদি করিতে পার, আমি তোমাদিগকে রক্ষা করিব; আমি একমাত্র তোমাদেরই পূজা গ্রহণ করিব; তোমরাই আমার chosen people; কিন্তু তোমরা অন্য দেবতার উপাসকদিগকে সমূলে নির্ম্মূল করিবে; তাহাদের দেশে যেন কোনও প্রাণী জীবিত থাকে না।" মূসা আসিয়া Aaronকে বলিলেন, সমবেত হিব্রু দলপতিদিগকে বলিলেন, জাভের আদেশ শিরোধার্য্য করিতে হইবে। তাঁহার প্রস্তাব সকলে অনুমোদন করিলেন। তখন হইতেই ত জাভের পূজা চলিয়া আসিতেছে। তাই কি? পুরোহিতের মনে পড়িল Aaronএর পদস্খলনের কথা; লজ্জায় পুরোহিত মাথা হেঁট করিলেন। সেই এক মুহূর্ত্তের বিশ্বাসঘাতকতার ফল কি আজ তাঁহাকে ভোগ করিতে হইবে? তিনিও কি আজ Aaron এর মত কর্ত্তব্যচ্যুত হইবেন? Aaronএর প্রতিজ্ঞাভঙ্গ দেবতা ক্ষমা করিয়াছিলেন। একমাত্র তিনি ও তাঁহার বংশধরেরা জাভের উপাসনায় পৌরোহিত্য করিতে পারিবেন, ইহা প্রথম হইতেই স্থির হইয়াছিল। পুরোহিতেরা ভাবিলেন, Canaanএ অন্য দেবতার পূজা প্রবর্ত্তিত করিয়া রাজা কি অনর্থের সূত্রপাত করিলেন!

নবীগণ (Prophets) ক্রুদ্ধ হইয়া গর্জ্জিয়া উঠিলেন। হিব্রুসমাজ ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল। মূর্ত্তিপূজার বিরুদ্ধে জাভের আদেশ কেমন করিয়া বিস্মৃত হইবেন! মূসা যখন দ্বিতীয়বার আদিষ্ট হইয়া জেহোবা

দর্শনাভিলাষে পাহাড়ে চলিয়া যান, দলপতিরা তাঁহার পথ চাহিয়া রহিয়াছিলেন; দিনের পর দিন অতিবাহিত হইল, তিনি প্রত্যাগমন করিলেন না। সকলে মনে করিল, তিনি আর ফিরিবেন না, হয় ত তিনি জীবিত নাই। Aaron বলিলেন,—"মূসা নাই; জাভের প্রত্যাদেশ ত ভাল করিয়া বুঝা গেল না; এস আমরা আমাদের সনাতন মূর্ত্তিপূজায় মন দি।" এই বলিয়া তিনি একটি স্বর্ণবৃষ গড়িয়া তুলিলেন। দেবতাকে বৃষরূপে পূজা করিবার আয়োজন হইতেছে, এমন সময়ে মূসা সহসা উপস্থিত হইলেন। সকলকে যথোচিত তিরস্কার করিয়া বলিলেন,—"আর এমন কাজ করিও না। জাভে ক্রুদ্ধ হইলে তোমাদিগের সর্ব্বনাশ হইবে। তাঁহার প্রত্যাদেশ পাইয়াছি। তাঁহার সহিত চুক্তির নিদর্শনস্বরূপ একটি কাষ্ঠের বাক্স নির্ম্মাণ করিতে হইবে,—আড়াই ফুট লম্বা, দেড় ফুট চওড়া, দেড় ফুট খাড়াই। সেইটিই Ark of the Covenant!" এতদিন ধরিয়া সেই Arkটিকে কেন্দ্রে রাখিয়া হিব্রুসমাজ ঘন হইয়া দানা বাঁধিয়া উঠিয়াছে। আজ তাহার বুকের উপরে অন্য দেবতা চাপিয়া বসিল।

জনসাধারণ বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। সলোমানের মৃত্যুর পরে তাঁহার রাজ্য দ্বিধা বিভক্ত হইল। উত্তরে ও দক্ষিণে দুইটি সতন্ত্র রাজ্য আবির্ভূত হইল। উত্তরের নাম হইল—ইস্রায়েল (Israel); দশটা tribe সেখানকার অধিবাসী হইয়া রহিল। দক্ষিণের নাম হইল—যুডা (Judah); দুইটি tribe মাত্র সেখানে রহিল।

আমি।—"এক ধর্ম্ম, এক নারায়ণে"র জন্য "এক রাজা" রহিল না। শতবর্ষ কাটিয়া গেল। দুইটা স্বতন্ত্র স্বাধীন রাজ্য লইয়া হিব্রুর জাতীয় জীবনের ট্র্যাজেডির তৃতীয় অঙ্ক আরম্ভ হইল।

রামেন্দ্রবাবু।—ইস্রায়েল দুইশত বৎসর স্বায় রাষ্ট্রীয় স্বাতন্ত্র্য রক্ষা

করিতে পারিয়াছিল; এই দুই শতাব্দীর মধ্যে যুডার সহিত অনেকবার তাহার যুদ্ধবিগ্রহ হইয়াছিল। "এক রাজা" ত রহিলই না; পরন্তু দুইটা খণ্ডিত অংশের মধ্যে পরস্পরের সহিত বিরোধ অনিবার্য্য হইয়া উঠিল। Canaanএ রাষ্ট্রীয় জীবন যাত্রার যে পাথেয় লইয়া তাহারা চলিতে আরম্ভ করিয়াছিল, তাহা নিঃশেষিত হইতে না হইতেই তাহারা দুই-খণ্ডে বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল। একটা পুরুভুজ যেমন দ্বিখণ্ডিত হইয়া দুইটি স্বতন্ত্র, দুইটি পৃথক্ পুরুভুজে পরিণত হয় ও হয়ত পরস্পর বিরোধ আরম্ভ করে; তেমনই দুইটা স্বতন্ত্র ধর্ম্মভাবকে কেন্দ্রে রাখিয়া হিব্রুজাতি দুইটা স্বতন্ত্র রাষ্ট্রে বিভক্ত হইল।

ইস্রায়েলের প্রথম রাজা জেরোবোয়াম জাভেকে বৃষরূপে পূজা করিতে আরম্ভ করিলেন। নূতন পুরোহিত-সম্প্রদায় আবির্ভূত হইল। নবী আহিয়া (Prophet Ahijah) এই মূর্ত্তিপূজার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া রাজার প্রতি কঠোর বাক্য প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। পরবর্ত্তী রাজারা তাঁহার পদাঙ্ক অনুসরণ করিলেন। ষষ্ঠ রাজা ওম্রি (Omri), সামারিয়াতে রাজধানী প্রতিষ্ঠিত করিলেন। এই ওম্রির সম্বন্ধে পূর্ব্বোক্ত Moabite Inscriptionএ উল্লেখ রহিয়াছে। সপ্তম রাজা, আহাব (Ahab) টায়র (Tyre) নগর হইতে বেয়ালের (Baal) পূজা আমদানি করিলেন। Baalএর সহিত Javehর প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলিতে লাগিল। লোকবিশ্রুত নবী ইলাইজা (Elijah) ও তাঁহার শিষ্য ইলাইশা (Elisha) পুনঃপুনঃ অভিসম্পাত করিতে লাগিলেন। দশম রাজা কিন্তু Baal এর উপাসকদিগকে উচ্ছেদ করিতে বদ্ধপরিকর হইলেন। অন্ততঃ কিছু দিনের জন্য জাভের জয় হইল। পঞ্চদশ রাজা, জেরোবোয়াম (Jeroboam II) বেশ শান্তিতে রাজত্ব করিলেন; দেশের শ্রী ফিরিল;

বহু দেবতাপূজার উপর নবীগণের অভিশাপ বর্ষিত হইল। ঊনবিংশ রাজা হোশিয়ার রাজত্ব কালে একেবারে সব ফুরাইল।

আসারিয়াধিপতি দ্বিতীয় সার্গন্ (Sargon II) সামারিয়া দখল করিয়া ইস্রায়েলের সমস্ত নরনারীকে য়ুফ্রেটিস নদীর পরপারে নির্ব্বাসিত করিয়া দিলেন। ইস্রায়েল আসীরিয়-সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইল।

আমি। তা'র পর?

রামেন্দ্রবাবু। তা'র পর যাহা ঘটিল তাহার তুলনা ইতিহাসে পাওয়া যায় কি? দশটা tribe একেবারে লুপ্ত হইয়া গেল; জগতে কুত্রাপি তাহাদের একটু চিহ্নমাত্রও খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছে না। তাহাদের কি হইল, সে সম্বন্ধে ইতিহাস একেবারে মূক। এমন tragedy বোধ হয় আর কোথাও অভিনীত হয় নাই। পরশুরাম পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয় করিয়াছিলেন; বুঝিতে পারি যে তিনি ক্ষত্রিয় কুল নির্ম্মূল করিয়া কাটিয়া ফেলিলেন; তাহা দু এক বারে পারেন নাই, একুশ বার চেষ্টা করিতে হইয়াছিল। কিন্তু এই দশটা হিব্রু tribe এর কি হইল তাহা যে জানিতেই পারা গেল না। তাহাদের জাতীয় জীবনের চতুর্থ অঙ্কের উপর যে যবনিকা পড়িল, তাহা এখন পর্য্যন্ত উত্তোলিত হইল না; চিরন্তন রহস্যই রহিয়া গেল।

ইস্রায়েলের রাষ্ট্রীয় জীবনের স্থিতিকাল দুইশত বৎসর খৃঃ পূঃ ৯৩০ হইতে খৃঃ পূঃ ৭২২ পর্য্যন্ত।

আমি।—ইস্রায়েল গেল। দক্ষিণের য়ুডারাজ্য কিন্তু আরও কিছু দিন ত টিকিয়া গেল। প্রথম রাজা রোহোবোয়ামের পর—

রামেন্দ্রবাবু।—রোহোবোয়ামের (Rehoboam) পর কেন, তাঁহারই রাজত্বকালে ধর্ম্মবিপ্লব আরম্ভ হইয়াছিল; বহু দেবতার পূজা হইতে লাগিল; ধর্ম্মবন্ধন শিথিল হইল; কোনও প্রকারেই রাষ্ট্রশক্তি দৃঢ়ভাবে

প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিল না। আসীরিয়া যখন ইস্রায়েলকে গ্রাস করিল, যুডা তাহার সহিত সখ্যসূত্রে আবদ্ধ হইয়া বাঁচিয়া গেল। অতিকষ্টে কিছুদিন তাহার রাষ্ট্রীয় স্বাতন্ত্র্য অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারিয়াছিল।

এমন সময় আসীরিয়ার সৌভাগ্যসূর্য্য সহসা অস্তমিত হইল। সদ্যোত্থিত ব্যাবিলনের প্রচণ্ডশক্তি আসীরিয়ার মহাশ্মশানের উপর দিয়া যুডার সিংহাসন কম্পিত করিল। সম্রাট নেবুকাডনেজর (Nebuchadnezzar) জেরুসালেম অধিকার করিয়া বসিলেন (খৃঃ পূঃ ৫৯৭); অনেকগুলি বন্দী লইয়া ব্যাবিলনে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন।

আরও দশ বৎসর কাটিয়া গেল। সম্রাটের দ্বিতীয় অভিযান হইল। যুডার দুইটা tribe এর সমস্ত নরনারীকে বন্দী করিয়া স্বরাজ্যে ফিরিয়া আসিলেন। এই Babylonish captivityতেই তাহাদের রাষ্ট্রীয় জীবনের পরিসমাপ্তি হইল।

আমি।—ট্র্যাজেডির পঞ্চমাঙ্কের উপর যবনিকা পতিত হইল।

রামেন্দ্রবাবু।—হইল বটে, কিন্তু এই ট্র্যাজেডির একটা after piece আছে; কপালকুণ্ডলা শেষ হইল, কিন্তু মৃন্ময়ী আছে; Three musketeers শেষ হইল, কিন্তু Twenty years After আছে; হিব্রুনেশনের ইতিহাস শেষ হইল, কিন্তু Judaism এর ইতিহাস আবার সুরু হইবে।

* * * *

পঞ্চাশ বৎসর কাটিয়া গেল। ব্যাবিলনের হিব্রু বন্দীদিগের দিনগুলি কেমন করিয়া কাটিতে লাগিল কে জানে। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর অতিবাহিত হইল; আর কি দেশে ফিরিবার আশা আছে? নবী এজেকায়েল (Ezekiel) বলিলেন, আশা আছে; নিরুৎসাহ হইলে চলিবে কেন? তাঁহারা ভাবিতে

লাগিলেন, কেন তাঁহাদের এই সর্ব্বনাশ হইল? জাতীয় জীবনের পুরাতন কথাগুলি একে একে মনে পড়িয়া গেল। মনে পড়িল কেমন করিয়া তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষ ধর্ম্মভ্রষ্ট হইয়া বিপথে চলিয়া গিয়াছিল; সত্যভ্রষ্ট হইয়া দেবতাকে ভুলিয়াছিল; তাই জাভে তাহাদিগকে রক্ষা করলেন না। পুরুষানুক্রমে যে শাপ সঞ্চিত হইয়া ঘনীভূত হইয়া উঠিয়াছে তাহার প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে বৈ কি। দেবতা কি প্রসন্ন হইবেন না? এতবড় প্রকাণ্ড ব্যাবিলন সাম্রাজ্যে তাহারা কি নিজের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিতে পারিবে না! সম্রাট্ ত তাঁহাদের দৈনন্দিন জীবনে হস্তক্ষেপ করেন না। ধর্ম্মের অনুশাসন মানিতে হইবে। মূসা-প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মশাস্ত্র নূতন করিয়া রচিত হইল; সমস্ত আচার ব্যবহার রীতি নীতি পূজা পদ্ধতি পুনরুজ্জীবিত হইল। পঞ্চাশৎ বৎসরব্যাপিনী অগ্নিপরীক্ষার পর দেবতা প্রসন্ন হইলেন। পারস্যাধিপতি সাইরাস (Cyrus) ব্যাবিলন সাম্রাজ্য ধ্বংস করিয়া হিব্রু বন্দীদিগকে দেশে ফিরিয়া যাইতে অনুমতি দিলেন।

কিন্তু এতকালের বাস কি সহজে উঠাইয়া দেওয়া যায়? হিব্রুর অল্পে অল্পে দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিল। প্যালেষ্টাইন তখন পারস্য সাম্রাজ্য-ভুক্ত। নূতন করিয়া জাভের মন্দির গঠিত করা হইল। ব্যাবিলন হইতে কিছু দিন পরে নবী এজ্রা (Ezra) আসিয়া সমাজ সংস্কারে প্রবৃত্ত হইলেন। প্রত্যাবর্ত্তনের পর এই কয় বৎসরের মধ্যে অনেক হিব্রু যুবক বাহিরের tribe হইতে কন্যা আনিয়া বিবাহ করিয়াছিল। নবী এজ্রা বলিলেন, এ কি হইয়াছে? অজ্ঞাতকুলশীলা কন্যার সংস্পর্শে আমাদের জাতীয় স্বাতন্ত্র্য থাকিতে পারে না। উহাদিগকে বহিষ্কৃত করিয়া দেওয়া হউক। তাহাই হইল। স্বীয় শিশুসন্তানদিগকে বক্ষে ধারণ করিয়া বিদেশিনীরা চিরদিনের মত চলিয়া গেল।

নেহেমিয়া (Nehemiah) ব্যাবিলন হইতে আসিয়া ধর্ম্মের অনুশাসন প্রচারিত করিলেন। প্রত্যেক ইস্রায়েল সন্তান এখন হিব্রুধর্ম্মের রীতি নীতি আচার ব্যবহার পূজা পদ্ধতি অবগত হইল। নবী নেহেমিয়া নূতন করিয়া Covenant করিলেন;—অন্য জাতির সহিত বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হইব না, সপ্তাহের মধ্যে একটি নির্দ্দিষ্ট দিন (Sabbath) কাজ কর্ম্ম হইতে বিরত থাকিব। মানুষের প্রথম সন্তান, গৃহপালিত পশুর প্রথম শাবক, ও বৎসরের প্রথম শস্য ও ফল দেবতাকে সমর্পণ করিতে হইবে; পুরোহিতদিগের ও তাঁহাদের আজ্ঞাকারী Leviteদিগের ভরণ পোষণের জন্য কর দিতে হইবে।

এই নবীন হিব্রুধর্ম্মের (Judaism) মধ্যে একটি নূতন জিনিষ দেখিতে পাই; যথা angel প্রভৃতি দেবযোনি অপদেবতা, ও সয়তানে বিশ্বাস; এবং মৃতের পুনরুত্থানে বিশ্বাস। এ গুলি পারস্য দেশ হইতে আমদানি করা হইয়াছিল।

সে যাহা হউক, এমনই করিয়া হিব্রুজাতি আপনাদিগকে এক দুর্ভেদ্য অচলায়তনের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়া জাতীয় স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিবার প্রয়াস পাইল। সমস্ত আচার ব্যবহারকে তাহারা আঁকড়াইয়া ধরিল। দেবতাকে প্রসন্ন রাখিবার জন্য পশুযজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইল; মেষ বৃষ ছাগশিশুর যথারীতি বলি হইতে লাগিল; প্রথম পুত্র সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবার পর এক মাস অতিবাহিত হইলে, তাহাকে দেবতার উদ্দেশে অর্পণ করা হইত, তৎক্ষণাৎ আবার কিছু মূল্য দিয়া তাহাকে দেবতার নিকট হইতে ক্রয় করিয়া লওয়া হইত। সপ্তাহের সপ্তম দিবস Sabbath বলিয়া গণ্য করা হইত। ছয় বৎসর অন্তর পূরা এক বৎসর পৃথিবীর Sabbath হইত। সে বৎসর, ভূমিকর্ষণ, খাল খনন, বৃক্ষছেদন নিষিদ্ধ ছিল; যে সকল খাদ্যদ্রব্য আপনা আপনি জন্মিত, সেগুলি ভূস্বামী,

দীন দুঃখীদিগের মধ্যে অধিকাংশই বণ্টন করিয়া দিতেন। হিব্রুসঙ্ঘের অচলায়তন দুর্ভেদ্য প্রাচীরের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হইল। যাজকতন্ত্র রাষ্ট্রতন্ত্রের স্থান অধিকার করিল।

* * *

দুই শত বৎসর কাটিয়া গেল। ম্যাসিডনের দিগ্বিজয়ী বীর পারস্য সাম্রাজ্য ধ্বংস করিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর যুডা বহুকাল গ্রীক সীরিয়ারাজ্যের অন্তর্ভুক্ত রহিল। সে কি বিষম দিন, যখন আন্তিওকস (Antiochos Epiphanes) যুডার যাজকদিগের সহিত পরামর্শ করিয়া হিব্রুজাতিকে নির্দ্দয়ভাবে নিপীড়িত করিল। আদেশ প্রচারিত হইল যে, হিব্রুভাষার অনুশীলন করিতে দেওয়া হইবে না, গ্রীসীয় ক্রীড়ারঙ্গে (Games) যুডার নরনারী যোগদান করিতে বাধ্য হইবে; মন্দিরে জাভে পূজার পরিবর্ত্তে গ্রীকদেবতার পূজা করিতে হইবে; Zeus দেবের মূর্ত্তি মন্দির মধ্যে স্থাপিত হইবে; ছুন্নদনুষ্ঠানের জন্য মৃত্যুদণ্ড ভোগ করিতে হইবে। ক্ষিপ্ত হিব্রুজাতি মাকাবিয়সের নেতৃত্বে বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। পঁচিশ বৎসর তাহারা রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিল। সীরিয়ার রাজা তাহাদিগকে দমন করিতে পারিলেন না। তাহারা নামমাত্র তাঁহার অধীন হইয়া রহিল।

কিন্তু যুডার মধ্যেই যাজক সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আর একটি সম্প্রদায় মাথা তুলিল; তাহারা ফ্যারিসী (Pharisee) নামে পরিচিত হইল। সমাজের মধ্যে এই অন্তর্বিদ্রোহের ফলে একদল রোমের সাহায্য প্রার্থনা করিল। পম্পি (Pompey) আসিলেন। রোমের কর্ম্মচারী Procurator ইহুদিজাতির প্রভু হইয়া বসিল।

* * *

রোমের সম্রাট্ বলিলেন, আমাকে দেবতার মত পূজা করিতে

হইবে। হিব্রু বলিল, "আমরা সীজরের Cæsar প্রাপ্য সীজরকে দিব; জাভের প্রাপ্য জাভেকে দিব।" সীজরের ভ্রুকুটি দেখিয়া হিব্রু শিহরিল না। অত্যাচার উৎপীড়ন চলিতে লাগিল। নানা সম্প্রদায় আবির্ভূত হইল। একদল (Zealots) ধর্ম্মের নামে সর্ব্বত্র সর্ব্বদা নরহত্যা করিতে আরম্ভ করিল, আর একদল (Sadducees) গ্রীসীয় হিব্রু ধর্ম্মের (Hellenistic Judaism) দিকে প্রবণতা প্রদর্শন করিল; Phariseeগণ অত্যন্ত নিষ্ঠাবান গোঁড়া হিব্রু বলিয়া পরিচিত হইবার প্রয়াস পাইল; খৃষ্টান সম্প্রদায় বিশ্বপ্রেমের বার্ত্তা ঘোষণা করিল; এসীনি ও থেরাপিউট সন্ন্যাসী সম্প্রদায় আবির্ভূত হইল; খৃষ্টের প্রতিদ্বন্দ্বী সাইমন (Simon the Magus) হেলেন নাম্নী রমণীকে লইয়া তান্ত্রিক উপাসনা আরম্ভ করিলেন। সম্রাট্ ভিস্পেশিয়ন Vespasion এবং টিটস্ (Titus) আসিয়া জেরুসালেম ধ্বংস করিয়া দিলেন। যাজক তন্ত্র হিব্রুজাতির ইতিহাস শেষ হইয়া গেল।

কিন্তু হিব্রুজাতি মরিয়াও মরিল না। তাহারা উত্তরে দক্ষিণে, পূর্ব্বে পশ্চিমে ছড়াইয়া পড়িল। কিন্তু সর্ব্বত্রই হিব্রু তাহার স্বাতন্ত্র্য অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য নিজেকে অচলায়তনের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়া রাখিয়াছে। প্রবল খৃষ্টীয় সমাজের মধ্যে থাকিয়া প্রায় দুই সহস্র বৎসর সে আপনাকে রক্ষা করিয়া আসিয়াছে। তাহাকে কি না সহ্য করিতে হইয়াছে! খৃষ্টানের উৎপীড়নে, মুসলমানের অত্যাচারে সে এক দিনের জন্যও আচারভ্রষ্ট হয় নাই। য়ুরোপের রাজন্যবর্গ, রোমের পোপ তাহার নিকট কত ঋণী!

কোথায় গেল আসীরিয়, ব্যাবিলনীয়, মিসরীয়, পারস্য, ম্যাসিডোনীয়, রোমক সাম্রাজ্য! কোথায় গেল বোগদাদের ও কর্ডোভার খলিফা সাম্রাজ্য! কোথায় গেল মোআবাইট্, আমালাকাইট্ কুলসমূহ!

কিন্তু হিব্রু এখনও বাঁচিয়া আছে; স্বতন্ত্র জাতি হিসাবে বাঁচিয়া আছে; তাহার দেবতা আচার অনুষ্ঠান লইয়া বাঁচিয়া আছে। শুধু যে বাঁচিয়া আছে তাহা নহে; সর্ব্বত্রই সে নিজের শির উন্নত করিয়া চলিতেছে। ড্রেফুব্যাপারে সে বিচলিত হয় না, Pogromএ উৎসন্ন যায় নাই। তাহার সমাজের এই জীবনীশক্তি কোথায় সঞ্চিত, পুঞ্জীভূত হইয়া আছে?—তাহার অচলায়তনে।

ইহুদি ও গ্রীক

রামেন্দ্রবাবু বলিতে লাগিলেন—"হিব্রুরা বাঁচিয়া গেল।

'চিরদিন আছি ভিখারীর মত
জগতের পথপাশে ;
যা'রা চলে যায়, কৃপাচক্ষে চায়,
পদ ধূলা উড়ে আসে !'—

"কবির এই কথাগুলি হিব্রুর সম্বন্ধে খাটে না। হিব্রু 'ষ্টেট্' নাই, হিব্রু 'নেশন্' নাই, কিন্তু হিব্রু জাতি (People) সগর্ব্বে মস্তকোত্তোলন করিয়া আছে। একবার তাহার দেবতার সহিত তাহার সম্পর্কটা ভাবিয়া দেখুন দেখি। সে বলিতেছে,—'এ দেবতা আমার, আমিও এ দেবতার, আমার দেবতার উপর অন্যের অধিকার নাই, আমার দেবতা অন্য কাহাকেও দিব না; আমার দেবতার আদেশ প্রতিপালন করিবার জন্য যে সকল অনুষ্ঠানের বিধান হইয়াছে, সে-গুলি একমাত্র আমাদেরই জাতীয় উৎকর্ষসাধনের উদ্দেশ্যেই হইয়াছে, অন্য কাহারও নহে; সমস্ত পৃথিবীর মধ্যে আমরাই জাভের (Jahveh) একমাত্র Chosen poeple, আমরাই তাঁহার নিকট প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া আছি যে অন্য দেবতার উপাসককে নির্ম্মূল ও নষ্ট করিব; আমাদের ধর্ম্মবিস্তারের আকাঙ্ক্ষা নাই; কেন আমরা বিধর্ম্মীদিগকে Chosen peopleএর অন্তর্ভুক্ত করিব? ব্যাবিলন্ হইতে প্রত্যাগমন করিয়া দেখিলাম যে, আমাদের যুডায় ও ইস্রায়েলে বিদেশী Samaritanরা আমাদের অনুপস্থিতি কালে আমাদের আচারানুষ্ঠান গ্রহণ করিয়া, আমাদেরই মত Chosen people হইবার ধৃষ্টতা প্রকাশ করিতেছিল। তৎক্ষণাৎ

তাহাদিগকে দূরে সরাইয়া দিলাম। মন্দির-নির্ম্মাণকার্য্যে তাহারা আমাদের সাহায্য করিতে চাহিলে, আমরা তাহা ঘৃণার সহিত প্রত্যাখ্যান করিলাম। আমরা দুনিয়ায় কাহারও সহিত মিশিতে চাহিনা। একবার State হিসাবে রাষ্ট্রীয় ভাবে, ঘন হইয়া জমাট বাঁধিবার চেষ্টা করিয়াছিলাম, পারিলাম না; প্রবল State হইয়া পরধর্ম্মের উচ্ছেদ করিতে পারিলাম না; আমাদের মধ্যেই অন্তর্বিদ্রোহ উপস্থিত হইল। রাষ্ট্রতন্ত্রের মধ্যে আমাদের জাতীয়শক্তি পুষ্টিলাভ করিল না; খণ্ডিত হইয়া গেল। হয় ত আমাদের জাতীয় ইতিহাসে গৃহপতিদিগের এইটিই সর্ব্বপ্রধান ভুল। আমাদের যিনি দেবতা, তিনিই রাজা; জাভে (Jahveh) ব্যতীত অন্য রাজা আমাদের নাই ও হইতে পারে না; কিন্তু বোধ হয় অন্যের দেখাদেখি তাঁহারা রাজা করিলেন। এই সকল রাজা জাভের অপমান করিয়া অন্যান্য দেবতার পূজাপ্রচলনের চেষ্টা করিলেন। জাভের কোপদৃষ্টি আমাদের উপর পতিত হইল। রাজাও গেল, রাজ্যও গেল। তদবধি আর আমরা রাষ্ট্রগঠনের চেষ্টা করি নাই; আপন দেবতাকেই রাজা করিয়া বসিলাম। কিন্তু সেই দেবতার নিকট আমরা পদে পদে অপরাধ করিয়াছি; তাঁহার আদেশবাণী অক্ষরে অক্ষরে পালন করিতে সমর্থ হই নাই। আমাদের সমাজতন্ত্রের সামাজিক অনুষ্ঠানের তৎপরতা লইয়া আমরা পরস্পর বিসংবাদ করিয়াছি। আমরা বিধর্ম্মী গ্রীক্‌কে জাভের মন্দিরে প্রবেশ করিতে দিয়াছি; বিধর্ম্মী রোমান্‌কে গৃহ বিবাদ মিটাইবার জন্য আমাদের ঘরে ডাকিয়া আনিয়াছি। সেই অপরাধের ফল ফলিয়াছে; জাভে আমাদিগকে ক্ষমা করেন নাই। আমাদের দেশ হইতে আমরা বিতাড়িত হইয়াছি, আমাদের দেবমন্দির বিচূর্ণিত হইয়াছে। আমাদেরই ভিতর হইতে একটা নূতন সম্প্রদায় মাথা তুলিল, তাহারা আমাদের পুরাতন ধর্ম্ম (Law) মানিতে চাহিল না, হিব্রুকে Chosen poeple বলিয়া স্বীকার করিল না, Jew ও Gentileকে সমান আসন প্রদান

করিল। তাহাদেরই অনুবর্ত্তিগণ এখন পৃথিবীর অধিকারী ; আর আমরা এত বড় পৃথিবীর মধ্যে Wandering jews! তাহাদের নেতা বলিয়াছিলেন—আমিই ঈশ্বর। সেকথায় হিব্রু কাণে আঙ্গুল দিয়াছিল। আজ তাঁহারই দলভুক্তেরা পৃথিবীর ঈশ্বর। আমাদের গত দুইসহস্র বৎসরের জাতীয়-ইতিহাস এই খ্রীষ্টানদেরই অত্যাচারকাহিনীতে পরিপূর্ণ। ইহুদির নাম লোপ করিতে ইহারা না করিয়াছে, এমন বর্ব্বরতা নাই। অথচ সময়ে অসময়ে রাজা, পোপ সম্রাট্ আমাদের শরণাপন্ন হইয়াছেন। মুসলমানের হাত হইতে জেরুসালেম্ উদ্ধার করিবার জন্য ক্রুসেডে অভিযান করিতে হইবে। টাকা চাই ; রোমের পোপ আমাদের নিকট হাত পাতিলেন। ইটালির নগরগুলির সমৃদ্ধিরক্ষা আমরাই করিয়া আসিয়াছি। ইংলণ্ডের রাজারা বিপদে পড়িলে, আমাদের নিকট টাকা কর্জ্জ লইতেন। খৃষ্টান্ প্রজাপুঞ্জের চোখ টাটাইল। প্রথম এড্ওয়ার্ড National King হইবার বাসনা করিলেন ; প্রজাপুঞ্জের মনোরঞ্জনের জন্য বিনাদোষে আমাদিগকে সাগরপারে নির্ব্বাসিত করিয়া দিলেন। কত শত বৎসর পরে আমরা আবার ইংলণ্ডে ফিরিয়া যাইবার আদেশ পাইলাম। খৃষ্টান্ য়ুরোপের নগরে নগরে রাজপথ দেড় হাজার বৎসর ধরিয়া ভূয়োভূয়ঃ আবালবৃদ্ধবনিতা ইহুদির রক্তে কর্দ্দমাক্ত হইয়াছে। এখন আমাদের দেশ নাই, রাষ্ট্র নাই, দেবমন্দির নাই, এমন কি পুরোহিত পর্য্যন্ত নাই ; কিন্তু আমরা স্বধর্ম্মে মরণ শ্রেয়ঃ বিবেচনা করিয়া আমাদের দেবতা, আমাদের আচারানুষ্ঠান, আমাদের বর্ত্তমান অবস্থায় যতদূর সাধ্য আঁকড়াইয়া ধরিয়া বসিয়া আছি। দূর সাইনে পর্ব্বতের শিখরদেশে যে অভয়বাণী ধ্বনিত হইয়া মুসার মুখ দিয়া প্রেরিত হইয়াছিল, আজ তিনসহস্র বৎসর পরেও আমরা তাহা স্বকর্ণে শুনিতে পাইতেছি। খৃষ্টান্ য়ুরোপের অতিকায় কলেবর তাহার মুষ্টিবন্ধনে আবদ্ধ ইহুদি জাতিকে দলিয়া

পিষিয়া মারিয়া গ্রাস করিয়া আত্মসাৎ করিতে যুগব্যাপিয়া চেষ্টা করিয়াছে, কিন্তু ইহুদি দলিত হয় নাই, পিষ্ট হয় নাই, আত্মরক্ষার জন্য লুকাইতে পর্য্যন্ত বাধ্য হয় নাই; সগর্ব্বে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া সে জ্ঞান-বিজ্ঞান, কাব্যকলা ও ঐশ্বর্য্যের সমৃদ্ধিতে য়ুরোপের খৃষ্টীয় জনসাধারণের বর্ব্বরতাকে বিদ্রূপ করিতেছে। * * যে দেবতাকে লইয়া সমগ্র মানবসমাজের সহিত আমাদের মর্ম্মান্তিক বিরোধ; যে দেবতা আমাদের, এবং আমরা যে দেবতার; যিনি আমাদিগকে বর ও অভয় দান করিয়াছেন; তাঁহার বাণী কি সফল হইবে না? তবে বসিয়া থাকা যাক্ তাঁহার বাণীর সাফল্যের প্রতীক্ষায়; কর্ম্ম করা যাক্ তাঁহার মহিমার প্রতিষ্ঠাকল্পে; ধৈর্য্যরক্ষা করিয়া পথ চাহিয়া থাকা যাক্ কবে মেশায়া (Messiah) আসিবেন! তিনি আসিবেন; কবে আসিবেন জানি না; নাই বা জানিলাম; তিনি আসিবামাত্রই তাঁহার Chosen peopleকে চিনিয়া লইতে পারিবেন; ইস্রায়েলের সন্তানদিগের ধমনীতে হিব্রুরক্ত নিষ্কলুষভাবে প্রবাহিত হইতে থাকুক;—বিধর্ম্মীদিগের রাষ্ট্রতন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত থাকিয়াও তাহারা নিজেদের স্বাতন্ত্র্য অক্ষুণ্ণ রাখিতে সমর্থ হইবে। দুই সহস্র বৎসর ধরিয়া বিপুল মানব সমাজের সহিত বিরোধ করিয়া যখন আমরা ধর্ম্মে কর্ম্মে আচারে অনুষ্ঠানে আমাদের জাতিগত স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিতে পারিয়াছি, তখন আমাদের ভাবনা কি? মেশায়া আসিবেন। আমাদিগকেই উপলক্ষ্য করিয়া জাভের মহিমা আবার প্রতিষ্ঠিত হইবে। আমরা যেন সে কার্য্যের অনুপযুক্ত না হই। আবার ধর্ম্মরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইবে। ধর্ম্মরাজ্য স্থাপন করিতে গিয়া একবার আমরা ভুল করিয়াছিলাম; ধর্ম্মের চেয়ে রাষ্ট্রকে বড় করিয়া দেখিয়াছিলাম; সমস্ত বিপর্য্যস্ত হইয়া গেল। আমাদের জাতীয় জীবনের সেই বিচিত্র স্বপ্ন "এক রাজ্য, এক ধর্ম্ম, এক নারায়ণ," বিলীন হইয়া গেল! সে কি নিষ্ঠুর জাগরণ!

রাজ্য গেল; ধর্ম্ম লইয়া দাঁড়াই কোথায়! মন্দির গেল; দেবতাকে প্রতিষ্ঠা করি কোথায়! এত বড় বিরাট্ বিশ্বে আমাদের নিজের বলিয়া পরিচয় দিবার একতিল স্থান নাই; Ark of the Covenantকে স্থাপিত করি কোথায়? সে যে আমাদেরই দেবতার সঙ্গে আমাদের চুক্তির নিদর্শন; সেটিকে লইয়া ক্রুর বিধর্ম্মী * * আমাদের অক্ষম আক্ষেপে কি হইবে? সহসা সেই Ark of the Covenant অন্তর্হিত হইল! সেইদিন হইতে আমরা দিন গণিতেছি। জেরুসালেম্ গিয়াছে; নব-জেরুসালেম প্রতিষ্ঠিত হইবে। একবার ভুল করিয়াছি; এবার আর ভুল হইবে না। আমরা বাঁচিতে চাহি; We mean to live,—we will to live,—আমরা বাঁচিবই। জাভের আদেশবাণীর নিকট আমরা আমাদের মতামত, আমাদের ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য, আমাদের রাষ্ট্রীয় স্বাতন্ত্র্য সমস্ত বিলুপ্ত করিয়া দিয়াছি। এই সম্পূর্ণ আত্মবিসর্জ্জনই আমাদের ধর্ম্ম—আমাদের যজ্ঞ—এই যজ্ঞে আমরা আমাদিগকে আহুতি দিয়াছি। ফলে আমরা নবজীবন পাইবই—আমরা বাঁচিয়া আছি এবং বাঁচিবই!"

রামেন্দ্রবাবু যেন একটু উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন; বলিলেন—"এমন ব্যাপার আর কোথাও সংঘটিত হইয়াছে কি? জীববিদ্যার মৌলিক তত্ত্বগুলির কথা মনে পড়ে কি? পারিপার্শ্বিক অবস্থার সহিত দুইসহস্র বৎসর ধরিয়া বিরোধ চলিয়াছে, অত্যাচার উৎপীড়নের বিরাম নাই; দেশ নাই, রাষ্ট্র নাই; অথচ হিব্রু লুপ্ত হইল না। Biologyর মূলসূত্রগুলি ধরিয়া বিচার করিবার চেষ্টা করিলে সন্তোষজনক ব্যাখ্যা পাইবেন না। সর্ব্বত্র মানবসমাজ একটা দেশে প্রতিষ্ঠিত হইয়া স্বাতন্ত্র্য ও আত্মরক্ষার জন্য একটা শাসনযন্ত্র, বা Government, গড়িয়া লইয়া দৃঢ়বদ্ধ রাষ্ট্র, বা Stateএ পরিণত হইবার চেষ্টা করিয়াছে। এই রাষ্ট্রের বলে বলীয়ান্ হইয়া স্বাতন্ত্র্য রক্ষার চেষ্টা পাইয়াছে; নতুবা সে শত্রু

হস্তে দলিত ও পিষ্ট হইয়া জীবন হারাইয়াছে, অথবা পরের দেহে মিশিয়া গিয়া আত্মলোপ করিয়াছে। ইহুদি সেরূপ পারে নাই, অথচ ইহুদি বাঁচিয়া আছে। সাধারণ জীবধর্ম্মের পশ্চাতে মানুষের আর একটা কিছু আছে, যেটা সাধারণ জীববিদ্যায় ধরা পড়ে না। সেইটির প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করিতে হইবে।

"এই Will to live কোথা হইতে আসিল, কিরূপে উৎপন্ন হইল, তাহার হিসাব দিতে না পারিলে LIFE—জীবের জীবন—কি, তাহা বুঝা যাইবে না। জীববিদ্যা ইহার হিসাব দিতে এপর্য্যন্ত পারে নাই; সম্ভবতঃ পারিবেও না। অতি অল্পদিন হইল—আজ বলিলেও চলে—য়ুরোপের সুধীগণের মধ্যে কেহ কেহ ইহা ধরিতেছেন। অথচ এইটুকু না বুঝিলে প্রাণী-জীবনের ও উদ্ভিদ্-জীবনের শেষ কথা জানা হইবে না;—মানুষের সামাজিক জীবনের, রাষ্ট্রীয় জীবনের, ধর্ম্মজীবনেরও হিসাব-নিকাশ মিলিবে না। এই বিচিত্র প্রসঙ্গ উপলক্ষ করিয়া যদি মানুষের সামাজিক ইতিহাসের সেই চরম কথা একটু স্পষ্ট করিতে পারি, তাহা হইলে আমি ধন্য হইব—আমার ক্ষুদ্রজীবনের একটা কাজ হইবে; এবং আপনাকে যে ভূতেরবেগার খাটাইতেছি, আপনারও এই অযথাপ্রযুক্ত পরিশ্রম ও হয়ত কতকটা সার্থক হইবে।

"আর একটি জাতিও উল্লেখযোগ্য। মুসলমান আক্রমণে ইহুদির সহিত তুলনায় স্বধর্ম্ম রক্ষার জন্য একদল পার্শী ভারতবর্ষে আসিয়া হিন্দু রাজার নিকটে আশ্রয় প্রার্থনা করিলেন; প্রার্থনা মঞ্জুর হইল। তাঁহারা নিজের ধর্ম্ম, আচার, অনুষ্ঠান লইয়া একটি ছোটখাটো উপ-নিবেশ স্থাপন করিলেন। আজ তেরশত বৎসর ধরিয়া তাঁহারা সর্ব্বতো-ভাবে নিজেদের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া আসিতেছেন, এবং কর্ম্মক্ষেত্রে উন্নতশির হইয়া বিচরণ করিতেছেন। একত্রিশ কোটি হিন্দু মুসলমান

পরিবেষ্টিত মুষ্টিমেয় পার্শী-সমাজ সগৌরবে স্বতন্ত্র হইয়া রহিয়াছে। অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, ইহুদির মত তাহাকে পারিপার্শ্বিক অবস্থার সহিত বিরোধ করিতে হয় নাই। কারণ যে দেশে তাহারা আশ্রয় লইয়াছিল, তাহারা অতিথির পীড়ন কখনই করে না। পরধর্ম্মে বিদ্বেষ তাহাদের নাই। বিরোধ না থাকিলেও এত বৃহৎ ভিন্নধর্ম্মী সমাজের মধ্যে এতকাল বাস করিয়া আপনার স্বাতন্ত্র্য রক্ষা জনকতক পার্শীর পক্ষে সাধ্য হইত না। কিন্তু তবুও সে প্রবলতর সমাজের মধ্যে আপনাকে লুপ্ত করিয়া দেয় নাই। ইহুদির মত সে নিজের ধর্ম্ম, নিজের Culture নিজেই পুষ্ট করিয়া আসিতেছে। তাহাদের বিশিষ্ট রীতিনীতি বিশিষ্ট অনুষ্ঠানগুলিকে অন্ধভাবে জড়াইয়া না থাকিলে, এই বিস্তীর্ণ আর্য্যভূমি ভারতবর্ষের আর্য্যজাতির মধ্যে বাস করিয়া স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করা কিছুতেই সম্ভবপর হইত না; পার্শী লুপ্ত হইত। তখন পার্শীজাতির ইতিবৃত্ত অন্বেষণ করিতে হইলে, জরথুস্ত্রের ধর্ম্মের কথা খুঁজিয়া বাহির করিতে হইলে, হেরোডোটসের ইতিহাসের পাতাই একমাত্র অবলম্বন হইত। গ্রীকের সহিত পারসীকের জীবনযুদ্ধ পৃথিবীর ইতিহাসে এক বিচিত্র অধ্যায়। সেই যুদ্ধে কেহ কাহারও নিকট পরাজয় স্বীকার করে নাই। সর্ব্বগ্রাসী ইস্‌লাম্, পারসীক জাতিকে ও পারসীক সভ্যতাকে আত্মসাৎ করিয়াছে; স্বদেশে পারসীকের চিহ্নমাত্রও রাখে নাই। ভারতবর্ষের আশ্রয় লইয়াও মুষ্টিমেয় পার্শী বেদপন্থী সমাজের বিপুল দেহে আত্মলোপ করে নাই। স্বধর্ম্মকে জড়াইয়া না থাকিলে ইহা সম্ভব হইত কি? নতুবা পার্শীর নাম উদ্ধারের জন্য তাহার শত্রু গ্রীকের সাহিত্যের আশ্রয় গ্রহণ ভিন্ন গত্যন্তর থাকিত না।"

একটু চুপ করিয়া রামেন্দ্রবাবু বলিলেন—"গ্রীক্‌দিগের কথা আসিয়া পড়িল; গ্রীক্ সভ্যতার কথা না বলিলে মানবের ইতিহাস বুঝা যাইবে

না। গ্রীসীয় বা হেলেনীয় সভ্যতার অর্থ কি? বাহির হইতে একটা নূতনজাতি আসিয়া গ্রীসের আদিম অধিবাসীদিগকে পরাজিত করিয়া নূতন সভ্যতা বিস্তার করিল, পুরাতনের বিশেষ কিছুই রহিল না, এই রকম একটা ধারণা ইতিহাস রচয়িতৃদিগের মধ্যে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ পর্য্যন্ত বদ্ধমূল হইয়াছিল। গত কয়েক বৎসরের অনুসন্ধানে, একটা অজ্ঞাতপূর্ব্ব সাগরবংশের কথা (Mediterranean race) জানিতে পারা গিয়াছে; ইহাদের পর Pelasgian Race, পরে Achœan Race, এই সকল বিভিন্নজাতি ঐতিহাসিকের চোখে অস্পষ্ট ভাবে দেখা দিতেছে। গ্রীসের এই পুরাতন সভ্যতাকে Minoan culture নামে অভিহিত করা হইয়াছে। তাহা কোনও সাহিত্য রাখিয়া যায় নাই, কিন্তু সভ্যতার নানা নিদর্শন রাখিয়া গিয়াছে। দিন দিন নূতন নূতন নিদর্শন ভূগর্ভ হইতে আবিষ্কৃত হইয়া গ্রীক্‌জাতির ইতিহাসের পুনর্গঠনের সাহায্য করিতেছে। ঊনবিংশ শতাব্দীতে স্থির হইয়াছিল যে গ্রীক্‌জাতি আর্য্যজাতির এক শাখা; ভূমধ্যসাগরের পূর্ব্বাংশের আদিম নিবাসীদিগকে দলিত, পিষ্ট ও আত্মসাৎ করিয়া গ্রীক্‌জাতির স্বতন্ত্র সভ্যতা প্রতিষ্ঠিত হয়। এখন দেখা যাইতেছে, উহা সম্পূর্ণ ঠিক নহে। পুরাতন Minoan ও মাইকিনীয় সভ্যতাকে ভিত্তি করিয়া এমন কি তাহারই মালমশলা লইয়া, গ্রীক্‌সভ্যতা পুনর্গঠিত হইয়াছিল মাত্র। কিন্তু এইরূপে যে সভ্যতা বিকশিত হইল, তাহা পৃথিবীর ইতিহাসে অতি অদ্ভুত পদার্থ; বোধ করি তাহার তুলনা নাই!

"এই অদ্ভুত গ্রীক্‌সভ্যতা—Hellenic culture—বুঝিতে হইলে, এই সভ্যতার বিশিষ্ট ভাব কি, তাহা বুঝা আবশ্যক। কএকটি বিষয়ে এই বিশিষ্টভাব লক্ষ্য করা যায়। প্রথম, গ্রীকের জাতীয় ভাব। সে আপনাকে পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ মানব বলিয়া জানিত। তাহার নানা দেবতা

ছিল, নানা পৌরাণিক Hero ছিল। দেবতাদিগের সহিত Hero দিগের নিত্যকারবার হইত; সর্ব্বদা আদান প্রদান চলিত। দেবতারা মানবীর গর্ভে সন্তান উৎপাদন করিতেন; মানুষেরা দেবতাদের কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিত। ঐ সকল মানুষ গ্রীক্‌জাতির প্রতিষ্ঠাতা; তাহাদের সমাজতন্ত্রের ও রাষ্ট্রতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাতা ও বিধানকর্ত্তা। উহাদের পূজা ও প্রীতিসাধন গ্রীক্‌সমাজের প্রধান অনুষ্ঠান; উহাদের পরামর্শ লইয়া গ্রীকের রাষ্ট্রতন্ত্র চালিত হইত; উহাদের স্তুতি ও উহাদের অবদান কীর্ত্তন লইয়াই অলৌকিক গ্রীক্‌সাহিত্যের সৃষ্টি ও পুষ্টি। ঐ সকল দেবতা ও অতিমানুষ-পুরুষদিগকে (Heroes) অবলম্বন করিয়া গ্রীকের জাতীয়ভাব (Nationalism) স্ফুর্ত্তি পাইল; এক ভাষা, এক সাহিত্য, এক Tradition ও Folklore, এই জাতীয়ভাবের অবলম্বন। সহস্র মন্দির ও Sanctuary অবলম্বন করিয়া এই সকল Tradition মূর্ত্তিগ্রহণ করিয়াছিল। উহা সমস্ত গ্রীক্‌জাতির সাধারণ সম্পত্তি। ট্রয়ের লড়াই, হোমর্, হিসীয়ড্, ডেল্‌ফাইয়ের Oracle, অলিম্পীয় ক্রীড়োৎসব, আপোলো দেবের Mysteries, আম্ফিক্‌টিয়ন্ সভা, এ সমস্তই গ্রীক্‌দিগের জাতীয় সম্পত্তি; সকল গ্রীকের এই সকল বিষয়ে সমান অধিকার। যাহারা এই সমাজতন্ত্রের অধীন, তাহারাই গ্রীক্। অন্য সকলে গ্রীক্ নহে,—Barbarian, বা ম্লেচ্ছ; তাহাদিগের ভাষা গ্রীক্ বুঝে না; গ্রীক্ সমাজতন্ত্রে তাহাদের স্থান নাই বা অধিকার নাই; তাহাদিগের প্রতি গ্রীকের কোন কর্ত্তব্য নাই; তাহারা অবজ্ঞাস্পদ বা হেয়; এত অবজ্ঞাত যে তাহাদিগকে নির্ম্মূল করিবার কোনও প্রয়োজন নাই! গ্রীক্ তাহাদিগকে দয়া করিত না; তাহাদিগকে হিংসা করা ও ধ্বংস করাও নিতান্ত আবশ্যক মনে করিত না! পরজাতিকে ধ্বংস করা যেমন হিব্রুর কর্ত্তব্য ছিল, ম্লেচ্ছকে নিধন করা গ্রীকের তেমন কর্ত্তব্য ছিল না; গায়ে পড়িয়া তাহাদিগের সহিত লড়াই করা

গ্রীকের কর্ত্তব্য ছিল না; গ্রীক্ তাহাদিগকে নগণ্য মনে করিত, ignore করিত মাত্র; তাহার ধর্ম্মশাস্ত্রে ও রাষ্ট্রিকশাস্ত্রে ম্লেচ্ছের প্রতি কোনও কর্ত্তব্য নির্দ্দিষ্ট হয় নাই। সে আপনার প্রতিভায়, আপনার শক্তিতে ও মাহাত্ম্যে এত গর্ব্বিত ছিল যে, পরজাতিকে উৎপীড়ন করা সে আবশ্যক বোধ করে নাই। এই জন্যই হিব্রুর তুলনায় গ্রীক্ tolerant; কিন্তু এই toleration কোনও রূপ প্রীতি হইতে উদ্ভূত হয় নাই; উহা কেবল মাত্র গ্রীকের আত্মসম্পর্কে উৎকট দম্ভের পরিচায়ক।

"এতবড় গর্ব্বিত ও অসামান্য ক্ষমতাপন্ন জাতির, নেশনরূপে দলবাঁধিয়া সমাজবদ্ধ হইবার যেমন সুবিধা ছিল, তেমন বোধ হয় ইতিহাসে আর কোনও জাতির ছিল না। ইহারা একদেশে অবস্থান করিয়া এক নেশনে পরিণত হইলে পৃথিবীতে অজেয় ও অধৃষ্য হইতে পারিত; কিন্তু তাহা ঘটিল না। গ্রীক্‌জাতি একটা রাষ্ট্রে পরিণত হইল না। একটা কারণ ছিল,—তাহাদের দেশের ভৌগোলিক অবস্থা। ভূমধ্যসাগরের পূর্ব্বাংশ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপে বিভক্ত, গ্রীসদেশটা পাহাড়পর্ব্বতে অসংখ্য উপত্যকায় বিভক্ত। এই সকল দ্বীপ ও উপত্যকা আশ্রয় করিয়া গ্রীকেরা ক্ষুদ্রক্ষুদ্র সমাজ বাঁধিল; কএক বর্গমাইল জমি লইয়া এক একটা নগর বা পুরী প্রতিষ্ঠা করিল। পুরীগুলি পর্ব্বতের ও সমুদ্রের ব্যবধানে জমাট বাঁধিল না; জমাট বাঁধিতে পারিত, কিন্তু তাহার প্রধান অন্তরায় হইল গ্রীকের চরিত্র। গ্রীক্ আপনাকে খুব বড় বলিয়া জানে; নিজের শক্তিতে ও মাহাত্ম্যে নিজে মুগ্ধ; কিন্তু সেই মোহই তাহার জাতীয়তার বন্ধনে প্রধান অন্তরায় হইল। সে কাহারও নিকট মাথা নোয়াইতে জানে না; কাহারও বশ্যতা স্বীকার করিতে চাহে না। স্বজাতীর বশ্যতা স্বীকারও তাহার স্বভাব নহে। এমন স্বার্থপর, আত্মসর্ব্বস্ব জাতি আর পৃথিবীতে জন্মে নাই। প্রত্যেক ব্যক্তিই নিজেকে

বড় বলিয়া জানে, এবং কিসে নিজে বড় হইবে সেই চেষ্টাই তাহার জীবনের প্রধান চেষ্টা। পরের জন্য স্বার্থত্যাগ গ্রীকের ধাতুতে ছিল না। স্বার্থ-সংহারের প্রবৃত্তিকে যদি ধর্ম্মপ্রবৃত্তি বলা যায়, সে প্রবৃত্তি জাতীয়স্বভাবরূপে গ্রীকের একেবারে জাগে নাই। তাহার জাতীয় ইতিহাসের গোড়া হইতেই গ্রীকের সহিত গ্রীকের মারামারি কাটাকাটি আরম্ভ হইল; ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুরীগুলি কেবলই পরস্পরের শত্রুতাচরণ করিতে লাগিল। কেবল বিবাদ ও রক্তপাত। কেহ কাহাকেও মানিতে চাহে না; সকলেই আপনাকে বড় করিতে চায় ও অন্যকে নষ্ট করিতে প্রবৃত্ত হয়। গ্রীকের সহিতই গ্রীকের বিরোধ ইতিহাসের আগাগোড়া ব্যাপিয়া দেখা যায়। ম্লেচ্ছের সহিত গ্রীকের বিরোধ প্রথম প্রথম দেখিতে পাওয়া যায় না। ম্লেচ্ছ ত নগণ্য, বিসংবাদের অনুপযুক্ত। গ্রীসের আদিম নিবাসীর সহিতও তাহার বিবাদ নাই; তাহারা ত দলিত হইয়া দাসজাতিতে পরিণত হইয়াছে; তাহাদিগকে কেবল বলদের মত খাটাইয়া লইতে হইবে। গ্রীকের সহিত গ্রীকের এই চিরন্তন বিরোধ, তাহার নেশন্ গড়িয়া উঠিবারপক্ষে প্রধান বিঘ্ন হইয়া দাঁড়াইল। একটা জমাট নেশন্, Organism এ পরিণত হইল না। গ্রীক্‌ভূমি সহস্র স্বাধীন, স্বতন্ত্র পরস্পর বিবদমান পুরিতে বিচ্ছিন্ন হইয়া রহিল। পরে যখন বিশাল পারসীক সাম্রাজ্যের সমবেতশক্তি সমুদয় পশ্চিম এশিয়া গ্রাস করিয়া গ্রীক্‌ভূমিকে ও গ্রীকজাতিকে গ্রাস করিতে আসিল, তখন গ্রীক্ পুরীগুলি সেই প্রবল আততায়ীর আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার জন্য দলবাঁধিয়া জমাট বাঁধিতে সমর্থ হইল না। দরিয়াযুশের সেনা যখন গ্রীসে উপস্থিত, স্পার্টা তখন এথেন্সের সহিত যোগ দিল না; এথেন্স্ প্রায় একাকী দাঁড়াইয়া মারাথনে লড়াই করিল। Xerxes এর বাহিনী যখন জলে স্থলে চারিদিকে আক্রমণ করিয়া গ্রীক্‌জাতিকে অভিভূত করিতে

আসিল তখন বহুগ্রীক্ নগরশত্রুর সহিত যোগ দিল। কতকগুলি নগর একত্রিত হইয়া জলে স্থলে শত্রুকে পরাজিত করিল বটে; কিন্তু বিদেশী ম্লেচ্ছআততায়ী পশ্চাৎপদ হইবা মাত্র, গ্রীক্ আবার গ্রীকের সহিত লড়াই আরম্ভ করিয়া দিল। প্রবল পারসীক আবার আসিতে পারে, আসিবার জন্য উন্মুখ হইয়া আছে, এ সম্ভাবনা স্পষ্টসত্ত্বেও গ্রীকের গৃহ বিবাদ আরম্ভ হইল; সেই রেষারেষি, দ্বেষাদ্বেষি, রক্তারক্তি, পরস্পর ছলনা, গুপ্তছুরির চালাচালি চলিল।

"বিদেশের আততায়ীর আক্রমণ, সমাজের দৃঢ়বদ্ধ হইবার প্রধান সুযোগ;—জীববিজ্ঞানুসারে সমাজবিজ্ঞার ইহা একটা গোড়ার কথা। আততায়ী হইতে, Environment হইতে, আত্মরক্ষা করিবার জন্য জীবদেহ জমাট বাঁধে; জীবদেহের প্রত্যেক অঙ্গপ্রত্যঙ্গ আপন আপন ক্ষুদ্র স্বার্থ বিসর্জ্জন করিয়া সমগ্র দেহের স্বার্থে আপনাকে সমর্পণ করে, ইহাই হইল Biologyর মূলসূত্র। পৃথিবীর ইতিহাসে সর্ব্বত্র জীববিদ্যার এই মূলসূত্রের প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু গ্রীক্ ব্যক্তিগত ক্ষুদ্রস্বার্থ বিসর্জ্জন করিতে পারে নাই; সাধারণস্বার্থে আত্মস্বার্থ নিমজ্জিত করিতে পারে নাই। উহাদের স্বদেশপ্রীতি (Patriotism) ছিল; কিন্তু তাহাও স্বার্থপ্রণোদিত। নিজের ক্ষতিলাভগণনা পরিত্যাগ করিয়া, ধর্ম্মবুদ্ধি-প্রণোদিত হইয়া, কর্ত্তব্যমাত্রবোধে স্বার্থত্যাগ গ্রীকৃচরিত্রে অপ্রকটিত রহিয়া গেল। গ্রীক্ যজ্ঞার্থে আত্মাহুতি জানিত না।

"আততায়ী পারসীকের ভয়ে গ্রীক্ ডেলস্ দ্বীপকে কেন্দ্র করিয়া একটা রাষ্ট্রীয় মিত্রসঙ্ঘ (Confederacy) গঠন করিল; কিন্তু সে সন্ধিবন্ধন টিঁকিল না। এথেন্স্ সঙ্ঘভুক্তগ্রীক্‌রাষ্ট্রগুলির নেতৃত্বগ্রহণ করিয়া নিজের স্বার্থ-সিদ্ধির প্রয়াস পাইল; ছোটখাটো একটি সাম্রাজ্য স্থাপনের চেষ্টা করিতে লাগিল; অল্পে অল্পে দ্বীপ ও নগরগুলির স্বাধীনতা হরণ করিয়া সেগুলিকে

নিজের বশতাপন্ন করিল। পারসীকের সহিত যুদ্ধ চালাইবার জন্য যে চাঁদা অঙ্গীকৃত হইয়াছিল, এথেন্স্ তাহা করস্বরূপ আদায় করিয়া নিজের সৌষ্ঠব ও শক্তি বৃদ্ধি করিতে লাগিল। এই অন্যায় প্রভুত্ব স্বাতন্ত্র্যাভিমানী গ্রীক্ কতদিন সহ্য করিতে পারে? সমরানল প্রজ্বলিত হইল। সমস্ত গ্রীক্‌ভূমি ব্যাপিয়া মহাকুরুক্ষেত্রের অভিনয় হইল। সেই কুরুক্ষেত্রে গ্রীকের রাষ্ট্রতন্ত্র ছিন্নভিন্ন হইয়া গেল। অবশেষে দেখিতে পাই যে গ্রীক্, পারস্য সম্রাটের উৎকোচ গ্রহণ করিয়া, স্বজাতিকে ধ্বংস করিবার চেষ্টা করিতেছে; পারস্য সম্রাটের ইঙ্গিতে ও অর্থে গ্রীক্‌দিগের পরস্পর সন্ধিবিগ্রহকার্য্য চলিতেছে। গ্রীকের চিরশত্রু ম্লেচ্ছপারস্যসম্রাট্ গ্রীক্‌রাষ্ট্রতন্ত্রের ভাগ্যবিধাতা সাজিয়া পারস্যের রাজধানীতে বসিয়া সূত্রচালনা করিতেছেন, এবং গ্রীক্‌রাষ্ট্রগুলি সেই সূত্রে চালিত হইয়া পুতুলনাচ নাচিতেছে। গ্রীক্‌রাষ্ট্রতন্ত্র চুর্‌মার্ হইয়া গেল; গ্রীক্‌সভ্যতা, গ্রীক্ Culture তাহার ভিত্তি হারাইয়া ভূকম্পপাতিত অট্টালিকার মত জীর্ণস্তূপে পরিণত হইল; এথেন্স্‌কে কেন্দ্র করিয়া জ্ঞানের ও রূপের যে উজ্জ্বল প্রদীপ জ্বলিয়া উঠিয়াছিল—যে জ্যোতিতে আজ পর্য্যন্ত সমগ্র জগৎ মুগ্ধ—সে প্রদীপ নির্ব্বাণ-প্রায় হইল। * * * কোথা হইতে অর্দ্ধগ্রীক্ অর্দ্ধম্লেচ্ছ ম্যাসিডন্‌পতি জোর করিয়া গ্রীক্‌সমাজতন্ত্রে প্রবেশ করিয়া, গ্রীক্‌রাষ্ট্রতন্ত্রকে দলিত করিয়া, গ্রীক্ Cultureএর মশাল কাড়িয়া লইয়া, গ্রীক্‌জাতির নেতৃরূপে পারসীকসাম্রাজ্যকে বিধ্বস্ত করিয়া পূর্ব্বদেশে গ্রীক্‌সভ্যতার আলোক বিকীরিত করিয়া দিলেন। মিশর, সীরিয়া আর্ম্মীনিয়, পার্থিয়, বাকৃত্রিয় প্রভৃতি ম্লেচ্ছজাতি সেই গ্রীক্ সভ্যতার আলোকে দীপ্ত হইয়া কিছুদিনের জন্য ইতিহাসে জাগিয়া উঠিল। * * * আলেকজান্দ্রিয়ার মত কোনও কোনও নগরে রাষ্ট্রপতিগণের সাহায্যে সময়ে সময়ে গ্রীক্ Culture পুনরুদ্দীপিত হইয়াছিল; কিন্তু অবশেষে

পশ্চিমে রোমক সাম্রাজ্যে ও পূর্ব্বে ইস্‌লাম্ প্রতিষ্ঠিত নূতনসাম্রাজ্যে আত্মবিলোপসাধন করিয়া সে জগতের ইতিহাসে নির্ব্বাণ লাভ করিল্। এখন আর গ্রীক্‌জাতি নাই। গ্রীক্ Culture'ও নাই,—একথা বলিতে সাহস করিব না; গ্রীক্ Culture অবিনাশী, অনশ্বর। অন্য ক্ষেত্রে অন্যজাতির আশ্রয় গ্রহণ করিয়া গ্রীক্ Cultureএর বীজ যে শাখাপল্লবে ফুলফলে প্রসারলাভ করিয়াছে, তাহা আজি পৃথিবী ছাইয়া পড়িবার উপক্রম করিতেছে।

"গ্রীকের মত আত্মসর্ব্বস্ব, আত্মকেন্দ্র মানুষ পৃথিবীতে জন্মে নাই! এত অসাধারণ ধীশক্তি ও সৌন্দর্য্যবুদ্ধি লইয়া আর কেহ বোধ করি পৃথিবীর পৃষ্ঠে আবির্ভূত হয় নাই; কিন্তু এই আত্মকেন্দ্রগতাই, এই individualismই গ্রীকের সর্ব্বনাশের মূল। গ্রীকের মত লঘুচিত্ত, চপলমতি, volatile মানুষ জগতে জন্মে নাই। তাহাকে কিছুতেই সংহত করিয়া জমাট বাঁধিয়া রাখা চলিত না। এত সুযোগ ছিল—অসাধারণ, অনন্যসাধারণ সুযোগ;—কিন্তু বৃহৎ গ্রীক্‌নেশন্ ঘন হইয়া দানা বাঁধিয়া উঠিল না, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রীক্‌রাষ্ট্রও স্থায়ী হইয়া রহিল না। যাহার ভিতর বারুদে ও ডাইনামাইটে পূর্ণ, তাহার স্থায়িত্বের আশা করা যায় না।

"সমগ্র গ্রীক্‌জাতি একটা বিরাট্ রাষ্ট্ররূপে পরিণত হয় নাই বটে, কিন্তু গ্রীক্ নগরগুলি পরস্পর লড়াই করিবার জন্য রাষ্ট্রে পরিণত হইয়াছিল। গ্রীকের ইতিবৃত্তে আধুনিক রাষ্ট্রতন্ত্রের ইতিহাসের সকল কথাই পাওয়া যায়। প্রত্যেক নগর, আপনার প্রতিবেশীর নিকট হইতে আত্মরক্ষার জন্য, government, বা শাসনযন্ত্র, প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল। এই শাসনযন্ত্র জীবদেহে মস্তিষ্কের অনুরূপ। মস্তিষ্ক জীবদেহকে পরের আক্রমণ হইতে রক্ষার জন্য এবং পরকে আক্রমণ করিবার জন্য সর্ব্বদা সতর্ক ও

সচেষ্ট থাকে; এমন কি জীবদেহকে এইরূপে প্রস্তুত রাখিবার জন্য দেহের অভ্যন্তরীণ সমুদয় যন্ত্রের উপর কর্ত্তৃত্ব করিতে চায়। ইহারই অধীন থাকিয়া জীবদেহ সর্ব্বদা আত্মরক্ষায় উদ্যত থাকে। শ্রেষ্ঠপর্য্যায়ের জীব, এই মস্তিষ্করূপযন্ত্রের সাহায্যে সর্ব্বদা জাগ্রত ও সচেতন থাকিয়া বিচারবিতর্কপূর্ব্বক নূতন নূতন আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করে: এই Conscious effort যে তাহার উৎকর্ষের লক্ষণ, তাহা গোড়ায় বলিয়াছি। মনুষ্যসমাজ যখন শাসনযন্ত্রের সৃষ্টি ও উদ্ভাবনা করিয়া রাষ্ট্রে, বা Stateএ, পরিণত হয়, তখন উহাও জ্ঞাতসারে বিচারপূর্ব্বক (Consciously) নূতন আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার নূতন উপায়—নূতন অবস্থার প্রতি নূতন ব্যবস্থার—প্রয়োগ করিতে পারে। কাজেই জীববিদ্যানুসারে রাষ্ট্রগঠন, সমাজের উৎকর্ষেরই লক্ষণ। এই শাসনযন্ত্র গ্রীক্ নগরগুলিতে যেমন পুষ্টিলাভ করিয়াছিল, তেমন আর কুত্রাপি করে নাই। রাষ্ট্রযন্ত্রের যতরূপ প্রকারভেদ হইতে পারে, Monarchy, Oligarchy, Aristocracy, Democracy, ইত্যাদি যত ভেদ আছে, গ্রীকেরা সে সমস্ত লইয়া নাড়াচাড়া করিয়াছেন; আবার দল বাঁধিয়া বা আত্মপ্রসার করিয়া আত্মরক্ষার জন্য বলবৃদ্ধির যত উপায় আছে,—Colony, Confederacy, Empire, সমস্তই তাঁহারা উদ্ভাবন করিয়াছেন। কিন্তু সমস্ত চেষ্টা, সমস্ত Experiment ব্যর্থ হইয়াছিল;—গ্রীক্ State বা রাষ্ট্রগুলি আত্মরক্ষা করিতে পারে নাই। এইখানে গ্রীকের জাতীয় ইতিহাসের গোড়ায় গলদ। কেন পারে নাই, জিজ্ঞাসা করিলে আমি বলিব,—ইহার কারণ গ্রীকের ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্যপ্রিয়তা, গ্রীকের মজ্জাগত স্বার্থপরতা, গ্রীক্ individualism; গ্রীক্ আপনাকে ভুলিতে জানিত না। গ্রীকের ধর্ম্মবুদ্ধি ছিল না। গ্রীক্ পণ্ডিতেরা একটা সর্ব্বাঙ্গসুন্দর Theory of State খাড়া করিয়াছিলেন; সেই

Theory সর্ব্বাংশে জীববিদ্যার অনুগত। রাষ্ট্রই সর্ব্বেসর্ব্বা, রাষ্ট্রই প্রভু; ব্যক্তিগণের স্বার্থ রাষ্ট্রের স্বার্থের সহিত অভিন্ন; রাষ্ট্রস্বার্থের বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত স্বার্থ থাকিতেই পারে না; রাষ্ট্র, ব্যক্তিকে লইয়া যাহা ইচ্ছা তাহা করিতে পারে; ব্যক্তির কোনও স্বাধীনতা নাই। দেহ যেমন আত্মরক্ষার জন্য তাহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে, তাহার Unit cellগুলিকে রাখিতে বা ছাঁটিতে পারে, রাষ্ট্র সেইরূপ ব্যক্তিকে যথেচ্ছভাবে রাখিতে বা ছাঁটিতে পারে। রাষ্ট্রমধ্যে ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্যের স্থান নাই। প্লেটোর Republic ও আরিষ্টটলের politicsএ এই থিয়োরি পূর্ণপ্রকটিত। এই থিয়োরিমতে রাষ্ট্রের আদেশ চূড়ান্ত-আদেশ; মানবজীবনের প্রত্যেক খুটিনাটি আচার-বিচার ধর্ম্মকর্ম্ম সর্ব্ববিষয়ে রাষ্ট্রের আদেশ চূড়ান্ত আদেশ। প্লেটো তাঁহার আদর্শ রাষ্ট্রে বিবাহ প্রণালীর উল্লেখ করিতে গিয়া বলিয়াছিলেন—পুরুষেরা পঞ্চান্ন বৎসর বয়স পর্য্যন্ত সন্তান উৎপাদন করিতে পারিবে, স্ত্রীলোকেরা চল্লিশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত গর্ভধারণ করিতে পারিবে; উক্ত বয়সের মধ্যে ভূমিষ্ঠ সন্তানই রাষ্ট্রের অনুমোদিত ব্যক্তি হইবে; চল্লিশ বৎসর বয়সের পরে স্ত্রী যদি নিতান্তই স্বেচ্ছাচারিণী হইয়া গর্ভধারণ করে, তাহা হইলে সেই ভ্রূণকে ভূমিষ্ঠ হইতে দিবে না; যদিই বা ভূমিষ্ট হয়, সেই সন্তানকে বাঁচিতে দিবে না, পালন করিবে না। দুর্ব্বল সন্তানকে বাঁচাইয়া রাখিলে রাষ্ট্রের ক্ষতি বই লাভ নাই। স্পার্টাতে এই আদর্শ রাষ্ট্রনীতি অনুসৃত হইয়া ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য একেবারে নষ্ট করিবার চেষ্টা হইয়াছিল! লাইকর্গস্ ঐতিহাসিক ব্যক্তি ছিলেন কি না, তাহা লইয়া পণ্ডিতগণ তর্ক করুন; কিন্তু তাঁহার নামে যে সকল সমাজবিধান চলিয়াছিল, তাহাতে মনুষ্যের ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্যকে একেবারে পিষ্ট করিবার চেষ্টা করা হইয়াছিল। ব্যক্তির স্ফূর্তি সেখানে ঘটিতে পায় নাই। জোর করিয়া সেখানে বক্তিগত

ভাব নষ্ট করা হইয়াছিল;—স্পার্টান্ ইচ্ছা করিয়া, ধর্ম্মবুদ্ধি চালিত হইয়া—অপর ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্য নষ্ট করিয়াছিল বলিলে, ভুল হইবে। এথেন্সে ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য উদ্দাম দেখা যায়—ব্যক্তির উৎকর্ষ সেখানে পরাকাষ্ঠা পাইয়াছিল। কিন্তু উহা ঘটিয়াছিল গ্রীক্‌থিয়োরির বিরুদ্ধে। এই বিরোধের ইতিহাসটাই গ্রীক্ইতিহাস। এই বিরোধের সমন্বয় করিতে না পারিয়া গ্রীক্‌রাষ্ট্র ও গ্রীক্‌ব্যক্তি উভয়ই নষ্ট হইয়া গেল।

"গ্রীক্‌চরিত্রের গোড়ায় গলদ এইখানে দেখা যায়। আমাকে যদি জিজ্ঞাসা করেন, গ্রীকের রাষ্ট্রীয় ইতিহাসের মূলসূত্র কি? আমি বলিব—তাহার কথার সহিত কাজের অসামঞ্জস্য, তাহার Theoryর সহিত Practiceএর বিরোধ। স্পার্টা ও এথেন্স্ উভয়স্থলেই রাষ্ট্রসম্বন্ধে থিয়োরি একই। Theory বলিতেছে, ব্যক্তির কোনওরূপ স্বাতন্ত্র্য থাকিতে পারে না; গ্রীকের চরিত্র বলিতেছে,—আমি আমার স্বাতন্ত্র্য রাখিবই রাখিব; রাষ্ট্র থাকে থাকুক, কিন্তু উহা ত আমাকে রক্ষার জন্যই উদ্ভাবিত হইয়াছে; উহাকে যেমন করিয়া পারি, আপন স্বার্থে বিনিয়োগ করিব; ছলে বলে রাষ্ট্রযন্ত্রকে আমি আপনার অধীন করিয়া লইব। ইহার ফলে রাষ্ট্রমধ্যে দলে দলে, জনে জনে, বিরোধ; এবং রাষ্ট্রের সহিত ব্যক্তির চিরন্তন বিরোধ। কোথাও রাষ্ট্রের জয়, কোথাও দলবিশেষের জয়। কোথাও ব্যক্তিবিশেষের জয়; কিন্তু কোনও জয়ই স্থায়ী নহে; কেবলই রেষারেষি, কাটাকাটি। কোথাও বা একজন নানাউপায় অবলম্বন করিয়া ছলেবলে-কৌশলে রাষ্ট্রের একাধিপতি হইয়া Tyrant হইতেছেন; কোথাও একটা দল আর সকলকে জখম করিয়া Oligarchyর প্রতিষ্ঠা করিতেছে; কোথাও বা পরামর্শ করিয়া রাষ্ট্রচালনার ভার ভিন্ন ভিন্ন দলের, বা সমস্ত ব্যক্তির উপর ভাগ

করিয়া অর্পণ করা হইতেছে, সকলকেই কিছু কিছু দিয়া আপাততঃ ঠাণ্ডা করা হইতেছে—ইহাই Democracy।

"উনবিংশ শতাব্দীতে ইংলণ্ডে Individualism ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্যের জয়জয়কার পড়িয়াছিল। গ্রোট ও ফ্রীম্যান্—এথেন্সে Democracyর মাহাত্ম্যে মুগ্ধ হইয়াছিলেন। ফ্রীম্যান্ গদ্‌গদ স্বরে বলিতেছেন—এমন কি আর হয়? এথেন্সে সবাই স্বাধীন, সবাই প্রধান; প্রত্যেক ব্যক্তি রাজা, প্রত্যেকে মন্ত্রী, প্রত্যেকে প্রজা, প্রত্যেকে ব্রাহ্মণ, প্রত্যেকে ক্ষত্রিয়, প্রত্যেকে জজ্, প্রত্যেকে ম্যাজিষ্ট্রেট্, প্রত্যেকে জুরর্, প্রত্যেকে উকিল। ফ্রীম্যান্ আরো একটু বলিতে পারিতেন, প্রত্যেকেই এখানে আসামী বা Criminal। এথেন্সের প্রত্যেক ব্যক্তিই রাষ্ট্রতন্ত্রে প্রভুত্ব করিত, কিন্তু কেহ কাহাকেও বিশ্বাস করিত না; প্রত্যেকেই অপরকে বাগ্‌বিতণ্ডায়, বাগ্মিতায় পরাস্ত করিয়া ও ভুলাইয়া নিজের স্বার্থসিদ্ধির প্রয়াস পাইত; প্রত্যেকেই অপরকে ঠকাইতে প্রস্তুত। এই জন্যই এথেন্সের Oratory, Rhetoric, Sophistry, এবং বিশ্ববিখ্যাত গ্রীক্ Comedy প্রভৃতির উৎপত্তি ও উৎকর্ষ। কেহ কাহাকেও বিশ্বাস করে না। যে দল বাঁধিয়া বড় হইয়া পড়ে, তাহাকেই রাষ্ট্র হইতে নির্ব্বাসিত করিয়া রাষ্ট্ররক্ষার ব্যবস্থা করিতে হয়। এথেন্সের যত দলপতি, যত প্রধান পুরুষ, সকলকেই এইরূপে নির্ব্বাসিত হইতে হইয়াছে; কাহাকেও বা হত্যা করা হইয়াছে। অন্যান্য লোকের কথা ছাড়িয়া দিই। যিনি এথেন্সের মুকুটমণি; এথেন্স্‌কে যিনি গ্রীক্ সভ্যতার কেন্দ্রে পরিণত করিয়াছিলেন; এথেন্স্‌কে কেন্দ্র করিয়া, সমুদয় গ্রীক্ নগরকে একতাসূত্রে গ্রথিত করিয়া একটা প্রকাণ্ড গ্রীক্ নেশন্ গঠিত করিবার কল্পনা যাঁহার মস্তিষ্কে উদিত হইয়াছিল, সেই পেরিক্লিসের কথা ভাবুন। তাঁহার চোর অপবাদ ঘোষিত হইল;

তিনি নাকি Stateএর তহবিল চুরি করিতেন; তাঁহার প্রিয় শিল্পী ফীডিয়স,—জগতে অতুল্য ফীডিয়স্—নাকি সোনার দেবমূর্ত্তি গড়িতে গিয়া সোণা চুরি করিয়াছিলেন। তাঁহার আস্পেশিয়ার মানরক্ষার জন্য তাঁহাকে এথেন্সের জনসাধারণের সম্মুখে মাথা নোয়াইয়া চোখের জল ফেলিতে হইয়াছিল।

"এই তরলপ্রকৃতি স্বার্থপর Patriotism কেবলমাত্র কথার কথা; অতি সহজেই ইহা সমাজদ্রোহে পরিণত হইত। মিল্টিয়াডিস্, থেমিষ্টক্লিস্ পসেনিয়স্, এই তিনটা নামই লওয়া যাক্—আলকিবিয়াডিস প্রভৃতির নাম নাই বা বলিলাম। ঐ তিনজন গ্রীসের রক্ষাকর্ত্তা, গ্রীক্ Culture-এর রক্ষাকর্ত্তা; ঐ তিনজন না থাকিলে গ্রীক্ নামই হয়ত জগতের ইতিহাসে থাকিত না। দেশের লোকে ইঁহাদিগকে নেতৃত্বে বরণ করিয়াছিল; কিন্তু তাহার প্রতিদানস্বরূপ দেশ পাইল কি? দেশকে তাঁহারাই রক্ষা করিয়াছিলেন; কিন্তু কি তুচ্ছ স্বার্থের জন্য তাঁহারাই আবার স্বদেশদ্রোহী হইলেন, মনে করিলে হৃৎকম্প হয় না কি? ম্যারাথন্-বিজেতা মিল্টিয়াডিস্; কেন তাঁহার অধঃপতন হইল? ক্ষুদ্র প্যারস্ দ্বীপের বিরুদ্ধে কি আক্রোশে তিনি অভিযান করিলেন? পরাজিত পারসীক বাহিনী ফিরিয়া যাইতে না যাইতেই, কেন তিনি তুচ্ছ স্বার্থের জন্য রাষ্ট্রের ধনবল সেনাবল নষ্ট করিয়া অপমানিত হইলেন? গৃহের বিজনকক্ষে শয্যাতলে মৃত্যুযন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করিতে করিতে যখন তিনি শুনিলেন যে তাঁহার স্বদেশবাসীরা তাঁহাকে গুরু-অপরাধী সাব্যস্ত করিয়া জরিমানা করিয়াছে, ম্যারাথন্-বিজেতার প্রাণদণ্ড নিতান্তই অসঙ্গত মনে করিয়া প্রাণদণ্ডের বদলে অর্থদণ্ডে নিষ্কৃতি দিয়াছে, তখন তাঁহার কি মনে হইয়াছিল? সেই একদিন যখন কএকটি অশ্বারোহী শত্রুসৈন্য তীর বেগে ছুটিয়া আসিয়া হেলেস্পণ্টের সমীপস্থ

গ্রীক্ সেনানীগণকে বলিল, 'সসৈন্য দরিয়ায়ুস ঊর্দ্ধশ্বাসে পলাইয়া আসিতেছে; তোমরা এই সেতুটী ভাঙ্গিয়া দেও; সম্রাট্‌কে আমরা ধ্বংস করিয়া ফেলিব; তোমরাও স্বাধীন হইয়া যাইবে।' একা মিল্টিয়াডিস্ জোর করিয়া বলিয়াছিলেন—'এস, সেতু ভাঙ্গিয়া দিয়া আমরা স্বাধীন হই'। আর সকলে কিন্তু ভয় পাইল। সেতু ভাঙ্গা হইল না। দরিয়ায়ুস ফিরিয়া আসিলেন। তা'র পর গ্রীক্ সেনাপতি মিল্টিয়াডিস্ দরিয়ায়ুসের বিরাট্ বাহিনীকে যে দিন ম্যারাথনে পরাজিত করিলেন, সেদিনকার গৌরবকাহিনী আজ আড়াই হাজার বৎসর ধরিয়া ইতিহাসের Whispering gallery'র ভিতর দিয়া ধ্বনিত হইয়া আসিতেছে। তিনি গুরু-অপরাধে স্বদেশবাসী-কর্ত্তৃক প্রাণদণ্ডের পরিবর্ত্তে অর্থদণ্ডে দণ্ডিত! এথেন্সের অধিবাসিগণ এথেন্সের রক্ষাকর্ত্তাকে প্রাণভিক্ষা দিয়া অপমানিত করিল। কাহার দোষ? দেশ কি তাঁহার প্রতি অবিচার করিল? ইতিহাস রচয়িতা বলেন যে, এথেন্সে 'ম্যারাথন্' শব্দটা যেন, একটা যাদুমন্ত্রের মত দাঁড়াইয়া গেল—Marathon became a magic word at Athens;—কিন্তু ক্ষুব্ধ এথেন্সবাসী, সেই যাদুমন্ত্রে মুগ্ধ হইয়া স্বজাতিদ্রোহী মিল্টিয়াডিসকে ক্ষমা করিল না। যে জাতির 'ম্যারাথন্' আছে, সেজাতি কখনই পরাধীন হইতে পারে না;—একজন ইংরাজ এই কথা জোর করিয়া বলিয়াছেন,—

"The mountain looks on Marathon,
And Marathon looks on the sea;
And musing there as I stood alone,
I dreamed that Greece might still be free;
For standing on rhe Persian's grave,
I could not deem myself a slave."

ইংরাজ কবি কল্পনাবলে নিজেকে গ্রীক্ মনে করিয়া এমন কথা বলিতে পারিয়াছেন; কিন্তু গ্রীক্ পসেনিয়স্ কি করিলেন? গ্রীক্ থেমিষ্টক্লিস্ কি করিলেন? মিল্টিয়াডিস্ আরো কিছুদিন জীবিত থাকিলে তাঁহাদিগের পথপ্রদর্শক হইতেন কি না, জানি না। কিন্তু প্লেটিয়া-বিজয়ী পসেনিয়স্ সমগ্র গ্রীক্‌জাতিকে পারস্য-সম্রাটের পদানত করিতে চাহিলেন কেন? স্পার্টার কর্তৃপুরুষ হইয়া তাঁহার আশা মিটিল না; যে পারসীককে প্লেটিয়াক্ষেত্রে তিনি পরাজিত করিলেন, সেই শত্রুর হস্তে সমস্ত গ্রীক্ রাষ্ট্রগুলি সমর্পণ করিতে তিনি কৃতসঙ্কল্প হইলেন। আমাকে রাজ্য ও রাজকন্যা দাও, সমস্ত গ্রীক্‌জাতিকে তোমার অধীন করিয়া দিব—এই হীন প্রস্তাব তিনি নিঃসঙ্কোচে পারস্য সম্রাটের নিকট পাঠাইলেন। ঘটনাচক্রে তিনি ধরা পড়িয়া গেলেন। যে স্পার্টান্ বীর প্লেটিয়াক্ষেত্রে পারস্যের বিপুলবাহিনী ছিন্ন ও পর্য্যুদস্ত করিয়া গ্রীক্ জাতিকে রক্ষা করিয়াছিলেন, তিনি স্বদেশদ্রোহে ধরা পড়িয়া স্পার্টার দেবমন্দিরে প্রাণের জন্য আশ্রয় লইলেন; স্পার্টানেরা মন্দিরের দ্বার গাঁথিয়া তাঁহাকে অনশনে মারিয়া ফেলিল। আর থেমিষ্টক্লিস্? স্যালামিসে অন্যান্য নৌসেনাধ্যক্ষদিগের সহিত ঝগড়া করিয়া গভীর নিশীথে পারস্যসম্রাটের সমীপে তিনি জানাইলেন যে গ্রীকেরা নিজেদের মধ্যে কলহ করিতেছে; সম্রাটের সহস্র নৌকা যদি রাতারাতি আসিয়া গ্রীক্ নৌকাগুলিকে ঘিরিয়া ফেলে, তাহা হইলে তাঁহার বিজয় অবশ্যম্ভাবী।—হইতে পারে, তখন তাঁহার উদ্দেশ্য সাধু ছিল; তিনি হয়ত জানিতেন, সত্বর সম্মুখযুদ্ধ ব্যতীত গ্রীক্‌জাতির রক্ষা নাই। ঘটনাচক্রে গ্রীক্ যুদ্ধ জিতিল। কিন্তু তিনশত গ্রীক্ নৌকায় একসহস্র পারসীক নৌকা বিধ্বস্ত করিবার সম্ভাবনা ছিল কি? পারস্যসম্রাটের রাজতক্তের সম্মুখে পারসীকের মত বেশভূষাপরিহিত থেমিষ্টক্লিস্ যখন

জানু পাতিয়া বসিয়া থাকিতেন, তখন কি সাগরপারে দূরে স্বদেশের কথা তাঁহার মনে পড়িত না? কি কৌশলে এথেন্স্ ও পিরিয়স্ বন্দরকে বেষ্টন করিয়া সুদৃঢ় প্রাচীর গঠন করাইয়াছিলেন, সেকথা তাঁহার স্মৃতিপথে উদিত হইত না কি? কেন তবে 'মজালি সোনার লঙ্কা, মজিলি আপনি'?—রাজা হইবার মোহে? ম্লেচ্ছ পারসীক রাজকন্যার রূপের মোহে? অর্দ্ধেক রাজত্ব ও একটি রাজকন্যা কেবলমাত্র রূপকথার জিনিষ নয়! গ্রীসের সিংহদ্বার দিয়া যে শত্রু প্রবেশ করিতে পারিল না, কেন তাহাকে প্রহরীরা গুপ্তদ্বার দিয়া আনয়ন করিতে চেষ্টা করিল? যে দেশে তাহারা জন্মগ্রহণ করিয়াছিল, কেন সেখানে অতি মাত্রায় ব্যক্তির সহিত ব্যক্তির বিরোধ, সমাজের সতহি ব্যক্তির বিরোধ, গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে দলাদলি মারামারি কাটাকাটি? কি অভিসম্পাত! অমাবস্যার নিশীথে তুবড়ি বাজির মত ফুল কাটিয়া গ্রীক্‌জাতির ইতিহাস বিলীন হইয়া গেল। সহস্র বৎসরের দুঃসাধ্য সাধনালভ্য সঞ্জীবনীমন্ত্র লাভ করিয়া কচরূপী গ্রীক্ বিদায়গ্রহণ করিল, রাষ্ট্ররূপিণী দেবযানীর অভিশাপ তাহার শিরে বর্ষিত হইল,—গ্রীক্ Culture তুমি অপরকে 'শিখাইবে, পারিবে না করিতে প্রয়োগ।' কোথায় সে চলিয়া গেল? কোন্ রহস্যপুর হইতে সে আসিয়াছিল; ইতিহাসের ঘন কুজ্ঝটিকার মধ্যে কোন্ রহস্যপুরে সে ফিরিয়া গেল? কাহাকে সে নিজের সঞ্জীবনীমন্ত্র শিখাইয়াছিল? য়ুরোপের ইতিহাসের মধ্যযুগে কে সেই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া য়ুরোপকে সঞ্জীবিত করিয়াছিল? ম্লেচ্ছমুসলমানের হস্ত হইতে খৃষ্টান য়ুরোপ গ্রীক্‌প্রদীপ গ্রহণ করিয়া আপনার আঁধারঘর আলো করিল মানবের ইতিহাসে ইহা অদ্ভুত দৃশ্য!

"সে সুন্দরকে ধরিতে চাহিয়াছিল। আজ তাহার 'সকল গীত

গান হয়েছে অবসান'; কিন্তু একদিন তাহার সর্ব্বাঙ্গের পুলকপ্রবাহ সঙ্গীতে, চিত্রে, স্থাপত্যে, ভাস্কর্য্যে হিল্লোলিত হইয়া গিয়াছিল। তরুণ দেবতার করুণ বংশীধ্বনির তালে তালে তালে ট্রয়্‌নগরী স্তরে স্তরে স্তরে গড়িয়া উঠিয়াছিল; আবার মোহিনী নটীর ও নর্ত্তকীর সঙ্গীত নর্ত্তনের তালে তালে তালে এথেন্স্‌ নগরীর প্রাচীর স্তরে স্তরে স্তরে ভাঙ্গা হইয়াছিল। ট্রয়্‌নগরী হেলেন্‌কে বন্দিনী করিয়া পুড়িয়া ছাই হইয়া গেল; এথেন্স্‌নগরী হেলেনীয় সভ্যতার যৌবনমদিরায় আত্মবঞ্চনা করিয়া নষ্ট হইল।"

দ্বিতীয় স্তবক

বর্ত্তমান য়ুরোপ

(গিজোর ইতিহাসের প্রথম পরিচ্ছেদ)

ভদ্রমহোদয়গণ,

এতকাল বিচ্ছেদের পরে আপনাদিগের সাদর অভ্যর্থনায় আমি বিচলিত হইয়াছি; আমাদের মধ্যে যে মনের মিল ছিল, এতদিনের ছাড়াছাড়ি হওয়া সত্ত্বেও তাহার ব্যত্যয় হয় নাই,—আজিকার আপ্যায়নে ইহাই যেন সূচিত হইতেছে, এইরূপেই আমি ইহা গ্রহণ করিতেছি।—হায়, আমি এমন ভাবে কথা কহিতেছি, যেন সাত বৎসর পূর্ব্বে যাঁহারা আমার তাৎকালিক কার্য্যের সহচর ছিলেন এবং এই গৃহে সমবেত হইতেন, তাঁহারাই যেন আজ আমাকে চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছেন; আমি নিজে এখানে পুনরায় উপস্থিত আছি বলিয়া বোধ হইতেছে, যেন আমার সমস্ত পুরাতন পরিচিত শ্রোতৃবর্গেরও এখানে হাজির হওয়া উচিত; কিন্তু ইহার মধ্যে সমগ্র জগৎসংসারে কি পরিবর্ত্তন, কি বিষম পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়া গিয়াছে! সাত বৎসর পূর্ব্বে যখন আমরা এখানে সমবেত হইতাম, আমাদের হৃদয় নানা সন্দেহ ও আশঙ্কা, উদ্বেগ ও দুশ্চিন্তায় নিপীড়িত ছিল। চারিদিকে বিপদ ঘনীভূত; আমরা যেন একটা অমঙ্গলের দিকে আকৃষ্ট হইয়া সেইদিকে প্রধাবিত হইয়াছি; যেন আমরা স্থির, গম্ভীর, শান্ত সংযমের দ্বারা সেই অমঙ্গল নিরাকরণের প্রয়াস পাইতেছি, কিন্তু সমস্তই ব্যর্থ হইয়া যাইতেছে। আমাদের আজিকার মিলন কিন্তু উদ্বেগশূন্য;—হৃদয় আশা ও শান্তিপূর্ণ; চিন্তাশক্তি স্বাধীন ও অপ্রতিহত। এই সুন্দর পরিবর্ত্তনের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ

করিবার একমাত্র উপায় আছে;—আমাদের এই সভার বৈঠকে আমাদের শাস্ত্রালোচনাকে সে কালের সেই গম্ভীর শান্ত সংযম ও স্থির-প্রতিজ্ঞা দ্বারা পুনরায় অনুপ্রাণিত করিতে হইবে; সেই যখন আমরা দিনের পর দিন গণিতাম, মনে হইত যে, আমাদের বিদ্যাচর্চ্চার উপর হয়ত কড়া পাহারা বসাইয়া দেওয়া হইবে, কিংবা লেখাপড়া সহসা বন্ধ করিয়া দিবে, তখনকার সংযম ও প্রতিজ্ঞাকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। সৌভাগ্যলক্ষ্মী চঞ্চলা। আশার সঞ্চার হইয়াছে বটে, কিন্তু এই নবজাগ্রত আশার পশ্চাতে প্রবৃত্তিকে উদ্দাম হইতে দিলে চলিবে না; আশঙ্কার সহিত সামঞ্জস্য বিধান করিয়া যেমন চলিয়াছিলাম, আশার সহিত সামঞ্জস্য রাখাও সেইরূপ আবশ্যক; ব্যাধির পূর্ব্বাভাসকালে যে সতর্কতার প্রয়োজন, রোগমুক্তির সময়েও প্রায় তেমনই সতর্ক হওয়া আবশ্যক। আশা করি, আপনারা সকলে সেই সতর্কতা ও সংযম প্রদর্শন করিবেন। ঘোর দুর্দ্দিনে ও বিপদের মধ্যে যে মতের মিল ও ভাবের ঐক্য আমাদিগকে নিবিড় সখ্যসূত্রে আবদ্ধ করিয়াছিল এবং অন্ততঃ ঘোর দুষ্কার্য্য হইতে বিরত রাখিয়াছিল, আজিকার এই শুভ-দিনেও তাহারা আমাদিগকে তেমনই করিয়া মিলিত করিবে; যে শুভফল প্রসূত হইবে, আমরা সকলে মিলিয়া তাহা সংগ্রহ করিতে পারিব। আপনাদের সাহচর্য্যের উপর আমি নির্ভর করিতেছি; তদ্ব্যতীত আর কিছু চাহি না।

আজিকার এই অধিবেশনের পর এ বৎসরের শেষ পর্য্যন্ত আমাদের সময় বড় বেশী থাকিবে না; আমি আবার আমার বক্তৃতাগুলির বিষয় সম্বন্ধে ভাবিবার অবসর অত্যন্ত অল্প পাইয়াছি। সুতরাং বিষয়-নির্ব্বাচন একটা গুরুতর ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইল। এমন বিষয় হওয়া চাই যে, এই বৎসরের যে কয় মাস আমাদের হাতে আছে, সেই কয় মাসে

তাহা আলোচিত হইতে পারে; অথচ অল্প কয়েক দিনের মধ্যে আমিও বক্তৃতার জন্য প্রস্তুত হইতে পারি। আমার বোধ হইল যে, সভ্যতা-বিকাশের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া, আধুনিক য়ুরোপের ইতিহাসের সাধারণ আলোচনা, অর্থাৎ য়ুরোপীয় সভ্যতার ইতিহাস,—তাহার উৎপত্তি, তাহার উন্নতি, তাহার উদ্দেশ্য, তাহার প্রকৃতি, এই সকলের আলোচনা আমাদের সময়োপযোগী হইবে। এই জন্য আমি মনে করিয়াছি যে, এই বিষয় লইয়া আমি আলোচনা করিব।

আমি য়ুরোপীয় সভ্যতা শব্দটি ব্যবহার করিলাম, কারণ বাস্তবিক য়ুরোপীয় সভ্যতা নামক একটা স্বতন্ত্র জিনিষ রহিয়াছে। সমগ্র য়ুরোপের রাষ্ট্রীয় সভ্যতার মধ্যে একটা ঐক্য রহিয়াছে; দেশ, কাল ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার পার্থক্য সত্ত্বেও এই সভ্যতা প্রায় একই প্রকার বাস্তব ঘটনা হইতে উদ্ভূত হইয়া, একই রকমের কার্য্যকারণ-পরম্পরার বশীভূত হইয়া চলিতে চলিতে সর্ব্বত্রই প্রায় একই রকমে ফলপ্রসবের প্রবণতা দেখাইয়া থাকে। কাজেই, একটা য়ুরোপীয় সভ্যতা আছে বৈ কি; এবং সেই সভ্যতাসমষ্টিকে আমার বক্তৃতার বিষয়ীভূত করিয়া, তৎপ্রতি আপনাদিগের মনোনিবেশ প্রার্থনা করিতেছি।

পুনশ্চ দেখা যাইতেছে যে, য়ুরোপের কোনও একটা রাষ্ট্র-বিশেষের ইতিহাসের মধ্যে এই সভ্যতাকে, এই সভ্যতার ইতিহাসকে খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না। এক হিসাবে ইহার যে কয়টি বিশিষ্ট মৌলিক গুণ আছে, তাহা স্বল্প বটে; কিন্তু ইহার বৈচিত্র্য বড় কম বিস্ময়কর নহে; কোনও দেশে ইহা আপনাকে সম্পূর্ণরূপে বিকশিত করে নাই; ইহার আকৃতি ও প্রকৃতি নানা স্থানে নানারূপে প্রকট হইয়া রহিয়াছে; ইহার সারতত্ত্বের অন্বেষণে আমাদিগকে কখনও ফ্রান্সে, কখনও ইংলণ্ডে, কখনও জর্ম্মানীতে, কখনও স্পেনে যাইতে হইবে।

আমরা ফ্রান্স-দেশবাসী; আমাদের পক্ষে এই বিষয়টি লইয়া গবেষণায় প্রবৃত্ত হওয়ার যথেষ্ট সুবিধা আছে। ব্যক্তিবিশেষের তোষামোদ, এমন কি, আমাদের স্বদেশের সুখ্যাতির আতিশয্য সব সময়ে বর্জ্জনীয়; কিন্তু আমরা নিঃসঙ্কোচে বলিতে পারি যে, ফ্রান্সই য়ুরোপীয় সভ্যতার কেন্দ্রস্থল। আমি এমন কথা বলি না যে, সে বরাবর সর্ব্বতোভাবে সমগ্র জাতির শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া আসিতেছে। বিভিন্ন যুগে, সুকুমার কলায় ইটালি, এবং রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানে ইংলণ্ড—ফ্রান্সের চেয়ে অধিকতর অগ্রসর হইয়াছে; বোধ হয়, সময়ে সময়ে অন্যান্য য়ুরোপীয় জাতি অন্যান্য বিষয়ে অধিকতর উৎকর্ষ প্রদর্শন করিয়াছে। কিন্তু এ কথা অস্বীকার করা অসম্ভব, যে যখনই সে বুঝিতে পারিয়াছে যে অন্যান্য জাতি তাহাকে পশ্চাতে ফেলিয়া সভ্যতার উচ্চতর সোপানে আরোহণ করিয়াছে, তখনই সে নূতন বল সঞ্চয় করিয়া, নবীন উদ্যমে এক লম্ফে তাহার প্রতিযোগীদিগের পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে; হয়ত বা তাহাদের সকলের সম্মুখে গিয়া পড়িয়াছে। ফ্রান্সের শুধু যে, এই টুকুই বৈশিষ্ট্য ও সৌভাগ্য, তাহা নহে। অন্যান্য দেশে যখন নবীন ভাবোন্মেষ হয়, নূতন নূতন অনুষ্ঠান গড়িয়া উঠে, তখন সেই সকল ভাব, সেই সমস্ত অনুষ্ঠান, দেশের রাষ্ট্রীয় সীমা অতিক্রম করিয়া চারিদিকে ব্যাপ্ত হইয়া

পাষাণ-বাঁধন টুটি ভিজায়ে কঠিন ধরা
বনেরে শ্যামল করি,' ফুলেরে ফুটায়ে ত্বরা,

সমগ্র য়ুরোপীয় সভ্যতাকে পরিপুষ্ট করিবার প্রয়াস পায়; কিন্তু তাহারা ফ্রান্সে প্রবেশ করিয়া রূপান্তর হইয়া যায়; যেন সেখানে তাহারা নবজন্ম লাভ করে; তখন যেন তাহারা তাহাদের এই নূতন জন্মস্থান হইতে দিগ্বিজয়ে বাহির হইয়া পড়ে। মানব-সভ্যতার ক্রমোন্মেষে

এমন কোনও বিরাট ভাব, এমন কোনও বিপুল তত্ত্ব নাই, যাহা পরিব্যাপ্তির পূর্ব্বে ফ্রান্সের ভিতর দিয়া যায় নাই।

ইহার কারণ নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। ফরাসীর জাতীয় চরিত্রে সামাজিকতা, সহৃদয়তা প্রভৃতি এমন কিছু বিশিষ্ট গুণ আছে, যাহা অতি সহজে সেই সকল স্থান অধিকার করিয়া বসে, যেখানে অন্যান্য দেশের জাতীয় শক্তি কার্য্যকরী হইতে পারে না; আমাদের ভাষার গুণেই হউক, কিংবা আমাদের জাতীয় প্রকৃতির বিশিষ্টতার জন্যই হউক, ইহা সুনিশ্চিত যে, আমাদের ভাবগুলি অন্যজাতির চেয়ে ইতর-সাধারণের নিকট স্পষ্টতর ও অধিকতর সুবোধ্য হইয়া, তাহাদিগের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হয়; স্বচ্ছতা, সামাজিকতা, সহৃদয়তা—ফরাসীর এবং ফরাসীর সভ্যতার বিশিষ্ট গুণ; এই গুণগুলিই তাহাকে য়ুরোপীয় সভ্যতার পুরোভাগে অগ্রণী হইবার উপযোগী করিয়া তুলিয়াছে।

অতএব, এত বড় ঐতিহাসিক সত্যসম্বন্ধে তথ্যালোচনায় প্রবৃত্ত হইয়া যদি আমরা ফ্রান্সকে বাছিয়া লইয়া, আমাদের বিষয়ের কেন্দ্রস্থলে দাঁড় করাইয়া দি, বোধ হয়, তাহা হঠকারিতার বা খামখেয়ালির পরিচায়ক হইবে না। যদি আমরা সভ্যতার মর্ম্মস্থানে পৌঁছিতে চাই, সারসত্যের অন্তস্তল উদ্‌ঘাটিত করিতে চাই, তাহা হইলে আমাদিগের গত্যন্তর নাই।

ঐতিহাসিক সত্য—এই কথাটা আমি ইচ্ছা করিয়াই ব্যবহার করিলাম; অন্যান্য সত্যের মত মানবসভ্যতাও সত্য,—তাহাদিগের মত ইহাও আলোচিত, বর্ণিত, বিবৃত হইতে পারে।

শুধু সত্য ঘটনার বিবৃতিতে ইতিহাসের কার্য্য পর্য্যবসিত হওয়া উচিত, এই রকম একটা কথা কিছু কাল ধরিয়া শুনা যাইতেছে; ইহার চেয়ে ন্যায়সঙ্গত কথা আর কিছু হইতে পারে না। কিন্তু আমাদের সর্ব্বদাই

মনে রাখিতে হইবে যে, সাধারণতঃ লোকে প্রথম প্রথম যেগুলিকে সত্য বলিয়া মনে করে, তদতিরিক্ত আরও অনেক বিচিত্র সত্য ঘটনা লিপিবদ্ধ করিতে হইবে ;—স্থূল, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সত্য,—যথা, যুদ্ধবিগ্রহ, রাজসরকারের কার্য্যাবলী ; আধ্যাত্মিক সত্য,—ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে বলিয়া যে সে গুলি সত্য হিসাবে কোনও অংশে ন্যূন তাহা নহে ; স্বতন্ত্র এক একটি সত্য,—তাহাদের স্বতন্ত্র নামকরণ হইয়াছে ; সাধারণ সত্য,—তাহাদের বিশেষ কোনও নামকরণ হয় নাই এবং তাহাদের সম্বন্ধে সাল তারিখ ঠিক করিয়া বলা অসম্ভব, তাহাদিগকে নির্দ্দিষ্ট সীমার মধ্যে আবদ্ধ করাও অসম্ভব, কিন্তু সে গুলিও অন্যান্য ঐতিহাসিক সত্যের মত খাঁটি সত্য, ইতিহাস হইতে সে গুলিকে বাদ দিলে ইতিহাস পঙ্গু হইয়া পড়িবে।

ইতিহাসের যে অংশটিকে আমরা সাধারণতঃ দার্শনিক বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকি,—ঘটনাপরম্পরার সম্বন্ধ, কি সূত্রে তাহারা পরস্পর গ্রথিত, তাহাদের কার্য্য-কারণের বিচার,—এ সকলই সত্য ; যুদ্ধের বিবরণের মত, অন্যান্য স্থূল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ঘটনার বিবরণের মত ঐতিহাসিক সত্য। এই সকল সত্যকে উদ্‌ঘাটিত করিয়া ব্যাখ্যা করা অবশ্যই অপেক্ষাকৃত কঠিন ব্যাপার ; ইহাদিগকে বর্ণনা করিবার সময় ভুলভ্রান্তির সম্ভাবনা অধিক, ইহাদিগের মধ্যে প্রাণসঞ্চার করা বড় সহজ ব্যাপার নহে ; বিচিত্র বর্ণ-সমাবেশে পরিষ্কার ভাবে দেখান শক্ত। কিন্তু শক্ত বলিয়া ইহাদের প্রকৃতি পরিবর্ত্তিত হয় না ; ইতিহাসের উপাদান হিসাবে ইহাদের আবশ্যকতার তিলমাত্র হ্রাস হয় না।

মানব-সভ্যতা এই রকম একটি সত্য ব্যাপার,—সাধারণ, রহস্যময়, জটিল সত্য ; স্বীকার করি, ইহাকে বর্ণনা করা, বিবৃত করা, অত্যন্ত কঠিন ; কিন্তু তৎসত্ত্বেও ইহার অস্তিত্ব অস্বীকার করা যায় না ; ইহা আছে, এবং আছে বলিয়া ইহার বর্ণিত বিবৃত হইবার অধিকার আছে। এ সম্বন্ধে

অনেকগুলি প্রশ্ন উত্থাপিত হইতে পারে। আমরা জিজ্ঞাসা করিতে পারি, এ প্রশ্ন অনেকবার করা হইয়াছে,—এই যে সভ্যতা, ইহা ভাল না মন্দ? অনেকে মন্দ মনে করিয়া ইহার জন্য দুঃখিত; আবার অনেকে খুব আনন্দিত। প্রশ্ন উঠে, ইহা কি শাশ্বত সত্য? সমগ্র মানবজাতির বিশ্বজনীন সভ্যতা বলিয়া একটা কিছু আছে কি? মানবের ধ্রুব অদৃষ্ট, অখণ্ডনীয় বিধিলিপি বলিয়া গণ্য হইতে পারে কি? এমন একটা কিছু, যেটিকে বিভিন্ন মানবসমষ্টি যুগে যুগে রক্ষা করিয়া আসিয়াছে; যেটি কখনও লুপ্ত হয় নাই, পরন্তু বর্দ্ধিতায়তন হইয়া অনন্তকাল চলিতে থাকিবে? আমার নিজের বিশ্বাস যে, মানব-সাধারণের বাস্তবিকই একটা ধ্রুব সুনির্দ্দিষ্ট পরিণাম আছে,—সমগ্র সভ্যতার ধারাবহন। সুতরাং শাশ্বত মানব-সভ্যতার ইতিহাস রচিত হইবে। কিন্তু এত বড় বড় প্রশ্ন উত্থাপিত না করিয়া—এ প্রশ্নগুলির সমাধান অত্যন্ত কঠিন—আমরা যদি নির্দ্দিষ্ট দেশকালের মধ্যে নিজেকে আবদ্ধ করিয়া, কয়েক শতাব্দীর ও কয়েকটি জাতির ইতিহাসে মনো-নিবেশ করি, তাহা হইলে দেখিতে পাই যে, এই অল্প পরিসরের মধ্যে মানবসভ্যতা এমন একটি সত্য ব্যাপার যাহাকে বর্ণিত, বিবৃত করা যায়,—যাহা বাস্তবিক ইতিহাস। আমি বলিতে চাই, ইহাই সর্ব্বোচ্চশ্রেণীর ইতিবৃত্ত,—অন্য সমস্তই ইহার অন্তর্গত।

আর বাস্তবিকই কি আমাদের নিকট এই সত্যটি সর্ব্বাপেক্ষা বড় বলিয়া প্রতীয়মান হয় না, সাধারণ সুনির্দ্দিষ্ট সত্য, যেখানে অন্য সমস্তই পর্য্যবসিত ও বিলীন হইয়া যায়? যে সকল জিনিষ একটা জাতির ইতিহাস রচিত করিয়া তুলে, যেগুলিকে আমরা সাধারণতঃ সেই জাতির ইতিহাসের প্রাণ-স্বরূপ মনে করিয়া থাকি,—ইহার জাতীয় অনুষ্ঠানগুলি, ইহার বাণিজ্যব্যাপার, ইহার যুদ্ধবিগ্রহ, ইহার রাষ্ট্রপদ্ধতি,

—এই সকলগুলির বিষয় একবার ভাবিয়া দেখুন। যখন আমরা এগুলিকে সমষ্টিভাবে দেখিয়া, ইহাদের পরস্পর মিলনের দিকে লক্ষ্য করিয়া, ইহাদের মূল্যের হিসাব করিতে বসি, বিচার করিতে বসি, তখন প্রশ্ন করি যে, এই জাতীয় সভ্যতায় ইহারা কি দিয়াছে, কি কাজ করিয়াছে, কি প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। এইরূপে আমরা যে শুধু এগুলিকে সমগ্রভাবে উপলব্ধি করিতে পারি, তাহা নহে, আমরা ইহাদের যথার্থ মূল্য নির্দ্ধারণ করিতে সমর্থ হই। এগুলি যেন ছোট ছোট নদী, আমরা যেন জিজ্ঞাসা করি, ইহারা কতটা জল সমুদ্রে ঢালিয়া দিয়াছে। সভ্যতা একটা সমুদ্র-বিশেষ; ইহারই ভিতর হইতে একটা জাতির সৌভাগ্যলক্ষ্মী উত্থিত হয়েন; ইহারই উপরে তাহার জীবনের সমস্ত উপাদান, তাহার জীবন রক্ষার্থ সমস্তশক্তি সংহত ও মিলিত হয়। এ কথাটি খুব সত্য; কারণ, এমন অনেক ঐতিহাসিক ব্যাপার আছে, যেগুলা জঘন্য ও হেয়, যাহা একটা জাতির বুকের উপরে জগদ্দল পাথরের মত চাপিয়া বসিয়া থাকে, যেমন মনে করুন, একেশ্বর রাজত্ব এবং অরাজকতা; কিন্তু তাহারা যদি সভ্যতার বিকাশে কিছুমাত্র সহায়তা করিয়া থাকে, যদি তাহাকে কতক দূর পর্য্যন্ত অগ্রসর করাইয়া দিয়া থাকে, তাহা হইলে আমরা তাহাদিগকে ক্ষমা করি, তাহাদের অন্যায় ও অমঙ্গলের দিকটার প্রতি লক্ষ্য করি না। যেখানেই আমরা সভ্যতাকে চিনিতে পারি, যে কোনও কারণেই তাহা উদ্ভূত হউক না কেন, কি মূল্য দিয়া তাহাকে পাওয়া গিয়াছে, সে কথা ভুলিয়া যাইতে ইচ্ছা হয়।

আবার এমন অনেকগুলি সত্য আছে, যেগুলি ঠিক সামাজিক বলা যায় না; বিশিষ্ট, স্বতন্ত্র জিনিষ, মানবাত্মার সহিত যাহার সম্পর্ক আছে বলিয়া বোধ হয়, তাহার সামাজিক জীবনের সহিত নহে।

ধর্ম্ম-বিশ্বাস, দার্শনিকমত, বিজ্ঞান, সাহিত্য, কলাবিদ্যা প্রভৃতিকে এই শ্রেণীভুক্ত করা যাইতে পারে। এগুলি মানুষের নৈতিক উন্নতির সহায়তা করে বলিয়া, তাহার চিত্তাকর্ষক বলিয়া, তাহার নিকট উপাদেয়; তাহার আভ্যন্তরিক উন্নতি, তাহার চিত্ত বিনোদনই ইহাদের উদ্দেশ্য; তাহার সামাজিক অবস্থার সহিত সম্পর্কিত নহে। কিন্তু এখানেও এই সত্যগুলিকে সভ্যতার দিক হইতে প্রায় বিচার করিয়া দেখা হয়; সেই দিক দিয়া বিবেচিত হইবার জন্য যেন ইহাদের একটা দাবী আছে।

সব সময়ে, সব দেশে, ধর্ম্ম বাহাদুরি লইয়া থাকে যে, সে মানুষকে সভ্য করিয়াছে; বিজ্ঞান, সাহিত্য, কলাবিদ্যা, সমস্ত মানসিক ও নৈতিক আনন্দ, এই বাহাদুরীতে ভাগ বসাইতে চায়; তাহাদের এই দাবী গ্রাহ্য হইলে আমরা মনে করিয়া থাকি যে, ইহা তাহাদের সুখ্যাতির ও গৌরবের পরিচায়ক। এইরূপে যে সকল জিনিষ স্বতঃই অতি আবশ্যক ও উচ্চ বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে, যাহাদের মূল বহির্জগতের ফলের উপর নির্ভর করে না, যাহাদের কেবলমাত্র মানবাত্মার সহিত সম্বন্ধ, তাহারাও সভ্যতার সম্পর্কে আসিয়া পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক শ্রদ্ধার ও ভক্তির জিনিষ হইয়া পড়ে। এই সাধারণ সত্যটির মূল্য এত অধিক যে ইহা যাহাকেই স্পর্শ করে, তাহাকেই মূল্যবান্ করিয়া তুলে। শুধু যে সভ্যতাই ইহাদিগকে মূল্যবান্ করিয়া তুলে, এমন নহে; অনেক সময়ে আমরা এই সকল ধর্ম্মবিশ্বাস, দার্শনিক মত, সাহিত্য, কলাবিদ্যা সম্বন্ধে ভাবিয়া দেখি যে, ইহারা বিশেষভাবে সভ্যতার উপর কিরূপ প্রভাব বিস্তার করিয়াছে; সেই প্রভাব কতক দূর পর্য্যন্ত এবং কিছু কালের জন্য তাহাদেরই গুণবত্তার নির্ভুল পরিমাপকরূপে গৃহীত হয়।

অতএব, এই ইতিহাসের প্রারম্ভেই আমি একটি প্রশ্ন করিব;—সেই জিনিষটি কি, স্বতঃই এত গুরু, এত বিরাট, এত মহামূল্য যে, তাহা সমগ্র জাতীয় জীবনকে পুঞ্জীভূত করিয়া বহিঃপ্রকটিত করে বলিয়া অনুমিত হয়?

এই খানে আমাকে একটু সতর্ক হইতে হইবে যেন আমি নিভাঁজ দর্শনশাস্ত্রের অবতারণা করিয়া না বসি; যেন একটি ন্যায়সূত্র অবলম্বন করিয়া, তাহা হইতে সভ্যতার প্রকৃতি নির্দ্ধারণ করিবার চেষ্টা না করি; এ পন্থা অবলম্বন করিলে ভুলের সম্ভাবনা অধিক। এই স্থলে আমরা একটি ঐতিহাসিক সত্যের যাথার্থ্য প্রমাণ করিতে ও বর্ণনা করিতে চাই।

অনেক দিন হইতে 'সভ্যতা' কথাটা নানাদেশে প্রচলিত হইয়া আসিতেছে; লোকে এই কথাটার সহিত কতকগুলা ভাব জড়িত করিয়া দিয়াছে,—কোনও কোনটা সুস্পষ্ট ও ব্যাপক, কোনটাও বা অপেক্ষাকৃত অস্পষ্ট ও সঙ্কীর্ণ; সে যাহাই হউক, এ শব্দটা কিন্তু ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে, এবং যাহারা এটাকে ব্যবহার করে, তাহারা কোনও না কোনও একটা অর্থ ইহার সহিত সংযোজিত করিয়া দেয়। এই শব্দটির সাধারণ, প্রচলিত অর্থটাই আমরা আলোচনা করিব। প্রায় দেখা যায় যে, অত্যন্ত সাধারণ শব্দগুলি যে অর্থে সচরাচর ব্যবহৃত হইয়া থাকে, সেই অর্থ তাহাদের সযত্নরচিত বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার চেয়ে অধিকতর সমীচীন। মানুষের সাধারণ সহজ জ্ঞান শব্দগুলিকে তাহাদের সাধারণ অর্থটাই দিয়া থাকে; এবং এই সাধারণ সহজবুদ্ধি মানুষেরই গুণবিশেষ। একটা শব্দের প্রচলিত অর্থ বাস্তব সত্যের সহিত বরাবর ঘনিষ্ট সম্পর্কে থাকিয়া অল্পে অল্পে গড়িয়া উঠে। ক্রমে এমন হয় যে, যখন একটা নূতন সত্য আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হয়

এবং মনে হয় যে, ইহাকে একটা পরিচিত শব্দের অর্থভুক্ত করা যাইতে পারে, তখন ইহা অতি সহজেই তন্মধ্যে গৃহীত হয়; ক্রমে সেই শব্দটির অর্থ বাড়িয়া যায়; যে সকল বিচিত্র সত্য ও বিভিন্ন ভাব স্বভাবতঃই এই শব্দের অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে, লোকে সেগুলিকে ঠিক তাহার মধ্যে আনিয়া ফেলে।

পক্ষান্তরে যদি একটা শব্দের অর্থ বিজ্ঞানের দ্বারা স্থিরীকৃত হয়, এই অর্থনির্দ্ধারণ-ব্যাপার কোনও ব্যক্তিবেশেষ বা অল্পসংখ্যক ব্যক্তি কর্তৃক সম্পাদিত হইয়া থাকে, যখন মন কোনও একটা বস্তুবিশেষকে অনুভব করে। এই জন্য শব্দের সাধারণ অর্থের চেয়ে তাহার বৈজ্ঞানিক অর্থ প্রায়ই সঙ্কীর্ণতর,—সুতরাং সত্য হিসাবে অপেক্ষাকৃত খর্ব্ব হইয়া পড়ে। সত্য হিসাবে 'সভ্যতা' শব্দটির তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিবার কালে কি ভাব এ শব্দটির ভিতর সন্নিবেশিত হইয়াছে, তাহা অনুসন্ধান করিবার সময়ে, যদি আমরা মানুষের সহজবুদ্ধির আশ্রয় লই, তাহা হইলে পরিস্কার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা অপেক্ষা খাঁটি সত্যের উপলব্ধি করিবার সম্ভাবনা আমাদিগের অপেক্ষাকৃত অধিক হইবে।

এই গবেষণায় প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে কয়েকটি কল্পিত সামাজিক অবস্থা আপনাদিগের সমক্ষে উপস্থাপিত করিবার চেষ্টা করিব। আমি বিভিন্ন অবস্থায় কয়েকটি সমাজের বর্ণনা করিব। পরে আমরা অনুসন্ধান করিয়া দেখিব যে, মানুষের সহজ বুদ্ধি তাহাদিগের মধ্যে এমন কিছু আবিষ্কার করিতে পারে কি না, যাহা হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, সেই জাতি নিজের সভ্যতার জন্য সচেষ্ট, তাহাদের মধ্যে মানুষ সাধারণতঃ 'সভ্যতা' শব্দটি যে অর্থে ব্যবহার করে, তাহার পরিচয় পাওয়া যায় কি না।

প্রথম একটা জাতির কথা মনে করুন, যাহার বাহিরের সামাজিক

জীবন বেশ সুখস্বচ্ছন্দে কাটিয়া যায়। তাহারা সামান্য টেক্স দেয়; তাহাদের কোনও কষ্ট নাই; পরস্পরের মধ্যে ব্যক্তিগতভাবে ন্যায়বিচার ভালই হইয়া থাকে। এক কথায় বলিতে গেলে, তাহাদের স্থূল সামাজিক জীবন সুখময় এবং সুন্দরভাবে নিয়ন্ত্রিত। কিন্তু তাহাদের মানসিক ও নৈতিক অস্তিত্বকে সচেষ্টভাবে জড়ত্বে পরিণত করিয়া রাখা হয়; নিপীড়িত করিয়া রাখা হয়; এমন কথা আমি বলি না, কারণ নিপীড়ন জিনিষটা কি, তাহা তাহারা বুঝে না; তবে পিষ্ট করিয়া রাখা হয়। এ রকম দৃষ্টান্ত বিরল. নহে। ছোট ছোট অভিজাততন্ত্র-রাষ্ট্র এমন অনেক আছে, যেখানে প্রজাপুঞ্জ গৃহপালিত পশুর মত ব্যবহার পাইয়া থাকে,—বেশ সুবন্দোবস্তে রক্ষিত ও সাংসারিক সুখসমৃদ্ধিবান, কিন্তু নৈতিক ও মানসিক জীবনীশক্তি বর্জ্জিত। ইহাকে কি সভ্যতা বলা যায়? এই লোকগুলি কি সভ্য?

আর একটা সামাজিক অবস্থা মনে করুন। সমাজের লোকের জীবনযাত্রা প্রথমটার চেয়ে একটু কম স্বচ্ছন্দতার সহিত নির্ব্বাহিত হয়; কিন্তু যাহা হউক, জীবন ধারণ করা চলে। পক্ষান্তরে, নৈতিক ও মানসিক শক্তি-বিকাশের ক্ষেত্র কতকটা প্রসারিত করিয়া দেওয়া হইয়াছে; সেখানে উচ্চ, পবিত্র ভাবগুলির অনুশীলন হইয়া থাকে; তাহাদের আধ্যাত্মিক ভাবগুলিও খানিকটা উন্নত; কিন্তু অতি সতর্কভাবে তাহাদিগের মাধ্য স্বাধীনতাবৃত্তিকে দমন করিয়া রাখা হয়। পূর্ব্বোক্ত সমাজে যেমন স্থূল সাংসারিক অভাবগুলি মোচন করা হয়, এখানে তেমনই মানসিক ও নৈতিক অভাবগুলি পরিতৃপ্ত করা হয়। প্রত্যেকের অংশস্বরূপ একটু একটু সত্য তাহাকে বণ্টন করিয়া দেওয়া হয়; নিজে অন্বেষণ করিয়া সেই সত্যকে উপলব্ধি করিবার অধিকার কাহারও নাই। নির্জীবত্বই ইহাদিগের আধ্যাত্মিক জীবনের লক্ষণ।

এই অবস্থায় অধিকাংশ এসিয়াবাসী পতিত হইয়াছে; যেখানে যাজক-তন্ত্রের প্রাধান্য মানুষকে নিশ্চেষ্ট করিয়া রাখিয়াছে; দৃষ্টান্তস্থলে হিন্দুদের উল্লেখ করা যাইতে পারে। এখানেও আমি পূর্ব্বের মত প্রশ্ন করিতে পারি,—এই সমাজ কি নিজকে সুসভ্য করিতেছে?

আমার কাল্পনিক সমাজের প্রকৃতিটা সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত করিয়া লই। মনে করুন, যেন এমন একটি সমাজ আছে, যেখানে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা অতিমাত্রায় প্রকটিত, কিন্তু গোলমাল ও বৈষম্য খুব বেশী। এটি পূরামাত্রায় বলের সাম্রাজ্য, এখানে দৈব ঘটনার পূর্ণ অধিকার। যে বলিষ্ঠ নয়, সে নিপীড়িত হইয়া, ক্লেশ ভোগ করিয়া মারা যায়; বলপ্রয়োগই এই সমাজের প্রধান লক্ষণ। ইহাকে কি সুসভ্য সমাজ বলা যায়? সম্ভবতঃ ইহার মধ্যে সভ্যতার বীজ নিহিত আছে; কালে তাহা অঙ্কুরিত ও মুকুলিত হইবে; কিন্তু এ সমাজের যে জিনিষের প্রভাব সর্ব্বাপেক্ষা অধিক, তাহাকে নিশ্চয়ই মানব-সাধারণের সহজবুদ্ধিতে সভ্যতা বলা যায় না।

এইবার আর একটি সমাজের কথা বলিয়া আমার কাল্পনিক সমাজ বর্ণনা শেষ করিব। আর একটি সমাজ মনে করুন; সেখানে প্রত্যেক ব্যক্তির স্বাধীনতা খুব বেশী; তাহাদের মধ্যে বৈষম্য নাই বলিলেই হয়, অন্ততঃ অত্যন্ত ক্ষণস্থায়ী। যাহার যাহা ইচ্ছা, প্রায় তাহা করে; তাহার ও তাহার প্রতিবেশীর মধ্যে ক্ষমতার তারতম্য বড় বেশী নাই; কিন্তু সেখানে সাধারণ সামাজিক ভাব অতি অল্পই আছে, সমাজ বলিতে যাহা বুঝায়, তাহা অতি ক্ষীণ;—অর্থাৎ স্বতন্ত্র ব্যক্তির ক্রিয়াশক্তি ও অস্তিত্ব দেখা দিয়া বিলীন হইয়া যায়, পরস্পরের প্রতি কোনও ঘাত প্রতিঘাত করে না, পশ্চাতে কোনও চিহ্নও রাখিয়া যায় না। বংশপর-ম্পরাক্রমে এইরূপ চলিয়া আসিতেছে; মানুষ সমাজের যে অবস্থায়

জীবনযাত্রা আরম্ভ করিয়াছিল, সেই যাত্রার অবসানেও সমাজকে তদবস্থ রাখিয়া যায়। বন্য বর্ব্বর জাতির এই অবস্থা; সাম্য ও স্বাধীনতা আছে বটে, কিন্তু সভ্যতা নাই।

আরো নানাবিধ সামাজিক অবস্থার কল্পনা আমি করিতে পারি; কিন্তু সভ্যতা শব্দটির সাধারণ লৌকিক তাৎপর্য্যার্থ বুঝাইবার জন্য যাহা বলা হইয়াছে, তাহাই যথেষ্ট।

স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে, উপরে যে কয়টি সামাজিক অবস্থার আলোচনা করিলাম তাহাদের একটিও ঐ শব্দের লৌকিক তাৎপর্য্যের সহিত খাপ খায় না। কেন? আমার মনে হয় যে, এই সভ্যতা শব্দটির মধ্যে যে মূলতত্ত্ব নিহিত আছে (আমার উল্লিখিত দৃষ্টান্তগুলি হইতেই ইহা পাওয়া যায়) তাহা আর কিছু নহে—গতিশীলতা, উন্নতিপ্রবণতা; এই শব্দটিতে একটি ভাব চকিতে মানসপটে উদিত হয়,—সমাজ অগ্রসর হইতেছে, স্থান পরিবর্ত্তন করিবার জন্য নহে, অবস্থা-পরিবর্ত্তনের জন্য: অনুশীলন, উন্নতির চেষ্টাই তাহার অবস্থার পরিচায়ক। এই যে গতির, উন্নতির ভাব, ইহাই সভ্যতাশব্দের মূলভাব, এইরূপ আমার মনে হয়। আচ্ছা, এই গতিটা কি? এই উন্নতিটাই বা কি? এইখানেই আমাদের কঠিনতম সমস্যা।

Civilization শব্দটার ব্যুৎপত্তিলব্ধ অর্থ দেখিলে মনে হইতে পারে যে, একটা পরিষ্কার, সন্তোষজনক উত্তর পাওয়া গেল। আভিধানিক অর্থে ইহা সমাজে মানুষের সহিত মানুষের সম্পর্কের, সামাজিক জীবনের, উন্নতি ও পরিণতি-চেষ্টা।

শব্দটি উচ্চারিত হইলেই প্রথমে এইভাব উদিত হয়; সামাজিক সমস্ত সম্বন্ধের সম্প্রসারণ, সর্ব্বাপেক্ষা অধিক কার্য্যকুশলতা, সর্ব্বোৎকৃষ্ট যন্ত্রবদ্ধ বিধিব্যবস্থা, এইগুলি আমাদের মানসপটে যুগপৎ চিত্রিত হইয়া

উঠে ;—একদিকে সমাজকে শক্তি ও সুখ দিবার জন্য নূতন নূতন উপায়ের উদ্ভাবন, পক্ষান্তরে স্বতন্ত্র ব্যক্তিগুলির মধ্যে অধিকতর ন্যায়-সঙ্গত ভাবে শক্তির বিস্তার।

এই মাত্র? সভ্যতা শব্দটির সহজ, সাধারণ তাৎপর্য্য কি ইহাতে আমরা নিঃশেষিত করিয়াছি? ইহার মধ্যে কি আর কিছুই নাই?

আমাদের প্রশ্ন যেন এইরূপ দাঁড়াইতেছে;—শেষ পর্য্যন্ত কি ইহাই দাঁড়াইল যে, মানবজাতি একটা বল্মীকমাত্র? একটা সমাজ যেখানে শান্তি ও শারীরিক স্বচ্ছন্দতা ব্যতীত আর কিছু আবশ্যক নহে, যেখানে যত বেশী শ্রম ও সেই শ্রমের ফল যত বেশী ন্যায্যভাবে বিভক্ত হয়, ততই উদ্দেশ্যটা সফল হয়, উন্নতিরও চরম পরিণতি হয়।

মানুষের চরম পরিণতি সম্বন্ধে এইরূপ সংকীর্ণ ভাব হৃদয়ে পোষণ করিতে আমরা স্বভাবতঃই নারাজ। হৃদয় প্রথম হইতেই অনুভব করে যে, এই civilization শব্দটিতে কেবলমাত্র সামাজিক সম্বন্ধের, সামাজিক শক্তির ও শান্তির সম্যক্ স্ফূর্ত্তি ব্যতীত ব্যাপকতর, জটিলতর, উন্নততর একটা কিছু আছে।

বাস্তব সত্য, জনসাধারণের মত ঐ civilization শব্দের সাধারণ লৌকিক তাৎপর্য্য, সমস্তই আমাদের এই অনুভূতির সহিত মিলিয়া যায়।

রোমের কথা মনে করুন। যখন তাহার গণতন্ত্রনীতির চরম বিকাশ হইয়াছে, কার্থেজের সহিত দ্বিতীয় দফার যুদ্ধের অবসান হইয়াছে, জাতীয় চরিত্রের শ্রেষ্ঠ গুণগুলি প্রকটিত হইয়াছে, জগতের আধিপত্যের অভিমুখে সে অগ্রসর হইয়াছে; তাহার সমাজ ক্রমোন্নতির দিকে চলিয়াছে, এইরূপ প্রতীয়মান হয়। আগষ্টসের সময়ের রোমের কথা মনে করুন। তখন অবনতির যুগ আরব্ধ হইয়াছে; অন্ততঃ উন্নতির দিকে সমাজের প্রবণতা স্তম্ভিত হইয়া, মন্দভাবগুলি প্রবল হইবার

সূচনা দেখা দিয়াছিল। এমন কেহ নাই যে, এরূপ ভাবিতে পারে কিংবা বলিতে পারে যে, ফ্যাব্রিসিয়াস্ বা সিন্সিনেটসের রোম অপেক্ষা আগষ্টসের রোম অধিকতর সুসভ্য ছিল।

আসুন, আমরা আল্প্স্ পর্ব্বতমালা অতিক্রম করিয়া সপ্তদশ এবং অষ্টাদশ শতাব্দীর ফ্রান্সের কথা ভাবিয়া দেখি। সমাজের দিক দিয়া দেখিলে, স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, তখনকার দিনে হল্যাণ্ড্, ইংলণ্ড্ প্রভৃতি য়ুরোপের অন্যান্য দেশের ব্যক্তিগত সুখস্বচ্ছন্দতা অপেক্ষা তাৎকালিক ফ্রান্সের সুখস্বচ্ছন্দতা খর্ব্বতর ছিল। আমার বিশ্বাস যে, হল্যাণ্ড্ ও ইংলণ্ডে সামাজিক ক্রিয়াশক্তি অপেক্ষাকৃত অধিক ছিল, এবং উত্তরোত্তর দ্রুততর বৃদ্ধি পাইতেছিল; সেই ক্রিয়াশক্তিপ্রসূত ফল ফ্রান্স অপেক্ষা অধিকতর পর্য্যাপ্ত পরিমাণে বণ্টন করিয়া দেওয়া হইতেছিল। তথাপি মানুষের সহজ বুদ্ধিকে যদি প্রশ্ন কর, তাহা হইলে উত্তর পাইবে যে, সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে য়ুরোপের মধ্যে ফ্রান্সই সর্ব্বাপেক্ষা সুসভ্য ছিল। এই উত্তরে অনুমোদন করিতে য়ুরোপ তিলমাত্র বিলম্ব করে নাই। ফ্রান্স সম্বন্ধে জনসাধারণের মতের কিছু কিছু চিহ্ন য়ুরোপীয় সাহিত্যে পরিলক্ষিত হইয়া থাকে।

অন্যান্য অনেক দেশের প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া দেখাইতে পারিতাম, যেখানে সমৃদ্ধি বিপুলতর, দ্রুততর বর্দ্ধিত ও জনসাধারণের মধ্যে ন্যায্যতর ভাবে বিভক্ত; মানুষ কিন্তু সহজবুদ্ধি-প্রণোদিত হইয়া বলিবে যে, এই সকল দেশের সভ্যতা কেবল মাত্র সামাজিক হিসাবে অপেক্ষাকৃত হীনাবস্থ দেশের সভ্যতা অপেক্ষা নিম্নপর্য্যায়ের জিনিষ।

ইহার অর্থ কি? এই সকল দেশের এমন কি ভাল জিনিষ আছে? ইহাদের মধ্যে এমন কি আছে যে, সভ্যদেশ হিসাবে তাহারা এই স্বতন্ত্র বিশিষ্টতা লাভ করে? সে জিনিষটা কি, যাহা জনসাধারণের

মতে এতগুলা সদ্‌গুণের অভাব অনেকটা দূরীভূত করিতে পারে।

তাহাদের মধ্যে সামাজিক জীবনের বিকাশ ব্যতীত আর একটা জিনিষ দীপ্ততর ভাবে প্রকটিত হইয়াছে; স্বতন্ত্র ব্যক্তির বিকাশ; তাহার আভ্যন্তরিক জীবনের, তাহার সমগ্র মনুষ্যত্বের, তাহার শক্তির, তাহার ভাবের বিকাশ। তাহাদের সমাজ হয়ত অন্য দেশের মত সর্ব্বগুণান্বিত নহে; কিন্তু তাহাদের মনুষ্যত্ব দীপ্ততর ও বলবত্তর ভাবে প্রকটিত হয়। অনেক সামাজিক অভাব পূর্ণ করিবার বাকী আছে বটে; কিন্তু প্রভূত মানসিক ও নৈতিক উন্নতি সাধিত হইয়াছে। অনেক লোক হয়ত সাংসারিক সুখস্বচ্ছন্দতা ও ন্যায্য অধিকার হইতে বঞ্চিত; কিন্তু অনেক বড় লোক আবির্ভূত হইয়া জগৎকে চমকিত করে। সাহিত্য, বিজ্ঞান, কলাবিদ্যা নিজ নিজ মহিমা প্রচার করে। মানুষ যেখানেই এই সকল চিহ্ন, মানব-চরিত্র মহিমায় মণ্ডিত এই সকল নিদর্শন, দেখিতে পায়, এই সকল অশরীরী আনন্দের উপাদান সৃষ্ট হইয়াছে দেখিতে পায়, সেইখানেই ইহাকে চিনিতে পারে এবং ইহাকে সভ্যতা আখ্যা প্রদান করে।

অতএব এই মহৎ সত্যের মধ্যে দুইটি বাস্তব সত্য নিহিত আছে: সেই দুটির উপর ইহা নির্ভর করিতেছে, তাহাদের সাহায্যে ইহা আত্ম-প্রকাশ করে:—সামাজিক এবং ব্যক্তিগত ক্রিয়াশক্তির যুগপৎ বিকাশ, সমাজের এবং মানবের উন্নতি। যেখানে সমাজের বাহ্য অবস্থা আপনাকে সঞ্জীবিত করিয়া, উন্নত করিয়া ব্যাপকতা লাভ করে, যেখানে মানুষের আভ্যন্তরীণ প্রকৃতি দীপ্ত ও মহিমান্বিত হইয়া নিজেকে প্রকটিত করে, সেইখানেই, সামাজিক অবস্থায় বিষম অসম্পূর্ণতা স্বত্বেও মানুষ সভ্যতার জয়গান গায়।

মানুষের সামান্য সহজবুদ্ধি-প্রণোদিত পরীক্ষার ফল এইরূপ দাঁড়ায়;

বোধ হয়, ঐ স্থলে আমি আত্মবঞ্চনা করিতেছি না। মানব-সভ্যতার ইতিহাসে এমন এক এক সময় আসে, যখন মনে হয় যে, সে একটা মহাসন্ধিস্থলে আসিয়া পড়িয়াছে, তখন যদি ইতিহাসকে জিজ্ঞাসা করা যায় যে, যে সকল বাস্তব ঘটনা ইহাকে সম্মুখে অগ্রসর করিয়া দিয়াছে, তাহাদের প্রকৃতি কিরূপ? যদি আমরা ইতিহাসের মহাসন্ধিক্ষণের ঘটনাবলীর প্রকৃতি পর্য্যালোচনা করি, তাহা হইলে আমরা উল্লিখিত লক্ষণ দুইটার একটা না একটা সর্ব্বদাই দেখিতে পাইব। তখন ব্যক্তিগত বা সামাজিক বিকাশে একটা বড় গোছের পরিবর্ত্তন সূচিত হয়; এমন ঘটনা সংঘটিত হয় যে, তদ্বারা মানুষের অন্তঃপ্রকৃতি ও বহিঃপ্রকৃতি, তাহার ধর্ম্মবিশ্বাস, অন্য ব্যক্তির সহিত তাহার সামাজিক সম্পর্ক, সমস্তই পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। খৃষ্টীয় ধর্ম্মের কথা ধরা যাউক; ইহার আবির্ভাব-কালে শুধু নহে, ইহার প্রথম যুগের ইতিহাসে অনেক দিন ধরিয়া, ইহা সামাজিক অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করে নাই; উচ্চৈঃস্বরে প্রচার করিল যে, সামাজিক ব্যাপারের সহিত ইহা সংশ্লিষ্ট হইবে না; প্রভুর আজ্ঞা পালন করিতে দাসকে হুকুম করিল; সমাজের বড় বড় ত্রুটিগুলাকে, দোষগুলাকে আক্রমণ করে নাই। তথাপি কে অস্বীকার করিবে যে, খৃষ্টীয় ধর্ম্মের আবির্ভাব সভ্যতার ইতিহাসে একটা যুগান্তকারী ঘটনা? কেন এমন হইল? কারণ, ইহা মানুষের অন্তঃপ্রকৃতিকে পরিবর্ত্তিত করিয়াছিল; তাহার ধর্ম্মবিশ্বাস, তাহার ভাব, সমস্তই বদলাইয়া দিয়াছিল। মানুষের নৈতিক প্রকৃতি মানসিক বৃত্তিগুলিকে নূতন করিয়া প্রবুদ্ধ করিয়াছিল।

আমরা আর এক প্রকারের যুগান্তকারী ঘটনা দেখিয়াছি, মানুষের অন্তঃপ্রকৃতির দিকে তাহার লক্ষ্য ছিল না, তাহার বহিরবস্থাই তাহার একমাত্র লক্ষ্য ছিল; সে সমাজকে পরিবর্ত্তন করিল, পুনরুজ্জীবিত

করিল। সমগ্র ইতিহাসের মধ্যে আপনাদের দৃষ্টি পরিচালিত করুন, সর্ব্বত্রই একই ফল লাভ করিবেন; যে সকল জিনিষ সভ্যতার বিকাশে আবশ্যক ও সহায়ক বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে, তাহাদিগকে উপরোক্ত দুইটি লক্ষণের একটি না একটির পর্য্যায়ভুক্ত দেখিতে পাওয়া যাইবে।

এই ত হইল শব্দটির সহজ এবং সাধারণ অর্থ; সভ্যতারূপ বাস্তব সত্যটি ঠিক এখানে পরিষ্কাররূপে ব্যাখ্যাত না হউক অন্ততঃ, বর্ণিত হইল, তাহার সামান্য লক্ষণগুলির যাথার্থ্যও পরীক্ষিত হইল। আমাদের সম্মুখে সভ্যতার দুইটি উপাদান রহিয়াছে। এখন প্রশ্ন উঠে এই—ইহাদের কোনও একটা কি সভ্যতাগঠনের পক্ষে যথেষ্ট? সামাজিক অবস্থার ক্রমোন্নতিকে বা ব্যক্তিত্বের ক্রমবিকাশকে সভ্যতা বলা যাইবে কি? কিংবা এই দুটা জিনিষের পরস্পর সম্পর্ক এত ঘনিষ্ঠ ও অবশ্যম্ভাবী যে, যদিই ইহারা যুগপৎ আবির্ভূত না হয়, তথাপি একের আবির্ভাবে অন্যটিও আজ না হয় কাল আবির্ভূত হইবে?

এই সমস্যাসমাধান করিতে হইলে, আমরা বোধ হয়, তিনটি বিভিন্ন দিক হইতে ইহার আলোচনা করিতে পারি। সভ্যতার উপাদান-দ্বয়ের প্রকৃতি পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারি যে, তাহাদের প্রকৃতি-গত এমন কিছু আছে কি না, যদ্দ্বারা তাহারা পরস্পরের সহিত এমন নিবিড় ভাবে সম্বদ্ধ যে একের পক্ষে অন্যটি অত্যাবশ্যক বলিয়া প্রতীয়মান হয়। ইতিহাসের মধ্যে অন্বেষণ করিয়া দেখিতে পারি, এই দুইটি লক্ষণ পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন ভাবে প্রকটিত হইয়াছে, না তাহাদের একটা হইতে অপরটা প্রসূত হইয়া থাকে? পরিশেষে আমরা এই প্রসঙ্গে জনসাধারণের মত সহজ বুদ্ধিকে প্রশ্ন করিতে পারি। আমি এই সহজবুদ্ধির দিক দিয়া প্রথমে আলোচনা করিব।

দেশের মধ্যে যখন একটা বড় গোছের পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয়,

সমৃদ্ধি ও শক্তি বেশী পরিবর্দ্ধিত হয়, সামাজিক উপকরণের বণ্টনে বিপ্লব ঘটে, তখনই এই অভিনব ব্যাপারের বিরুদ্ধে অনেক লোক দণ্ডায়মান হয়; এ বিরোধ অবশ্যম্ভাবী। এই পরিবর্ত্তনের বিরুদ্ধবাদীরা বলেন কি? তাঁহারা বলেন যে, এই সামাজিক অবস্থার উন্নতির সঙ্গে মানুষের আভ্যন্তরিক নৈতিক উন্নতি সমপরিমাণে হয় না। এই উন্নতি মিথ্যা ও মায়িক, ইহার ফল মানুষের পক্ষে, মানুষের চারিত্রনীতির পক্ষে অশুভ। সামাজিক উন্নতির বন্ধুগণ কিন্তু সবলে এই আক্রমণ প্রত্যাখ্যান করেন। তাঁহারা দৃঢ় স্বরে বলেন যে, সামাজিক উন্নতির সহিত চারিত্র-নীতি নিত্যসম্বদ্ধ, সামাজিক উন্নতির মধ্যে উহা নিহিত; সামাজিক জীবন সুন্দরতররূপে নিয়ন্ত্রিত হইলে, অন্তঃপ্রকৃতিও মধুরতর ও পূততর হয়। উভয় পক্ষের মধ্যে সমস্যাটা এইরূপ দাঁড়ায়।

ঠিক বিপরীত অবস্থা কল্পনা করুন,—মনে করুন যেন নৈতিক উন্নতি হইতেছে। যাঁহারা উন্নতিকল্পে সচেষ্ট হইয়া কাজ করেন, তাঁহারা মানুষকে কি আশার কথা শুনান? যে সকল ধর্ম্মতন্ত্রের নেতা, সাধু পুরুষ ও কবি, সমাজগঠনের প্রারম্ভে মানুষের স্বভাবচরিত্র কোমল ও সংযত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, তাঁহারা কি আশার বাণী শুনাইয়াছিলেন? তাঁহারা আশা দিয়াছিলেন যে, সমাজ উন্নত হইবে, সামাজিক জীবনের উপকরণও ন্যায্যতর ভাবে বিতরিত হইবে। তবে এই সকল কলহের, এই সকল উক্তির মধ্যে কি নিহিত আছে? ইহাদের তাৎপর্য্য কি? ইহাদের অর্থ কি?

ইহাদের অর্থ এই যে, সভ্যতার দুটি অঙ্গই,—সামাজিক ও চারিত্রনীতিক উন্নতি নিবিড় ভাবে সম্বদ্ধ বলিয়া, লোকের সহজেই ধারণা এত স্বাভাবিক দাঁড়াইয়া গিয়াছে যে একটাকে দেখিলেই সে আর একটার আবির্ভাবের আশা করে। এই সহজ ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া

পূর্ব্বোক্ত দুইটী দল স্বপক্ষে ও বিপক্ষে তর্ক করিয়া থাকে। সকলেই বুঝেন যে, যদি আমরা মানবজাতির মনে এমন ধারণা বদ্ধমূল করিতে পারি যে, সামাজিক উন্নতি ব্যক্তিগত উন্নতির বিরুদ্ধ, তাহা হইলে সমগ্র সমাজ ব্যাপিয়া যে বিপ্লব সংঘটিত হইতেছে, তাহাকে হেয় ও দুর্ব্বল করা যাইতে পারে। পক্ষান্তরে যদি আমরা এরূপ বুঝাইতে চেষ্টা করি যে, ব্যক্তিগত উন্নতির দ্বারা সামাজিক উন্নতি সংঘটিত হইবে, তাহা হইলে এই প্রকার উক্তিতে বিশ্বাসস্থাপন করিবার প্রবণতা হয়, এবং ইহাকে কার্য্যে পরিণত করিবার চেষ্টা করা হয়। সুতরাং স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে সভ্যতার বিকাশে উহারা পরস্পর সম্বদ্ধ, এবং একটি অপরটিকে উৎপাদন করে, ইহাই মানুষের সহজ স্বাভাবিক বিশ্বাস।

জগতের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে আমরা ঐ উত্তরই পাই। আমরা দেখিতে পাই যে, মানুষের আভ্যন্তরীণ উন্নতির ফলে সমাজের লাভ হইয়াছে; এবং সামাজিক অবস্থার যত কিছু উন্নতি, তাহা প্রত্যেক ব্যক্তির উপকারে আসিয়াছে। আমরা দেখিতে পাই যে, উপরোক্ত দুইটি বাস্তব সত্যের মধ্যে একটি প্রবলতর হইয়া, লোক সমক্ষে প্রকটিত হয়, এবং এই সভ্যতা-বিকাশের উপর একটি স্বতন্ত্র রেখা অঙ্কিত করিয়া দেয়। মানুষের আভ্যন্তরীণ উন্নতি হইতে যে সভ্যতা প্রসূত হইয়া বহুযুগ পরে সহস্র বাধা অতিক্রম করিয়া, সহস্র পরিবর্ত্তনের ভিতর দিয়া চলিতে থাকে, হঠাৎ একদিন সামাজিক অঙ্গটি আপনাকে বিকশিত করিয়া, তাহার সহিত মিলিত হইয়া, তাহাকে পূর্ণতা দান করে। বিশ্বনিয়ন্তার কার্য্য সঙ্কীর্ণ সীমার মধ্যে আবদ্ধ নহে; কাল যে নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া কার্য্যারম্ভ হইয়াছে, আজ তাহার ফল পাওয়া যাইবে, এমন কোন কথা নাই। যখন কাল

পূর্ণ হইবে, তখন ফল পাওয়া যাইবে; হয় ত শত শত বৎসর অতি-বাহিত না হইলে পাওয়া যাইবে না। অনেক সময় লাগে বটে, কিন্তু ফল ধ্রুব ও সত্য; বিশ্বনিয়ন্তার প্রতিপাদ্য বিষয় বুঝাইতে কিছু দেরী লাগে বটে, কিন্তু তাঁহার সিদ্ধান্তটি স্থির ও ধ্রুব। তাঁহার কাছে কাল কিছুই নহে; হোমরের দেবতারা যেমন আকাশের মধ্যে সহজে চলিয়া যায়, কালের মধ্য দিয়া তাঁহারও গতি তদ্রূপ; পদক্ষেপে কত-যুগ অন্তর্হিত হয়। খৃষ্টীয়ধর্ম্ম মানব-সমাজের উপর তাহার মহান্ প্রভাব বিস্তার করিয়া, তাহাকে নবজন্ম দিবার পূর্ব্বে কত শতাব্দ অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে, কত অগণন ঘটনা সংঘটিত হইয়াছে! তথাপি ইহা সফলপ্রযত্ন হইয়াছিল, এ কথা কে অস্বীকার করিবে?

ইতিহাসের কথা ছাড়িয়া দিয়া, আমরা সভ্যতার যে দুটি অঙ্গের কথা আলোচনা করিতেছি, তাহাদের প্রকৃতিগত লক্ষণ যদি স্বতন্ত্রভাবে বিশ্লেষণ করিয়া দেখি, তাহা হইলেও ফল সেই একই দাঁড়াইবে। এমন কেহ নাই, যাঁহার এ বিষয়ে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা আমার এই উক্তির সমর্থন করে না। মানুষের মধ্যে যখন কোনও একটা নৈতিক পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয়; যখন সে একটা নূতন ভাব, একটা নূতন গুণ, নূতন শক্তি লাভ করে, অর্থাৎ যখন সে ব্যক্তিহিসাবে অধিকতর উন্নত হয়, তখন তাহার অন্তরে কি আকাঙ্ক্ষা, কি অভাব জাগিয়া উঠে? সেটি আর কিছু নহে, তাহার মধ্যে যে নবীন ভাব জাগিয়া উঠিয়াছে, সেই ভাবে সমস্ত জগৎকে অনুপ্রাণিত করিবার আকাঙ্ক্ষা; সেই ভাবটিকে বহিঃপ্রকটীত করিবার বাসনা। মানুষ যখনই একটা নূতন জিনিষ পায়; যখনই সে বুঝিতে পারে যে, তাহার সত্বার অভিনব বিকাশ আরব্ধ হইয়াছে; তখনই সে এই নূতন মহামূল্য জিনিষটিকে একান্ত তাহার নিজস্ব বলিয়া মনে করে; তাহার অন্তরতম প্রদেশে

কে যেন বলিতে থাকে যে, এ জিনিষটি অপরকেও দিতে হইবে; যে পরিবর্ত্তন, যে উন্নতি তাহার মধ্যে সংসাধিত হইয়াছে, জগৎসংসারে তাহা প্রসারিত করিবার জন্য কে যেন তাহাকে তাড়না করিতে থাকে; তাহার সহজবুদ্ধিও সেই দিকে যেন তাহাকে লইয়া যায়। এই রকম করিয়া বড় বড় সংস্কারকের আবির্ভাব হয়; যে সকল মহাপুরুষ নৈতিক পরিবর্ত্তনের ভিতর দিয়া নব জন্ম লাভ করিয়া, জগতে যুগান্তর আনয়ন করিয়াছেন, তাঁহারা অন্য কোন বাসনার বশবর্ত্তী হইয়া, নিজ নিজ পথে চালিত হয়েন নাই। মানুষের আভ্যন্তরীণ পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে এতটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে; এখন অপরটি দেখা যাউক। ধরুন—যেন সামাজিক অবস্থার সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়াছে; সমাজ এখন পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর সুনিয়ন্ত্রিত; রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক অধিকার এবং ধনসম্পত্তি সমাজভুক্ত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে যথোচিত বণ্টন করিয়া দেওয়া হইয়াছে; ফলতঃ সংসারের চেহারা ফিরিয়াছে; রাজসরকারের কার্য্যাবলী ও সামাজিক ব্যক্তিগণের পরস্পরের প্রতি ব্যবহার অধিকতর ন্যায়সঙ্গত ও উদার ভাব ধারণ করিয়াছে; আপনারা কি মনে করেন যে, বহির্জগতের এই সুন্দর পরিবর্ত্তনে মানব-হৃদয়ে কোনও ঘাতপ্রতিঘাত হয় না? উন্নত আদর্শের, দৃষ্টান্তের, সামাজিক বিধিব্যবস্থার অনুজ্ঞার ভিত্তি এই যে, বহির্জগতের কোনও একটা সুন্দর, সুনিয়ন্ত্রিত সত্য, আজ হউক—কাল হউক, মানুষের অন্তর্জগতের অল্পবিস্তর পরিবর্ত্তন করিবেই, তাহাকেও সুন্দর, সুনিয়ন্ত্রিত করিয়া তুলিবে; বহিঃসংসার অধিকতর ন্যায়পরতন্ত্র হইলে মানুষকেও তদ্রূপ করিয়া তুলিবে; বাহির ভিতরকে সংস্কৃত করে, যেমন ভিতর বাহিরকে সংস্কৃত করে; সভ্যতার দুইটি অঙ্গ ঘনিষ্ঠভাবে সম্বদ্ধ; উভয়ের মধ্যে বহু শতাব্দীর ব্যবধান ও বহু প্রতিবন্ধক থাকিতে পারে; হয় ত তাহাদের পরস্পরের সহিত মিলিত হইবার পূর্ব্বে তাহাদের আকার সহস্রবার পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়; কিন্তু

আজ হউক, কাল হউক, তাহারা পরস্পরের সহিত মিলিত হইবেই ; ইহাই তাহাদের প্রকৃতিগত চিরন্তন বিধি, ইহাই ইতিহাসের শাশ্বত সত্য, সমগ্র মানবজাতির নিগূঢ় বিশ্বাস।

সভ্যতারূপ ঐতিহাসিক সত্যটিকে বোধ হয়, সমগ্ররূপে না হউক, কতকটা মোটামুটি, আপনাদের সমক্ষে উপস্থাপিত করিলাম, জিনিষটাকে বর্ণনা করিলাম, ইহার সীমা নির্দ্ধারিত করিয়া দিলাম, যে সকল মুখ্য মৌলিক সমস্যা আসিয়া পড়ে, তাহাও বলিলাম। এইখানেই চুপ করিলে চলিত ; কিন্তু এইখানে একটি নূতন সমস্যা আসিয়া পড়ে, তাহার আভাস না দিয়া থাকিতে পারিতেছি না। এই ধরণের সমস্যাকে ঠিক ঐতিহাসিক বলা চলে না বটে, আনুমানিক বলা যাইতে পারে ; ইহার এক প্রান্ত দৃঢ় করিয়া যদি কেহ ধরে, অপর প্রান্তটি চিরকাল তাহার অনায়ত্ত থাকিবে ; মানুষ ইহার একদেশদর্শী,—সর্ব্বাঙ্গীণ জ্ঞান তাহার সম্ভবপর নহে ; অথচ এই সকল সমস্যা ঐতিহাসিক সত্য অপেক্ষা কোনও অংশে হীন নহে ; ঐতিহাসিক সত্যের মত মানুষের চিন্তাশক্তিকে নাড়াচাড়া দিয়া থাকে, তাহার অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাহার সম্মুখে প্রতিমুহূর্ত্তে উপস্থিত হয়।

এই যে দুটা স্বতন্ত্র বিকাশের কথা বলিলাম, যে দুটাকে লইয়া সভ্যতা গড়িয়া উঠে,—সমাজের বিকাশ ও মানবত্বের বিকাশ—ইহাদের মধ্যে কোন্‌টা পরিসমাপ্তি, কোন্‌টা আরম্ভ? সামাজিক অবস্থার উন্নতিবিধান করিবার জন্য, সাংসারিক জীবনযাত্রা অধিকতর আনন্দময় করিবার জন্যই কি মানুষ তাহার নিজের সমস্ত শক্তির, সমস্ত ভাবের পুষ্টিসাধন করে? অথবা, সমাজের উন্নতি প্রয়াস, সমাজের ক্রমোন্নতি, গোটা সমাজটাই কি ব্যক্তিত্ব-বিকাশের সহায়ক ক্রীড়াক্ষেত্র নহে অর্থাৎ, মানুষের জন্য সমাজ,—না, সমাজের জন্য মানুষ? এই সমস্যা-সমাধানের সহিত মানব-জীবনের উদ্দেশ্য নিবিড় ভাবে সংশ্লিষ্ট। মানুষের কি একান্ত ভাবে

সামাজিক হওয়া চাই? সমাজ কি তাহার সমগ্র শক্তিকে নিঃশেষে হরণ করিয়া লইবে? অথবা তাহার ভিতরে সমাজ ছাড়া, সংসার ছাড়া, উন্নততর একটা কিছু আছে, যেটা শুধু প্রাণধারণ অপেক্ষা মহত্তর?

মিঃ রয়ে কলার একটি বক্তৃতায় ইহার উত্তর দিয়াছেন; উত্তরটি তাঁহার আন্তরিক বিশ্বাস-প্রণোদিত। তাঁহাকে আমার বন্ধুসম্বোধনে গর্ব্ব অনুভব করি; আমাদের এই সভার মত বহুসমিতির মধ্য দিয়া অগ্রসর হইয়া, তিনি অপেক্ষাকৃত অধিক অশান্ত ও প্রবল সমিতির অগ্রণী হইয়াছেন। তাঁহার বক্তৃতায় আমি এই দুটি ছত্র দেখিতে পাই—"মানব-সমাজগুলি পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে, জীবন ধারণ করে, এবং লয় প্রাপ্ত হয়; সেই খানেই তাহাদের বিধি-নিয়ন্ত্রিত কার্য্যের অবসান…কিন্তু তাহারা সমগ্র মানুষটিকে আত্মসাৎ করিতে পারে না। সে যখন সমাজের সঙ্গে চুক্তি করিয়া ফেলে, তাহার মহত্তম অংশটি তাহার নিজস্ব রহিয়া যায়; সেই সকল উচ্চ বৃত্তি, যদ্দ্বারা সে ভগবানের দিকে, পরকালের দিকে, একটা অদৃশ্য লোকে অননুভূতপূর্ব্ব সুখের দিকে উন্নীত হয়…আমরা স্বতন্ত্র ব্যক্তি, অমরত্ব লাভ করিয়াছি; রাষ্ট্রের অস্তিত্ব হইতে আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য স্বতন্ত্র।"

ইহার অধিক আমি আর কিছু বলিতে চাহি না; আমি এ প্রশ্ন লইয়া নাড়াচাড়া করিব না; প্রশ্নটি উত্থাপন করিয়াই আমি ক্ষান্ত হইলাম। সভ্যতার ইতিহাসে আমরা ইহাকে দেখিতে পাই। যখন সেই ইতিহাস পরিসমাপ্ত হয়; যখন আমাদের ইহজীবন সম্বন্ধে আর কিছু বলিবার থাকে না; তখন মানুষ অগত্যা নিজেকে জিজ্ঞাসা করে যে, সমস্তই সে নিঃশেষ করিয়া ফেলিয়াছে কি না, তাহার সমগ্র জীবনের পরিসমাপ্তি হইয়াছে কিনা। সভ্যতার ইতিহাসে এইটাই শেষ ও সর্ব্বোচ্চ সমস্যা। ইহার স্থান ও ইহার বিরাটত্ব নির্দ্দেশ করাই আমার পক্ষে যথেষ্ট।

আমি যাহা বলিলাম, তাহাতে প্রতিপন্ন হইতেছে যে, সভ্যতার ইতিহাস দুই রকমে রচিত হইতে পারে, দুইটি স্বতন্ত্র উৎস হইতে বাহির করা যাইতে পারে, দুইটি স্বতন্ত্র দিক হইতে আলোচিত হইতে পারে। ইতিহাস-রচয়িতা কোনও এক নির্দিষ্ট জাতি-বিশেষের মানব-হৃদয়ের অন্তস্তলে কিছুকাল ধরিয়া বা বহুযুগ ব্যাপিয়া অধিষ্ঠিত হইয়া, মানবহৃদয়ের অভ্যন্তরের সমস্ত ঘটনাপরম্পরা, সমস্ত পরিবর্ত্তন, সমস্ত বিপ্লব পর্য্যবেক্ষণ ও বর্ণনা করিতে পারেন; যখন তিনি শেষ সীমায় আসিয়া পৌছিবেন, তখন সে জাতির সে যুগের ইতিহাস তাঁহার রচিত হইয়া গেল। তিনি আর এক উপায় অবলম্বন করিতে পারেন। মানবহৃদয়ের অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট না হইয়া, তিনি সংসারের মাঝখানে দণ্ডায়মান হইতে পারেন। ব্যক্তিগত ভাবসমষ্টির বর্ণনা না করিয়া, তিনি সামাজিক অবস্থার বিষয়গুলির, ঘটনাবলীর বিচিত্র পরিবর্ত্তনের বর্ণনা করিতে পারেন। এই দুই অংশ, মানবসভ্যতার এই উভয়বিধ ইতিহাস, পরস্পরের সহিত অতি নিবিড়ভাবে সম্বদ্ধ। অথচ তাহাদিগকে পৃথক করা যাইতে পারে; বোধ হয়, তাহাদিগকে পৃথক করা উচিত (অন্ততঃ প্রারম্ভে), তাহা হইলে উভয়দিক পরিষ্কারভাবে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচিত হইতে পারে। আমি ত আপনাদের সহিত মানবহৃদয়ের অভ্যন্তরে সভ্যতার ইতিহাস আলোচনা করিতে চাহি না; বাহিরের ঘটনাবলীর ইতিহাস, পরিদৃশ্যমান সংসারের ইতিহাস লইয়া আমি ব্যাপৃত থাকিব। আমি ভাবিয়াছিলাম যে, সভ্যতার যত জটিলতা ও ব্যাপকতা আমি উপলব্ধি করিতে পারিয়াছি, তাহা সমগ্রভাবে আপনাদের সম্মুখে উপস্থাপিত করিব; যে সকল বড় বড় সমস্যা উত্থিত হয়, সেগুলি আপনাদের সম্মুখে বিবৃত করিব। আপাততঃ আমি নিজেকে সংযত করিতেছি; অপেক্ষাকৃত সঙ্কীর্ণ সীমার মধ্যে তত্ত্বানুসন্ধান করিতে চাহি; কেবলমাত্র সামাজিক অবস্থার আলোচনা করিবার অভিপ্রায় করিয়াছি।

আমরা প্রথমেই য়ুরোপীয় সভ্যতার অতি শৈশব কালের উপাদান-গুলির অন্বেষণ করিব; তখন রোমক সাম্রাজ্যের অধঃপতন হইয়াছে। সেই দেশবিশ্রুত ধ্বংসাবশেষের মধ্যে যে সমাজ ছিল, তাহা আমরা মনোযোগসহকারে আলোচনা করিব। তাহাকে পুনরুজ্জীবিত করিতে চেষ্টা করিব না; তাহার উপাদানগুলি পাশাপাশি স্থাপিত করিতে চেষ্টা করিব; স্থাপিত করা হইলে সেগুলিকে পরবর্ত্তী পঞ্চদশ শতাব্দের মধ্য দিয়া পরিচালিত করিয়া, তাহাদের ক্রমবিকাশের অনুসরণ করিবার প্রয়াস পাইব।

আমার বিশ্বাস যে, এই আলোচনায় কিয়দ্দূর অগ্রসর হইলে, আমাদের প্রতীতি জন্মিবে যে, সভ্যতা এখনও অতি নবীন; পৃথিবীর সমগ্র জীবনের পরিমাপ এখনও হয় নাই। নিশ্চয়ই মানুষের চিন্তাশক্তির যতদূর পরিণতি সম্ভবপর, তাহা সুদূরপরাহত; মানুষের সমগ্র ভবিষ্যৎ উপলব্ধি করিতে এখনও খুব বিলম্ব। যদি আমরা প্রত্যেকে হৃদয়ের গভীরতম প্রদেশে অবতরণ করিয়া, আপনা আপনি প্রশ্ন করি যে, আমরা চরমতম মঙ্গলের ধারণা বা আশা কতদূর পর্য্যন্ত করিতে পারিয়াছি; যদি আমাদের সেই ধারণার সহিত জগতের বাস্তব অবস্থার তুলনা করিয়া দেখি; তাহা হইলে, আমাদের স্থির বিশ্বাস জন্মিবে যে সমাজ ও সভ্যতা এখনও অত্যন্ত নবীন; যদিও তাহারা অনেকটা পথ অতিক্রম করিয়া আসিয়াছে, এখনও তাহাদের বহুদূর যাইতে হইবে। কিন্তু তজ্জন্য আমাদের বাস্তব অবস্থার আলোচনায় আনন্দের হ্রাস হইবে না। য়ুরোপের গত পঞ্চদশ শতাব্দীর সভ্যতার ইতিহাসের বড় বড় যুগান্তকারী ঘটনাগুলি যখন আপনাদের সম্মুখে উপস্থাপিত করিবার চেষ্টা করিব, আপনারা দেখিবেন যে, আমাদের একাল পর্য্যন্ত মানুষের বাহ্য অবস্থা ও আধ্যাত্মিক জীবন কি পর্য্যন্ত ক্লেশময় ও ঝটিকাসঙ্কুল হইয়া আসিয়াছে। এত শত বৎসর ধরিয়া মানব

জাতির সহিত মানবচিত্তও ব্যথিত হইয়াছে; আপনারা দেখিবেন যে, এতদিন পরে এই আধুনিক যুগে মানবচিত্ত কতকটা শান্তি ও সামঞ্জস্য লাভ করিয়াছে; এ অবস্থাটি এখনও খুব অপরিণত। সমাজেরও অবস্থা তদ্রূপ; বেশ দেখা যাইতেছে যে, সমাজ খুব উন্নতি করিয়াছে; মানুষের অবস্থা এখন অনেক অংশে পূর্ব্বাপেক্ষা ভাল। আমাদের পূর্ব্বপুরুষের কথা স্মরণ করিয়া, আমাদের নিজেদের প্রতি ল্যুক্রেশিয়সের কয়েক পংক্তি প্রয়োগ করিতে বোধ হয় পারি—"সমুদ্রতীরে নিশ্চিন্তভাবে দাঁড়াইয়া বাত্যাতাড়িত অর্ণবপোতগুলির বিপদ কল্পনা করিতে আরাম বোধ হয়" হোমরের স্থেনেলসের মত আমরাও বিশেষ অহঙ্কার না করিয়া বলিতে পারি,—"ভগবানকে ধন্যবাদ দি, যে আমরা আমাদের পূর্ব্বপুরুষের চেয়ে অনেক ভাল আছি।"

আমাদের সতর্ক হইতে হইবে, যেন আমরা আমাদের সুখের ও উন্নতির কল্পনায় বিভোর ও তন্ময় হইয়া না যাই; তাহা হইলে, আমরা যুগপৎ গর্ব্বের ও আলস্যের কবলে পতিত হইব; যতটুকু আলোক পাইয়াছি, তাহাতেই মানবচিত্তের শক্তি ও সাফল্য সম্বন্ধে বিশ্বাস অতিমাত্রায় জন্মিতে পারে; এবং সেই সঙ্গে একটা দৌর্ব্বল্য আসিতে পারে, যেটা অলস বিলাস-জনিত। আমার মনে হয় যে, আমরা সামান্য কারণে অভিযোগ করিতে যেমন পটু, তেমনি অকারণে সন্তুষ্ট হইতেও পারি; এই দুই অবস্থার মধ্যে আমাদের চিত্তবৃত্তি সদাই দোদুল্যমান। আমাদের একটা ভাবপ্রবণতা আছে; মানসিক আকাঙ্ক্ষার অসীমতা, কল্পনার চাঞ্চল্য আছে। কিন্তু যখনই কর্ম্মজীবনে আসিয়া পড়া যায়; ক্লেশ স্বীকারের জন্য, ত্যাগের জন্য, উদ্দেশ্য সিদ্ধির অভিপ্রায়ে প্রচেষ্টার জন্য আমরা আহূত হই, তখনই আমাদের বাহু অসাড় হইয়া পড়ে, আমরা হতাশ হইয়া কার্য্য হইতে বিরত হই; সাফল্যলাভের জন্য পূর্ব্বে যে অধৈর্য্য প্রকাশ

করিয়াছিলাম, কাজটা ছাড়িয়া দিবার জন্য এখন তদনুরূপ তৎপরতা দেখাইয়া থাকি। আমাদিগকে সতর্ক হইতে হইবে, যেন আমরা এই উভয়বিধ দৌর্ব্বল্যের নিকট পরাভব স্বীকার না করি। আমাদের শক্তি, সামর্থ্য ও জ্ঞানের প্রসার কতদূর, সে সম্বন্ধে যেন আমরা পূর্ব্বাহ্নেই একটা ঠিক হিসাব করিতে অভ্যস্ত হই। ন্যায়ানুমোদিত পন্থা অবলম্বন করিয়া, সভ্যতার মৌলিক সত্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া, যাহা পাওয়া যায় না, এমন জিনিসের দিকে যেন আমরা প্রধাবিত না হই। যে সকল জিনিষকে আমরা সাধারণতঃ হেয় বলিয়া ঘৃণা করি, সেইগুলিকেই সাদরে গ্রহণ করিবার প্রলোভন আমাদের মাঝে মাঝে হইয়া থাকে,—অসভ্য বর্ব্বর য়ুরোপের বলবত্তমের অধিকার, পশুশক্তি, অত্যাচার, মিথ্যাচরণ, যাহা চারি পাঁচ শত বৎসর পূর্ব্বে দৈনন্দিন জীবনের অঙ্গীভূত ছিল। কিন্তু যখনই আমরা মুহূর্ত্তের জন্য এই আকাঙ্ক্ষার বশবর্ত্তী হই, তখনই বুঝিতে পারি যে, সেই বর্ব্বরযুগের মানুষের মত অধ্যবসায় ও উদ্দাম উৎসাহ আমাদের নাই ; তাহারা নিজের অবস্থায় পীড়িত হইয়া স্বভাবতঃই মুক্তির জন্য উৎকণ্ঠিত হইয়া অনবরত চেষ্টা করিত। আমরা আজকাল আমাদের অবস্থায় পরিতৃপ্ত ; অপরিস্ফুট আকাঙ্ক্ষার বশবর্ত্তী হইয়া যেন আমরা সঙ্কটাপন্ন না হই ; সে সকল কামনার পরিতৃপ্তির সময় এখনও আসে নাই। অনেক জিনিষ আমরা পাইয়াছি বটে, আমাদের নিকট হইতে লোকে অনেক চাহিবে ; আমাদের উত্তর-পুরুষের কাছে আমাদের কার্য্যাবলীর কড়ায় গণ্ডায় হিসাব দিতে হইবে ; সামাজিক জীবন, রাষ্ট্রীয় পদ্ধতি, সমস্তই এখন তর্কের, পরীক্ষার, দায়িত্বের বিষয়ীভূত হইয়াছে। ন্যায়ানুগত্য, স্বাধীনতা, জনসাধারণে বিজ্ঞাপ্তি প্রভৃতি যে সকল মৌলিক ভাব লইয়া আমাদের সভ্যতা গড়িয়া উঠিয়াছে, আসুন আমরা সেইগুলিকে দৃঢ়তার সহিত, অবিচলিতভাবে, একনিষ্ঠভাবে ধরিয়া থাকি ; যেন ভুলিয়া না

যাই যে, আমরা যেমন চাই যে আমাদের তত্ত্বানুসন্ধিৎসার পরিতৃপ্তির জন্য যাবতীয় পদার্থ আমাদের সম্মুখে উন্মুক্ত থাকুক, তেমনই আমরাও এই সংসারের চক্ষু এড়াইতে পারি না ; আমরাও তাহার আলোচনার, বিচারের বিষয়ীভূত হইব।

সভ্যতা বনাম বর্ব্বরতা

বন্ধু প্রশ্ন করিলেন, " 'গীজোর ইতিহাস' তর্জ্জমা করিবার আর কি তুমি সময় পাইলে না? য়ুরোপীয় সভ্যতার বিশিষ্টতার জন্য যে গীজোর নিকট যাওয়া আবশ্যক, এ কথা তোমার হঠাৎ এখন মনে হইল কেন? আমাদের ব্রাহ্মণ্য-সভ্যতার প্রতি তিনি ত দেখিতেছি, বেশ একটু কটাক্ষ করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার এত সাধের য়ুরোপীয় সভ্যতার যে অগ্নি-পরীক্ষা হইতেছে, তাহার ফল কি দাঁড়ায়, তাহা দেখিবার জন্য আমার একটু ঔৎসুক্য জন্মিয়াছে।"

লেখক উত্তর করিলেন, "অনুবাদ যে সূত্রেই আরব্ধ হউক না কেন, পত্রিকায় প্রকাশ করিবার জন্য পাঁজিপুঁথি খুলিয়া, সময়-অসময় বিচার করিয়া দেখি নাই। তবে, নেহাৎ অসময় বলিয়া ত আমার মনে হয় না। এখন পাষণ্ড বর্ব্বরের হাতে য়ুরোপীয় সভ্যতা যায় যায় হইয়াছে, এই আশঙ্কায় অর্দ্ধজগৎ সন্ত্রস্ত। যদিই এই অগ্নি-পরীক্ষার ফলে য়ুরোপীয় সভ্যতার পাতালে প্রবেশ হয়, তাহা হইলে—"

বন্ধু বলিলেন,—"তাহা হইলে, গীজোর মুখে কিছু আশার বাণী শুনিতে পাইলেই বা কি আসে যায়? অশীতি বৎসর পূর্ব্বে তিনি কি বলিয়াছিলেন, তাহা শুনিয়া আমার লাভ কি?"

লেখক বিনীতভাবে নিবেদন করিলেন,—"না হয় তুমি সে কথা নাই শুনিলে। কিন্তু য়ুরোপীয় সভ্যতা বলিলে কি বুঝায়, তাহাও ত জানা আবশ্যক। তিরাশি বৎসর বয়সে, মৃত্যুশয্যায় শুইয়া, গীজো এই কয়েকটি কথা লিপিবদ্ধ করিয়া যাইতে পারিয়াছিলেন—'আমি পীড়িতা ধরিত্রী হইতে বিদায় লইতেছি। আবার কি ইহার নবজীবন হইবে?' আমি

জানি না, কিন্তু আমি বিশ্বাস করি—হইবে।' (Je laisse le monde bien trouble. Comment renaitra-il ? Je l'ignore, mais j'y crois.) এই যে বেদনাপূর্ণ করুণধ্বনি,—

'আবার কবে, ধরণী হবে
তরুণা ?'

"বৃদ্ধের হৃদয়-বীণায় ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিয়াছিল, তাহা ভগ্নহৃদয়ের বিলাপের সুরে নহে ; তাহার পশ্চাতে সাধকের একান্ত-বিশ্বাসের বল অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে ; চারিদিকে বিভীষিকা, কিন্তু মন বলিতেছে—'আসিবে সে দিন, আসিবে'। নর্ম্মাণ্ডির অন্তঃপাতী গ্রামের মধ্যে বিজন কক্ষে শয়ন করিয়া, কর্ম্মক্লান্ত জীবনের অবসানকালে একবার তিনি তাঁহার চারিদিকের ঘন অন্ধকার দেখিয়া শিহরিয়া উঠিয়াছিলেন।—গ্র্যাভ্‌লট্‌, মেট্‌জ্‌, সেডান্‌, প্যারিস ! ফ্রান্স যদি দৈত্যকর্ত্তৃক নির্য্যাতিত হইয়া আত্মবিস্মৃত হইয়া পড়ে, তাহা হইলে য়ুরোপীয় সভ্যতাকে সঞ্জীবিত করিয়া রাখিবে কে ? বারংবার প্রশ্ন হইতেছে,—'আবার কবে, ধরণী হবে তরুণা ?' কবে হবে তাহা আমি জানি না ; কিন্তু আমার একান্ত বিশ্বাস আছে,—হবে।"

বন্ধু হাসিয়া বলিলেন,—"তোমারই ভাষায় তোমার কথার একটা পালটা জবাব দিতেছি। দৈত্য নির্য্যাতিত ফ্রান্স আত্মবিস্মৃত হইলে, য়ুরোপীয় সভ্যতাকে সঞ্জীবিত করিয়া রাখিবে কে ? দেখ, ১৮৭০ সালে ১৯এ জুলাই বেলা পৌনে দুইটার সময় ফরাসী-সম্রাট্‌ তৃতীয় নেপোলীয়ন সমর ঘোষণা করিলেন। যে দৈত্যের কথা বলিতেছ, সেই দৈত্যগুরু বিস্‌মার্ক, তাহার তিন মাস পূর্ব্বে 'কোয়ল্‌নিশ্‌ জাইটাঙ্গ' (Kolnische Zeitung) পত্রিকায় লিখাইয়াছিলেন,—ফরাসীরা অধঃপাতে গিয়াছে ; বহুপুরুষ পরে তাহারা সাম্‌লাইয়া উঠিতে পারে ; দুর্ভাগ্যবশতঃ সমস্ত য়ুরোপেরই অবনতি হইয়াছে।—('The French show themselves

to be a decadent nation, and not the least in their manners. It will require generations, to recover the ground they have lost. Unfortunately, so far as manners are concerned, all Europe has retrograded.') এখন ব্যাপারটা কি দাঁড়াইল, ভাবিয়া দেখ। গীজো বলিতেছেন—'Comment renaitra-t-il'?—'আবার কবে ধরণী হবে তরুণা?' বিস্‌মার্ক উত্তর দিতেছেন,—'It will require generations, to recover the ground they have lost.' ফরাসী অধঃপাতে গিয়াছে। আভাসে যেন বলা হইল, য়ুরোপীয় সভ্যতাকে সঞ্জীবিত করিবার জন্য যে মন্ত্র আবশ্যক, সেই সঞ্জীবনী-মন্ত্র একমাত্র দৈত্যগুরু বিস্‌মার্কের জানা আছে;—'All Europe has retrograded.'

লেখক হাসিয়া বলিলেন—"ফরাসী অধঃপাতে গিয়াছে? বিস্মার্ক এই কথা প্রচার করিয়াছেন! বিস্মার্কের জন্মভূমি ফরাসীর কাছে কতদূর ঋণী, তাহা বোধ হয় তিনি বিস্মৃত হয়েন নাই। শার্ল্‌মানের সময় হইতে আরম্ভ করিয়া উইল্‌হেল্‌মের সময় পর্য্যন্ত, সহস্র বৎসরব্যাপী জর্ম্মণির ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে এই ঋণের বোঝার গুরুত্ব কতকটা উপলব্ধি করিতে পারা যায়। জর্ম্মণ জাতির সর্ব্বপ্রথম বিশ্ববিদ্যালয় যখন প্রাগ্ (Prague) নগরে প্রতিষ্ঠিত হয়, প্যারিস্ য়ুনিভার্সিটির সমস্ত নিয়মাবলি সেখানে গোড়া হইতেই অনুষ্ঠানের অঙ্গীভূত করিয়া লওয়া হইল। আজ কিন্তু, য়ুরোপীয় সভ্যতার দোহাই দিয়া, জর্ম্মণির বিশ্ববিদ্যালয়গুলির অধ্যাপক-বর্গ ফ্রান্সের বিরুদ্ধে কি না বলিতেছেন! যে হোহেনজোলার্ণ্ রাজা ফ্রেড্রিক প্রুসিয়াকে য়ুরোপের রাষ্ট্রপুঞ্জের মধ্যে প্রথম শ্রেণীতে উন্নীত করিয়াছিলেন, তিনি কায়মনোবাক্যে নিজেকে ফরাসী বলিয়া পরিচয় দিতে গর্ব্ব অনুভব করিতেন। আর আজ অধঃপতিত য়ুরোপকে শিক্ষা

দিবার জন্য বুঝি নিট্‌শের (Nietzsche) অতিমানুষ (superman) জর্ম্মণির কৈশররূপে অবতীর্ণ হইয়া বর্ব্বরের হাত হইতে য়ুরোপীয় সভ্যতাকে রক্ষা করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন ! তুমি কি বল যে, নিট্‌শের শক্তিমন্ত্র—Will to power—পাশ্চাত্য সভ্যতার মূলমন্ত্র হইবে ?"

বন্ধু বলিলেন—'য়ুরোপীয় জনকতক পণ্ডিতের কথায় সায় দিয়া তুমিও নিট্‌শেকে দোষী করিতেছ ? তুমি কি ভুলিয়া গেলে যে, যদি কেহ জর্ম্মণির বৈশ্য-সভ্যতার তীব্র প্রতিবাদ করিয়া থাকে, জর্ম্মণিকে গালাগালি দিয়া থাকে—,

লেখক বলিলেন—"সে নিট্‌শে। এই ত তুমি বলিতে চাও ? বেচারা গালি দিতে দিতে, প্রতিবাদ করিতে করিতে, বিকৃতমস্তিষ্ক হইয়া গেল বলিয়া বোধ হয় তোমার আক্ষেপের পরিসীমা নাই। যে মাটির পুতুল গড়িয়া জর্ম্মণ সমাজ খেলা করিতেছিল, প্রমিথিয়স্-পন্থাবলম্বী নিট্‌শে কোন্ স্বর্গ হইতে অগ্নিকণা অপহরণ করিয়া, সেই পুত্তলিকার প্রাণসঞ্চার করিবার চেষ্টা দেখাইতে গিয়া, কোন্ দেবতার কোপে পাগল হইয়া গেলেন ! ডারুয়িন বলিয়াছিলেন—'জীবজগতে যেটি সর্ব্ব-প্রথম এবং সর্ব্বপ্রধান সত্য, সেটি আর কিছু নহে—বাঁচিয়া থাকিবার ইচ্ছা (Will to live)'। নিট্‌শে বলিলেন, 'এ শাস্ত্র মানবেতর জীবের শাস্ত্র হইতে পারে, ইতর মানবেরও শাস্ত্ররূপে পরিগণিত হইয়া আসিয়াছে ; কিন্তু শুধু বাঁচিয়া থাকিবার ইচ্ছাই সর্ব্বোচ্চ-শ্রেণীর মানবের প্রধানতম বৃত্তি হইতে পারে না ; প্রকৃত মনুষ্যত্ব-প্রয়াসী ব্যক্তি মাত্রই, এই কাপুরুষের ধর্ম্মকে দূরে পরিহার করিয়া, শক্তিমান্ হইবার ইচ্ছা হৃদয়ে পোষণ করিবে।' 'এই 'will to power' এর বিকাশ করিতে হইলে,' শুধু অন্ধ জীবন-সংগ্রামে পারিপার্শ্বিক অবস্থাকে কোনও রূপে এড়াইয়া, আত্মরক্ষার চেষ্টা দেখিলে চলিবে না ; প্রকৃতির উপর, মানব-সমাজের উপর নির্ম্মমভাবে আত্মপ্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। 'আত্ম-

সংযমে কোনও মাহাত্ম্য নাই ; পরকে পরাজিত না করিতে পারিলে সুখ কোথায়? মানবের লৌকিক ধর্ম্ম এতদিন তাহাকে সঙ্কুচিত করিয়া রাখিয়াছে মাত্র। তাহার আত্ম-সম্প্রসারণ আবশ্যক। অতএব যুদ্ধ আবশ্যক।' তুমি বলিতেছ, নিট্‌শে জর্ম্মণিকে গালি দিয়াছেন ; তাহার অর্থ আর কিছুই নহে,—জর্ম্মণির খৃষ্টীয় culture ও বণিগ্‌বৃত্তি তাঁহার পক্ষে অত্যন্ত পীড়াদায়ক হইয়াছিল। যে মার্টিন্ লুথার যুদ্ধকে খাওয়া-পরার মত অত্যন্ত-আবশ্যক ঐশ্বরিক ব্যবস্থা বলিয়া প্রচার করিয়াছিলেন, সেই লুথারকেও নিট্‌শে অবজ্ঞার চক্ষে দেখিতেন ; কেন না, লুথার খৃষ্টীয় ধর্ম্মটাকে লইয়া অত বাড়াবাড়ি করিলেন। যে ধর্ম্ম মানুষকে শিক্ষা দেয় যে এক গালে চড় মারিলে অন্য গালটীও ফিরাইয়া দিতে হইবে, সে ধর্ম্ম ত হীন ক্রীতদাসের ধর্ম্ম। নিট্‌শে যেন বলিতেছেন,—'ধিক্ লুথারকে! এই ধর্ম্ম লইয়া উহারা জগৎটাকে তোল্‌পাড়্ করিয়া তুলিল।' নিট্‌শে তাঁহার স্বদেশবাসীকে অনেক কটু কথা শুনাইয়া দিলেন ; কিন্তু তাঁহার শক্তিমন্ত্র, তাঁহার স্বদেশবাসীর মূলমন্ত্র দাঁড়াইয়া গেল। তিনি যে অভাব রাখিয়া গেলেন, ট্রাইট্‌যেক তাহা পূরণ করিয়া দিল ; ট্রাইট্‌যেক স্বদেশপ্রীতি ও ইংরাজবিদ্বেষ জর্ম্মণির মজ্জাগত হইয়া গেল। এই সব জানিয়াশুনিয়াও যদি নিট্‌শের দায়িত্বের কথা আলোচনা না করা যায়, নিট্‌শেকে দোষী বলিয়া সাব্যস্ত না করা যায়, তাহা হইলেই কি সত্যের মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ থাকিয়া যায়? নিট্‌শের শক্তিমন্ত্রে জর্ম্মণির মহাদ্রুমে সবুজপত্র গজাইয়া উঠিল। আজ বিশ্বের মানব সভয়ে চকিত হইয়া দেখিতেছে,—সেই সবুজ পত্রের অভিযান!

"বিস্‌মার্ক বলিয়াছিলেন যে, ফ্রান্স অধঃপাতে গিয়াছে! ইংরাজ-সাহিত্যিক এড্‌মণ্ড্ গস্ (Edmund Gosse) বলিতেছেন,—'ফরাসী-প্রতিভা কখনও বিনষ্ট হইতে পারে না।' ফ্রান্সের নব-অভ্যুদয় হইবে, গীজোর যেমন বিশ্বাস জীবনের শেষমুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত ছিল, এই ইংরাজ সাহিত্যিকেরও

সেই বিশ্বাস খুব প্রবল। তিনি বলিতেছেন—'But for the ultimate salvation of France, he would be a cowardly pessimist who should doubt for a moment. If the lovely provinces from Dunkirk to St. Jean de Luz, from Brest to Menton, were wholly overrun by barbarians, if everything we have honoured and delighted in were obscured, and if the lamp lay shattered in the dust, still the world would not despair for France. In the last hour, the horn of Roland must sound from the dark gorge of Roncevaux, and angels must descend from heaven with vengeance against the enemies of France and God.' গীজোও শেষপর্য্যন্ত হতাশ হয়েন নাই; শেষমুহূর্ত্তে বন্ধুবান্ধবগণকেও হতাশ হইতে নিষেধ করিয়াছিলেন—"Dites-le je vous prie, a mes amis ; je n'aime pas a les savoir decourages." ১৮৭৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসে এই আশার বাণী শুনাইয়া, তিনি মানবলীলা সংবরণ করিলেন; ১৯১৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসে আততায়ী জর্ম্মণসৈন্য Rheims Cathedral ভস্মীভূত করিল। আজ কিন্তু সমগ্র ফরাসীজাতি বৃদ্ধ গীজোর কথা ভক্তিভরে স্মরণ করিতেছে। তাঁহার বিশ্বাস ছিল,—'আসিবে সে দিন, আসিবে;' ফ্রান্স ভাবিতেছে,—সেই দিন আসিয়াছে।

'অনেক দিন, পরাণ-হীন
ধরণী,—
বসনাবৃত খাঁচার মত
তামস-ঘন বরণী।'

"আজ 'ঈষৎ ত্রাসের তড়িৎ-চমকে' প্রাণহীনা ধরণী চঞ্চলা হইয়া উঠিয়াছে; স্রস্তবসনা খাঁচার গায়ে বিদ্যুৎ খেলিতেছে; অন্ধকার কাটিয়া যাইবে। ১৮৭১ সাল হইতে সে দিন গণিতেছে; কে তাহার ব্রত উদ্‌যাপন করিবে? কবে তাহার ব্রত সফল হইবে? কত ভয়ে ভয়ে তাহাকে চলিতে হইয়াছে, পাছে সে আত্মবিস্মৃত হইয়া যায়। ছেলে বেলায় হরিশ্চন্দ্র নাটকের যাত্রাভিনয় দেখিয়াছিলে, মনে পড়ে কি? সেই 'রাজা যাওয়া, রাণী যাওয়া, প্রাণের কমল যাওয়া?' নেপোলীয়ন্ গেলেন, সম্রাজ্ঞী ইউজেনী প্রবাসিনী হইলেন, ফরাসীর রাজসিংহাসনের কমল দল—fleur de lys—পাষণ্ড বর্ব্বর পদদলিত করিল।"

বন্ধু বলিলেন—"মনে পড়ে বৈ কি? খগা পাগ্‌লার কথা মনে পড়ে,—'উঃ, কি কুচুটে বিষ!' ফরাসীর জাতীয় জীবনপাত্রে কে সেই কুচুটে বিষ ঢালিয়াছিল? বিস্‌মার্ক? নিট্‌শের শক্তিমন্ত্র তখনও ত ফরাসীকে সন্ত্রস্ত করে নাই। বিলাসিনী ফ্রান্স, বিলাস-বিভ্রমের ভিতর দিয়া, তাহার সমস্ত জাতীয় জীবনের শক্তিটাকে সুরার মত নিঃশেষে পান করিয়া, আপনার মধ্যে সংহরণ করিয়া লইল;

'শেষে শ্রান্ত শয়নে অবশ পরাণ,
আলস রসে
আবেশ বশে;
পরশ করিলে জাগে না সে আর!
কুসুমের হার লাগে গুরুভার,
ঘুমে জাগরণে মিশি একাকার
নিশি-দিবসে,
বেদনা-বিহীন অসার বিরাগ মানসে পশে
আবেশ বশে।'

"তুমি বলিতেছ, সে ১৮৭১ সাল হইতে দিন গণিতেছে। তোমার এই বঙ্কিমি ভাষার অতিশয়োক্তি আমি ক্ষমা করিতে পারি; কিন্তু একথাটা মানিয়া লইতে আমি প্রস্তুত নহি। তাহা হইলে ম্যাল্থসের নির্দ্দিষ্ট পন্থা অবলম্বন করিয়া, সে নিজের ও য়ুরোপীয় সভ্যতার সর্ব্বনাশের জন্য বদ্ধপরিকর হইত না। ১৮৭১ সালে তাহার লোকসংখ্যা ছিল—প্রায় চার কোটি; ১৯১০ সালে দেখা গেল, তাহার লোকসংখ্যা কিঞ্চিদূন চারি কোটি মাত্র! ১৮৭১ সালে জর্ম্মণির লোকসংখ্যাও প্রায় চারি কোটি ছিল; ১৯১০ সালে তাহার লোকসংখ্যা প্রায় সাত কোটি দাঁড়াইল! এখন বল দেখি, জাতীয় ব্রত-উদ্‌যোপন করিবার কি এই প্রকৃষ্ট উপায়? ফ্রান্স যদি বিশ লক্ষ সৈন্য যুদ্ধক্ষেত্রে সমবেত করিতে পারে, জর্ম্মাণ যে চল্লিশ লক্ষ সৈন্য আনিয়া ফেলিবে, তাহা আর বিচিত্র কি? তুমি বলিতেছ, সে ভয়ে ভয়ে চলিতেছে—পাছে সে আত্মবিস্মৃত হয়। একদিন ছিল বটে, যখন Bourbon-বংশ নূতন কিছু সহজে শিখিত না, পুরাতনও কিছু সহজে বিস্মৃত হইত না। আজ, সেই বংশলোপের সঙ্গে সঙ্গে, স্মৃতিলোপও হইয়াছে। ষোলবৎসর পূর্ব্বেও তাহার রণতরীর সংখ্যা কেবলমাত্র ইংলণ্ডের অপেক্ষা ন্যূন ছিল; এখন জর্ম্মণি ও মার্কিণ তাহাকে পশ্চাতে ফেলিয়া অগ্রসর হইয়াছে। তালিকা দেখিলেই তুমি বুঝিতে পারিবে, শ্রাদ্ধ কতদূর গড়াইয়াছে;—

	ইংলণ্ড	জর্ম্মণি	ফ্রান্স	অষ্ট্রিয়া
বৃহত্তম রণতরী—	৩১	১৬	৪	৩
দ্বিতীয় শ্রেণীর ঐ—	৪০	২০	১৮	৬
বড় ক্রুজার—	৩৪	৯	২০	২
ছোট ঐ—	৭৪	৪১	৯	৫

অন্যান্য জাহাজের কথা ছাড়িয়া দিই। জর্ম্মণির কৈসর বলিলেন—'জর্ম্ম-

'জর্ম্মণির ভবিষ্যৎ সমুদ্রের উপর প্রসারিত'—অমনি যেন যাদুমন্ত্রে এই কয় বৎসরের মধ্যে এত বড় নৌ-বাহিনী গড়িয়া উঠিল। জর্ম্মণির প্রথম নৌ-বিধি Navy Law প্রচারিত হয় ১৮৯৮ সালে; এই ১৬ বৎসরের মধ্যে সে ষোলখানা Dreadnought জাহাজ ভাসাইয়াছে; লক্ষাধিক নাবিককে প্রস্তুত করিয়াছে; Kiel খাল খনন করিয়া, বল্‌টিক্-সাগরের সহিত জর্ম্মণ-সাগরের যোগসাধন করিয়াছে; জগতের সর্ব্বত্র উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছে। কে আত্মবিস্মৃত হয় নাই? ফ্রান্স, না জর্ম্মণি?"

লেখক বলিলেন,—"রোমান্‌দের সময়ে জর্ম্মণি যে বর্ব্বর ছিল, আজও সে সেই-বর্ব্বর রহিয়া গেল; সেদিক দিয়া দেখিলে, আমি অবশ্যই স্বীকার করিব যে, জর্ম্মণি আত্মবিস্মৃত হয় নাই। এখন কিন্তু সে নূতন ধুয়া ধরিয়াছে। সে বলিতেছে যে 'সভ্যতার অনুরোধে, সত্যের অনুরোধে, সে অস্ত্রধারণ করিয়াছে।' জর্ম্মণ Kultur সমগ্র মানবসমাজে প্রসারিত না হইলে, সত্যের প্রতিষ্ঠা হইবে না—ধর্ম্মরাজ্য স্থাপিত হইবে না।—মানবসভ্যতা জর্ম্মণ্য-ভাব প্রণোদিত হইবে; পৃথিবীর উপরে জর্ম্মণ এক-মাত্র World-Race হইয়া দাঁড়াইবে; নতুবা মানবসমাজ যে তিমিরে সেই তিমিরেই থাকিয়া যাইবে। অধ্যাপক ক্র্যাম্ব লিখিতেছেন—'The triumph of the Empire will be the triumph of the German culture, of the German world-vision in all the phases and departments in human life and energy,—in religion, poetry, art, politics and social endeavour. The characteristics of this German world-vision, the benefits which its predominance is likely to confer npon mankind, are, a German would allege, truth instead of falsehood in the deepest preoccupation

of the human mind.'—অসত্যকে দূর করিতে হইবে; সত্যের প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে; তাই বোধ হয় জর্ম্মণির 'super-man' কৈসর উইল্‌হেল্‌ম্ সত্যের ভেরি বাজাইয়াছেন,—

'তোমার শঙ্খ ধূলায় পড়ে
কেমন করে সইব?'

"তাই তিনি জগতে সত্যের ধ্বজা উড়াইয়াছেন; সেই পতাকা বহন করিবার জন্য কিন্তু দুর্ব্বল ভীরুর মত ভগবানের কাছে আবেদন করেন নাই—'বহিবারে দাও শকতি।' ভগবান যে তাঁহার হাত-ধরা! ফন্ মল্টকে বলিলেন—'ভগবানের রাজ্যে যুদ্ধ আবশ্যক';

ফন্ বুএলো বলিলেন—'যুদ্ধ আবশ্যক';

নিট্‌শে বলিলেন—'will to power-মন্ত্র সাধনা কর';

ট্রাইট্‌স্কে বলিলেন—'বৈশ্য-বণিক ইংরাজ জর্ম্মণ-সভ্যতা বিস্তারের প্রধান অন্তরায়; ইংরাজ-বিদ্বেষ সমস্ত জর্ম্মণজাতির মজ্জাগত করিয়া দাও';

বার্ণার্ডি বলিলেন—'আলোচনা করিয়া দেখা যাউক, ভবিষ্যতে জর্ম্মণি কেমন করিয়া যুদ্ধ করিলে জয়লাভ করিতে পারে';

ক্রুপ বলিলেন—'আমি অস্ত্র-শস্ত্র গড়িয়া দিতেছি;

জেপেলিন্ বলিলেন—'মেঘের অন্তরাল হইতে যুদ্ধ করিবার ব্যবস্থা আমি করিয়া দিতেছি;

ফন ট্রাপিটজ বলিলেন—'আমি এমন নৌ-বাহিনী প্রস্তুত করিয়া দিব যে, ইংরাজ তাহাকে আক্রমণ করিতে ইতস্ততঃ করিবে।'

"হাঁ, এক হিসাবে সে আত্মবিস্মৃত হয় নাই। সাম্রাজ্য-প্রতিষ্ঠার আরম্ভ হইতে সে যে গন্তব্য পথে অগ্রসর হইয়াছিল, তাহার শেষসীমায় না পৌঁছিয়া সে বিরত হইবে না। ছেলেবেলায় একটি রূপকথা মনে পড়িয়া

গেল।—রাজপুত্র, কোটালের পুত্র, মন্ত্রিপুত্র, ও সওদাগরের পুত্র মৃগয়া করিতে গেলেন। অনেকদূর গিয়া, একটা বিস্তীর্ণ প্রান্তরে অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া, তাঁহারা দেখিতে পাইলেন যে, কতকগুলা অস্থিখণ্ড ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে। কোটালের পুত্র বলিলেন—'আমি এমন বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছি যে, মন্ত্রবলে এই পশুর যেখানে যত হাড় আছে, সব একত্র করিতে পারি।' সকলে অনুরোধ করিলেন; তিনি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন। সওদাগরের পুত্র বলিলেন—'আমি এইগুলিকে পশুর কঙ্কালে পরিণত করিতে পারি।' তাহাই করা হইল। মন্ত্রিপুত্র বলিলেন—'আমি ইহাকে রক্ত-মাংস-মেদ-মজ্জা দিতে পারি' পশুটা একটা প্রকাণ্ড ব্যাঘ্রের আকার ধারণ করিল। রাজপুত্র বলিলেন—'আমি ইহার মধ্যে প্রাণ-সঞ্চার করিতে পারি।' তখন সকলে বলিলেন 'দাঁড়াও, আমরা এই গাছের উপরে উঠি।' প্রাণ পাইয়া ব্যাঘ্র, ভীষণ গর্জ্জন করিয়া, এক লম্ফে রাজপুত্রকে আক্রমণ করিল। তালপাতার খাঁড়ায় রাজপুত্র তাহাকে সংহার করিলেন।—ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত উত্তর-জর্ম্মণ ও দক্ষিণ-জর্ম্মণ Confederationএর ছোটবড় রাষ্ট্রগুলিকে বিরাট্ জর্ম্মণ সাম্রাজ্যে পরিণত করিয়া, মন্ত্রিপুত্র বিস্‌মার্ক স্বর্গারোহণ করিলেন; রাজপুত্র উইল্‌হেল্‌ম্ তাহাতে প্রাণসঞ্চার করিলেন;—জর্ম্মণজাতিকে বিনষ্ট না করিয়া, সে নিরস্ত হইবে না। তাঁহার mailed fistরূপ তালপাতার খাঁড়া তাঁহার Hohenzollernবংশকে এই উন্মত্ত পশুর হাত হইতে রক্ষা করিতে পারিবে কি? খ্রীষ্টাব্দ ১৪১৫ হইতে খ্রীষ্টাব্দ ১৯১৪ পর্য্যন্ত, পাঁচশত বৎসর ধরিয়া, হোহেনজোলার্ণ বংশ য়ুরোপের রঙ্গমঞ্চে যে বিচিত্র অভিনয় করিয়াছে, আজ কি তাহার পর্য্যবসান?

"দুইশত বৎসর ধরিয়া প্রুসিয়ার হোহেনজোলার্ণ রুসিয়ার রোম্যানফ্‌কে মন্ত্রমুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল। পীটর্ হইতে আরম্ভ করিয়া নিকোলস্

পর্য্যন্ত প্রায় সমস্ত রোম্যানফ্ সম্রাট্ জর্ম্মণ্যভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া আসিতেছিলেন। জর্ম্মণভাষার অনুকরণে পীটর নিজের রাজধানীর নাম রাখিলেন—'পীটর্স্ বর্গ।' এত দিন পরে, গত পহেলা সেপ্টম্বরে তাহার স্লাভ নাম হইল—'পেট্রোগ্রাড্'। উনবিংশ শতাব্দীতে, পুস্কিণ হইতে আরম্ভ করিয়া ডষ্টয়েভ্স্কী পর্য্যন্ত অধিকাংশ প্রতিভাবান রুষীয় সাহিত্যিক স্বদেশের মাহাত্ম্যে দেশের লোকের শ্রদ্ধা জাগাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। স্বদেশের কথা লইয়াই টুর্গেনিফের সহিত ডষ্টয়েভ্স্কীর বিষম বিরোধ হইল। তাঁহার একখানা চিঠিতে প্রকাশ যে, টুর্গেনিফ তাঁহাকে বলিয়াছিলেন যে, 'যদি একটা ভূকম্পে রুষিয়া নষ্ট হইয়া পৃথিবী হইতে অন্তর্হিত হয়, তাহাতে মানবজাতির কোনও ক্ষতি নাই; কেহ তাহার খবরও লইবে কি না সন্দেহ। রুষজাতি চিরকাল জর্ম্মণদিগের পদতলে ধূলায় লুটাইবে। স্বাধীন রুষীয় Cultureএর প্রতিষ্ঠা করিতে চেষ্টা করা বাতুলতা মাত্র!' ডষ্টয়েভ্স্কী বলিতেন—'য়ুরোপের শেষ আধ্যাত্মিক হিসাব-নিকাশ রুষিয়াতে হইবে; রুষিয়ার Orthodox ধর্ম্মের ভিতর হইতে এক জন নবীন খ্রীষ্টের আবির্ভাব হইবে।' এমনই করিয়া স্লাভের সঙ্গে জর্ম্মণের ভাবদ্বন্দ্ব উৎকটভাবে দেখা দিল। আজ, প্রধানতঃ এই স্লাভ-টিউটনের দ্বন্দ্বে, এই দিক্ দিয়া ব্যাপারটা স্পষ্ট করিয়া উপলব্ধি করিবার চেষ্টা করা আবশ্যক।

"উনবিংশ শতাব্দীতে ইংলণ্ডে জর্ম্মণ-প্রভাব কেমন করিয়া প্রসার লাভ করিয়াছিল, তাহা ইংরাজী-সাহিত্যসেবীমাত্রেই জানেন। আবার জ্ঞাতিকুটুম্ব হিসাবে য়ুরোপের অধিকাংশ রাজন্যবর্গ আপনাদিগকে জর্ম্মণ বলিয়া মনে করিতে পারেন। ইংলণ্ডের 'নেশন' পত্রিকায় এই যুদ্ধ সম্বন্ধে মিঃ বার্ণার্ড শ'র একখানা খোলা-চিঠি প্রকাশিত হইয়াছে; তিনি আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্টকে লিখিতেছেন—

'A war waged formally between the German Kaiser, the German Tsar, the German King of Belgians, the German King of England, the German Emperor of Austria, and a gentleman who shares with you the distinction of not being related to any of them, and is, therefore, describable monarchially as one Poincaré, a Frenchman'! এখন দেখা যাইতেছে যে, এই মহাকুরুক্ষেত্র একটা প্রকাণ্ড জ্ঞাতিবিরোধ।"

বন্ধু জিজ্ঞাসা করিলেন—"স্লাভ-টিউটনের দ্বন্দ্ব বুঝিতে পারি; ফ্রান্স-জর্ম্মণের বিরোধ ইতিহাসের জিনিষ হইয়া দাঁড়াইয়াছে।—ইংলণ্ড কেন যুদ্ধে নামিলেন?"

লেখক উত্তর করিলেন—"লর্ড কিচনার বলিয়াছেন, ইংলণ্ড আত্মরক্ষার জন্য যুদ্ধ করিতেছে। কিন্তু ইংলণ্ডের আসল কথাটা আমি ওথেলোর ভাষায় বুঝাইতে পারি—

'She is protrectress of her honour too;
Can she give that away?'

"এই কথাটা জর্ম্মণ গোড়া হইতেই বুঝিবার চেষ্টা করে নাই। এক টুক্‌রা কাগজের জন্ত ইংরাজ সহসা যুদ্ধের আসরে নামিবেন! ইম্পিরিয়াল চান্সেলর্ বিস্মিত হইয়া ইংরাজ প্রতিনিধি গোশেনকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'এই যুদ্ধে কত বলক্ষয় ও ধনক্ষয় হইবে, তাহা আপনারা হিসাব করিয়া দেখিয়াছেন কি?' গোশেন ধীরভাবে দৃঢ়স্বরে উত্তর করিলেন—'যেখানে সমস্ত ইংরাজজাতির মান লইয়া টানাটানি পড়ে, সেখানে আমরা লাভ-লোকসানের হিসাব করিয়া কাজ করি না।' ক্ষত্রিয় তেজোদৃপ্ত জর্ম্মণ অবাক্ হইয়া গেল। বৈশ্য-বণিক-ইংরাজ লাভ-লোকসানের খতিয়ান

করে না! Honourএর জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ইংরাজ বেল্‌জিয়ম্‌কে রক্ষা করিতে কৃতসঙ্কল্প! প্রিন্স লিক্‌নোস্কি এ কথাটা ঘুণাক্ষরেও যদি আগে জানিতে পারিতেন! কিন্তু এখন উপায় নাই, উপায় নাই! এতক্ষণে বোধ হয় জর্ম্মণির সীমান্ত-রেখা অতিক্রম করিয়া জর্ম্মণসৈন্য বেলজিয়মে পদার্পণ করিয়াছে! 'এখন ফিরাবে তারে কিসের ছলে?' ইংরাজ যুদ্ধ-ঘোষণা করিলেন। এই ইংরাজ-জর্ম্মণের বিরোধে যে ভাবদ্বন্দ্ব প্রকট হইয়া উঠিয়াছে, এইদিক দিয়া মহাকুরুক্ষেত্রের ব্যাপারটা আলোচনা করিলে, 'সভ্যতা বনাম বর্ব্বরতা' সমস্যার মর্ম্মস্থানে পৌঁছিতে পারিবে।'

বন্ধু জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তবে লর্ড কিচনারের আত্মরক্ষার্থ যুদ্ধের অর্থ কি?"

লেখক বলিলেন,—"একজন প্রসিদ্ধ জর্ম্মণলেখকের ভাষায় ইহার অর্থ বুঝাইয়া দিতে পারি। Herr Harden সম্প্রতি একটি প্রবন্ধে লিখিয়াছেন,—'কেন জর্ম্মণি এই যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছে, সে সম্বন্ধে লুকাচুরি করার দরকার নাই। আমরা সমগ্রজাতি যে, সহসা আমাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে এই যুদ্ধে নামিয়াছি, তাহা নহে। এ যুদ্ধ আমাদের অভীপ্সিত; আমরা য়ুরোপের বিচারাসনের সম্মুখে দাঁড়াইতে চাহি না। জর্ম্মণি আঘাত করিবে; কেন না সে মনে করে যে, পৃথিবীতে নড়িবার-চড়িবার একটু জায়গায় তাহার ন্যায়সঙ্গত দাবি আছে। জর্ম্মণি প্রধানতম শক্তির স্থান অধিকার করিতে চায়;—বেলজিয়ম্‌ তাহার অধিকারে থাকিবে; ক্যালে পর্য্যন্ত সমুদ্রতীরবর্ত্তী খানিকটা জমি তাহার দখলে থাকিবে; তাহার পতাকা ইংলিশ চ্যানেলের উপরে উড়িবে;—এই টুকু হইলেই সে যুদ্ধ হইতে বিরত হইবে।' জর্ম্মণির ভাবগতিক দেখিয়া ইংলণ্ডের সমর-সচিব প্রথম হইতেই এ কথাটা হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন।

এই দিক হইতে এই মহাকুরুক্ষেত্রের আলোচনা করিলেও 'সভ্যতা বনাম বর্ব্বতা' সমস্যার উপর অনেকটা রশ্মিপাত হইবে।

'ইংলণ্ডের উপর জর্ম্মণির আক্রোশের মূলে কেবলমাত্র ক্ষত্রিয়বৈশ্য-ভাব-সংঘর্ষের আভাস পাওয়া যায়,—এমন কথা মনে করিলে ভুল হইবে। জর্ম্মণির ক্ষাত্রধর্ম্ম Militarismই বল, আর নৌ-বিধি Navy Law বল, উহার উদ্দেশ্য আর কিছুই নহে,—ইংরাজের মত বৈশ্যসভ্যতার কেন্দ্রস্থান অধিকার করিয়া বসিতে হইবে। এই কথাটা 'নর্থ্ আমেরিকান্ রিভিউ' পত্রিকায় একজন লেখক বেশ ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। তিনি বলেন,—'এ যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী। ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের বৈশ্য-সভ্যতার লক্ষ্মীকে জর্ম্মণির অঙ্কশায়িনী করিতে হইলে, যুদ্ধ ব্যতীত গত্যন্তর নাই। ইংলণ্ডকে সম্পূর্ণ জখম না করিলে, আফ্রিকা ও এসিয়ার জলপথে তাহার অভিষ্ট সিদ্ধ হইবে না। যেসকল জাতির শিরায় জর্ম্মণ্-রক্ত প্রবাহিত হইতেছে, তাহাদিগকে লইয়া একটা নূতন রাষ্ট্র গড়িয়া তুলিতে হইবে;—বর্ত্তমান জর্ম্মাণ, অষ্ট্রিয়া, হাঙ্গেরি, হল্যাণ্ড্, বেল্‌জিয়ম্, ডেন্‌মার্ক, সুইট্‌জারল্যাণ্ড্, ইটালি, বল্‌কানপুঞ্জ ও তুর্কি সেই রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হইবে।...বল্‌কানে একমাত্র সার্ভিয়া আপত্তি করিতে পারে; তাহাকে জখম করিতে হইবে। ইংলণ্ড এখন আল্‌ষ্টর্ লইয়া ব্যস্ত; ফ্রান্স্ যুদ্ধ করিতে অসমর্থ; রুষিয়া একাকী অষ্ট্রিয়া ও জর্ম্মণির সহিত লড়াই করিবে না। এই ত উপযুক্ত সময়।...'

"সার্ভিয়া সম্বন্ধে মার্কিন্‌লেখক যাহা বলিয়াছেন, ইটালির ভূতপূর্ব্ব পররাষ্ট্র-সচিব জিওলিট্টি সেদিন সভার মধ্যে যে গুপ্তরহস্য প্রকাশ করিয়া দিয়াছেন, তাহার পরে আর সে সম্বন্ধে কোনও সন্দেহ থাকে না।

"ইংলণ্ডের ভাবগতিক দেখিয়া জর্ম্মণি বুঝিল, শুধু ভয় দেখাইলে কার্য্যোদ্ধার হইবে না। বীরভোগ্যা বসুন্ধরার আধিপত্যলাভ করিতে হইলে, অস্ত্রধারণ করিতে হইবে। অগত্যা কৈশর উইল্‌হেল্‌ম্ জগৎকে জানাইয়া

দিলেন—'The sword has been forced into our hands.' একদিন ছিল, যখন তাঁহার 'shining armour' দেখিয়া রুষিয়া ভয় পাইয়াছিল ; অষ্ট্রিয়ার সম্রাট্ বার্লিন্-সন্ধির কাগজের টুক্‌রাখানা ছিঁড়িয়া ফেলিয়া, দুইটা দেশ আত্মসাৎ করিলেন ; বুল্‌গেরিয়ার প্রিন্স ফার্ডিনাণ্ড স্বাধীন নৃপতি (King) হইলেন। তাঁহার কথায় বল্‌কান্-যুদ্ধের পর অষ্ট্রিয়া ও ইটালি সার্ভিয়াকে আট্‌কাইবার জন্য একটা স্বতন্ত্র আল্‌ব্যানিয়া রাষ্ট্র খাড়া করিয়া দিল। এক দিন ছিল, যখন তাঁহার কথায় ফ্রান্সের মন্ত্রী পদচ্যুত হইত, ফ্রান্সের প্রেসিডেণ্ট পদত্যাগ করিত। কিন্তু ইংরাজকে তিনি ভুলাইতে পারিলেন না। তাই এই বিংশ শতাব্দীর সমুদ্র-মন্থনব্যাপারে দেবাসুরদ্বন্দ্ব সুরু হইল। এই মন্থনের ফলে লক্ষ্মী উঠিবেন কি না, জানি না ; কিন্তু যে গরল উত্থিত হইতেছে, তাহার উপায় কি হইবে ? এসিয়ায় আফ্রিকায় ইংরাজ

'বণিকের মানদণ্ড দেখা দিল পোহালে শর্ব্বরী
রাজদণ্ডরূপে।'

'কিন্তু জর্ম্মণি চাহে, যে ভবিষ্যতে—

'কৈশরের রাজদণ্ড দেখা দিবে পোহালে শর্ব্বরী
মানদণ্ডরূপে।'

"ইংরাজ তাহা ভাল রকমই বুঝিতে পারিয়াছেন। তাই লর্ড কিচনার, ওকথা বলিয়াছেন। যে সমুদ্রের উপর ইংরাজ লক্ষ্মীকে লাভ করিয়াছেন, সেই সমুদ্রের উপরেই ইংরাজের পাঁচশত রণতরী দশসহস্র-পণ্যবাহী অর্ণবপোতকে রক্ষা করিয়া, পদ্মালয়া কমলাকে ঘিরিয়া ঘিরিয়া নাচিতেছে।"

বন্ধু জিজ্ঞাসা করিলেন—"ইংরাজের সহিত যুদ্ধ করাই যখন জর্ম্মণির সঙ্কল্প ছিল, ইংরাজের সঙ্কল্প দেখিয়া সে বিচলিত হইল কেন ?"

লেখক বলিলেন—"জর্ম্মণি ভাবে নাই যে, ইংরাজ গোড়া হইতেই যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইবে; অন্ততঃ কিছুদিনও সে যদি অপেক্ষা করে, তাহা হইলে ফ্রান্স ও রুষিয়াকে জর্ম্মণি জখম করিতে পারিবে। কিন্তু গোড়ায় গলদ হইয়া গেল। জর্ম্মণির রণতরী বাহিরে আসিয়া, ফ্রান্সকে জখম করিতে পারিল না। অন্ততঃ যদি সে বিদেশে ফ্রান্সের উপনিবেশগুলি দখল করিতে পারে, তাহা হইলে, তবুও খানিকটা 'place in the sun' পাওয়া যায়। কিন্তু তাহার কোনও সম্ভাবনাই রহিল না। এইজন্য গোশেনের সহিত কথাবার্ত্তার সময়ে ইম্পিরিয়াল চান্সেলর অত চঞ্চল হইয়া উঠিলেন। জর্ম্মণির সুবিধামত সে ইংরাজের সহিত যুদ্ধ করিবে, এইরূপ তাহার মৎলব ছিল। উইন্‌ষ্টন্ চর্চ্চিল্ জর্ম্মণির 'chosen moment'এর জন্য অপেক্ষা করিলেন না।

"যাক্,—এসকল কথার আলোচনায় আমাদের আসল কথাটা চাপা দিলে চলিবে না। য়ুরোপীয় সভ্যতার কথা হইতেছিল। তুমি বলিতেছিলে যে, আশী বৎসর পূর্ব্বে গীজো য়ুরোপীয় সভ্যতা সম্বন্ধে কি বলিয়াছিলেন, তাহা শুনিয়া আমার লাভ কি?

"গোশেনের মত আমারও বলিবার ইচ্ছা হইতেছে যে, 'য়ুরোপীয় সভ্যতার আলোচনা করিতে বসিয়া, লাভলোকসানের খতিয়ান্ করা সুধীজনের উচিত নহে।' গীজোকে ফ্রান্সের chauvinist বলিয়া যদি মনে কর, খ্রীষ্টীয় য়ুরোপীয় সভ্যতার নিন্দক নিট্‌শেকে জর্ম্মণির আদিম-বর্ব্বর বলিয়া মনে করিতে আপত্তি কি?

"আপত্তি এই যে, কাহারও কাহারও মনে হইত পারে যে, যেদেশ গয়টে, শিলার্, বেটোবেন্, ওয়াগ্নারের জন্মস্থান; যেখানে কাণ্ট, হেগেল্ প্রভৃতি পণ্ডিতমণ্ডলী দর্শনশাস্ত্রের আলোচনা করিয়াছেন—সে দেশকে বর্ব্বর বলিব কিরূপে?

"তদুত্তরে একজন বলিতেছেন,—'আমি প্রমাণ করিয়া দিতে পারি, জর্ম্মণির অধিকাংশ নামজাদা বড়লোক খাঁটী জর্ম্মণ নহেন,—হয় পোল, না হয় হিব্রু।

"এ কথার নাকি উল্টা জবাব একজন জর্ম্মণ দিয়াছেন। তিনি প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, 'হিব্রু বলিয়া কোনও জাতি জগতে ছিল না; হিব্রু জাতিটা বেনামি জর্ম্মণ মাত্র। খুব সম্ভব Jesus Christ জর্ম্মণ ছিলেন। ঐ যে 'us' suffix, ওটাতে পুরুষ—অর্থাৎ man বুঝায়; আবার Jesএর s, যে r অক্ষরের পরিবর্ত্তে অনেক জায়গায় বসে;—ফলে দাঁড়াইল Jesus=Jerman, বা German।' Emile Richeএর এই অনুমানটা না হয় রসিকতা বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া গেল।'

"সিড্‌নি লো বলিতেছেন—'প্রুসিয়ার militarism জর্ম্মণ্ cultureকে অভিভূত করিয়া, জর্ম্মণিকে বর্ব্বর করিয়া তুলিয়াছে।'

"মেটার্লিঙ্ক্ কিন্তু একথা একেবারেই মানেন না। তিনি লণ্ডনের Daily Mail পত্রিকায় লিখিয়াছেন,—'যখন আমাদের জয় হইবে, শত্রু মাথা তুলিতে পারিবে না, তখন বোধ হয়, কেহ কেহ আমাদের হৃদয় আর্দ্র করিবার চেষ্টা করিতে পারে। আমরা হয় ত শুনিব যে, নিরীহ জর্ম্মণ্ জাতির কোনও দোষ নাই; তাহাদের সম্রাট্ ও তাহাদের ক্ষত্র-সম্প্রদায়-কর্ত্তৃক তাহারা চালিত হইয়াছে মাত্র। যে জর্ম্মণি আমাদের পরিচিত, তাহার হৃদয় বেদনায় স্পন্দিত হয়, সে পরকে আপন করিতে জানে, তাহার কোনও দোষ নাই; যত দোষ মদোন্মত্তা প্রুসিয়ার। শান্তিপ্রিয় বাভেরিয়া, রাইন্-তীরবর্ত্তী অতিথিবৎসল গৃহস্থসকল, সাইলে-শিয়ান্, স্যাক্সন্ প্রভৃতি সকলেই অত্যন্ত অনিচ্ছায় বাধ্য হইয়া অস্ত্রধারণ করিয়াছে। আজ আমাদের চোখের সাম্‌নে সত্য প্রসারিত হইয়া

রহিয়াছেন। এই মহাপাপের মধ্যে দোষী নির্দ্দোষ নাই, অথবা দোষের তারতম্য নাই। যাহারা এই পাপকার্য্যে লিপ্ত হইয়াছে, তাহারা সকলেই এক পর্য্যায়ভুক্ত। জর্ম্মণ জাতি ক্রীতদাস নহে যে, একজন অত্যাচারী রাজা, তাহাদিগকে তাড়াইয়া লইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে আনিয়াছে। একটা জাতিকে ঠকান যায় না,—যদি সে ইচ্ছা করিয়া নিজে না ঠকে।'

"মেটার্লিঙ্কের কথা শুনিয়া জেরার্ড হাউপ্টমান্ বিদ্রূপ করিয়াছেন। তিনি বলেন,—প্যারিসের পল্লবগ্রাহী দার্শনিক বার্গসোঁ যত ইচ্ছা আমাদিগকে বর্ব্বর বলিয়া নিন্দা করিতে পারেন; বড় কবি মেটার্লিঙ্কও ঐ রকম আখ্যায় আমাদিগকে আপ্যায়িত করিতে পারেন। মেটার্লিঙ্ক ভ্রান্ত, ফরাসি-সভ্যতায় মাতোয়ারা Gallomaniac; তিনিই একদিন জর্ম্মণিকে য়ুরোপের conscience বলিয়া বরণ করিয়াছেন। আমাদের মত সার্ব্বভৌমিক উদারতা আর কোন জাতির আছে? আমাদের অনুবাদ-সাহিত্যের প্রতি লক্ষ্য কর; আমার নিকটে আর কোনও জাতির নাম কর দেখি, যে নানাদেশের নানাজাতির মর্ম্মস্থানে পৌছিবার জন্য আমাদের মত চেষ্টা করিতেছে! মেটার্লিঙ্কের খ্যাতি ও অর্থলাভ, অনেকটা আমাদের দেশেই হয় নাই কি? অবশ্যই, কাণ্ট ও শোপেনহয়ারের দেশে, বার্গসোঁর মত বৈঠকখানার ঝুটা-দার্শনিকের স্থান নাই। আমি খোলসা করিয়াই বলিতেছি। ফ্রান্সের বিরুদ্ধে কোনও আক্রোশ আমাদের কখনও ছিল না; এখনও নাই। তাহার ভাস্কর্য্য, চিত্রকলা, সাহিত্য আমরা পূজা করিয়া আসিতেছি; রোদাঁর বিশ্ববিশ্রুতির পথ জর্ম্মণিই প্রশস্ত করিয়া দিয়াছে। আমরা আনাতোল ফ্রাঁস্‌কে শ্রদ্ধা করি। মোপাসাঁ, ফ্লবেয়ার, বাল্‌জাকের রচনা, আমাদের দেশের লেখকের রচনার মত, আমাদের দেশে পঠিত হয়। দক্ষিণ-ফ্রান্সের জাতীয় জীবনের প্রতি আমাদের আন্তরিক ভক্তি আছে। জর্ম্মণির ছোট ছোট সহরে, দরিদ্র কুটীরেও, কবি মিস্ত্রালের

একান্ত ভক্ত দেখিতে পাইবে। আমি বিশ্বাস করিতে পারি না যে, কোনও আগন্তুক বিদেশী, জর্ম্মণ পরিবার, জর্ম্মণ সহর, জর্ম্মণ হোটেল, জর্ম্মণ জাহাজ' জর্ম্মণ কন্সার্ট, জর্ম্মণ থিয়েটর—বেরুথ, জর্ম্মণ লাইব্রেরি, জর্ম্মণ মিউজিয়ম্ পরিদর্শন করিতে আসিয়া কখনও মনে করিয়াছেন যে, তিনি বর্ব্বরদিগের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছেন। ইংলণ্ডের ভূতপূর্ব্ব সমরসচিব হল্‌ডেন্ অনেকগুলি ইংরাজবন্ধু সমভিব্যাহারে মাঝে মাঝে আমাদের বর্ব্বর উয়াইমার সহরে তীর্থদর্শন করিতে আসিতেন; এইখানেই বর্ব্বর গয়টে, শিলার, হার্ডার, উইল্যাণ্ড, এবং আরও অনেকে বিশ্বের মানবের জন্য আজীবন কর্ম্ম করিয়া গিয়াছেন। আমাদের একজন জর্ম্মণ কবি আছেন, যাঁহার নাটকগুলি আমাদের জাতীয় সম্পত্তি হইয়াছে; অন্য কোনও জর্ম্মণ কবির নাটক সেরূপ হয় নাই;—তাঁহার নাম উইলিয়ম্ সেক্ষপীয়র্; যিনি ইংলণ্ডের কবিসম্রাট্, সেই সেক্ষপীয়র্।'

"ফরাসি লেখক রোমাঁ রোলান্দ বলিলেন,—'জেরার্ড হাউপ্টমান্! অন্যান্য ফরাসীর মত আমি জর্ম্মণিকে বর্ব্বর মনে করি না। আমি তোমাদের অত বড় জাতির মানসিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির বিষয় অবগত আছি। জর্ম্মণির প্রতিভাশালী চিন্তয়িতাদিগের নিকট আমি কত ঋণী, তাহা আমি জানি। সেই জন্য তোমাদের জর্ম্মণি আমাকে যতই বেদনা দিক, আমি তজ্জন্য সমস্ত জর্ম্মণজাতিকে দোষী করিব না। তোমার মত আমি যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী বলিয়া বিবেচনা করি না। ফরাসী কখনও ভবিতব্যে বিশ্বাস করে না। আমাদের দুঃখের জন্য তোমাদিগকে তিরস্কার করি না। যদি ফ্রান্স অধঃপাতে যায়, জর্ম্মণিও অধঃপাতে যাইবে। যখন তোমাদের সেনাদল বেলজিয়মের রাষ্ট্রীয় ঔদাসীন্যের অপমান করিল, তখনও আমি বাঙনিষ্পত্তি করি নাই। ওটা তোমাদের

প্রুসীয় রাজাদের কৌলিক ধর্ম্ম ; উহাতে আমি বিস্মিত হই নাই। কিন্তু যখন দেখি যে, ঐ নির্ভীক জাতির ন্যায়ধর্ম্ম ও স্বাধীনতা রক্ষা করিবার প্রাণপণ প্রয়াসকে মহা অপরাধ বিবেচনা করিয়া উহার প্রতি কি পাশব অত্যাচার করিতেছ...উঃ, তাহা একেবারে অসহ্য ! তোমরা জর্ম্মণজাতি, তোমরাও ত ১৮১৩ সালে এইরকম করিয়া স্বাধীনতা রক্ষার প্রয়াস পাইয়াছিলে। সমস্ত জগৎ শিহরিয়া উঠিয়াছে। ঐ সমস্ত বর্ব্বরতা আমাদের ফরাসিজাতির জন্য রাখ ; আমরাই তোমাদের শত্রু। কিন্তু এই ক্ষুদ্র, দুঃখী, নিরপরাধ বেল্‌জি জাতির উপর এত আক্রোশ ! কি লজ্জা ! শুধু জীবন্ত বেল্‌জিয়মের উপর নিপতিত হইয়া তোমরা ক্ষান্ত হও নাই। তোমরা মৃতের সহিত যুদ্ধ কর, অতীত যুগের মহৎ স্মৃতি-চিহ্নগুলির সহিত তোমাদের বিরোধ। তোমরা ম্যালিনের উপর অগ্নিবৃষ্টি করিয়াছ, রিউবেন্স পুড়াইয়াছ, লুভেঁ ভস্মীভূত করিয়াছ। তবে কি তোমরা, হাউপ্টমান ! কি নামে তোমাদিগকে অভিহিত করিব ? তুমি ত বর্ব্বর আখ্যা প্রত্যাখ্যান করিতেছ। তোমরা গয়টের বংশধর, না আটিলার উত্তরাধিকারী ? তোমরা সেনার সহিত যুদ্ধ করিতেছ, না মানবাত্মার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতেছ ? ইচ্ছা হয় নরহত্যা কর ; কিন্তু 'আর্টে'র, ধর্ম্মের, চরম উৎকর্ষের চিহ্নগুলিকে শ্রদ্ধা করিয়া চল। সেগুলির উপর সমস্ত মানবজাতির উত্তরাধিকারসূত্রে দাবী আছে। আমাদের মত, তোমাদেরও এবিষয়ে দায়িত্ব আছে ; যদি ইহা অস্বীকার কর, তাহা হইলে যে ক্ষুদ্র য়ুরোপীয় সৈন্য সভ্যতার রক্ষক, তাহার মধ্যে তোমরা স্থান পাইবার অনুপযুক্ত।"

বন্ধু মাথা চুল্‌কাইয়া বলিলেন—"নানা মুনির নানা কথা শুনিয়া, আমি তোমার ঐ 'সভ্যতা বনাম বর্ব্বরতা' সমস্যার কিনারা পাইলাম না। যে ব্রাহ্মণ্য-সভ্যতার উপর গীজো একটু কটাক্ষ করিয়াছেন, সে দিক হইতে এ সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করা যায় না কি ?"

লেখক বলিলেন—"এখন তাহার সময় আসে নাই। আমার কর্ণে এখনও লর্ড রোজবেরির কথা বাজিতেছে—'Europe rattling back into barbarism'। ভারতবর্ষের ব্রাহ্মণ্য-সমাজ দেখিতেছে যে, একদিন যে য়ুরোপীয় সভ্যতা মানবের সম্মুখে বর ও অভয় লইয়া আবির্ভূতা হইয়াছিল, আজ তাহার মূর্ত্তি ভীমা ছিন্নমস্তারূপিণী! স্বহস্তে নিজের মুণ্ড ছিন্ন করিয়া নিজের রুধির নিজে পান করিতেছে। সংসারের সমস্ত মঙ্গল ভূমা শিবকে পদদলিত করিয়া, সভ্যতার সমস্ত বসনভূষণ ফেলিয়া দিয়া, নৃমুণ্ডমালিনীর একি ভৈরব তাণ্ডব! Renaissanceএর পূর্ব্ব হইতেই যিনি মানবকে বৈরাগ্যের পথ হইতে ফিরাইবার জন্য, ভোগের দিকে, সংসারের সুখের দিকে বাঁশীর স্বরে আহ্বান করিয়াছিলেন, আজ তিনি বাঁশী ফেলিয়া অসি ধরিলেন কেন? এই যে 'পরাণের সাথে মরণ খেলা, নিশীথ বেলা'—এই যে 'দে দোল্, দোল্, মত্ত রোল'—কোন্ চক্রী এই খেলা খেলিতেছেন? কোন্ বিরাট্ Cosmic Force এই দোল্না দুলাইতেছে? ব্রাহ্মণ্য-সমাজ ভাবিতেছে, মানুষ ভোগের মধ্যে আপনাকে হারাইতে বসিয়াছিল,—

'ঢালি মধুরে মধুর, বঁধুরে আমার
হারাই বুঝি,
পাইনে খুঁজি;
বাসরের দীপ নিবে নিবে আসে,
ব্যাকুল নয়নে হেরি চারি পাশে,
শুধু রাশি রাশি শুষ্ক কুসুম
হয়েছে পুঁজি,
অগাধ স্বপ্ন সাগরে ডুবিয়া

মরি যে বুঝি,
পাই নে খুঁজি।"

"এই যে ভোগের 'সুপ্তিতে ডুবিয়া গেল জাগরণ,'—ইহাতে 'স্বপনের সুখ, সুখের ছলনা' থাকিতে পারে, কিন্তু জীবনের উদ্দাম আনন্দের আভাস মাত্র নাই। প্রাণকে ঝাঁকানি দিয়া জাগাইয়া তুলিতে হইবে; আলো চাই, হাওয়া চাই, place in the sun চাই; নইলে নিশ্বাস রুদ্ধ হইয়া আসে, জীব জড়ত্বে পরিণত হইতে থাকে; War is a biological necessity!—হিমাচলের পাদমূলে বসিয়া মৌন শান্ত ব্রাহ্মণ্য-সমাজ পশ্চিমাকাশের রক্ত মেঘপুঞ্জের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া ভাবিতেছে—ঐ মহাকুরুক্ষেত্রে মানবের নবীন যুগের নবীন গীতা উদ্গীরিত হইবে কি?"

ইটালি

সংবাদপত্র পড়িতে বসিয়া জনৈক ইটালীয় লেফ্‌টেনন্টের একখানি চিঠি আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া অনেক কথা মনে হইতে লাগিল। তিনি লিখিতেছেন, "আমাদের যুদ্ধ গরুড়ের লড়াই; মহাকাব্যের রৌদ্ররস এই সমরকে ভীষণোজ্জ্বল করিয়াছে। ছয় সহস্র ফুট উচ্চে আমরা যুঝিতেছি; মহান্ আল্পস্ পর্ব্বতমালা আমাদের যুদ্ধক্ষেত্র। উপত্যকা হইতে উপত্যকায়, গিরিশৃঙ্গ হইতে শৃঙ্গান্তরে, বায়ুতে আকাশে, সমরনির্ঘোষ হইতেছে; প্রকম্পিত শৈলমালা যেন বেদনায় গুমরিয়া গুমরিয়া কাঁদিতেছে। ডান্টে কিম্বা সেক্ষপীয়র ভিন্ন কে এই বিরাট্ দৃশ্যের ভীমকান্ত চিত্র অঙ্কিত করিতে পারে? ... ... তুমি শুনিলে সুখী হইবে যে সমগ্র নেশন-মণ্ডলীর এই বিপুল দ্বৈরথ যুদ্ধে ইটালি তাহার ইতিহাসের পূর্ব্ব গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিয়া কার্য্য করিতেছে। গ্যারিবল্ডি—বীরশ্রেষ্ঠ দেবোপম গ্যারিবল্ডি, নক্ষত্রখচিত নিশীথে, অত্যুজ্জ্বল আভায় ও অনুপম সৌন্দর্য্যে মণ্ডিত হইয়া সর্ব্বোচ্চ তুঙ্গশৃঙ্গোপরি আমাদের সম্মুখে আবির্ভূত হয়েন। তাঁহার দেহযষ্টি সরল, চক্ষুদ্বয় প্রোজ্জ্বল, বাহুদ্বয় প্রসারিত। গম্ভীর অদৃষ্ট-দেবতার মত যেন তিনি অঙ্গুলি-নির্দ্দেশ করিয়া দেখাইয়া দেন—পরপ্রপীড়িত ইটালির ভগ্নাংশের দিকে, যেখানে আমাদের ভ্রাতৃবৃন্দের মৃত্যুগাথা অগ্নির অক্ষরে লিপিবদ্ধ করা রহিয়াছে। তিনি আমাদিগকে বর ও অভয় দিতেছেন। যেন তিনি বলিতেছেন—'অগ্রসর হও, ইটালি আমার, অগ্রসর হও; নেশন শ্রেষ্ঠ তুমি, মানবেতিহাসের বিপুল-নাট্যে বঞ্চিত নেশনগুলির সাধারণ অধিকার সমর্থন করিয়া, তাহাদের

পক্ষ অবলম্বন করিয়া, তুমি অবতীর্ণ হইবে; তোমাদের ডান্টে ও ম্যাট্‌সিনি ত এই ভবিষ্যদ্বাণীই বহু পূর্ব্বে শুনাইয়া গিয়াছেন।"

* * *

এই চিঠিখানি পড়িয়া ইটালির গত পঞ্চাশ-ষাট বৎসরের কথা মনে পড়িয়া গেল। যে পর-প্রপীড়িত ইটালির ভগ্নাংশের প্রতি গ্যারিবল্ডির প্রেতাত্মা তর্জ্জনী প্রদর্শন করিতেছেন, তাহার দুঃখের কথা মনে পড়িয়া গেল। আর্য্যাবর্ত্তে তখন সবে মাত্র দুরন্ত সিপাহীবিদ্রোহ-বহ্নি নির্ব্বাপিত হইয়াছে; কোম্পানীর হাত হইতে তখনও ভারতবর্ষের শাসনভার মহারাণী ভিক্টোরিয়ার হস্তে ন্যস্ত হয় নাই। ইংরাজ দেখিল, যে-ইটালিকে অষ্ট্রিয়ার মেটার্ণিক্ অবজ্ঞাভরে একদিন কেবল মাত্র 'একটা ভৌগোলিক নাম' বলিয়া নাসিকা কুঞ্চিত করিয়াছিল, আজ সে রাষ্ট্রীয় একীকরণের জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছে; ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিক্ষিপ্ত স্বতন্ত্র রাষ্ট্রগুলির স্বাতন্ত্র্য লুপ্ত করিয়া একমাত্র অবিচ্ছিন্ন রাষ্ট্রশক্তির ছত্রতলে সকলকে সমবেত করিয়া রোমের পূর্ব্বগৌরব পুনরুদ্দীপিত করিবার চেষ্টা হইতেছে। ইংরাজ তখন অত্যন্ত ব্যস্ত, সহসা তাহাদিগকে সাহায্য করিতে অগ্রসর হইতে পারিলেন না। ফরাসী সম্রাট্ তৃতীয় নেপোলিয়ন, তাহাদের সুখের স্বপ্ন বাস্তবে পরিণত করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। ঠিক যে পরার্থ-প্রণোদিত হইয়া তিনি এই নূতন কার্য্যে ব্রতী হইলেন, তাহা নহে; যদি এই সুযোগে ফ্রান্সের রাষ্ট্রীয় সীমান্ত আরও একটু পূর্ব্বদিকে সরাইয়া লওয়া যায়, তাহাতে নব-জাগ্রত ইটালির বিশেষ কোনও আপত্তি না থাকিতেও পারে; সে ত বহুশত বর্ষের অভিশাপ হইতে মুক্ত হইতে চায়, নেপোলিয়ন তাহাকে সেই মুক্তির পথে লইয়া যাইবেন—অবশ্যই তিনি যাহা চাইবেন, তাহা পাইবেন। তিনি বলিলেন—আমি পীড্‌মণ্টের রাজাকে সাহায্য করিতে প্রস্তুত আছি; অষ্ট্রিয়াকে ইটালি হইতে বিতাড়িত করিয়া দিব; আমি কিন্তু

চাই—নীস্ (Nice) ও স্যাভয় (Savoy)। পীড্‌মণ্টের রাজমন্ত্রী ক্যাভূর (Cavour) একটু ইতস্ততঃ করিয়া, সম্মত হইলেন। পীড্‌মণ্টের রাজা ভিক্টর ইম্যানুয়েলের বংশের পরিচয় ও গৌরব যে Savoy লইয়া, সেই স্যাভয় দেশটীকে ফরাসী আত্মসাৎ করিতে চায়। যে Nice গ্যারিবল্ডির জন্মস্থান, সেটি পরহস্তগত হইবে। তথন, ক্ষুদ্র স্বার্থ বিসর্জ্জন না দিলে, বৃহদনুষ্ঠানে সাফল্য-লাভ করা যাইবে না; ফ্রান্স সহায় না হইলে সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হইবে। অগত্যা ক্যাভূর সম্মত হইলেন।

* * *

প্রথম প্রথম কিন্তু ক্যাভূর ভাবিতে পারেন নাই যে, পীড্‌মণ্টের রাজা সমগ্র ইটালির একেশ্বর হইতে পারিবেন। অষ্ট্রিয়াকে আপাততঃ আল্পস্ পাহাড়ের পরপারে দূর করিয়া দিতে পারিলেই যথেষ্ট হইবে; লম্বার্ডি ও ভেনিসিয়াকে বিদেশীয়ের হাত হইতে মুক্ত করিতে পারিলে, প্রথম পর্ব্ব ত সমাপ্ত হইবে; তাহার পরে, আর কিছু করা যায় কি না, সে কথা পরে ভাবা যাইবে। ১৮৪৯ খৃঃ অব্দ হইতে ১৮৫৭ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত মার্শ্যাল্ র‍্যাডেট্‌স্কির অত্যাচারের মাত্রা ক্রমাগত বর্দ্ধিত হইয়া চলিল; জনসাধারণকে প্রতিশ্রুত রাষ্ট্রীয় অধিকার দেওয়া দূরে থাকুক, তাহাদিগকে লঘু অপরাধে গুরু দণ্ডে দণ্ডিত করা তাঁহার যেন নিত্যপ্রথা দাঁড়াইয়া গেল। ম্যাট্‌সিনির বিশ্বাস ছিল যে—কয়েকজন বিদ্রোহী সমস্ত লম্বার্ডিকে অষ্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিতে সমর্থ হইবে। সম্রাট্ ফ্রান্স্ জোসেফ যথন ভেনিসে আসিবেন স্থির হইল, ম্যাট্‌সিনির বিদ্রোহীদল তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিয়া সরাইয়া ফেলিবে, এ রকম আয়োজনও ভিতরে-ভিতরে হইয়াছিল। নানাকারণে তাঁহার চেষ্টা ফলবতী হয় নাই। তবুও ম্যাট্‌সিনি কিছুতেই স্বীকার করিতে প্রস্তুত হয়েন নাই যে—এরূপ বলপ্রয়োগে

স্বাধীনতালাভের চেষ্টা বাতুলতা মাত্র। ক্যাভূরের সহিত ম্যাট্‌সিনির এই বিষয়ে বিষম মতদ্বৈধ প্রকাশ পাইল। কিন্তু ঘটনাচক্রে র‍্যাডেট্‌স্কির সহিত ক্যাভূরের মনোমালিন্য জন্মিল; তিনি পীড্‌মণ্টের রাজপ্রতিনিধিকে ভিয়েনা হইতে ফিরাইয়া আনিলেন। ইংরাজ ও ফরাসী গভর্মেণ্ট্‌ তাঁহার এই তেজস্বিতার পরিচয় পাইয়া খুসী হইয়াছিলেন। ... ... এমন সময়ে ক্রিমীয় যুদ্ধ আরব্ধ হইল; পীড্‌মণ্টের সৈন্য, ইংরাজ ও ফরাসীর পার্শ্বে দাঁড়াইয়া, যুদ্ধ করিবার অবসর পাইয়া আপনাদিগকে ধন্য মানিল। ১৮৫৬ সালে যখন প্যারিসে সন্ধি হইয়া গেল, সার্ডিনিয়ার প্রতিভূস্বরূপ দাঁড়াইয়া ক্যাভূর ইটালির দুঃখের কথা ইংলণ্ড ও ফ্রান্সকে জানাইয়া রাখিলেন। এমনি করিয়া কিছুদিন কাটিয়া গেল। এদিকে পার্মা, মডেনা, নেপল্‌স ও পোপের অধিকারভুক্ত রাষ্ট্রে উৎপীড়ন চলিতে লাগিল। ম্যাট্‌সিনির কথায় আর জনসাধারণ বড় একটা কর্ণপাত করিতে সাহস করে না। ক্যাভূর ভাবিলেন—যদি ইংলণ্ডের সাহায্য পাওয়া যাইত! য়ুরোপে যদি কেহ নিঃস্বার্থভাবে ইটালির সাহায্য করিতে পারিতেন, সে ইংরাজ; ফরাসী নহে। কিন্তু ইংরাজ তখন অন্য বিষয় লইয়া অত্যন্ত ব্যস্ত; সুতরাং ফরাসীর সহিত সর্ত্ত করিতে হইল। সম্রাট্‌ তৃতীয় নেপোলিয়ন খুসী হইলেন। ... ...কিন্তু সমস্ত পণ্ড হইবার উপক্রম হইল। ম্যাট্‌সিনির দলভুক্ত অর্সিনি নামক এক ব্যক্তি নেপোলিয়নের উপর বোমা নিক্ষেপ করিল। চেষ্টা ব্যর্থ হইল বটে; কিন্তু সম্রাট্‌ ক্রুদ্ধ হইলেন। অনেক কষ্টে ক্যাভূর, তাঁহাকে নীস্‌ Nice ও স্যাভয় Savoy এর প্রলোভন দেখাইয়া, তাঁহার মিত্রতা লাভ করিতে পারিলেন। কথা এক রকম পাকা হইয়া গেল ১৮৫৮ সালের জানুয়ারী মাসে।

* * *

কিন্তু নেপোলিয়ন কি মনে করিলেন, বলা যায় না; সহসা ভিক্টর

ইম্যানিউয়েলকে বলিয়া পাঠাইলেন—ইটালির রাষ্ট্রীয় সমস্যাসম্বন্ধে ভাল করিয়া বিচার করিবার জন্য একটা কংগ্রেস্ আহূত হইবে; সেই সভায় পীড্‌মণ্টের বক্তব্য শুনিয়া কিংকর্ত্তব্য স্থির করা হইবে। ক্যাভুর বিস্মিত হইলেন; কি করা উচিত, তাহা মনে মনে চিন্তা করিতেছেন, এমন সময়ে শুনিলেন যে অষ্ট্রিয়া বলিয়াছে—'আমি কংগ্রেসে উপস্থিত হইতে সম্মত আছি—যদি পীড্‌মণ্ট্ উপস্থিত না হয়; আরও একটি কথা—পীড্‌মণ্ট্ সমরসজ্জা পরিত্যাগ করুক।' তিনি এ প্রস্তাব দৃঢ়ভাবে প্রত্যাখ্যান করিলেন। কংগ্রেস হইল না। ভিয়েনা গভর্মেণ্ট, টিউরিণ গভর্মেণ্টকে Ultimatum দিলেন—'তিন দিনের মধ্যে তুমি disarm কর, নিরস্ত্র হও, সমর-সাজ ত্যাগ কর।'...ক্যাভুরের আনন্দের সীমা রহিল না। অষ্ট্রিয়া যুদ্ধঘোষণা করিল; সঙ্গে সঙ্গে ফ্রান্সও অষ্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে অভিযান করিল। একদল ভলণ্টীয়র-সৈন্য লইয়া গ্যারিবল্ডি সমরক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে ম্যাজেণ্টায় ও সল্‌ফারিণোয় অষ্ট্রিয়া পরাজিত হইল।

* * *

সহসা নেপোলিয়ন যুদ্ধে বিরত হইলেন। তাঁহার এই চিত্তবিকার কেন উপস্থিত হইল, আজও সে রহস্য সম্যক্ উদ্‌ঘাটিত হয় নাই!—তিনি কি ফ্রান্সের বলক্ষয় করা সমীচীন বলিয়া মনে করেন নাই? অথবা বিজয়ী পীড্‌মণ্ট্ পাছে ইটালিতে অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠে, সেই ভয়ে তিনি পশ্চাৎপদ হইলেন! ইটালির আসন্ন রাষ্ট্রীয় একীকরণ, তাঁহার বোধ হয় একেবারেই অপছন্দ ছিল। গত্যন্তর নাই দেখিয়া, ক্যাভুর সন্ধি করিতে বাধ্য হইলেন। লম্বার্ডি, পীড্‌মণ্ট্-রাষ্ট্রভুক্ত হইল; ভেনিসিয়া অষ্ট্রিয়ার দখলে রহিয়া গেল। ক্যাভুর, ভিক্টর ইম্যানুয়েল, গ্যারিবল্ডি, সকলেই ক্ষুণ্ণ হইলেন। কিন্তু উপায়ান্তর নাই।—১৮৫৯ সালের মাঝামাঝি ব্যাপারটা এই রকম দাঁড়াইল।

দক্ষিণে ফ্লরেন্সবাসিগণ উত্তেজিত হইয়া, তাহাদের ডিউকপরিবারকে বহিষ্কৃত করিয়া, ভিক্টর ইম্যানিউয়েলের শরণাপন্ন হইল। মডেনার ডিউক অষ্ট্রিয়ার দলে চলিয়া যাওয়ায়, সেখানকার জনসাধারণ মডেনাকে পীড্‌মণ্টের রাষ্ট্রভুক্ত বলিয়া প্রচার করিল; পার্মাও তাহাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করিল। বলোনিয়া ও রোমানিয়া (Romagna) তাহাদের সহিত যোগ দিল।.........এসকল ঘটনা নেপোলিয়নের আদৌ ভাল লাগে নাই। তিনি বলিলেন,—'Nice ও Savoy দাও, মধ্য-ইটালির রাষ্ট্রগুলি লও।' ক্যাভুর বিষম সমস্যায় পড়িলেন। নেপোলিয়নের কর্ত্তব্য পালিত হইল কই? ইটালি হইতে অষ্ট্রিয়া বিতাড়িত হইল না; তবুও তিনি নীস ও স্যাভয় চাহিতেছেন! কিন্তু উপায় নাই—উপায় নাই।—১৮৬০ সালে টিউরিণের পার্লামেণ্ট্ উক্ত প্রদেশদ্বয় হস্তান্তরিত করিতে সম্মত হইল।

* * * *

এদিকে, আরও দক্ষিণে, নেপ্‌ল্‌স্‌রাজ্যের শেষ রাজা ফ্রান্সিস্‌, এত দেখিয়া শুনিয়াও, কিছু নূতন শিক্ষালাভ করিল না। বোনাপার্ট এক-দিন বলিয়াছিলেন—'বুর্ব্বোঁ বংশ কিছু ভুলিয়াও যায় না, কিছু শিক্ষাও করে না।' নেপ্‌ল্‌স্‌এর ফ্রান্সিস্‌ও কাহারও কথায় কর্ণপাত করিল না। ম্যাট্‌সিনির শিষ্যবর্গের সুবিধা হইল; তাহারা সিসিলিতে বিদ্রোহবহ্নি প্রজ্জ্বলিত করিল। গ্যারিবল্ডি, একসহস্র ভলণ্টীয়র-সৈন্য লইয়া, জেনোয়া হইতে সিসিলি অভিমুখে যাত্রা করিলেন। ক্যাভুর ভাবিলেন—সব বুঝি মাটি হইল; এই সূত্রে যখন নেপোলিয়ন আবার ইটালির ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিয়া বসিবে; তখন উপায়?—ওদিকে গ্যারিবল্ডি, বিজয়ী বীরের মত, সিসিলির রাজধানী প্যালার্মোতে প্রবেশ করিয়া, রাজা ভিক্টর ইম্যানিউয়েলের নাম লইয়া, নিজেকে সিসিলির হর্ত্তাকর্ত্তা Dictator বলিয়া প্রচার করিলেন।......ক্যাভুরের ভয় হইল—পাছে গ্যারিবল্ডি,

সিসিলিকে করায়ত্ত করিয়া, নেপ্‌ল্‌স্‌ অভিমুখে অভিযান করেন! নেপোলিয়ন নিশ্চয়ই তাহা সহ্য করিবেন না। তখন সিসিলিও হস্তচ্যুত হইবে।......তিনি গ্যারিবল্ডিকে নিরস্ত হইতে উপদেশ দিলেন। সিসিলি পীড্‌মণ্টের সহিত সংযুক্ত হউক, আর কিছু করিয়া কাজ নাই। গ্যারিবল্ডি সে কথায় কর্ণপাত করিলেন না। তিনি নেপ্‌ল্‌স্‌ অভিমুখে যাত্রা করিলেন; ফ্রান্সিস রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিলেন। গ্যারিবল্ডি নেপ্‌ল্‌স্‌-এ প্রবেশ করিয়া নিজেকে সেখানকার Dictator বলিয়া জাহির করিলেন।......ক্যাভূর দেখিলেন—সিসিলির পর নেপ্‌ল্‌স্‌ তাহার পরে রোম না কি? গ্যারিবল্ডিকে বারণ করিলে কোনও ফল হইবে না; সবদিক বজায় করিতে হইলে পীড্‌মণ্টকে খোলাখুলিভাবে এক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে হইবে। যদি রাগ করিয়া গ্যারিবল্ডি নেপল্‌স্‌ ও সিসিলিকে গণতন্ত্র (republic) করিয়া ফেলে? রাজাকে ক্যাভূর বলিলেন—'গ্যারিবল্ডি ক্যাট্টালিকায় পৌঁছিবার পূর্ব্বেই আমাদিগকে ভল্টার্ণো নদীর পারে উপস্থিত হইতে হইবে, নহিলে ইটালি যে তিমিরে সেই তিমিরে থাকিয়া যাইবে।'......ফলে দাঁড়াইল এই যে, গ্যারিবল্ডি ও ভিক্টর ইম্যানিউয়েল একত্র নেপ্‌ল্‌স্‌-এর রাজধানীতে প্রবেশ করিলেন। রাজার হস্তে সমস্ত ভার অর্পণ করিয়া, গ্যারিবল্ডি নিজ গৃহে ফিরিয়া গেলেন। ১৮৬১ খৃঃ অব্দে সংযুক্ত-ইটালিরাজ্যকে ইংলণ্ড ও ফ্রান্স স্বীকার করিয়া লইল।—ভেনিস ও রোম কিন্তু ইহার বাহিরে রহিল। কয়েক মাস পরে ক্যাভূরের মৃত্যু হইল।

* * * *

গ্যারিবল্ডি ভাবিলেন—'এইবার রোম হস্তগত করিতে হইবে।' আবার সিসিলীয় ভলণ্টীয়র-সৈন্য সমভিব্যাহারে তিনি ইটালিতে পদার্পণ করিলেন। রাজা কিন্তু, সৈন্য পাঠাইয়া, তাঁহাকে বন্দী করিয়া আনিলেন।

ভিক্টর ইম্যানিউয়েল্ দেখিলেন যে রোম না পাইলে ইটালিতে শান্তির সম্ভাবনা নাই। তিনি নেপোলিয়নের সহিত গোপনে কথাবার্ত্তা চালাইতে লাগিলেন। নেপোলিয়ন রোমের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য যে ফরাসি সৈন্য উক্ত নগরের মধ্যে রাখিয়া দিয়াছিলেন, তাহা ফিরাইয়া আনিতে ইতস্ততঃ করিলেন। লোকে যদি বলে যে—তিনি পোপের বিরুদ্ধাচরণ করিতেছেন! অবশেষে স্থির হইল যে, ফরাসি সৈন্য রোম ছাড়িয়া ফিরিয়া আসিবে বটে, কিন্তু ভিক্টরের সৈন্য তথায় পদার্পণ করিতে পারিবে না; পরন্তু ছয়মাসের মধ্যে ভিক্টর যেন টিউরিণ হইতে অন্যত্র তাঁহার রাজধানী সরাইয়া লইয়া যান। নেপোলিয়নের উদ্দেশ্য সহজেই বুঝা গেল। একবার রাজধানী সরাইয়া লইয়া গেলে, আবার সহসা রোম নগরীকে ভিক্টর ইটালির রাজধানী বলিয়া জাহির করিতে পারিবে না। ১৮৬৫ সালে ফ্লরেন্স নগরী টিউরিণের স্থান অধিকার করিল। টিউরিণ-অধিবাসিগণের আক্ষেপের সীমা রহিল না—রোম হইলে আনন্দের কারণ হইত। কিন্তু...... ফ্লরেন্স!

* * * *

এখনও যে ভেনিস্ অষ্ট্রিয়ার হাতে রহিল; শত ক্ষুদ্র চেষ্টাতেও যে তথায় অষ্ট্রিয়ার প্রতাপ পূর্ব্ববৎ অক্ষুণ্ণ রহিয়া গেল; তাহা হইলে, সমগ্র ইটালির একেশ্বরত্ব হইল কোথায়? নেপোলিয়নেরও ইচ্ছা যে ভেনিস হইতে অষ্ট্রিয়া বহিষ্কৃত হউক; কিন্তু তজ্জন্য আবার অষ্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিতে তিনি ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। ভিক্টর ইম্যানিউয়েল্ তাঁহাকে এবার খোসামোদ করিতেও নিতান্ত ইচ্ছুক ছিলেন না—কি জানি এবারেও যদি নেপোলিয়ন আরও কিছু জমি চাহিয়া বসেন! প্রুসিয়া সবেমাত্র ডেন্মার্কের নিকট হইতে শ্লেজ্‌বিক্—হোল্‌ষ্টাইন কাড়িয়া লইয়া, উত্তরে তাহার রাষ্ট্রীয় সীমারেখা আরও সরাইয়া লইয়া গিয়া, দক্ষিণে

অষ্ট্রিয়াকে টিউটন্ জাতির মধ্যে অপদস্থ করিয়া, তাহার স্থান অধিকার করিবার চেষ্টা করিতেছিল। সুতরাং, ইটালির সুবিধা হইয়া গেল। অষ্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে সন্ধিপ্রস্তাবে প্রুসিয়া সম্মত হইল। নেপোলিয়নও ভাবিলেন—মন্দ কি! পরের দ্বারা যদি কার্য্যসমাধা হয়, তাহাতে তাঁহার আপত্তি থাকিবে কেন? কিন্তু একেবারে নির্লিপ্ত থাকিলে চলিবে না। তিনি গোপনে প্রুসিয়ার সহিত বন্দোবস্ত করিলেন যে, ভেনিস্ হইতে অষ্ট্রিয়া তাড়িত হইলে প্রুসিয়া যেন ভেনিসিয়াকে নেপোলিয়নের হস্তে অর্পণ করে; তিনি পরে বুঝিয়া-সুঝিয়া ভিক্টর ইম্যানিউয়েলকে উহা দিবেন। গোপন সর্ত্তের কথা ভিক্টর ইম্যানিউয়েল কিন্তু বিন্দুবিসর্গও জানিতে পারিলেন না।

* * * *

১৮৬৬ খৃঃ অব্দে অষ্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ আরম্ভ হইল। কাষ্টোজা-ক্ষেত্রে ইটালীয় সৈন্য পরাজিত হইল। সমুদ্রবক্ষে লিস্সার যুদ্ধেও ইটালির নৌবাহিনী হটিয়া গেল। সেই বিষম দুর্দ্দিনে সকলেই বুঝিতে পারিল যে, দেশের সমগ্র শক্তি ভেনিসের উদ্ধারকল্পে নিয়োজিত করিতে না পারিলে কার্য্য সম্পন্ন হইবে না; এমন সময়ে সহসা যুদ্ধ স্থগিত হইয়া গেল। কোয়নিগ্‌গ্রেয়াট্‌জ ক্ষেত্রে প্রুসিয়া জয়লাভ করিয়া, ইটালির সহিত পরামর্শ না করিয়াই, অষ্ট্রিয়ার সহিত কথাবার্ত্তা কহিয়া, দিনকতকের জন্য যুদ্ধ স্থগিত রাখিল। কয়েকদিনের মধ্যে সন্ধি হইয়া গেল। ভেনিসিয়া ফরাসির হস্তে অর্পিত হইল। ফরাসি ইংরাজপ্রতিনিধি ভেনিস-বাসিগণের করে তাহাদের দেশ ফিরাইয়া দিলেন। তাহারা সমবেত হইয়া, ভোট দিয়া, স্বেচ্ছায় ইটালিরাজ্যভুক্ত হইল। ভিক্টর ইম্যানিউয়েলের সাধনা সিদ্ধ হইল। হায়; ক্যাভূর যদি এখন জীবিত থাকিতেন!

* * * *

কিন্তু রোম যে এখনও বাহিরে রহিল। বন্দী গ্যারিবল্ডি ক্যাপ্রেরা হইতে পলায়ন করিলেন। কতকগুলা সশস্ত্র দলের সর্দ্দার হইয়া তিনি রোমের বিরুদ্ধে অগ্রসর হইলেন ; কিন্তু পরাজিত হইয়া সরিয়া পড়িলেন। মহাগোল বাঁধিয়া গেল। ম্যাটসিনি বিরক্ত হইয়া রাজার বিরুদ্ধেই বিদ্রোহী হইতে প্রবৃত্ত হইলেন। এদিকে ১৮৭০ সালের জুলাই মাসে রোমের পোপ খৃষ্টীয় সঙ্ঘের এক বিরাট সভা আহ্বান করিলেন। এখন পর্য্যন্ত এইটিই রোমানক্যাথলিক চার্চ্চের শেষ সম্মিলন। ঠিক দুইদিন পূর্ব্বে নেপোলিয়ন প্রুসিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করিয়াছিলেন। রোম হইতে ফরাসি সৈন্য ফ্রান্সে প্রত্যাবর্ত্তন করিল ; a la Berlin শব্দে দিঙ্মণ্ডল-ধ্বনিত হইয়া উঠিল। এইত অবসর। ভিক্টর ইম্যানিউয়েল বিনীত ভাবে পোপকে রোমসম্বন্ধে আলাপ করিবার জন্য আহ্বান করিলেন। কোনও ফল হইল না। এমন সময়ে সেডান ক্ষেত্রে নেপোলিয়ন ধরা পড়ার সংবাদ ভিক্টরের কানে পৌঁছিল। কালবিলম্ব না করিয়া, রাজার সৈন্য রোমের দিকে অগ্রসর হইল। রোম তাঁহার হস্তগত হইল। ভেনিসের মত, রোমের অধিবাসীরা স্বেচ্ছায় ভোট দিয়া, রোমকে ইটালি-রাষ্ট্রভুক্ত করিয়া দিল। —১৮৭২ সালে রোম নগরী সমগ্র ইটালির রাজধানী হইল।

* * * *

পাঁচ বৎসর কাটিয়া গেল। ক্রিস্পি, রাজার ক্যাবিনেটে প্রবেশ লাভ করিলেন। একসময়ে তিনি, ম্যাটসিনির শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া, রাজ্যতন্ত্রের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন। কিছুকাল পরে, তিনি বুঝিতে পারিলেন যে রাজা না থাকিলে ইটালির রাষ্ট্রীয় স্বপ্ন বিষম অনর্থ ঘটাইবে। তখন তিনি, ম্যাট্‌সিনিকে ছাড়িয়া, গ্যারিবল্ডিকে গুরুত্বে বরণ করিলেন। তাঁহার রাজনৈতিক জীবনের, প্রথমাংশটা এমনি করিয়া আকা-বাঁকা পথে চলিয়া, শেষটা নিজের গন্তব্য ও কর্ত্তব্য স্থির করিয়া লইল। তাঁহার মত

প্রতিভাসম্পন্ন রাজভক্ত পুরুষের আবশ্যকতা অতি শীঘ্রই বুঝা গেল। ১৮৮১ খৃঃ অব্দে আল্‌জীরিয়ার সীমান্তে একদল লোক একটা ফরাসি পল্টনকে আক্রমণ করে। ফরাসি গভর্মেণ্ট টিউনিসের শাসনকর্ত্তাকে বলিল যে, ফ্রান্স আততায়ীদিগকে শাস্তি দিবে। এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে টিউনিস্ য়ুরোপের রাজন্যবর্গের নিকটে আবেদন করিল বটে; কিন্তু অল্পকালের মধ্যেই ফ্রান্স বিসার্টা দখল করিয়া বসিল। টিউনিস্ ফ্রান্সের বশ্যতা স্বীকার করিয়া সন্ধি করিতে বাধ্য হইল।......এই ব্যাপারে সমগ্র ইটালি ক্ষুব্ধ ও চঞ্চল হইয়া উঠিল। ইটালির অধিবাসী ব্যতীত আর কেহ যে সিসিলির এত সন্নিকটে নিজ প্রভাববিস্তার করিতে চেষ্টা করিবে, এমন চিন্তা কাহারও মনে উদিত হয় নাই। বিশেষতঃ, টিউনিসিয়াতে বহুসংখ্যক ইটালীয় নরনারী কাজকর্ম্ম করিতেছিল; তাহাদের মনে এই আশা ক্রমশঃ বলবতী হইয়া উঠিতেছিল যে—একদিন টিউনিসিয়া ইটালির উপনিবেশে পরিণত হইতে পারে। কিন্তু ঘটনাচক্রে ইটালি এ সময়ে কিছুই করিতে পারিল না। বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় দলের নেতৃগণ এখন ইটালিকে জর্ম্মনি ও অষ্ট্রিয়ার সহিত সখ্যসূত্রে আবদ্ধ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন;—ক্রিস্পি ও সিড্‌নি সন্নিনো বিশেষভাবে এই দিকে ঝুঁকিলেন। আরও একটু কথা ছিল।—পোপকে ছলে-বলে-কৌশলে নবীন ইটালির রাষ্ট্রতন্ত্রে সম্মত করিয়া রাখা হইয়াছিল। যদি কোনও সূত্রে তিনি, অষ্ট্রিয়া ও জর্ম্মনির সাহায্য লইয়া, আবার নিজের রাষ্ট্রীয় স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা করেন! মহিষী-সমভিব্যাহারে রাজা হাম্বার্ট (বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি যে, ১৮৭৮ সালে রাজা ইম্যানিউয়েলের মৃত্যু হইয়াছিল) ভিয়েনা নগরীতে উপস্থিত হইলেন।—অষ্ট্রিয়া, ইটালি ও জর্ম্মনিতে রাজা-প্রজার আনন্দের সীমা রহিল না।

১৮৮২ খৃঃ অব্দের মে মাসে মধ্য য়ুরোপের শক্তিত্রয়ের মৈত্রী কাগজে-

কলমে পাকাপাকি হইয়া গেল। দিনকয়েকের মধ্যেই গ্যারিবল্ডি ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন। ইটালির ইতিহাসে তাঁহার অক্ষয়কীর্ত্তি স্বর্ণাক্ষরে খোদিত হইয়া আছে। আজ এই মহাপ্রলয়ের মধ্যে, যেন তাঁহার প্রেতাত্মা আল্পস এর তুঙ্গশৃঙ্গে দণ্ডায়মান হইয়া, স্বদেশবৈরীকে নিপাত করিবার জন্য গভীর নিশীথে নক্ষত্রালোকে ইটালির সৈনিকগণকে আহ্বান করিতেছেন! ঘটনাচক্রে আজ ইটালির পরমবৈরী—অষ্ট্রিয়া; আর, অষ্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে সমর ঘোষণা করিলেন—ব্যারণ সিড্নি সন্নিনো। ১৯১৫ খৃঃ অব্দের মে মাসে ইটালি অষ্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ-ঘোষণা করিল।

* * *

জর্ম্মানির চান্সেলর ডাক্তার ফন্ বেট্‌ম্যান, হল্‌বেগ্ বলিলেন—'অষ্ট্রিয়া-হাঙ্গেরি কিম্বা জর্ম্মান, কেহই ইটালিকে ভয় দেখায় নাই। একবিন্দু রক্তপাত না করিয়াও, একজন ইটালীয়ানের জীবন বিপন্ন না করিয়াও, ইটালি তাহার অভীপ্সিত দ্রব্য পাইত, টাইরল প্রদেশে এবং ইজঞ্জো নদীতীরে—যতদূর পর্য্যন্ত ইটালীয় ভাষা কথিত হয়—সর্ব্বত্রই ইটালীয় জাতির আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করা হইত; ট্রীষ্ট্-প্রদেশে ইটালীয় জাতির 'নেশনত্ব' বজায় রাখিবার ব্যবস্থা করা হইত; আল্‌বানিয়াতে ইটালি যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পাইত; ভ্যালোনা বন্দর সম্বন্ধেও কেহ কোন কথা কহিত না।—কেন তবে ইটালি আমাদের পরামর্শ লইল না?' তদুত্তরে ইটালির পররাষ্ট্র-সচিব ব্যারণ সন্নিনো বলিলেন—'ইটালীয় জাতীয়তা-সম্বন্ধে অষ্ট্রিয়া বরাবর একটা কূটনীতি পালন করিয়া আসিতেছে—আড্রিয়াটিক্ সাগরের তীরে, যেমন করিয়াই হউক, ইটালীয় জাতির নেশনত্ব ও জাতীয়তা সম্পূর্ণরূপে উচ্ছেদ করিতে হইবে। সর্ব্বত্রই ক্রমে-ক্রমে ইটালীয় কর্ম্মচারীর পরিবর্ত্তে ভিন্ন জাতীয় লোক নিযুক্ত করা হইতেছে; নানাপ্রকার লোভ দেখাইয়া ভিন্নভিন্ন জাতির শতশত গৃহস্থকে

সমুদ্রতীরবর্ত্তী প্রদেশে বাস করিবার সুবিধা করাইয়া দেওয়া হইতেছে; ট্রীষ্টের স্বায়ত্তশাসনক্ষমতা খর্ব্ব করিয়া দেওয়া হইয়াছে; নূতন ইটালীয় স্কুল-স্থাপনে যৎপরোনাস্তি বাধা দেওয়া হইতেছে; ধর্ম্মাধিকরণে, বিশ্ববিদ্যালয়-স্থাপনে বাণিজ্য-ব্যবসায়ে ইটালীয় জাতিকে মাথা তুলিতে দেওয়া হইতেছে না। মাঝে মাঝে diplomatic কথাবার্ত্তা চলিয়াছে। কিন্তু এবার, এই বল্‌কান্‌-ব্যাপারে, অষ্ট্রিয়া, সন্ধির সর্ত্তমতে, আমাদিগকে আগে কিছু জানায় নাই, অথচ Article VII অনুযায়ী আমাদিগকে জানান একান্ত আবশ্যক ছিল। শেষপর্য্যন্ত আমরা Italia Irredenta (অষ্ট্রিয়াধীন) ইটালি সম্বন্ধে পাকা-কথা পাইলাম না; তাই, তেত্রিশ বৎসর পরে, ৪ঠা মে তারিখে মধ্য য়ুরোপের শক্তিত্রয়-মৈত্রী denounce করিতে হইল।'

* * *

১৮৬৬ খৃঃ অব্দে, যে দিন বিজয়ী গ্যারিবল্ডিকে ট্রেন্টিনো গিরিসঙ্কট হইতে প্রত্যাবৃত হইবার জন্য প্রধান সেনাপতি দূতমুখে বলিয়া পাঠাইলেন —"অগ্রসর হইও না; সন্ধি করিবার ব্যবস্থা হইতেছে"—সেইদিন হইতে এই ইটালীয় Irredentism-এর আরম্ভ। গ্যারিবল্ডি বুঝিতে পারিলেন, ভেনিস পাওয়া যাইবে; কিন্তু ট্রীষ্ট্‌-ট্রেন্ট্‌-ডাল্‌মেশিয়া পাওয়া যাইবে না। তাই, আজ, আল্পসের গিরিসঙ্কটে ইটালীয় সৈনিক পুরুষের সম্মুখে তাঁহার প্রেতমূর্ত্তি আবির্ভূত হইয়া, অঙ্গুলিনির্দ্দেশে তাঁহার প্রাণাধিক প্রিয়তমা Italia miaর দিকে সকলের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিতেছে;—তাঁহার চক্ষুদ্বয় প্রোজ্জ্বল, বাহুদ্বয় প্রসারিত; অধিত্যকায়-উপত্যকায়, আকাশে-গিরিকন্দরে, স্তব্ধ নক্ষত্রালোকে, তাঁহার Italia mia যেন করুণ সুরে ধ্বনিত হইতেছে।

* * *

পালামেজ্জিও ক্রিস্পি যখন বুঝিতে পারিলেন যে—ট্রেন্টিনো পাওয়া যাইবে না; বিস্মার্ক যখন তাঁহাকে বলিলেন—'কি করিব? নেপোলিয়ন ও ফ্রান্স যোসেফ্ দুই সম্রাটে মিলিয়া সমস্ত ভাঙ্গা-গড়া আগে হইতেই স্থির করিয়া ফেলিয়াছিলেন; প্রুসিয়ার সহিত আদৌ এ বিষয়ে পরামর্শ করা হয় নাই';—তখন হইতে তিনি সঙ্কল্প করিলেন, যেমন করিয়াই হউক, অষ্ট্রিয়ার সহিত সখ্যবন্ধন বজায় রাখিতে চেষ্টা করিতে হইবে। যখনই গোলযোগের চিহ্নপ্রকাশ পাইয়াছে, তখনই তিনি, কড়া ব্যবস্থা করিয়া, দুষ্টের দমন করিতে লাগিলেন। ভিতর ভিতর তিনিও যে Irredentist ছিলেন, সেবিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ থাকিতে পারে না। ইটালির এমন কোনও অধিবাসী ছিল না, যিনি ট্রেন্টিনো পাইবার আকাঙ্ক্ষা মনে মনে পোষণ করিতেন না। কিন্তু ক্রিস্পি, অনন্যোপায় হইয়া, শক্তিত্রয়-মৈত্রীর উপর একান্ত নির্ভর করিয়া, কার্য্য করিতে বদ্ধ-পরিকর হইলেন। অত্যন্ত অসহ্য হইয়া উঠিলে, অষ্ট্রিয়ার পররাষ্ট্রসচিবকে ট্রেন্টিনোর শাসনপ্রণালী সম্বন্ধে সতর্ক করিয়া দিতেন। তাঁহার একখানি পত্রে (২৯এ জুলাই, ১৮৯০) দেখিতে পাই, তিনি লিখিতেছেন—'আমার দৃঢ়বিশ্বাস যে আমাদের রাষ্ট্রীয়সখ্যতা, ইটালি ও অষ্ট্রিয়া উভয়ের পক্ষে মঙ্গলকর। ইটালি তাহার চতুঃসীমার রক্ষণাবেক্ষণ অবশ্যকর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচনা করে। দুর্ভাগ্যবশতঃ ফ্রান্সকে বন্ধুভাবে পাওয়া এখন তাহার পক্ষে সম্ভবপর নহে; সুতরাং, অষ্ট্রিয়ার সহিত অচ্ছেদ্যবন্ধনে আবদ্ধ হওয়া তাহার দরকার। যাহাতে এ বন্ধুত্ব নষ্ট হইতে পারে, এমন কিছু করা উচিত নয়। যদি অষ্ট্রিয়া আমাদের হাতছাড়া হইয়া যায়, তাহা হইলে হয় ত সে, আমাদের বিরুদ্ধে ফ্রান্সের সহিত ষড়্যন্ত্র করিয়া, পোপের ক্ষমতা পুনরুজ্জীবিত করিতে পারে। ওদিকে আবার অষ্ট্রিয়ারও

ইটালিকে আবশ্যক; অবস্থাবিশেষে ইটালি তাহার যথেষ্ট সাহায্য করিতে পারে। আল্পস্ ও আড্রিয়াটিক সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইয়া, অষ্ট্রিয়া তাহার প্রাচ্য সীমান্তের দিকে বেশী মনোযোগ করিতে পারে; সেই দিকেই তাহার স্বার্থ ব্যাহত হইবার আশঙ্কা আছে।' অতএব, অষ্ট্রিয়া যেন ইটালীয় জাতিকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া না তুলেন। উভয়েরই যখন উভয়কেই আবশ্যক, তখন দ্বন্দ্ব-কলহে কাহারও লাভ নাই।

*   *   *

কিন্তু ব্যাপারটা ক্রমশঃই গুরুতর হইয়া দাঁড়াইল। ট্রেন্টিনো প্রদেশে ইটালীয়দিগের সংখ্যা প্রায় চারলক্ষ; খাঁটি অষ্ট্রিয়ান্—মাত্র দশ-বার হাজার। ট্রেন্টিনোর ভৌগোলিক অবস্থান দেখিয়া বোধ হয় যেন ইহার ইটালির সহিত নৈসর্গিক সম্বন্ধ বিধির বিধান। স্থানে স্থানে লম্বার্ড বা ভেনিসীয় ভাষা ব্যবহৃত হয়। ইহাদের প্রধান কারবার—রেশমের। ব্যবসা চলিত প্রধানতঃ ভেনিসিয়া ও লম্বার্ডির সহিত। কিন্তু লম্বার্ডি ও ভেনিসিয়া স্বতন্ত্র ইটালি রাজ্যভুক্ত হইলে, এই ব্যবসাটি নষ্ট হইয়া গেল। এখন সেখানকার অধিকাংশ লোক কৃষিকার্য্যে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে লাগিল। সহরে অল্প লোকই বাস করে। গভর্মেণ্টের দিক্ দিয়া দেখিলে, এই পার্ব্বত্য প্রদেশটীকে একটা প্রকাণ্ড সেনানিবাস বলিলে অত্যুক্তি হয় না। সেনানীর হুকুমে কোনও ইটালীয় শিল্পীর আবেদন গ্রাহ্য হইত না; কোনও কারণে, বা অকারণে, তাহাকে বহিষ্কৃত করিতে পারিলে ভাল হয়; ইটালীয় অর্থে ট্রেন্টিনোর শিল্পবিস্তার নিষিদ্ধ। ইটালি হইতে গরু ভেড়াপর্য্যন্ত আমদানি করা বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল। অষ্ট্রিয়ার চোখে—ট্রেন্টিনো 'দক্ষিণ টাইরল্' ভিন্ন আর কিছু নহে। ট্রেন্টিনো

নামে যদি ইটালির গন্ধ থাকে, দক্ষিণে টাইরলে ত একেবারেই তাহা নাই।

*   *   *

ট্রীষ্ট, ফিউম্, অষ্ট্রিয়া, ডলিমেশিয়া সম্বন্ধে মোটামুটি একটা কথা বলা যাইতে পারে,—সহরতলি জায়গার অধিবাসিগণ ইটালিয়ান; গ্রাম্য লোকগুলা অধিকাংশই স্লাভ। ট্রীষ্টের লোক সংখ্যা দুইলক্ষেরও অধিক, কিন্তু অত্যাচারের সীমা ছিল না। অষ্ট্রিয়ান গভর্মেণ্ট, দূরদেশ হইতে স্লাভ আনাইয়া, ইটালীয়দিগকে জব্দ করিবার চেষ্টা করিতেছিল। এমন অনেকের সন্দেহ হইয়াছিল যে, অষ্ট্রিয়ার যুবরাজ, সারাযেভোয় হত না হইলে, এই অঞ্চলে তিনি একটা স্লাভ ষ্টেট গড়িয়া তুলিতেন;

*   *   *

অথচ ক্রিস্পি যে রাষ্ট্রনীতি অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহা পরিত্যাগ করা একেবারেই অসম্ভব। টাকার অত্যন্ত দরকার; কিন্তু পারিসে পাইবার সম্ভাবনা নাই। তিনি বিস্মার্ককে বলেন—যদি জর্ম্মন্ ব্যাঙ্ক-গুলার কর্তৃপক্ষীয়েরা ইটালিতে ব্যাঙ্ক স্থাপিত করে, তাহা হইলে ইটালির বড় উপকার করা হয়। ইটালির গরজ বুঝিয়া, বিস্মার্ক, যেন কতকটা অনিচ্ছার সহিত তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। কাথাবার্ত্তা পাকা হইয়া গেলে, ১৮৯৪ খৃঃ অব্দে Banca Commerciale Italiana স্থাপিত হইল। তিন কোটী মুদ্রা মূলধনের অধিকাংশই জর্ম্মন, অষ্ট্রিয়ান ও সুইস্ ধনীদিগের টাকা। আজিকার এই মহা-যুদ্ধের প্রারম্ভে তাহার মূলধন দাঁড়াইয়াছে প্রায় এক সহস্র কোটী মুদ্রা! অল্পদিনের মধ্যেই ইটালির সমস্ত বাণিজ্য-পোত এই ব্যাঙ্কের জালের মধ্যে আসিয়া পড়িল; The Navigazione Generale

Italiana, The Lloyd Italiano প্রভৃতি বড় বড় কারবারগুলা ইহার নিকটে আত্মসমর্পণ করিল। এই ব্যাঙ্ক তখন লোহা-ইস্পাতের ব্যবসায়ে টাকা ধার দিতে লাগিল, রণতরী নির্ম্মাণে সাহায্য করিতে লাগিল; জর্ম্মনি হইতে প্রতি বৎসর এগার লক্ষ মণ লোহা আমদানীর ব্যবস্থা করিল। রাসায়নিক, খনিজ ও তাড়িৎ-বিজ্ঞানের দ্রব্যাদি ও জর্ম্মনি হইতে আসিতে আরম্ভ করিল। ক্রিস্পি যাহা স্বপ্নেও ভাবেন নাই, তাহাই হইল। 'শনৈঃ পন্থা, শনৈঃ পর্ব্বতলঙ্ঘনম্' নীতিসূত্র ধরিয়া আল্পস্ পর্ব্বত-লঙ্ঘন করিয়া জর্ম্মনজাতি ইটালির মধ্যে ধীরে ধীরে economic penetration আরম্ভ করিয়া দিল।

* * *

বিদ্যালয়ের ভিতর দিয়া আর এক রকম অনুপ্রবেশের পন্থা জর্ম্মনি অবলম্বন করিল। এই educational penetration অত্যন্ত সাঙ্ঘাতিক হইয়া দাঁড়াইল। তখন য়ুরোপে জর্ম্মনির পাণ্ডিত্য ও বিদ্যাচর্চ্চার ব্যবস্থা দেখিয়া সকলেই চমৎকৃত হইয়াছিল। ইটালি হইতে দলে দলে যুবকবৃন্দ, জর্ম্মনির বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করিয়া প্রত্যাবৃত্ত হইয়া স্বদেশে জর্ম্মনির শিক্ষাদীক্ষাবিস্তারের অনুকরণ করিবার প্রয়াস পাইল। ইটালির বাইশটি বিশ্ববিদ্যালয়ে ইটালীয় ছাত্রবৃন্দকে অল্পে অল্পে শিখান হইল যে, ইটালীয় সভ্যতায় যাহা কিছু সুন্দর, যাহা কিছু সারবান, তাহা লাটিন-মস্তিষ্ক সঞ্জাত নহে;—যে জর্ম্মন্ জাতিকে রোমের ইতিহাস-রচয়িতা ট্যাসিটস্ 'বর্ব্বর' আখ্যা প্রদান করিয়াছিলেন, সেই জর্ম্মন জাতির মস্তিষ্ক-প্রসূত; তাহারই কঙ্কালসার লাটিন সভ্যতার মধ্যে প্রাণসঞ্চার করিয়া সমগ্র য়ুরোপীয় সভ্যতার চেহারা ফিরাইয়া দিল; লাটিন ইটালিতে সমাগত জর্ম্মন জাতি যে বীজ বপন করিয়াছিল, তাহারই ফসল খ্রীষ্টীয় মধ্যযুগের নবজাগরণে—Renaissance-এ দেখা গেল।

সেই নব জাগরণের যুগের দেড় শত বিখ্যাত নাম উদ্ধৃত করিয়া একজন জর্ম্মন লেখক দেখাইলেন যে—তাঁহাদিগের মধ্যে ১৩০ জন নিঃসন্দেহ জর্ম্মন; তাঁহাদের চোখ, চুল, চেহারা, নরকপাল, সমস্তই তাঁহাদের জর্ম্মন্তের সাক্ষ্য দিতেছে। বাকী ২০ জনও জর্ম্মন, কিন্তু সঙ্কর। এত বেশী বাড়াবাড়ি করিতে গিয়া কিন্তু জর্ম্মনি ঠকিয়া গেল। তাহার Cultural penetration ইটালীর অন্তর্নিহিত কোন এক কঠিন মর্ম্মরস্তরে ঠেকিয়া পিছলিয়া গেল।

* * * *

জর্ম্মনি এইবার ইটালীর Home politicsএর ভিতর দিয়া বাজি মাৎ করিতে চেষ্টা করিল। দেশের অধিকাংশ লোক বুঝিতে পারিল—ইটালীর ভয় অষ্ট্রীয়া অপেক্ষা জর্ম্মনির বেশী; কিন্তু দেশের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ Politician জিওলিট্টি, নিজের গূঢ় উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিবার অভিপ্রায়ে জর্ম্মনির সহিত বন্ধুভাবে কথাবার্ত্তা চালাইতে লাগিলেন। সন্নিনো প্রমাদ গণিলেন।—তিনি যে বরাবর জর্ম্মনিকে সন্দেহের চক্ষে দেখিয়া আসিতেছেন। ক্রিস্পির বিশ্বস্ত অনুচর হইয়াও তিনি জর্ম্মন ব্যাঙ্কগুলাকে কখনও বেশী সুবিধা করিতে দিতে চাহেন নাই। অথচ পার্লামেণ্টের অধিকাংশ সভ্য জিওলিট্টির মুঠার ভিতরে। জর্ম্মন রাজপ্রতিনিধি ফন্ বুএলো তাঁহাকে বুঝাইয়া দিলেন—বিনা যুদ্ধে ইটালী অনেকটা সুবিধা করিতে পারিবে। জিওলিট্টি, রাজার সহিত দেখা করিয়া তাঁহাকে এই কথা বুঝাইয়া দিলেন। গত্যন্তর না দেখিয়া সন্নিনো পদত্যাগ করিলেন। সমগ্র ইটালীয় জাতি ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল—গ্যারিবল্ডির Italia mia কি জর্ম্মনির দাসী হইয়া থাকিবে?—দেশদ্রোহী জিওলিট্টির নিপাত হউক!—জিওলিট্টি রোম হইতে পলায়ন করিলেন। সন্নিনো স্বপদে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইলেন। তারপর?...আল্পস্‌এর শিখরদেশে এই গরুড়ের লড়াই।

য়ুরোপের বর্ত্তমান সমস্যা

(১৩২৯)

ইংরাজ বলিলেন,—"জেনোয়ায় চল"।

ফরাসী ঘাড় নাড়িলেন,—"জাহান্নমে যাও। ভার্সাইল পরিত্যাগ করিয়া পাদমেকং ন গচ্ছামি।"

জর্ম্মন একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন,—"জানিয়া শুনিয়া চুপ করিয়া থাকা যায় না। নিমন্ত্রণ পাইলে জেনোয়ায় কেন, যেখানে বল, যাইতে রাজি আছি।"

রুশ বলিলেন,—"যাহা হউক, এত দিন পরে অপাঙ্‌ক্তেয় বল্‌শেভিক যে তোমাদের পঙ্‌ক্তিতে আসন পাইবার উপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে, ইহা মন্দ রহস্য নয়। তবে,—জেনোয়া কেন, বাপু? লণ্ডন হইলে স্বয়ং লেনিন্ সশরীরে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে পারিতেন। আপাততঃ তাঁ'র শরীর কিছু খারাপ বটে। কিন্তু শুনিতেছি না কি যে, আমাদিগকে পরীক্ষা করিয়া লওয়া হইবে, আমরা শান্ত ভালমানুষ কি না? খবরদার!"

পোল বলিলেন,—"ফরাসী যখন বিমুখ, তখন আমার কি জেনোয়ায় যাওয়া উচিত? কিন্তু যাব, কি যাব না, মিছে সে ভাবনা; যাইতেই হইবে। জর্ম্মনির মার্ক তবু পদে আছে; আমার মার্ক আমাকে কি না বিপদে ফেলিয়াছে! আমার কথায় কেহ কর্ণপাত করিবে কি? ছোট-আঁতাতের সঙ্গে একজোটে মিলিয়া কাজ করিলে হয় না?"

চেকো-শ্লোভাক—"তা' বেশ ত; আমাদের তাহাতে আপত্তি নাই। জেনোয়ায় ছোট-আঁতাৎ ও পোল্যাণ্ড সম্মিলিত হইয়া কাজ করুক।"

যুগো-শ্লাভিয়া—"ঠিকই ত ; আমরা পরস্পরের দুঃখকাহিনী ভাল করিয়া বলিতে পারিব।"

রুমানিয়া—"তা বটেই ত। এখন আমাদের ছোটআঁতাতের স্বার্থ ও পোল্যাণ্ডের স্বার্থ পরস্পরবিরোধী নহে। তবে দলে পুরু হওয়া মন্দ কি ?"

অষ্ট্রীয়া—"আমি কি করি ? আমার নাড়ী কাটিয়া যে কয়টি রাষ্ট্রশিশু আজ সদ্যোজাত গরুড়ের মত চন্দ্রলোকে অমৃতের সন্ধানে ছুটিতেছে, তাহারা কি এই বিনতারূপিণী দাসীবৃত্তিধারিণী পরমুখাপেক্ষীকে সঙ্গে লইতে আজ লজ্জা বোধ করিবে ? কিন্তু আমার যে নান্যঃ পন্থাঃ।"

ইটালী বলিলেন,—"জেনোয়ায় আসিবে ? একটু সবুর কর। এখানকার রাষ্ট্রযন্ত্র প্রায় বিকল হইবার জোগাড় হইয়াছে। অমাত্যবর্গ এতই চঞ্চল যে, জেনোয়ায় কি কি বিষয় আমাদের তরফ হইতে কি ভাবে আলোচিত হওয়া উচিত, তাহা নির্দ্ধারণ করিবার চেষ্টা ত কাহারও দেখি না। আগে নিজের ঘর-করনা ঠিক না করিয়া আন্তর্জ্জাতিক বিপ্লবের মিটমাট করিবার চেষ্টা বৃথা।"

পোঁয়াকারে মাথা তুলিলেন।—"তবু ভাল! য়ুরোপের জাহান্নমে যাওয়ায় বাধা পড়িল। আমার আপত্তির কথা আমি ঘরে বাহিরে খোলসা করিয়া জানাইতে দ্বিধা করি নাই ; কিন্তু তোমার আপত্তি কি ?"

জিওলিট্টির ভ্রূ কুঞ্চিত হইল।—"জেনোয়ায় অষ্টবজ্রসম্মিলন তোমার ভাল লাগিতেছে না কেন, তাহা আমি জানি। তুমি কিছুতেই বিশ্বাস করিতে পারিতেছ না যে, এই অষ্টবজ্র-সম্মিলন না হইলে য়ুরোপ শাপমুক্ত হইবে না। নেপোলিয়নের মুখোস পরিয়া সভ্য জগতের রঙ্গমঞ্চের উপর তোমার আস্ফালনের ও তাণ্ডবের পশ্চাতে মার্শ্যাল ফশএর অসির ঝনৎকার আটলাণ্টিক মহাসাগর অতিক্রম করিয়া সুদূর ওয়াশিংটনের কর্ণপটহে

ধ্বনিত হইয়াছে। কুক্ষণে ব্রিয়াঁ লয়েড্ জর্জ্জের সঙ্গে গল্ফ্ ক্রীড়া করিলেন ; প্যারী নগরে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে না করিতেই তিনি দেখিলেন যে, সেই খেলার ফটোগ্রাফ সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়িয়াছে। কাগজওয়ালারা দেখাইল, কি কৌশলে সুচতুর ওয়েল্স্ খেলোয়াড় সরল কেল্টকে পরাজয় স্বীকার করাইতেছে। ব্রিয়াঁ পদত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। তুমি তাঁহার আসন অধিকার করিয়া বসিলে। সভ্যজগৎ বুঝিল, এইবার পোঁয়াকারে ও লয়েড্ জর্জ্জের দ্বৈরথ-যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী। ভার্স াইলের লয়েড্ জর্জ্জ, আইরিশ ফ্রী ষ্টেটের লয়েড জর্জ্জ, জেনোয়া অভিযানের লয়েড্ জর্জ্জ আজ হঠাৎ রথ হইতে অবতরণ করিতেছেন না কি ? পৃথিবী কি তাঁহার রথচক্র গ্রাস করিল ? তাঁহার সারথি, প্রাইভেট সেক্রেটরী সার জর্জ্জ ইয়ঙ্গার মূর্ত্তিমান্ টোরিবিদ্রোহের মত আজ বিমুখ হইয়া দাঁড়াইয়াছেন। লয়েড জর্জ্জ সরিয়া পড়িলে তুমি কি নিষ্কণ্টক হইবে ? ইংরাজ বলিতেছেন,—তুমি যে-সে লোক নও ; তুমি একটি মূর্ত্তিমান্ প্রোগ্রাম। তুমি জীবন্ত ভার্স াইল্ !”

পোঁয়াকারে মৃদুভাবে বলিলেন,—“তুমিও কি একটি প্রোগ্রাম নও ? দুই বৎসর এখনও পূর্ণ হয় নাই, ১৯২০ খৃষ্টাব্দের ৯ই জুন নিট্টি পদত্যাগ করিতে বাধ্য হইলে তুমি পনের দিনের মধ্যে নূতন রাষ্ট্র-সংসদ্ গঠিত করিলে। তদবধি ধনী ও নির্ধ নের দ্বন্দ্বে তোমার হস্তক্ষেপ, তোমার কার্য্য-প্রণালী, তোমার কাটা-ছাঁটা প্রোগ্রাম...আর,—ইটালীর ভূতপূর্ব্ব রাজমন্ত্রী নেপোলিয়নের নাম লইয়া শ্লেষ করিতেছেন ! উত্তম।”

জিওলিট্টি ছাড়িবার পাত্র নহেন। “শ্লেষ করিব কেন ? তুমি বোধ হয়, আমাকে স্মরণ করাইয়া দিতে চাও যে, তোমাদের তৃতীয় নেপোলিয়ন না থাকিলে আমাদের ইটালী-রাষ্ট্র গঠিত হইত না। আমরা তাহা অবনত-মস্তকে স্বীকার করিয়া লইব। কিন্তু তিনি তাঁহার সাহায্যদানের পরিবর্ত্তে

যে দুইটি প্রদেশ দখল করিয়া লইলেন, তাহাদের সহিত আমাদের বহু কালের স্মৃতি জড়িত;—নীস্, গ্যারিবল্ডির জন্মভূমি; আর স্যাভয়, আমাদের রাজবংশের কুলপরিচয় বহু যুগ ধরিয়া দিয়া আসিতেছে। জর্ম্মনির কাছেও আমাদের রাষ্ট্রসংগঠন ব্যাপারে আমরা ঋণ স্বীকার করিতে বাধ্য।”

বিদ্রূপের স্বরে পোঁয়াকারে বলিলেন,—“তবু ভাল যে, এখনও জর্ম্মনিকে সুখ্যাতি করিবার লোক সভ্যজগতে অন্ততঃ একজন জীবিত আছেন। তোমার ঐ ভদ্র জর্ম্মনিটি কিন্তু কোনও বিষয়ে ঋণ স্বীকার করিতে চাহেন না; তাই মহাসংসদ্ (Supreme Council)এর এত মাথাব্যথা; তাই ক্যানে (Cannes); তাই জেনোয়া! ভার্সাইল্ সন্ধির সর্ত্ত সে নেহাৎ গরজে পড়িয়া কিছু কিছু মানিতে বাধ্য হইতেছে। কিন্তু আমাদের ক্ষতিপূরণের সময় সে ক্রমাগত জবাব দিয়া আসিতেছে যে, সে সম্পূর্ণ অসমর্থ। গলা টিপিয়া জোর করিয়া যা কিছু আদায় করা হইতেছে। টাকাকড়ি সম্বন্ধে তার যত কিছু চাতুরী, তা আমাদের কাছে ধরা পড়িতেছে; কিন্তু লয়েড্ জর্জ্জ দেখিয়াও দেখিতেছেন না, ইহাই আমাদের আক্ষেপ। আবার ইংরাজী কাগজগুলাতে যে সুর বাজিয়া উঠিয়াছে, ফরাসীর পক্ষে তাহা মোটেই আরামপ্রদ নহে। কাজেই আমাদের কাগজওয়ালারাও পাল্টা জবাব গাহিতেছে। ইংরাজ বলেন, আমরা আট লক্ষ সশস্ত্র সুসজ্জিত সৈনিক রাখিয়াছি, সমগ্র য়ুরোপকে নেপোলিয়নের মত পদতলে রাখিবার জন্য;—তুমিও ত নেপোলিয়নের মুখোস-পরা ইত্যাদি ভাষা প্রয়োগ করিয়া ঐ রকমই ভাব প্রকাশ করিলে। যাক, সে সব বোঝাপড়া ইংরাজের সঙ্গে আমাদের করিবার সময় আসিয়াছে; কিন্তু জেনোয়ায় নহে। জেনোয়া লয়েড্ জর্জ্জের কীর্ত্তি; যেমন হেগ্ ট্রিবিউন্যাল্ ছিল নিকোলাসের কীর্ত্তি; জেনীভা, উইল্সনের কীর্ত্তি; ওয়াশিংটন্, হার্ডিঙ্গের কীর্ত্তি। যে বল্‌শেভিক রুশিয়া পূর্ব্বতন রোম্যানফ্ বংশের

আমলের সমস্ত ঋণ অস্বীকার করিয়া আমাদিগকে ভরাডুবি করিতে বসিয়াছে, তাহাকে না কি সাদরে জেনোয়া বৈঠকে আহ্বান করা হইয়াছে; জর্ম্মনিকেও না কি বিশেষ কিছু: সুবিধা করিয়া দিবার আয়োজন করা হইতেছে! সে ক্ষেত্রে আমরা সব দিক্ না বুঝিয়া সহসা একটা ফাঁদে পড়ি কেন? যাক, আমি কেবল নিজের কথাই বলিয়া যাইতেছি। আমরা পরস্পর বৃথা কথা কাটাকাটি করিতেছি। তোমাদের রাষ্ট্রীয় ব্যাপার কি এতই জটিল হইয়া উঠিয়াছে যে, য়ুরোপের এই দুর্দ্দিনে তুমি সকলকে আরও দিন কতক সবুর করিতে বলিতেছ?"

জিওলিট্টি বলিলেন,—"হইয়াছে বই কি! যুদ্ধশেষে ইটালী ঋণভারে প্রপীড়িত হইয়া দেখিল যে, বিজয়ী হইয়াও সে বিশেষ কিছু লাভ করিতে পারিল না। এসিয়া ও আফ্রিকার জর্ম্মন উপনিবেশে তার কোনও দাবী রহিল না। তুর্কী-রাষ্ট্রের অন্তর্গত বিশেষ বিশেষ ভূখণ্ডে ইংরাজ ও ফরাসী কোন এক কাল্পনিক নেশন-সঙ্ঘের (League of Nations) আদেশে তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত হইয়া, সেই সমস্ত mandated territoryতে নিজ নিজ আধিপত্য বিস্তার করিতে আরম্ভ করিলেন। গ্রীস কোথা হইতে আসিয়া তাহাদের পাশে আসর জুড়িয়া বসিল; ইটালী কিন্তু দন্তস্ফুট করিতে পাইল না। এমন কি, তাহার বড় সাধের আড্রিয়াটিকের পথে পাঁচ জনে কাঁটা দিল। এ দিকে সাধারণ শ্রমজীবীর অন্নসংস্থান করা ক্রমশঃ কঠিন হইয়া পড়িল। দেশের মধ্যে বলশেভিক-নীতির প্রচার বৃদ্ধি পাইল। লোকে ভাবিল, মস্কো-নীতির অনুসরণ করিলে সমাজ রক্ষা পাইবে। এই নবীন ভাব-মদিরা আমাদের সেনা-বিভাগকেও চঞ্চল করিল। তুমি অবশ্যই জান যে, নিট্টি-সংসদ্ তাড়াতাড়ি অনেক সৈন্য কমাইয়া দিলেন, পাছে রুশিয়ার মত একটা ভীষণ আকস্মিক বিপ্লব আসিয়া পড়ে। কিন্তু সোশ্যালিষ্টদিগের তাড়নায় নিট্টি-গভর্মেণ্ট টিকিল

না। লণ্ডন ও প্যারী নগরীতে রাষ্ট্র-সচিবদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আড্রিয়াটিক সমস্যার সমাধানের তিনি কিরূপ চেষ্টা করিয়াছিলেন,—ব্রিয়াঁর বিপক্ষে থাকিয়াও তোমার তাহা অবিদিত ছিল না। এই সমস্ত কূট রাষ্ট্রনৈতিক তর্কবিতর্কের সূক্ষ্ম সূত্র ছিন্ন করিয়া কবিবর ডি-আনাঞ্জিও কেমন করিয়া ফিউম দুর্গ দখল করেন, কেমন করিয়াই বা তিনি বড়আঁতাঁৎ ও ছোট-আঁতাঁতের চাপে ফিউম পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হয়েন, তাহাও তোমার অবিদিত নাই।"

পোঁয়াকারে বলিলেন,—"হাঁ, কিছু কিছু জানি বটে। আরও জানি যে, ধনী ও নির্ধনের দ্বন্দ্ব মিটমাট করিতে গিয়া তোমার গভর্মেণ্ট দেশের সমস্ত কল-কারখানা, শিল্প-ব্যবসায়ের উপর ধনীর ও শ্রমজীবীর সমান কর্তৃত্বাধিকার দাঁড় করাইয়া দিল। সোশ্যালিষ্ট পত্রিকা 'অবন্তী' তোমার জয় ঘোষণা করিল।"

জিওলিট্টি বলিলেন,—"সোশ্যালিষ্টদিগের মধ্যে দলাদলি আরম্ভ হইল। আরও গোল বাধাইল, একটা নবীন ন্যাশনালিষ্ট দল—ফ্যাসিষ্ট। লড়াই বন্ধ হইয়া যাইবার পর বহু সেনানী স্থানে স্থানে ছোট বড় ক্লব স্থাপিত করিতে আরম্ভ করিলেন; নাম হইল—Fasci dei Combattenti যোদ্ধসঙ্ঘ। গ্যাব্রীল ডি-আনাঞ্জিওর ফিউম্ অভিযানে ইহারাই দল ভারি করিয়াছিল। ধনী বণিক্ ও কল-কারখানাওয়ালারা ইহাদের সাহায্যে সোশ্যালিষ্ট ও অন্যান্য শ্রমজীবি-সম্প্রদায়ের উচ্ছেদ সাধন করিবার প্রয়াস পাইল। তোমরা ধনি-নির্ধন-নির্ব্বিশেষে সমাজের সকল স্তরে কায়মনোবাক্যে মিলিত হইয়া তোমাদের দেশের লক্ষ্মীকে ফিরাইয়া আনিবার চেষ্টা করিতেছ;—দলাদলি বাদ-বিসংবাদ যত কিছু—জর্ম্মনির নিকট হইতে ক্ষতিপূরণস্বরূপ কতকটা আদায় করা যায়; ইহাই তোমাদের একমাত্র আসল তর্কের বিষয়। আর আমাদের গত বৎসরে

কল-কারখানায়, রেলষ্টেশনে, জাহাজে নৌকায় রক্তপাত ও বহ্নিবিভীষিকা! মিলান, ফ্লরেন্স, ব্যারি, ট্রীষ্ট—সর্ব্বত্রই এই উচ্ছৃঙ্খল তাণ্ডব! গত জুন মাসে আমাকে পদত্যাগ করিতে হইল। বনমী নূতন ক্যাবিনেট গঠিত করিলেন। তিনি নিজে সোশ্যালিষ্ট, কতকটা ফ্যাসিষ্টদিগকে জব্দ করিতে তিনি সমর্থ হইয়াছেন। আবার এখন ক্যাবিনেটে গোলমাল বাধিয়াছে। একটা পাকাপাকি মীমাংসা না হওয়া পর্য্যন্ত জেনোয়া মন্ত্রণা-সভায় আমরা কিছুই করিয়া উঠিতে পারিব না।...অথচ জেনোয়ায় যদি ভার্সাইলের গলদ সারিয়া লইবার চেষ্টা হয়—"

বিদ্রূপের স্বরে পোঁয়াকারে বলিলেন,—"ভার্সাইলের গলদ তোমার আমার দোষে হয় নাই; হঠাৎ জর্ম্মনির প্রতি ইংরাজ অত্যন্ত করুণা-পরবশ হইয়া একটা অনর্থের সৃষ্টি করিতেছেন। তিনি বলেন যে, তিনি যদি আমাদের সাহায্য না করিতেন, তাহা হইলে আমরা অতলে ডুবিয়া যাইতাম। কথাটা হয় ত আংশিকভাবে সত্য। কিন্তু আমরা চার কোটি নরনারী প্রাণপ্রণে জর্ম্মনীর গতিরোধ না করিলে, ইংরাজ আজ কোথায় থাকিতেন? যে জর্ম্মনি আমাদের দেশকে বিধ্বস্ত করিয়া য়ুরোপের মধ্যে আমাদিগকে সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষতিগ্রস্ত করিয়াছে, তাহার নিকট হইতে ক্ষতিপূরণস্বরূপ যাহা প্রাপ্য, তাহা আদায় করিবার চেষ্টা করিলেই ইংরাজ বাধা দিবার চেষ্টা করিতেছেন। অথচ আমাদের অর্থকোষ শূন্য; কিন্তু টেক্সের উপর টেক্স বসাইয়াও আমরা এবার বৎসরের আয়-ব্যয়ের হিসাব ঠিক রাখিতে পারিলাম না। গত মহা-সমরে অন্যূন পঞ্চদশ লক্ষ ফরাসী যুবক হত ও পঞ্চবিংশতি লক্ষ সাংঘাতিক-রূপে আহত হইয়াছে। এখন যদি আমরা অধিকৃত রাইন নদের তীরে লক্ষসংখ্যক কাফ্রী সৈন্যের সমাবেশ করাইয়া শত্রুদমনে চেষ্টিত হই, তাহা হইলে কেন আমাদের প্রতিবেশী পরমবন্ধুর গাত্রদাহ উপস্থিত

হয়? কেন তাঁহারা আমাদের শত্রুপক্ষীয়ের অভিযোগ নির্ব্বিচারে বিশ্বাস করিয়া বসেন? যে বলশেভিক রুশিয়ার সঙ্গে কোনও প্রকার মিত্রতাস্থাপনের চেষ্টা করা হইবে না,—ইংরাজের সঙ্গে এইরূপ সর্ত্ত আমাদের ছিল; কেন তাহার সহিত ইংরাজ বাণিজ্যসূত্রে গ্রথিত হইলেন,—অথচ আমাদের মতামত গ্রাহ্য করা সমীচীন বিবেচনা করিলেন না? রোমানফ বংশের বহুমূল্য হীরকাদি ইংরাজের বাজারে কেমন করিয়া প্রবেশ লাভ করিল? অথচ রোমানফের নামে ভূতপূর্ব্ব রুশিয়া গভর্মেণ্ট আমাদের নিকট হইতে ঋণ লইয়াছিল; আজ লেনিনের গভর্মেণ্ট সোজা বলিয়াছে যে, জারের আমলের ঋণের জন্য ইহারা কিছুমাত্র দায়ী নহে। সেই লেনিনের গভর্মেণ্টকে না কি জেনোয়া-সভায় প্রতিনিধি পাঠাইবার জন্য আহ্বান করা হইয়াছে? অথচ তুর্কীকে সে সভায় নিমন্ত্রণ করা হয় নাই;—কেন না, ইংরাজ বলিতেছেন, তুর্কী য়ুরোপের নহে; তুর্কী এসিয়ার রাষ্ট্র! সেই তুর্কীসাম্রাজ্য ভাংচুর করিয়া যেটুকু আমাদের তত্ত্বাবধানে রাখা হইল, সেটার জন্য সৈন্য-সামন্তের উপর প্রভূত অর্থব্যয় করিতে না পারিলে অ্যাঙ্গোরাকে লইয়া কিছু বিপন্ন হইবার সম্ভাবনা। রাইন নদের তটে ফরাসী সৈন্যরক্ষার খরচ জর্ম্মনি যোগাইতেছে। কিন্তু এই অদূর প্রাচ্য ভূখণ্ডে ঘরের কড়ি দিয়া সীমান্ত-রক্ষার চেষ্টা বেশী দিন না করিয়া, যদি আমরা অ্যাঙ্গোরাকে খানিকটা বন্ধুভাবে গ্রহণ করিয়া, তাহার হাতে ছাড়িয়া দিয়া থাকি, তাহাতে লর্ড কর্জ্জনের মাথার টনক নড়ে কেন? বলশেভিক রুশের সঙ্গে ইংরাজ বাণিজ্য করিবার ব্যবস্থা করিলেন আমাদের মতামত অগ্রাহ্য করিয়া; ইংরাজকে সম্পূর্ণরূপে না জানাইয়া অ্যাঙ্গোরার সহিত বোগদাদ রেলপথ ও সিলিসিয়া সম্বন্ধে যদি আমরা একটা সুব্যবস্থা করিয়া থাকি, তাহা কি এতই গর্হিত হইয়াছে? ভার্সাইলের উপর কারিগরি করিয়া গলদ দাঁড় করাইল

কে? এখন জেনোয়ায় তাহার কতটা সারিয়া লইবার চেষ্টা করা হইবে? সভ্যজগতের রণসাজ খুলিয়া রাখিবার ব্যবস্থা করিবার জন্য ওয়াশিংটনে বৈঠক বসিল। স্থির হইল যে, বড় বড় যুদ্ধের জাহাজ আগামী দশ বৎসরের মধ্যে আর কেহ নির্ম্মাণ করিতে পাইবে না; যার যা' আছে, তা'ও সম্পূর্ণ রাখা হইবে না; ইংরাজ, মার্কিণ ও জাপানের নৌবহরের হার ৫: ৫: ৩ নির্দ্ধারিত হইল; আমরা বলিলাম, আমাদেরও বড় লড়াইয়ে জাহাজের সংখ্যা জাপানের সমান করা হউক; কেহ তাহা সমর্থন করিলেন না; প্রায় অর্দ্ধেক করিয়া দাঁড় করান হইল,—৫: ৫: ৩: ১.৭৫; আমরা তাহাই মানিয়া লইলাম। কিন্তু ভবিষ্যতে আমাদের সমুদ্রতীরবর্ত্তী নগর-বন্দরগুলিকে রক্ষা করিবার জন্য ও ব্যবসাবাণিজ্য অপ্রতিহত রাখিবার জন্য আমরা অধিকসংখ্যক ডুবজাহাজ চাহিয়াছিলাম; মিঃ ব্যালফোর অম্লানবদনে বলিলেন যে, আমরা ডুবজাহাজ চাহিতেছি, ইংরাজের বাণিজ্যতরী ডুবাইয়া দিবার জন্য! আমাদের সে প্রার্থনায় কেহ কর্ণপাত করিল না; পরন্তু মার্কিণের মনে আমাদের প্রতি অবিশ্বাস দাঁড় করাইবার চেষ্টা করা হইল,—যে মার্কিণ লড়াইয়ে নামিয়াছিল ফরাসীকে শ্মশানচিতা হইতে উদ্ধার করিবার জন্য। সে সময়ে আমি আমাদের প্রতিনিধি-চেম্বারকে যে কথা বলিয়াছিলাম, সে কথা তোমার মনে পড়ে কি?—America has entered the war because she will not see France on her funeral pyre,—সেই মার্কিণকে বিধিমত প্রকারে বিগড়াইবার চেষ্টা যাঁহারা করিলেন, আজ তাঁহাদের আহ্বানে আমরা জেনোয়া-বৈঠকে কেমন করিয়া যাই?"

জিওলিট্টি হাসিলেন,—"তোমার এ অভিমান বেশীক্ষণ স্থায়ী হইবে না। একবার ঐ ওয়েল্‌স্ ঐন্দ্রজালিক ভেল্কির মধ্যে তুমি আসিয়া

পড়িলেই ঠাণ্ডা হইয়া যাইবে। বুলোঁ নগরে না তোমাদের শীঘ্রই দেখা-শুনা ও অনেক বিষয়ে আলোচনা হইবে ?”

পোঁয়াকারে বলিলেন,—“তা’ ত হবে ; কিন্তু আগে হইতেই আমার একটা মন্তব্য লর্ড কর্জ্জনের নিকটে পাঠাইয়াছি ; তাহাতে কোনও কথাই গোপন করি নাই। ভার্সাইল সন্ধির বড় কথাগুলার পুনরুত্থাপন যদি করা হয়, তাহা হইলে আমাদের জেনোয়ায় যাওয়া নিষ্ফল। ক্ষতিপূরণ বাবদে জর্ম্মনি কত টাকা দিতে বাধ্য, তাহা পাকাপাকি স্থির হইয়া আছে ; রুশিয়াকে সভ্য য়ুরোপীয় শক্তিসঙ্ঘের মধ্যে প্রবেশ করিতে দেওয়া হইবে না, যদি সে আগেকার ঋণ স্বীকার না করে ; সে সম্বন্ধেও আমাদের মতের দ্বৈধ ছিল না ; পোল্যাণ্ড এবং ছোট-আঁতাতের রাষ্ট্রগুলির যে সীমানা ভার্সাইলে স্থির হইয়া সাধারণ জনমত কর্ত্তৃক গ্রাহ্য হইয়াছে, তাহার কোনও প্রকার নড়চড় করা হইবে না। সাইলিসিয়ার সীমান্ত লইয়া জর্ম্মনি এখনও গোলযোগ করিতে প্রস্তুত। এই রকম অনেক গোলমালের কথা রহিয়াছে, যাহার সুমীমাংসা জেনোয়ায় হওয়া কঠিন। তাই আমি জেনোয়ার বৈঠক আপাততঃ তিন মাস স্থগিত রাখিতে বলিয়াছিলাম। ইংরাজী কাগজগুলা কিন্তু ইহারই মধ্যে হৈ-চৈ আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। তাই ইংরাজ যখন বলিলেন,—‘জেনোয়ায় চল,’ আমি বলিলাম, ‘জাহান্নমে যাও’।”

এই সমস্ত কথোপকথনের মধ্যে ইংরাজ এতক্ষণ চুপ করিয়া ছিলেন ; কিন্তু আর ধৈর্য্যরক্ষা করা অসম্ভব হইল। তিনি বলিলেন,—“সকলকে জেনোয়ায় উপস্থিত হইবার জন্য অনুরোধ করিয়া আমি যে বিশেষ অন্যায় করিয়াছি, তাহা এখনও বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না। স্বীকার করি, আমাদের প্রত্যেকেরই নিজ নিজ স্বার্থসিদ্ধির প্রয়োজন আমাদিগকে ভিন্ন ভিন্ন পথে চালিত করিবার চেষ্টা করিতেছে ; আমাদের আন্তরিক

মিলনে বাধা দিতেছে; কিন্তু ভুলিলে চলিবে না যে, সকলের সমবেত চেষ্টা না হইলে য়ুরোপীয় সভ্যতাকে রক্ষা করা দুষ্কর। মার্কিণ আমাদিগকে সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখিতেছে; এত দিনের স্তব্ধ এসিয়া আজ ক্ষুব্ধ হইয়া আমাদের আচরণের ত্রুটিবিচ্যুতি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে লক্ষ্য করিতেছে; আফ্রিকায় নানা নবীন ভাবতরঙ্গের ঘাত-প্রতিঘাত তথাকার য়ুরোপীয় সভ্যতাভিমানী শ্বেতাঙ্গ নরনারীর জীবন-তটে আছাড় খাইতেছে। সেই সভ্যতা-তরীখানি আজ বিষম হেলিতেছে, দুলিতেছে,—বুঝি বা ডুবিতেছে। এই য়ুরোপীয় সভ্যতার কোন্ এক গোপন স্তরে হয় ত প্রাচীন গ্রীসের শিল্পকলা ঝিক্‌মিক্ করিতেছে; রোমক নীতিশাস্ত্র আইন-আদালতের কঠিন কীলকে মানব-জীবন বিদ্ধ করিয়াছে। কিন্তু য়ুডীয় ও খৃষ্টীয় ধর্ম্মের হাওয়া সেই নৌকার পাল স্ফীত করিয়া ধ্রুবতারার আলোকে আর তাহাকে চালিত করে না। এখন শিল্প-বাণিজ্য, আপিস, ব্যাঙ্ক যে সভ্যতার অঙ্গ, তাহার স্থায়িত্ব নির্ভর করিতেছে সোনা-রূপা ও কাগজের টাকার ধ্রুবত্বের উপর;—আন্তর্জাতিক দ্রব্য ও টাকা বিনিময়ের মধ্যে যদি কোথাও বিষম ফাঁক পড়িয়া যায়, তবেই সর্ব্বনাশ; এই exchange ও currency আধুনিক য়ুরোপীয় সভ্যতার মর্ম্মস্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে। সেই বিনিময় currency যদি বিকল হইয়া যায়, তাহা হইলে সবই গোলমাল হইবার সম্ভাবনা। যুদ্ধের সময় য়ুরোপের সকলেই ঋণী হইয়াছিল মার্কিণের কাছে; এখন পর্য্যন্ত সে ঋণের বাবদে এক কিস্তিও টাকা দেওয়া কাহারও ঘটিয়া উঠিল না;—আসল ও সুদের হিসাব ভীষণ হইয়া উঠিতেছে। তবুও হয় ত কিছু সুব্যবস্থা সম্ভবপর হইত, যদি আন্তর্জাতিক পরস্পর বিনিময়ের হার পূর্ব্বের মত অন্ততঃ মোটামুটি বজায় থাকিত। কিন্তু তাহা হইল না। ঘটনা-পরম্পরায় য়ুরোপের সমস্ত টাকাকড়ির ব্যাপার বিপর্য্যস্ত হইয়া গেল।

আমাদের গিনি (sovereign) ছিল সর্ব্বাপেক্ষা ধ্রুব; লড়াইয়ের মাঝামাঝি মার্কিণ ডলারের কাছে তাহার গৌরব ক্ষুণ্ণ হইল। মার্কিণ স্পর্দ্ধাভরে বলিল—Henceforth the world will think in terms of dollars; তাহার কাছে আমাদের ষ্টার্লিংএর মূল্য পনের শিলিংএরও কম হইয়া গেল! বেগতিক দেখিয়া আমরা ফরাসীর সহিত পরামর্শ করিয়া এক জন মার্কিণ ধনকুবেরকে আমাদের দালাল নিযুক্ত করিলাম। যতকিছু দ্রব্য অতঃপর আমেরিকায় ক্রয় করা হইল, ঐ দালাল সেগুলির মূল্য ষ্টার্লিংএ না দিয়া ডলারে দিতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু এমন করিয়া কি বেশী দিন চলে? উত্তমর্ণ মার্কিণ যখন আমাদের ষ্টার্লিং উচিত মূল্যে গ্রহণ করিতে রাজি হইল না, তখন তাহাকে আন্তর্জাতিক বিনিময় currencyতে পূর্ব্বের মত খাড়া করিয়া রাখা গেল না। যুদ্ধের অবসান হইলে ভার্সাইলে আমরা পরাভূত শত্রুকে চাপিয়া ধরিলাম। যে কয়লার দৌলতে গত শতাব্দীর প্রথমভাগে শিল্পবাণিজ্যে আমরা জগতের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হইয়াছিলাম, সেই কয়লা গত শতাব্দীর শেষভাগে জর্ম্মনিকে আমাদের চেয়েও বড় করিয়া দিল, এবং মার্কিণকে জর্ম্মনির চেয়ে বড় করিয়া তুলিল। ভার্সাইল সন্ধির সর্ত্তে জর্ম্মনির বড় বড় কয়লা-গর্ভ ভূখণ্ড হস্তান্তরিত করা হইল;—একটা ফরাসীকে ও অপরটা পোল্যাণ্ডকে দেওয়া হইল। জর্ম্মনির রহিল কেবল-মাত্র ওয়েষ্টফেলিয়ার কয়লা। শিল্পবাণিজ্যে জর্ম্মনিকে সম্পূর্ণরূপে জখম করাই উদ্দেশ্য। সমস্ত বড় ও মাঝারি বাণিজ্যপোত কাড়িয়া লওয়া হইল। চল্লিশ বৎসরেরও অধিক কাল জর্ম্মনি বিজেতৃ-শক্তিপুঞ্জকে বৎসরে বৎসরে ক্ষতিপূরণস্বরূপ যে টাকা দিবে বলিয়া অঙ্গীকার করিতে বাধ্য হইল, তাহা সুবর্ণমুদ্রা ভিন্ন অন্য কোনওরূপে দিলে গ্রাহ্য হইবে না; অর্থাৎ জর্ম্মনির যত সোনা আছে, সে সমস্ত ভারে ভারে আমাদের শূন্য-কোষে

অর্থাৎ আমাদের উত্তমর্ণ মার্কিণের বিপুল ধনাগারে নিয়মিত সময়ের মধ্যে পৌঁছাইয়া দিতে হইবে। যত কিছু জিনিষ সে রপ্তানী করিবে, সেগুলির উপর খুব কড়া শুল্ক বসাইয়া দেওয়া হইল। আর সমগ্র রাইন নদের তটে ইংরাজ-ফরাসী-মার্কিণ পাহারা বসান হইল। তাহার খরচ জর্ম্মনি যোগাইতেছে। প্রবল শত্রুকে এইরূপে নাগপাশে বদ্ধ করিয়া আমরা জয়োল্লাসে ভার্সাইল হইতে নিজ নিজ গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম। মিঃ লয়েড জর্জ্জ বলিলেন—এইবার জগতে গণতন্ত্র-রাষ্ট্রের আর কোনও বাধা থাকিবে না, the world will be made safe for democracy. কিন্তু তিনি কি বুঝেন নাই যে, এ সন্ধি শুধু জর্ম্মনির পক্ষে নয়, সমগ্র য়ুরোপের পক্ষে সাংঘাতিক হইবে? কেমন করিয়া বলিব যে, তিনি না বুঝিয়া বাঘা ক্লেমাসঁার কথায় সায় দিয়া গেলেন? ইটালীর তদানীন্তন প্রধান মন্ত্রী নিট্টি সম্প্রতি "শান্তিহীন য়ুরোপ" নামক যে পুস্তক রচনা করিয়াছেন, তাহাতে দেখা যায় যে, ১৯১৯ খৃষ্টাব্দের ২৫এ মার্চ্চ তারিখে মিঃ জর্জ্জ ফরাসী প্রতিনিধিগণকে বিজয়োদ্ধত হইয়া জর্ম্মনির প্রতি অবিচার করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। জর্ম্মনজাতীয় অধিকসংখ্যক লোক যাহাতে অপর রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত না হয়, ক্ষতিপূরণস্বরূপ দেয় টাকা যাহাতে জর্ম্মনি এক পুরুষের মধ্যেই পরিশোধ করিতে পারে, যাহাতে তাহাকে পৃথিবীর কোনও হাটে ক্রয়-বিক্রয় করিবার বাধা দেওয়া না হয়, যাহাতে সে নিজে পায়ে ভর দিয়া পুনরায় দাঁড়াইতে পারে; মিঃ জর্জ্জ পুনঃ পুনঃ ফরাসী-দিগকে তাহাই করিতে বলেন। তিনি আরও বলিয়াছিলেন,—'য়ুরোপের বড় বড় দেশগুলাকে নৌ-বাহিনীদ্বারা অবরুদ্ধ রাখা ভাল হইতেছে না; জর্ম্মনিকে নেশন-সঙ্ঘের মধ্যে প্রবেশ করিবার অধিকার দেওয়া হউক। যদি জর্ম্মনিকে অত্যাচার-নিপীড়নে ক্ষিপ্ত করিয়া তোলা হয়, তাহা হইলে য়ুরোপের পক্ষে ভয়ঙ্কর হইবে।' ক্লেমাসঁার পার্শ্বচরগণ যে জবাব দিলেন,

তাহাতে মিঃ জর্জ্জের আর বাঙ্‌নিষ্পত্তি হইল না। তাঁহারা বলিলেন,—'আপনি ভয় করিতেছেন যে, য়ুরোপে আমরা যে অবিচার করিতেছি, তাহাতে জর্ম্মনি ক্রুদ্ধ হইবে? তাহার প্রতি আপনারা যে অবিচার করিতে উদ্যত হইয়াছেন, তজ্জনিত জর্ম্মনির মর্ম্মান্তিক আক্রোশের কথা ভাবিয়া দেখিয়াছেন কি? আপনারা তাহাকে বৈদেশিক সমস্ত হাট-বাজার হইতে বহিষ্কৃত করিতে চাহিতেছেন; তাহার উপনিবেশগুলা কাড়িয়া লইতেছেন; তাহার নৌ-বাহিনী আত্মসাৎ করিতে প্রস্তুত। যাহা হউক, ও সব কথা কেন? মনে করুন না কেন, সুবিচারের অথবা অবিচারের জ্ঞান জর্ম্মনির তিরোহিত হইয়াছে; আমরা সব সখা মিলিয়া যত ইচ্ছা, অবিচার করিতে পারি।' বাদানুবাদ খুব হইল বটে; কিন্তু কয়েক সপ্তাহের মধ্যে মিঃ জর্জ্জ শান্ত শিষ্ট ভালমানুষটির মত সন্ধির কাগজে সহি করিলেন; নিটিও সহি করিলেন।

"সে আজ প্রায় তিন বৎসরের কথা। জর্ম্মনির সেনাদল ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইল। আমরাও ক্রমে ক্রমে বিদেশ হইতে অধিকাংশ সৈন্য ঘরে ফিরাইয়া আনিলাম। ভাবিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারা যাইবে,—ব্যাপারটা কি দাঁড়াইল। প্রায় পঞ্চাশ লক্ষ কর্ম্মক্ষম পুরুষ জর্ম্মনির গ্রামে নগরে ছড়াইয়া পড়িল। রাজা নাই,—কিন্তু অরাজকতার লক্ষণ দেখা গেল না। নেপোলিয়নের এল্‌বা অথবা সেণ্ট হেলেনা, উইলহেল্‌মের এমারঙ্গেন্—ভাবুকের মনে কি কবিত্ব জাগাইয়া তুলে, জানি না; কিন্তু এই পঞ্চাশ লক্ষ জর্ম্মন সৈনিক পুরুষ রণক্ষেত্র হইতে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া দেখিল যে, অন্নসংস্থানের কোনও উপায় তাহাদের নাই। পঁচিশ ছাব্বিশ লক্ষ বৃটিশ সৈন্যও দেশে ফিরিয়া দেখিল যে, তাহাদিগকে সম্পূর্ণ অকেজো হইয়া ভিক্ষাস্বরূপ ষ্টেটের নিকট হইতে যৎকিঞ্চিৎ অর্থ-সাহায্য লইয়া জীবনধারণ করিতে হইবে। কিন্তু ইংরাজের আশা ছিল, জর্ম্মনির নিকট হইতে

ক্ষতিপূরণস্বরূপ বেশ মোটা টাকা মধ্যে মধ্যে পাইবে, তাহাতেই তা'র মুস্কিল আসান ; কিন্তু জর্ম্মনির কোনও আশা ছিল কি ?

"দেখিতে দেখিতে তিন বৎসর প্রায় কাটিয়া গেল। এখন যাঁহারা মোটামুটি একটা হিসাব নিকাশ করিতে বসেন, তাঁহারা কোনও হিসাব মিলাইতে পারেন কি না, সন্দেহ। কেন পারেন না, তাহারও কোনও সঙ্গত কারণ খুঁজিয়া পাওয়া দুষ্কর। কার্য্য ও কারণের মাঝখানে একটা প্রকাণ্ড রহস্য-যবনিকা পড়িয়াছে ;—মিশরের স্ফিংক্স-রহস্যের মত যে তাহা উদ্‌ঘাটন করিতে না পারিবে, তাহার মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। ফরাসীর বুদ্ধিতে সেই সমস্যা-সমাধানের যে উপায় সমীচীন বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে, বাকি সমগ্র য়ুরোপ তাহা বাতুলতার পরিচায়ক বলিয়া উড়াইয়া দিতে প্রস্তুত। ফরাসী ভার্সাইল্ ছাড়িয়া এক পা যাইতে রাজী নহেন ; মধ্য ও প্রাচ্য য়ুরোপ বলিতেছে, এবং আমরাও দেখিতেছি যে, ঐখানেই আমাদের সকলের মৃত্যুবাণ রহিয়াছে। অথচ ভার্সাইলের জন্য এক ফরাসীকে দোষ দিলে তাহার প্রতি অবিচার করা হয় ; য়ুরোপের মধ্যে ইংলণ্ডের ও ইটালীর দায়িত্ব ফরাসীর অপেক্ষা কিছুমাত্র ন্যূন নহে। এই রহস্যময়ী সমস্যার উল্লেখ করিলেই বোধ হয়, ব্যাপারটা সকলের নিকটে সুস্পষ্ট হইবে। প্রথম দফা এই :—জর্ম্মনির রাজ্য নষ্ট হইয়াছে, বাণিজ্য নষ্ট হইয়াছে ; উপনিবেশগুলি গিয়াছে ; অধিকাংশ কয়লার খনিও গিয়াছে ; কাগজের মুদ্রায় দেশ ছাইয়া গিয়াছে, অথচ গত ১৫ই সেপ্টেম্বর হইতে দফায় দফায় কিস্তিবন্দি করিয়া, রেলের মালগাড়ী বোঝাই করিয়া স্বর্ণমুদ্রা মার্ক পশ্চিম সীমান্ত ছাড়াইয়া মার্কিণের কোষাগারে পৌঁছাইয়া দিতে হইতেছে। সমগ্র য়ুরোপই যখন মার্কিণের কাছে ঋণী, তখন সমস্ত সোনা তাহারই প্রাপ্য ; কিন্তু এক কপর্দ্দকও সে স্পর্শ করিল না। বেল্‌জিয়ম্ ও ফ্রান্স কাঁদাকাটি করিতে লাগিল। আগে তাহাদিগকে না দিলে চলে না।

যাক্, ও কথা এখন আলোচনা নাই করিলাম। কিন্তু যে জর্ম্মনির শিল্প-বাণিজ্য একেবারে জখম করা হইল, সে কেমন করিয়া এই ক্ষতিপূরণের টাকা যোগাইতে পারে? বিশেষতঃ ফ্রান্স বলিলেন,—'জর্ম্মনিকে বিশ্বাস নাই; সে সুযোগ পাইলেই ফাঁকি দিবে; তাহার নিকট হইতে প্রত্যেক পাই পয়সা আদায় করা চাই; যদি উহারা কিছুমাত্র ইতস্ততঃ করে, তাহা হইলে আমাদের কাফ্রী-সৈন্য রাইন অতিক্রম করিয়া আরও দু'একটা প্রদেশ অধিকার করিতে প্রস্তুত আছে।' স্বদেশের মধ্যে অবাধ প্রচলনের জন্য যথেষ্ট-সংখ্যক সুবর্ণমুদ্রার যখন অভাব, আর চারিদিকে সে শত্রু-পরিবেষ্টিত হইয়া রহিয়াছে, তখন কোথা হইতে সহসা সে আলাদ্দীনের দীপ পাইল, বলিতে পার কি? একজন সেই আঁধার পুরীতে হঠাৎ সেই দীপ জ্বালিয়া দিল। ষ্টিন্‌স্ নামধেয় এক জর্ম্মন কর্ম্মবীর বলিলেন,—'এ আর বেশী কথা কি? আমাদের দেশে যেখানে যা' সোনারূপা আছে, বাহির করিয়া দাও। ওগুলাকে আগে বিদায় কর; আর আমাদের ষ্টেটের যত ছাপাখানা আছে, সবগুলা দিনরাত চালাইয়া দেওয়া হউক, কেবল অনবরত কাগজের মার্ক মুদ্রিত করা হউক। মুদ্রা ত দ্রব্য-বিনি-ময়ের সহজ উপায়স্বরূপ; তা আমাদের দেশের মধ্যে সোনা রূপা না-ই রহিল, কাগজের টাকাতেই কাজ হইবে। যখন সোনায় আমাদের ঋণ-পরিশোধ করিতে হইবে, তখন সোনা চাই; অতএব আমাদের কাগজের মার্ক বিদেশে বিক্রয় কর।' রাশি রাশি মার্ক বিদেশের পোদ্দারের কাছে আসিল। এক পাউণ্ডের পরিবর্ত্তে ক্রমশঃ দু' শো, চার শো, ছ শো, আট শো…সাড়ে চৌদ্দ শো'র উপর মার্ক দাঁড়াইল। গত সেপ্টেম্বরের পূর্ব্বেই জর্ম্মনি পঁচিশ কোটি পাউণ্ডের মার্ক বিক্রয় করিয়া, সেই টাকায় প্রথম কিস্তি ক্ষতিপূরণের দাবী মিটাইয়া দিল। এত মার্ক কিনিল কাহারা? যাহারা ভাবিল যে, এই সময়ে মার্ক কিনিয়া মজুত করিতে পারিলে, পরে যখন

মার্কের মূল্য অধিক হইবে, তখন ছাড়িলেই প্রচুর লাভ হইবে। একদিন না এক দিন অবশ্য মার্কের দাম চড়িবে। কিন্তু ক্রমশঃ দেখা গেল, মার্কের দাম চড়িল না। তখন আমাদের দোকানী পশারী কারবারীরা হৈ-চৈ করিতে লাগিল। তাহারা বলিল, জর্ম্মনি পৃথিবীর হাটে সব চেয়ে সুবিধার দরে কেনা-বেচা করিবার জন্য ইচ্ছা করিয়া মার্কের দর চড়াইতেছে না। কেহ কেহ বলিল, সে নিজের দেশের মধ্যে মার্কের যে দর রাখিয়াছে, জর্ম্মনির বাহিরে তদপেক্ষা অনেক কম দরে মার্ক ছাড়িতেছে; সুতরাং তাহার কারবার বাণিজ্য বেশ চলিতেছে; বিদেশ হইতে সে বহু জর্ম্মন জিনিষ সরবরাহ করিবার জন্য অর্ডার পাইতেছে। ফরাসী বলিলেন, জর্ম্মনি আমাদিগকে ফাঁকি দিবার জন্য মার্ক লইয়া খেলা করিতেছে। সকলে বলিয়া উঠিলেন,—জর্ম্মনির ছাপাখানাগুলা বন্ধ করিয়া দেওয়া হউক, যাহাতে সে আর কাগজের মার্ক ছাপিতে না পারে। জর্ম্মন বলিলেন,— 'সে কি কথা? কেহ কি ইচ্ছা করিয়া নিজের দেশের টাকার মূল্য, কমাইয়া দেয়? ফাঁকি দিবার জন্য আমরা এমন কল পাতিয়াছি, যাহাতে সমগ্র নেশনটা দেউলিয়া হইয়া যাইবার সম্ভাবনা, এ রকম মনে করা কি বাতুলতা নহে? ফরাসীর যাত্রা ভঙ্গ করিবার জন্য জর্ম্মনি নিজের নাক কাটিতেছে, ইহা কি সম্ভবপর? মার্ক যখন কেহ লইতে চায় না, অথচ মার্ক বিক্রয় না করিলে reparationএর স্বর্ণমুদ্রা পাইবার সম্ভাবনা নাই, তখন মার্ক যে দরে অন্যে লইতে পারে, সেই দরে আমাদিগকে ছাড়িতে হইয়াছে; বাধ্য হইয়া আমাদিগকে ছাড়িতে হইয়াছে; ইহাতে কিসে আমাদের চাতুরি প্রকাশ পাইতেছে, বুঝিতে পারি না।' আমরা কিন্তু ছাড়িবার পাত্র নই; বলিলাম,—'যুদ্ধের পূর্ব্বে তোমরা আমাদের নিকট হইতে অনেক জিনিষ কিনিতে; এখন আমরা সেই সব এবং অন্যান্য আবশ্যক দ্রব্য বিক্রয় করিতে পারি, কিন্তু তোমরা অর্ডার দিতেছ

না কেন? এখন তোমাদের সঙ্গে ব্যবসা করিতে আমাদের আপত্তি নাই।' জর্ম্মনি উত্তর করিল,—'তোমাদের সঙ্গে ব্যবসা করিতে আমাদেরই কি আপত্তি আছে? তবে একটা মস্ত বাধা এই যে, তোমরা কেহ আমাদের নির্দ্ধারিত মূল্যে মার্কের পরিবর্ত্তে জিনিষ বিক্রয় করিতে প্রস্তুত নও; অথচ তোমাদের পাউণ্ডের সঙ্গে সমতা রক্ষা করিতে গিয়া আমাদের মার্কের এই দুর্গতি দাঁড়াইয়াছে। ধারে জিনিষ দিতে পার? খুব লম্বা ওয়াদায় ধার, long-term credit? যখন সামর্থ্য হইবে, মূল্য দেওয়া যাইবে।' কিন্তু তাহাতে আমাদের চলে কি? পোল্যাণ্ডের মার্ক, রুশিয়ার রুবল, অষ্ট্রিয়ার ক্রোণ কোন্ অতলে ডুবিয়াছে; ইটালীর লাইরার, ফরাসীর ফ্রাঙ্কের ও আমাদের পাউণ্ডের সঙ্গে ইহাদের কোনও সমতা রাখা অসম্ভব হইয়াছে। অথচ এই gold parityর উপর আমরা এতকাল নির্ভর করিয়া বসিয়া আছি; কোনও আকস্মিক ভূকম্পে আমাদের সেই চিরাভ্যস্ত gold parity নষ্ট হইয়া গেলে, আমাদের মনে হয়, যেন য়ুরোপীয় সভ্যতা নষ্ট হইতে বসিয়াছে। ফলে দাঁড়াইয়াছে এই যে, আমাদের জিনিষের কাট্তি য়ুরোপে একেবারে নাই বলিলেই চলে; কল-কারখানার কাজ বড়ই মন্দ। ১৯২০ খৃষ্টাব্দে এ দেশে যে আমদানী রপ্তানী হইয়াছিল, ১৯২১ সালে তাহার ঠিক অর্দ্ধেক হইয়া গিয়াছে। ফরাসী যে সকল বিলাস-সামগ্রী স্বদেশে প্রস্তুত করে, তাহা জর্ম্মনিকে ক্রয় করিতে অনুরোধ করা হইল। জর্ম্মনি বলিল,—'আমাদের জীবনধারণের উপযোগী অত্যাবশ্যক দ্রব্যাদি কি দিয়া ক্রয় করিব, তাহার চিন্তায় আমরা আকুল; বিলাস-সামগ্রী ব্যবহার করা এখন অসম্ভব।' বিজেতা ইংরাজ ও ফরাসী নিজ নিজ পণ্য লইয়া য়ুরোপের কোন হাটে বিকাইতে পারিতেছে না। জর্ম্মনির নিকট হইতে ঠিক যে পরিমাণ টাকা পাইবার আশা করা গিয়াছিল, তাহা অবশ্যই কেহ আমরা পাইলাম না; সুতরাং বাৎসরিক

আয়ব্যয়ের হিসাবে তাহার নিকট হইতে প্রাপ্য টাকার হিসাবে একটা আনুমানিক অঙ্ক বসাইয়া মিত্র-শক্তিদের মধ্যে কাহারও কাহারও বজেট ঠিক করিতে হইয়াছে। য়ুরোপের বর্ত্তমান সমস্যার এই দিক্‌টাই আমাদের সকলের চোখে পড়ে। দেখিয়া শুনিয়া মার্কিণ লেখকরা দূর হইতে বলিতেছেন,—'য়ুরোপ একটা প্রকাণ্ড হাসপাতাল; সকলেই শয্যাগত; কাহারও উঠিবার শক্তি নাই; আবার মজা এই যে, যদি কোনও কবিরাজ রোগের নিদান আবিষ্কার করিয়া আরোগ্য লাভের জন্য সুপরামর্শ দেন, তাঁহার ব্যবস্থায় কেহ কর্ণপাত করেন না। ইংরাজ ফরাসীকে দোষ দেন, ফরাসী ইংরাজকে দোষ দেন, এবং ইটালীর ভূতপূর্ব্ব প্রধান মন্ত্রী নিটি, ইংরাজ ও ফরাসী উভয়কেই দোষী বিবেচনা করেন।' আমাদের এই আঁতাৎ প্রায় কর্পূরের মত রাতারাতি উবিয়া যাইতেছে। কিন্তু বন্ধুবর পোঁয়াকারে কিছুতেই স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহেন যে, ভার্সাইল্‌ই য়ুরোপের সর্ব্বনাশ করিতে বসিয়াছে।"

পোঁয়াকারে মুখ তুলিলেন,—"ভার্সাইল্ য়ুরোপের সর্ব্বনাশ করিতে বসিয়াছে? হায় অমূর্ত্ত চতুর্দ্দশ লুই!"

ইংরাজের চক্ষু দীপ্ত হইয়া উঠিল।—"যে চতুর্দ্দশ লুই, সুরম্য ভার্সাইল প্রাসাদ ও মর্ম্মর-নির্ঝর-সেবিত ত্রিয়ানংকুঞ্জভবন রচিত করিয়াছিলেন, সার্দ্ধ দুই শতাব্দী পরে আজ তিনি ক্লেমেঁসো-পোঁয়াকারে মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া তাহার কক্ষে কক্ষে বিচরণ করিতেছেন। এক দিন মদোদ্ধত লুই বলিয়াছিলেন,—'L'etat c'est moi, রাষ্ট্র? সে ত আমি!' আজ তাঁহার ছায়ামূর্ত্তি বলিতেছেন,—'La Europa c'est moi, য়ুরোপ? সে ত আমি!"

দন্তে দন্ত নিপীড়ন করিয়া পোঁয়াকারে বলিলেন,—"কি যাতনা বিষে, বুঝিবে সে কিসে, কভু আশীবিষে দংশেনি যারে!' যে যুদ্ধে সমগ্র ফরাসী

জাতি চিতারোহণ করিয়াছিল, সে যুদ্ধ বিলাসী সমুদ্রমেখলদ্বীপবাসী ইংরাজের মুখের অর্দ্ধদগ্ধ চুরুটের ভস্মাগ্রটুকুও স্খলিত করিতে পারে নাই!”

ইংরাজ ধীরস্বরে বলিলেন,—“যুদ্ধে পারে নাই সত্য; কিন্তু ভার্সাইলের সন্ধিতে আমাদের পোড়া চুরুটের ছাই কেন, আস্ত চুরুট হইতেই আমরা একেবারে বঞ্চিত হইতে বসিয়াছি। আমাদের পাদরী ডীন্ ইঞ্জ্ বলিতে-ছেন, আমাদের কিছুতেই রক্ষা নাই—যদি আমরা ভার্সাইলের মত সন্ধি-শর নিক্ষেপ করিতে থাকি—if we wage peace; তাঁ'র এই ছোট্ট bon motটুকু তোমার হৃদয়ঙ্গম হইবে কি?”

বেগতিক দেখিয়া বেলজিয়মের এমিল্ ক্যামেয়ার্ট মধ্যস্থ হইয়া বলিলেন, —“আপনারা নিজ নিজ দুঃখের কাহিনী বলিতেই ব্যস্ত। একবার আমাদের অবস্থাটা ভাবিয়া দেখুন দেখি। ফরাসী মনে করিতেছেন, তিনি সম্মুখে না দাঁড়াইলে ইংরাজ বাঁচিত না; ইংরাজ ভাবিতেছেন যে, তিনি না দাঁড়াইলে ফরাসী বাঁচিত না। কিন্তু যুদ্ধের প্রারম্ভে প্রথম তিন সপ্তাহ আমরা যদি শত্রুর গতিরোধ না করিতাম, তাহা হইলে আপনারা উভয়ে কোথায় দাঁড়াইতেন? আমাদের বর্ত্তমান অবস্থা দেখুন। আমরা কিন্তু পরস্পরের দোষ ধরিয়া চুল চিরিয়া বিচার করিতে বসা প্রয়োজন মনে করি না। সে প্রকার বাগ্‌বিতণ্ডায় বিশেষ কোনও লাভ নাই, বরঞ্চ মনোমালিন্য আমাদের নিবিড় সখ্য-বন্ধন শিথিল করিয়া দিতে পারে। যাহা ঘটিবার ঘটিয়াছে; এখন দেখিতে হইবে, কিসে সব দিক্ বজায় থাকে। হিসাব করিয়া দেখা হইয়াছে যে, ১৯১৩ সালের প্রত্যেক দেশের লোকসংখ্যার অনুপাতে ফ্রান্সের লোকক্ষয় গত যুদ্ধে শতকরা ৪·৬ হইয়াছে, ইংল্যাণ্ডের ২·২ এবং আমাদের ২·৬। কাজেই ইংরাজের চুরুটের অগ্রভাগ হইতে ছাইটুকু পর্য্যন্ত খসিয়া পড়ে নাই, এরূপ মন্তব্য প্রকাশ

করিলে সত্যের মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ থাকে না। কিন্তু আমাদের দেশের মোট লোকসংখ্যা পঁচাত্তর লক্ষ যুদ্ধের প্রাক্কালে ছিল; এখনও তাহাই আছে বলিলে চলে। ফ্রান্সের লোকসংখ্যা পূর্ব্বেও ছিল চার কোটি; এখনও তাহাই আছে;—এল্সাস্ লোরেণের লোকসংখ্যা হিসাবের মধ্যে ধরিয়া লইয়াও বিশেষ কিছু বৃদ্ধির লক্ষণ দেখা যায় নাই। গ্রেট বৃটেনে চার কোটির কিছু অধিক ছিল, অল্প কিছু বৃদ্ধি পাইয়াছে। এল্সাস লোরেণ ও সাইলিশিয়া বাদ দিলে জর্ম্মনির লোকসংখ্যা এখন মোটামুটি ছয় কোটি ধরা যাইতে পারে। যুদ্ধের অবসান হইলে আমরাই সর্ব্বাপেক্ষা বিপন্ন হইয়াছিলাম। প্রায় আটত্রিশ লক্ষ লোকের খাওয়া পরার ভার ষ্টেট লইল। দেশের অর্দ্ধেক লোক কাজ খুঁজিতে ব্যস্ত; কিন্তু কাজ দেয় কে? বৎসর দেড়েকের মধ্যে কিন্তু অধিকাংশ নিষ্কর্ম্মা লোককে আর অকেজো অবস্থায় বসিয়া থাকিতে হইল না। দেশের পুনর্গঠনকার্য্যে সকলকে যথাসম্ভব নিয়োজিত করা হইল। ৪০,০০০ কিলোমিটর বাঁধান রাস্তার প্রায় পঞ্চমাংশ নষ্ট হইয়াছিল; ৪,৬০০ কিলোমিটর রেলপথের অর্দ্ধেকেরও বেশী বিধ্বস্ত হইয়াছিল; অধিকাংশ রেলগাড়ী যে কোথায় অন্তর্হিত হইয়াছিল, তাহার কোনও খবরই আমাদের জানা ছিল না। ১৯১৯এর মে মাসে আমরা জর্ম্মনির দেয় টাকার প্রথম দশ কোটি পাউণ্ড পাইবার অধিকারী হইলাম। আমাদের মিত্র-শক্তিবর্গের নিকটে আমরা যত টাকা ঋণ করিয়াছিলাম, তাহা জর্ম্মনির ঘাড়ে আপনারা চাপাইয়া দিয়া আমাদিগকে ঋণমুক্ত করিয়াছিলেন। কৃষিকার্য্যের উপযোগী যত গরু ঘোড়া জর্ম্মনি আমাদের দেশ হইতে লইয়া গিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে অনেকগুলি সে ফিরাইয়া দিল। ৪৭,০০০ বাড়ী ভূমিসাৎ হইয়াছিল; তন্মধ্যে ২৪,০০০এরও অধিক পাকা বাড়ী, এবং ১২,০০০ অস্থায়ী কুটীর নির্ম্মিত হইয়াছে। ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে আমাদের কয়লার খনিগুলাতে এক

লক্ষ উনচল্লিশ হাজার লোক কাজ করিত; ১৯২০ খৃষ্টাব্দে তাহাদের সংখ্যা দাঁড়াইল এক লক্ষ উনষাট হাজার। পিতল-কাঁসার কারখানায় ১৯১৩ সালে ছিল এক লক্ষ সাইত্রিশ হাজার; সাত বৎসর পরে দাঁড়াইল এক লক্ষ পঁয়ত্রিশ হাজার। এমনই করিয়া অধিকাংশ লোকের কাজ জুটিয়া গেল। জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে, আপনাদের গায়ে পড়িয়া এমন করিয়া আমি সহসা আমাদের নগণ্য ক্ষুদ্র দেশের কথা বলিতে বসিলাম কেন? ইংল্যাণ্ডের চার কোটি নর-নারীর মধ্যে বিশ লক্ষ কর্ম্মক্ষম লোকের কাজ জুটিতেছে না। অনেক কলকারখানার কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা বহু কর্ম্মচারীকে ছাড়াইয়া দিয়াছে; কতকগুলা কারখানা প্রায় বন্ধ হইবার যোগাড় হইয়াছে। ইংল্যাণ্ডের উভয়-সঙ্কট;—জর্ম্মনির নিকট হইতে স্বর্ণমুদ্রা লইলেও বিপদ্; ক্ষতিপূরণস্বরূপ দ্রব্যাদি লইলেও বিপদ্। জর্ম্মনির অনেকগুলি বাণিজ্য-পোত ইংল্যাণ্ডের হস্তগত হইলে গ্রেট বৃটেনের নৌ-কারখানায় যতগুলি নূতন জাহাজ নির্ম্মিত হইতেছিল, তাহাদের অধিকাংশই অনাবশ্যক হইয়া পড়িল; সুতরাং কয়েক হাজার মিস্ত্রী ও কারিগরের চাকরী গেল। জর্ম্মনির রং ইংরাজ কিছু পাইলেন; অমনই ইংরাজের নব-প্রতিষ্ঠিত রংএর কারখানা বাঁচাইবার জন্য নূতন আইন করিতে হইল। এ যেমন এক দিক্‌কার কথা; তেমনি আর এক দিক্ দেখুন। জর্ম্মনির লোকসংখ্যা ছয় কোটি। যুদ্ধশেষে পঞ্চাশ লক্ষের অধিক সৈন্য ও সামরিক কর্ম্মচারী একেবারে কর্ম্মহীন বেকার হইয়া পড়িল। সমরোপচার যোগাইবার জন্য যে সকল বড় বড় কারখানায় গোলা, বারুদ, গ্যাস, এয়ারোপ্লেন প্রভৃতি তৈয়ার করা হইত, সেখানকার লক্ষ লক্ষ শ্রমজীবীর অন্নের উপায় রহিল না। কিন্তু ইহারই মধ্যে অধিকাংশ লোকের কাজ জুটিয়াছে; বোধ করি, কিঞ্চিদধিক এক লক্ষ এখনও ষ্টেটের নিকট হইতে মাসহারা লইয়া

জীবনধারণ করিতে বাধ্য হইতেছে। এ প্রহেলিকা মন্দ নয়। এখন য়ুরোপের অন্নবস্ত্রের এই বিষম সমস্যার সমাধান কিসে হইবে?"

ইংরাজ বলিলেন,—"তাই ত বলিতেছি, জেনোয়ায় চল; সকলে মিলিয়া একটা পথ খুঁজিয়া বাহির করিবার চেষ্টা করিতে হইবে।"

ফরাসী বলিলেন,—"একটু ভাবিবার কথা বটে। ওয়াশিংটন, রাইনে পাহারা দেওয়ার খরচ বাবদ যে টাকা চাহিয়াছে, তাহা এখনই দিতে হইলে আমরা একটি পয়সাও পাই না। কিন্তু রুশিয়া—"

প্রেতের অট্টহাস্যের মত একটা অস্বাভাবিক শব্দ করিয়া রুশ বলিলেন, —"এখনও রুশিয়াকে তোমাদের পঙ্‌ক্তিতে বসিবার উপযুক্ত বিবেচনা করিতেছ না? ত্রিশ বৎসরের নিবিড় সখ্যভাবের কি এই পরিণাম? রোম্যানফ্ বংশের পুঞ্জীভূত ঋণস্বীকার করিয়া আপনাদিগকে কলঙ্কিত করি নাই বলিয়া তোমাদের এত আক্রোশ? পোল্যাণ্ডকে শিখণ্ডীর মত সম্মুখে খাড়া করিয়া তোমরা ইংরাজের সহিত মিলিত হইয়া আমার উপর শরনিক্ষেপ করিলে; রুশের বিরুদ্ধে রুশকে ক্ষেপাইয়া তুলিলে;—সেই য়ুডেনিচ-ডেনিকিন-কলচাক-সংবাদ কতটা তোমাদের কাহিনীর সহিত জড়িত, তাহা তোমরা খুব জান। কি আক্রোশের বশবর্ত্তী হইয়া তোমরা জলপথে স্থলপথে আমাদিগকে অবরুদ্ধ করিয়া জয়ধ্বনি করিয়াছ, বল দেখি? আমরা কি তোমাদের বিরুদ্ধে কখনও অস্ত্রধারণ করিয়াছিলাম? আজ ভল্গাপ্রদেশে দুই কোটি নর-নারী অন্নাভাবে মরিতেছে; কচি কচি ছেলেমেয়েরা কেমন করিয়া বাঁচিবে, সে কথা ভাবিতে পারিতেছ না? সমগ্র ভল্গা-প্রদেশকে প্রেতপুরী করিল কে? কি বলিতেছ? ভল্গা-প্রদেশ হইতে আড়াই শ' মাইল দূরে ডেনিকিন ও কল্‌চ্যাক লড়াই করিয়াছিল, অতএব তাহারা ওখানকার দুর্ভিক্ষের জন্য দায়ী নহে? আড়াই শ' মাইলের মধ্যে তা'রা আসে নাই,—সত্য; কিন্তু ঐ প্রদেশের

মানবসমাজের বিচিত্র জীবনপ্রবাহ যে চারিচিন্‌এর ভিতর দিয়া প্রবাহিত হইত,—বল দেখি, ভল্গার সেই মর্ম্মস্থানের উপর ডেনিকিন্‌প্রমুখ কত 'শ্বেত'-চমূনায়ক পদাঘাত করিয়াছে? চেকোশ্লাভাক আততায়ীরা যখন সামারা, কাজান, সারাটফ প্রভৃতি দখল করিয়া, ১৯১৮ খৃষ্টাব্দের ৯ই সেপ্টেম্বর একটা অত্যন্ত স্পর্দ্ধাসূচক ইস্তাহার জাহির করিল, তাহাতে স্পষ্টই প্রকাশ পাইল যে, প্রেসিডেন্ট ম্যাসারিক পাশ্চাত্য শক্তিপুঞ্জের নিকট হইতে আশ্বাস পাইয়াছেন যে, বলশেভিক রুশিয়াকে বিধ্বস্ত করার জন্য চেকো-শ্লাভাকের যে শক্তি ব্যয়িত হইয়াছিল, তাহার মূল্য-স্বরূপ নবীন চেকো-শ্লাভাক রাষ্ট্রকে স্বীকার করিয়া লওয়া হইবে। যে সামারায় এই ইস্তাহার জাহির হইয়াছিল, সেটা কোন্‌খানে জান কি? বাকুর পেট্রো-লিয়ম তেল, ডনেট্‌জ্‌এর কয়লা, ভল্গার গম, যব, ধান প্রভৃতি শস্য কে অবরুদ্ধ করিয়া রাখিল? তেল, কয়লা, শস্য আটকাইয়া কে আমাদের শিল্প-বাণিজ্য ছারখার করিয়া দিল? শিল্প গেল; মস্কো গভর্মেণ্ট শস্যের বিনিময়ে চাষাকে কাগজের রুবল ব্যতীত আর কিছু দিতে পারিল না। কৃষকের চাষ-আবাদ কমিয়া গেল। দুর্ভিক্ষ দেখা দিল। 'We spent £100,000,000 in causing it'—মিঃ ম্যাসিংহাম একখানা ইংরাজি কাগজে সম্প্রতি ইহা কবুল করিয়াছেন। আর ফরাসীর দায়িত্ব কত বেশী? কিন্তু পুষ্কিন, টুর্গেনিফ, টলষ্টয়, ডষ্টয়ভস্কির দেশকে নষ্ট করিতে কেহ পারিবে না। আমাদের পল্টাভায় বিজয়োদ্ধত সুইডেন চিরনির্ব্বাণ লাভ করিল;—আর আমাদের মস্কো কি তোমরা ভুলিয়াছ?...এবার আমাদিগকে বাদ দিয়া কেমন করিয়া এই ভাঙ্গা য়ুরোপ জোড়া লাগে, তাহা মস্কোর third International বিবেচনা করুন।"

জর্ম্মন বলিলেন,—"আমি কাগজের ফানুস বানাইয়া গোটা য়ুরোপ-টাকে হাওয়ার উপর উড়াইতেছি,—আমার বিরুদ্ধে এই অভিযোগ! কে

আমাকে নগ্ন করিয়া জগতের রঙ্গমঞ্চে নিষ্ঠুরভাবে দাঁড় করাইল? বলশেভিক রুশিয়া, রাজবংশের দপ্তর হইতে যে সকল গোপন কাগজ-পত্র প্রকাশিত করিয়াছে, তাহাতে কি এই মহাযুদ্ধের জন্য প্রধানতঃ জর্ম্মনিকে দায়ী করা যায়? স্বাজনফ ও পৌয়াকারের তখনকার পত্রাবলী কি সাক্ষ্য দিতেছে? এতকাল পরে সে দিন কেন মিঃ লয়েড জর্জ্জ ইংরাজকে বলিলেন,—We all tumbled into the war? তাই যদি হইল, তবে আমার স্কন্ধে reparationএর এই গুরুভার চাপান হইল কেন? এখানে সে সকল কথা তুলা নিষ্ফল; বিশেষতঃ যখন দেখিতেছি যে, যদিও পৌয়াকারে জেনোয়ায় পদার্পণ করেন, তাঁহার এক পা ভার্সাইলে থাকিবেই থাকিবে।"

অষ্ট্রিয়া বলিলেন,—"আমরা যদি জর্ম্মন রাষ্ট্রের সহিত মিলিত হইতে পারিতাম, তাহা হইলে আমাদের সব দিক্ বজায় না থাকুক, অন্ততঃ রক্ষা পাইতাম। কিন্তু আমাদের ভাগ্যবিধাতারা সে কথায় কর্ণপাত করিলেন না। জাতি হিসাবে আমরাও জর্ম্মন; তবে এ মিলনে আপত্তি হইল কেন? গণনা করিয়া দেখা হইল যে, ছয় কোটি জর্ম্মনের সঙ্গে আমরা আশী নব্বই লক্ষ মিশিয়া গেলে ফারাসীর চার কোটি অপেক্ষা এত অধিক দাঁড়াইয়া যায় যে, পুনরায় যদি কখনও জর্ম্মনির প্রতিহিংসাবৃত্তি জাগিয়া উঠে, তবেই সর্ব্বনাশ! এই কাল্পনিক ভবিষ্যতের আশঙ্কায় কেহ আমাদের আবেদন গ্রাহ্য করিলেন না। যে পোল্যাণ্ড চেকো-শ্লোভাক ও যুগো-শ্লাভ্ ষ্টেট ফরাসীর বীর্য্যে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, তাহারা নিশ্চয়ই ফরাসীর আপদে বিপদে তাহার পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইবে; তবে ভিয়েনাকে এমন করিয়া এক-ঘরে করিলে কেন? সমস্ত দেশ দুধ, রুটি, পরিধেয় বস্ত্রের অভাবে হাহাকার করিতেছে; মার্কিণ ও ইংরাজ কিছু কিছু অর্থ সাহায্য করিতেছেন। আমাদের ক্রোণ মুদ্রা যুরোপের উপহাসের সামগ্রী হইয়াছে। কিসের জোরে আমরা অন্যের সহিত দ্রব্য-বিনিময় করিতে সাহস করি?

জেনোয়া আমাদের কোনও উপায় স্থির করিবে কি না, বলিতে পারি না। আমাদের একূল ওকূল দুকূল গেল দেখিয়া আমরা আমাদের প্রতিবেশীর সঙ্গে ল্যানায় সন্ধি করিতে বাধ্য হইলাম। ফরাসী একটু খুসী হইলেন বোধ হয়; কিন্তু যাঁহারা জর্ম্মন putschএর দিকে ঝোঁক করিয়াছিলেন, তাঁহারা কিছু ক্ষুব্ধ হইলেন। কার্ল গেলেন; হ্যাপসবর্গ বংশের ইতিহাস এখন প্রত্নতত্ত্বের বিষয় হইয়া দাঁড়াইল। কিন্তু হ্যাপসবর্গ ধুরন্ধররা আমাদের কি দশায় ফেলিয়া গেলেন?"

পোল্যাণ্ড বলিলেন,—"আমরা অষ্ট্রিয়া বা রুশিয়ার বিরোধী, এ কথা যাঁহারা বলেন, তাঁহারা সত্যের মর্য্যাদা রক্ষা করেন না। আমরা যদি বলশেভিক রুশিয়ার বিরুদ্ধে বৈরিভাব পোষণ করিতাম, তাহা হইলে সেনাপতি রাঙ্গেলের অমন দুর্গতি বোধ করি হইত না। কিন্তু প্রেসিডেণ্ট প্যাডারুস্কি ও মার্শ্যাল পিলসুড্স্কি ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে হেমন্তকালে বলশেভিক রুশিয়ার সহিত সন্ধি করিবার আয়োজন করিয়াছিলেন; লয়েড জর্জ্জ ও ক্লেমেশোঁ কিছুতেই তাহা কার্য্যে পরিণত হইতে দেন না। হয় ত ফরাসী আমাদের উপর কিছু বিরক্ত হইলেন। কিন্তু আমাদিগকে সন্দেহ করিবার কোনও কারণ ছিল না, এবং এখনও নাই। অষ্ট্রিয়ার বিরোধী হইব কেন? তাঁহার নাড়ী কাটিয়া যে চেকো-শ্লোভাক ও যুগোশ্লাভ ষ্টেট দুইটি জন্ম লাভ করিয়াছে, তাহারা সর্ব্বত্র শ্লাভজাতির প্রতিষ্ঠাকল্পে বদ্ধ-পরিকর; সেই শ্লাভ-সার্ব্বভৌমি-কতা আমাদের জাতীয় চিন্তাতরঙ্গের সহিত কিছুতেই মিশ খাইতে পারে না। আপনারা সকলেই ইহা জানেন বলিয়া আমি অসঙ্কোচে আজ আপনাদের সকলের সমক্ষে এ কথাটার উত্থাপন করিলাম। এই নবীন শ্লাভ-রাষ্ট্রগুলির সহিত মিলিত হইয়া নব-জাত পোল্যাণ্ড যে অষ্ট্রিয়ার অনিষ্টসাধন করিবার চেষ্টা করিবে, তাহা সহজে হইতে পারে না। স্বীকার করি, সেনাপতি কর্ফাণ্টির অভিযানে

ও অন্যান্য কয়েকটা ব্যাপারে আমাদের প্রতিবেশীদিগের সহিত কিছু অসদ্ভাব হইয়াছে; সে কেবল আমাদের রাষ্ট্রের সীমান্ত-রেখা পাকাপাকি স্থির করিয়া দেওয়া হয় নাই বলিয়া। আমাদের মার্ক মুদ্রা যে এক এক খণ্ড সাধারণ সাদা কাগজের চেয়ে কম মূল্যবান্, সে কথা পরিব্রাজক ডক্টর ডিলন্ সম্প্রতি য়ুরোপে সর্ব্বত্র প্রচার করিয়াছেন। এ অবস্থায় আমাদিগকে রণসাজে মণ্ডিত হইয়া চব্বিশ ঘণ্টা কখন কি হয়, তাহার জন্য প্রস্তুত থাকিতে হইতেছে। অদৃষ্টের এই পরিহাস হইতে জেনোয়া আমাদিগকে নিষ্কৃতি দিবে কি? জেনোয়ায় আমরা স্বতন্ত্রভাবে কাজ করিতে চাহি না; ছোট-আঁতাতের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া একজোটে কাজ করা সকলের পক্ষে সুবিধাজনক বলিয়া বিবেচনা করিতেছি। তাহাতে অন্য কাহারও বিশেষ কোনও আশঙ্কার কারণ থাকিতে পারে না। আবার য়ুরোপের ইতিহাসে পোল, শ্লাভ ও চেক্‌এর বিভিন্ন cultureকে জোর করিয়া কেহ একটা রাষ্ট্রীয় কটাহে চাপাইয়া অদ্ভুত সমন্বয়ের চেষ্টা করিলে হ্যাপ্‌সবর্গের মত সফলপ্রযত্ন হইবেন না। নেশন হিসাবে আমাদের একটা রাষ্ট্রীয় সমস্যা আছে বটে; কিন্তু এখন সমগ্র য়ুরোপের একমাত্র সমস্যা দাঁড়াইয়াছে—অর্থ-সমস্যা। এই ইকনমিক ব্যাধির নিরাকরণ করিতে না পারিলে ফল—অপমৃত্যু।"

ইটালী বলিলেন,—"তাই ত দেখিতেছি! আর সবুর করা চলে না। জেনোয়া-সম্মিলনে আর কোনও বাধা-বিপত্তি না ঘটে, তাই আমাদের গভর্মেণ্ট ১০ই এপ্রিল বৈঠক বসিবে বলিয়া স্থির করিয়াছেন। আমাদের নিজের গোলমাল অনেকটা মিটিয়াছে। বণমী সরিয়া দাঁড়াইলেন; ফ্যাক্টা নূতন মন্ত্রি-সংসদ্ গড়িয়া তুলিয়াছেন। তিনি এরই মধ্যে জেনোয়ার তারিখ ঠিক করিয়া ফেলিয়াছেন। দুঃখের বিষয়, মার্কিণ আসিবেন না। মার্কিণ স্বর্ণস্তূপের উপর নিশ্চিন্তভাবে বসিয়া আছেন। অনেকে

মনে করেন যে, তিনি ইচ্ছা করিলে য়ুরোপকে তাঁহার স্বর্ণঘটিত মকরধ্বজ সেবন করাইয়া রোগমুক্ত করিতে পারেন। যদি তিনি পঁচিশ ত্রিশ কোটি স্বর্ণমুদ্রা য়ুরোপের বাজারে চালাইতে দিতেন, তাহা হইলে য়ুরোপের অর্থ-বিনিময় ব্যাপারে পুনরায় gold parity ফিরিয়া আসিত; য়ুরোপ আবার ক্রয়-বিক্রয় করিতে সমর্থ হইত। য়ুরোপের এই সামর্থ্যহীনতা মার্কিণের পক্ষেও অনিষ্টকর হইয়াছে; মার্কিণের অনেক জিনিষ য়ুরোপ কিনিতে পারিতেছে না। ফলে সেখানেও দাঁড়াইয়াছে এই যে, বহু সহস্র কর্ম্মক্ষম ব্যক্তি জীবিকা অর্জ্জনের জন্য কাজ করিতে প্রস্তুত, কিন্তু কাজ পাইতেছে না। কিন্তু তবুও মার্কিণ কোনও সর্ত্তে আপাততঃ য়ুরোপকে সোনা দিয়া সাহায্য করিতে অনিচ্ছুক। য়ুরোপের কেহ কেহ বলিতেছেন,—রূপকথার রাজপুত্রের মত মার্কিণ আটলান্টিক মহাসাগর অতিক্রম করিয়া মূর্চ্ছিতা য়ুরোপকে সোনার কাঠি স্পর্শ করাইয়া সঞ্জীবিত করিতে পারেন। কিন্তু তিনি য়ুরোপের যে মূর্ত্তি দেখিতেছেন, তাহা কল্যাণময়ী নহে; তাহা ভীমা রাক্ষসী মূর্ত্তি। তাহার ভ্রূ কুঞ্চিত। পরিধানে এখনও যোদ্ধবেশ। তাই মার্কিণ ইতস্ততঃ করিতেছেন। কিন্তু তাঁহার বিবেচনার উপর নির্ভর করিয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে না। য়ুরোপকে ভাল করিয়া জাগাইতে হইবে। জেনোয়া পারিবে না কি? দুর্দ্দিনের সখার মত মার্কিণ যে দিন য়ুরোপের পার্শ্বে আসিয়া এক হস্তে বর ও অপর হস্তে অভয় লইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন, সে দিনের কথা তিনি কেমন করিয়া ভুলিলেন? এখনও য়ুরোপের দুঃখ-যামিনীর অবসান হয় নাই। হায়! তবে—

'থাকিতে যামিনী কেন
গুণমণি যেতে চায়!

ফিরাইলে যাত্রাভঙ্গ,

না ফিরালে প্রাণ যায়।'

* * * *

উদ্যোগপর্ব্ব সমাপ্ত হইল বটে; কিন্তু ইহার শেষভাগে ইটালীর যে lyrical mood জেনোয়া-যজ্ঞের আয়োজনকে ব্যর্থ হইতে দেয় নাই, সভা-পর্ব্বেও তাহা সমবেত সুধীজনের মনকে স্নিগ্ধ-মাধুর্য্য-রসে সিক্ত করিতে পারিয়াছে। পৌঁয়াকারে নিজে না গিয়া বার্টুকে পাঠাইয়াছেন। বার্টুও Quai d' Orsay'র সহিত পরামর্শ না করিয়া কোনও কাজ করিতেছেন না। ফরাসী গোড়া হইতে ধরিয়া বসিয়াছেন যে, কানে বৈঠকে যে রকম স্থির করা হইয়াছিল, সেই রকম কাজ এ ক্ষেত্রে করিতে হইবে; অন্যথাচরণ হইলে ফরাসী সরিয়া পড়িবেন। সভাপতি ফ্যাক্টা মধুর ভাষায় সভার উদ্বোধন করিলে পর কতকগুলি কমিটি গঠিত হইল। রুশিয়া হইতে লেনিন আসিতে পারেন নাই;—তখনও তাঁহার স্কন্ধদেশ হইতে আততায়ীর বন্দুকের গুলী ডাক্তার বাহির করিতে পারেন নাই। কিন্তু বলশেভিক পররাষ্ট্র-সচিব চিচারিন, লিট্‌-ভিনফ ও ক্রাসিনকে সঙ্গে লইয়া জেনোয়ায় আসিয়াছেন। চিচারিন বলিলেন,—"এ কমিটিতে জাপানকে বসিতে দেওয়া উচিত নয়; কারণ, সে এখনও আমাদের সাইবিরিয়ার অংশবিশেষ অধিকার করিয়া বসিয়া আছে!" রুশিয়ার এ তেজোব্যঞ্জক উক্তিতে সকলেই বিস্মিত হইয়া গেল। ভাইকাউণ্ট ইশিয়াই বলিলেন,—"চিচারিনের সম্মতি থাকুক আর না-ই থাকুক, আমি এ কমিটি হইতে নড়িতেছি না।"...কিছুকাল পরে চিচারিন বলিলেন,—"ফরাসী এখনও রণ-সাজ পরিয়া আছে। ওয়াশিংটনে সে বলিয়াছিল যে, রুশিয়ার ভয়ে তাহাকে সর্ব্বদাই সশস্ত্র থাকিতে হইয়াছে। বেশ কথা। আমরা অস্ত্রত্যাগ করিতেছি; তাঁহারা করিবেন কি?"

ফরাসী কি একটা নূতন ওজর করিলেন। গোলযোগ বৃদ্ধি পায় দেখিয়া ফ্যাক্টা মিষ্ট কথায় সকলকে তুষ্ট করিলেন।

ফরাসী বলিলেন,—"রুশিয়া আগেকার দেনা শোধ করিবে ত?" রুশ বলিলেন,—"তা'তে আমাদের আপত্তি নাই। কেবল আপনাদের পাঁচ জনের চেষ্টায় আমাদের দেশে 'সাদা'র দল যে ক্ষতি করিয়াছে, তাহার হিসাবটাও আপনারা মিটাইয়া দিবেন। বোধ হয়, তাহা হইলে আমাদের দেনা পাওনার হিসাব-নিকাশ সহজ হইবে।" বিস্ময়ের উপর বিস্ময়! এ আবার কি! ইংরাজ, ফরাসী, জাপান গরম হইয়া উঠিলেন। খবরদার! ও সব কথা চলিবে না।...জর্ম্মন চ্যান্সেলর ওয়ার্থ একখণ্ড কাগজ লয়েড জর্জ্জএর হাতে দিলেন। রু-শজর্ম্মন মৈত্রী রীতিমত সন্ধি-সূত্রে গ্রথিত হইয়া গেল। এবার কিন্তু ইটালীর lyrical mood'ও কিঞ্চিৎ রৌদ্র হইয়া উঠিল। লয়েড জর্জ্জ বলিলেন,—"ক্ষুব্ধ জর্ম্মনির সহিত ক্ষুধিত রুশিয়ার এ সম্মিলন অবশ্যম্ভাবী। আর রাগ করা বৃথা।"

জেনোয়ার রঙ্গমঞ্চ কি রুশিয়ার জন্যই রচিত হইয়াছিল?

প্রশান্ত মহাসাগর

১৩২৯

"তোমার উপর শনির দৃষ্টি পড়িয়াছে!"

দিগন্ত-প্রসারিত প্রশান্ত মহোদধির উপর দৃষ্টিনিবদ্ধ আত্মনিমগ্ন জাপ্ সহসা চমকিয়া উঠিলেন। অলক্ষিতে বন্ধুবর মার্কিণ তাঁহার চেয়ারের পশ্চাতে কখন্ আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন, তাহা তিনি জানিতে পারেন নাই। ঈষৎ হাস্যের রেখা তাঁহার অধরপ্রান্তে বিলীয়মান। "ভাই জাপ্, তোমার উপর শনির দৃষ্টি পড়িয়াছে। লর্ড নর্থক্লিফ তোমার পিছনে বড় লাগিয়াছেন।"

"সমুদ্রে যা'র শয়ন, তার শিশিরে ভয় কি, ভাই! আর শনির কথা বলিতেছ,—শনি যদি আমার তুঙ্গস্থ হ'ন, তা হ'লে আমার ভয় কি? আর তিনি যদি আমার রন্ধ্রগত হ'ন, তা'তেই বা ভয় করিলে চলিবে কেন?"

ক্ষুদ্র টেবিলের উভয় পার্শ্বে দুই বন্ধু উপবেশন করিলেন। প্রস্ফুট চন্দ্রমল্লিকার স্নিগ্ধ সৌন্দর্য্য উপভোগ করিতে হইলে এই রকম সমুদ্রতীরে জাপানী বন্ধুর গৃহে আতিথ্যলাভ ভিন্ন সম্ভবপর হয় না।

মার্কিণ বলিলেন,—"তোমার এই ক্রিস্যান্থিমাম্ কোন্ এক গোপন রহস্যপুরের বার্ত্তা আমার কাছে বহন করিয়া আনে, তাহা আমাদের এই অত্যন্ত নীরস স্যাক্সন ভাষায় বর্ণনা করা দুঃসাধ্য। এইমাত্র যে কথা বলিয়া এই ঘরে প্রবেশ করিলাম, এই ফুলটি প্রায় তাহা আমাকে বিস্মরণ করাইয়া দিয়াছিল।"

জাপ্ চেয়ারে একটু হেলিয়া বসিলেন। "এত দিন তোমার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মেলা-মেশা করিয়াও জানিতে পারি নাই যে, তুমি একটী নীরব কবি।"

"কবিত্ব আমার ধাতুতে আছে কি না, সন্দেহ করিবার যথেষ্ট কারণ বিদ্যমান থাকিলেও এটা ঠিক যে, তোমার ঐ ক্রিস্যান্থিমাম্—"

"গেইশা নর্ত্তকীকে স্মরণ করাইয়া এক অপূর্ব্ব মায়াপুরীর রহস্যময় কক্ষে তোমার চিত্তকে উদ্‌ভ্রান্ত করিয়া দেয়।" উভয়ের কলহাস্য অদূর-বর্ত্তী সমুদ্রবীচিভঙ্গে মিলিয়া গেল। দাসী আসিয়া উভয়ের জন্য দুই পেয়ালা কাফি রাখিয়া দিল।

মার্কিণ বলিলেন,—"এই পীনোন্নত প্রশান্ত পয়োধিকে অপ্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া একাকী ভোগ করিবার বাসনা তোমার আমার মনে জাগিয়াছিল। তখন সবে তুমি পরিত্যক্তজর হইয়া নবযৌবন লাভ করিয়াছ; আমিও আমার মন্‌রোনীতি-শাসিত গৃহস্থালীর মধ্যে আমার লালসাশিখাকে গোপন করিয়া রাখিতে পারিতেছিলাম না। কিন্তু তোমার এই নবীন যৌবন-লাভের পূর্ব্বে তোমার সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয়ের কথা মনে পড়ে কি?"

"মনে পড়ে কি না, জিজ্ঞাসা করিতেছ? আজিকার মত এইরূপ সন্ধ্যার প্রাকালে কতদিন তোমার কাছে সেই গল্প করিব মনে করিয়াছি; কিন্তু কখনও তাহা হইয়া উঠিল না। মনে হইত, বোধ হয় তোমার ভাল লাগিবে না।"

"আমারও কত দিন মনে হইয়াছে, একবার সেই কথা পাড়ি; কিন্তু পাছে তোমার মনে আঘাত লাগে, এই ভয়ে ও-কথা তুলিতে গিয়াও তুলি নাই। কিন্তু বাস্তবিকই এমন সময়ে আর ঈর্ষ্যা-দ্বন্দ্-কলহের ভাব থাকিতে পারে কি? বিশেষতঃ ওয়াশিংটনের চতুঃশক্তি-সন্বময়ে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব সব

ঘুচিয়া গিয়াছে। তাই আজ অসঙ্কোচে সেই পুরাতন প্রসঙ্গের উত্থাপন করায় কিছুমাত্র দোষ দেখিতেছি না।"

"আমাদের গল্পের প্রথম নায়ক তোমাদের কাপ্তেন পেরি।"

"হাঁ। প্রেসিডেণ্ট ফিল্‌মোর কমোডোর পেরিকে আজ্ঞা করিলেন,—'তুমি চারখানি জাহাজ লইয়া জাপানে গিয়া শান্ত অথচ দৃঢ়ভাবে নিপ্পন্ গভর্মেণ্টের নিকট হইতে এই অনুমতি লাভ করিবার চেষ্টা কর যে, যেন দু একটা জাপানী বন্দরে অথবা ক্ষুদ্র, এমন কি, জনহীন দ্বীপেও আমরা আমাদের জাহাজের জন্য কয়লা মজুত করিবার ব্যবস্থা করিতে পাই, এবং মার্কিণ নাবিকগণ অসহায় হইলে তাহাদের জন্য সুব্যবস্থা করিতে পারি।' প্রেসিডেণ্ট ফিল্‌মোর পেরির হাতে একখানি পত্র দিলেন তোমাদের সম্রাটের নামে।"

"ঠিক বলিয়াছ; কিন্তু সম্রাট্ তখন রাজধানী কিওটোতে বাস করিতেছিলেন। বাস্তবিক চিঠিখানা লিখা হইয়াছিল শোগান্ গোষ্ঠী-পতিকে। ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দের ১৪ই জুলাই তারিখে পত্রখানি শোগানের হস্তগত হইল। তা'র পর—"

"আহা, আসল মজার কথাটি বাদ দিতেছ কেন? শোগান্ পেরিকে একখানা রসিদ দিলেন। তা'তে লিখা ছিল যে, মার্কিণ দূতের উচিত ছিল, নাগাসাকি বন্দরে তাঁহার চিঠি লইয়া অপেক্ষা করা; নাগাসাকি বন্দর ব্যতীত অন্য কোথাও বিদেশীয়ের সহিত আমরা দেখাশুনা করি না। তবে চিঠি না লইয়া দূতকে ফিরাইয়া দিলে তাঁহার অপমান করা হয়, এই জন্য যেডোতেও চিঠিখানা লওয়া হইল।"

দু'জনেই হাসিয়া উঠিলেন। জাপ বলিলেন,—"শোগানদিগের আবাসস্থান ছিল যেডো।...যাক্। কিন্তু পরদিন এক বিজ্ঞ মোড়ল তোমাদের সঙ্গে কারবার করার বিরুদ্ধে আমাদের গভর্মেণ্টের কাছে

যে আবেদন করিয়াছিলেন, ইতিহাস হিসাবে তাহা নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর নহে।”

আলমারির ভিতর হইতে জাপ্ একখণ্ড পুরাতন কাগজ বাহির করিয়া বলিলেন,—“শুন; আবেদনের ভাষা ও যুক্তিতর্ক কেমন চমৎকার!—

১। আমাদের দেশের যে সকল বীর বিদেশে জয়পতাকা উড্ডীন করিয়াছেন, তাঁহাদের শৌর্য্যগাথায় আমাদের ইতিহাস পুরাণ পরিপূরিত। বিদেশীর অস্ত্র-ঝনৎকার এ দেশের পবিত্র ভূমিতে কখনও শ্রুত হয় নাই। যে ভূমিতে আমাদের পিতৃপুরুষগণ চিরবিশ্রাম লাভ করিতেছেন, সে ভূমিতে বর্ব্বর সৈন্যের পদাঘাতের অপমান আমরাই যেন প্রথম ভোগ না করি।

২। খৃষ্টীয় ধর্ম্ম বর্জ্জনের জন্য কঠোর ব্যবস্থা সত্ত্বেও কোনও কোনও পাপী ঐ কুনীতির আশ্রয় লইয়াছে। এখন যদি মার্কিণকে আমরা বন্ধুভাবে গ্রহণ করি, ঐ ধর্ম্মটা নিশ্চয়ই মাথা তুলিবে।

৩। কি! পশম, কাচ ও ঐ রকম কতকগুলা তুচ্ছ নগণ্য দ্রব্যের পরিবর্ত্তে আমরা আমাদের স্বর্ণ, রৌপ্য, পিতল, লৌহ প্রভৃতি বহু অত্যাবশ্যক দ্রব্য হস্তান্তর করিয়া বাণিজ্য করিব! ওলন্দাজদিগের সহিত যৎকিঞ্চিৎ দ্রব্য-বিনিময়ও এত দিন বন্ধ করিয়া দেওয়া উচিত ছিল।

৪। সম্প্রতি রুশিয়া ও অন্যান্য বহু দেশ হইতে আমাদের সহিত ব্যবসা বাণিজ্য করিবার জন্য আবেদনপত্র আসিয়াছে; কিন্তু তাহা আমরা প্রত্যাখ্যান করিয়াছি। মার্কিণকে প্রশ্রয় দিলে তাহাদিগকে হাঁকাইয়া দেওয়া চলিবে কি?

৫। বর্ব্বরদিগের কূটনীতি এই যে, প্রথমে তাহারা ব্যবসা করিবার ছলে একটা দেশে প্রবেশ করে; তা'র পরে তা'দের ধর্ম্মটা প্রতিষ্ঠিত

করিবার চেষ্টা করে ; পরে দলাদলি বাদবিসংবাদ জাগাইয়া তুলে। দুই শতাব্দী পূর্ব্বে আমাদের পিতৃপুরুষগণের অর্জ্জিত অভিজ্ঞতার দ্বারা আপনারা পরিচালিত হউন। মহাচীনের অহিফেন-সমর হইতে যে শিক্ষালাভ করা যায়, তাহা অবজ্ঞা করিবেন না।

৬। ওলন্দাজ পণ্ডিতগণ বলেন যে, আমাদের সমুদ্র পার হইয়া বিদেশীর সহিত ব্যবসা-বাণিজ্য করা উচিত। ইহা খুবই বাঞ্ছনীয় হইত, যদি আমাদের বীর পূর্ব্বপুরুষগণের বংশধরগণ তাঁহাদের মত কর্ম্মক্ষম ও পরাক্রমশালী হইতেন। কিন্তু বহুকাল শান্তিতে থাকিয়া তাঁহাদের কার্য্যকরী শক্তি লুপ্ত হইয়াছে।

৭। বন্দরে এখন পেরির যে জাহাজগুলা রহিয়াছে, তাহাদের বিরুদ্ধে সতর্কভাবে কাজ করা প্রয়োজন মনে করিয়া বহু দূর হইতে সামুরাই রাজধানীতে সমবেত হইয়াছে। তাহাদিগকে হতাশ করা কি ভাল হইবে?

৮। নাগাসাকির নৌবাহিনীসম্পর্কীয় যাবতীয় বিষয় এবং পররাষ্ট্র-সম্বন্ধীয় সমুদয় ব্যাপার কুরোদা ও নবেশিমা কুলপতিদ্বয়ের উপর ন্যস্ত আছে। নাগাসাকি বন্দরের বাহিরে একটা বৈদেশিক শক্তির সহিত এই আলাপে তাঁহাদের চিরাগত অধিকারে হস্তক্ষেপ করা হইতেছে। এই প্রবল বংশদ্বয় বিশেষ কৃতজ্ঞতাসহকারে ইহা স্বীকার করিয়া লইবে না।

৯। বন্দরের বর্ব্বরগুলার দাম্ভিক ব্যবহারে নিরক্ষর জনসাধারণও ক্ষুব্ধ হইয়াছে। যদি এমন কিছু দেখান না হয় যে, গভর্ণ্মেণ্ট তাহাদের বিরক্তিতে সহানুভূতি প্রকাশ করিতেছে, তাহা হইলে গভর্ণ্মেণ্ট তাহাদের শ্রদ্ধা হারাইবে।

১০। বহুকাল শান্তিতে থাকিয়া আমরা তেজোহীন হইয়া পড়িয়াছি। কবে এই মূঢ় জাতির জাগরণ হইবে? এখন কি সেই শুভ মুহূর্ত্ত আসে নাই?

"এখন শুনিলে ত এই দশ দফা ? সত্তর বৎসর পূর্ব্বে আমাদের দেশের অবস্থা কি ছিল, এই আবেদনপত্র হইতে তাহার কিছু আভাস তুমি নিশ্চয়ই পাইলে। কিন্তু আমাদের মত একটা প্রাচীন জাতির পক্ষে সত্তর বছর কতটুকু সময় ! ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসের শেষে অনেক বাগ্‌বিতণ্ডার পর পেরির দৌত্য সফল হইল। দুইটি বন্দরে মার্কিণদিগের গতিবিধির সুবিধা করিয়া দেওয়া হইল। চারি বৎসরের মধ্যে মার্কিণ, ইংরাজ, ওলন্দাজ, রুশ, ফরাসী ও পোর্ত্তুগীজদিগের সহিত বাণিজ্যসন্ধিসূত্রে আমরা আবদ্ধ হইলাম।

"কিছু দিনের মধ্যে আমাদের দেশে বিপ্লব-বহ্নি জ্বলিয়া উঠিল। দুই জন ইংরাজ ১৮৬২ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে নিহত হইল। আমাদের নিকট হইতে খেসারৎ চাওয়া হইল। সহসা চার্লস রিচার্ডসন নামধেয় জনৈক ইংরাজ আমাদের মহাপ্রতাপান্বিত সৎসুমাবংশ-শিরোমণিকে অপমান করিল। শিমাজু সবুরো পাল্কিতে চড়িয়া যাইতেছিলেন। রিচার্ডসন অশ্বপৃষ্ঠে পাল্কির পাশ দিয়া উন্নতশির হইয়া যাইবার চেষ্টা করিল। শুনিয়াছি, অন্য ইংরাজ তাহাকে বারণ করিয়াছিল। সে অত্যন্ত অবজ্ঞাভরে না কি বলিয়াছিল,—'আমার সঙ্গে তর্ক কোরো না। আমি চীনেতে চৌদ্দ বছর কাটিয়েছি ; এই সব নেটিভগুলোর সঙ্গে কি রকম ব্যবহার করিতে হয়, আমি খুব জানি।' সে অশ্ব হইতে অবতরণ করিল না ; মস্তকও অবনমিত করিল না। মুহূর্ত্তমধ্যে তাহার প্রাণহীন দেহ ভূলুণ্ঠিত হইল।

"ইংরাজ ইহার প্রতিশোধ লইলেন। কামান দাগিয়া আমাদের একটা বড় নগর তাঁহারা ধ্বংস করিলেন। ইংরাজের সঙ্গে আমাদের এই রকমে প্রথম পরিচয় হইল। ঠিক প্রথম পরিচয় হইল বলিলে ভুল হইবে। সাত আট বৎসর পূর্ব্বে ইংরাজ গভর্মেণ্টের প্রথম দূত ও প্রতিনিধি লর্ড এল্‌গিনকে আমরা অত্যন্ত শ্রদ্ধার সহিত আমাদের একটি প্রশস্ত সুন্দর

প্রাচীন দেবমন্দিরে বাস করিবার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলাম। এমনই করিয়া ইংরাজের সহিত আমাদের প্রথম পরিচয়ের প্রথম অঙ্কের উপর যবনিকা পড়িয়া গেল। কিন্তু তোমাদের সঙ্গে আমাদের প্রথম পরিচয়ের গল্পটা ত এখনও শেষ হইল না।

"আবার বিদেশীয়দিগের সহিত গোলমাল বাধিল। তোমাদেরও কিছু বোধ হয় ক্ষতি হইয়াছিল। পাঁচ জনে মিলিয়া আমাদের নিকট হইতে ক্ষতিপূরণ বাবদে অনেক টাকা আদায় করিয়া লইল। কিন্তু তোমার মহৎ চরিত্রের—"

"ঐঃ, বেশ লোক ত তুমি! একেবারে আমার মহৎ চরিত্রের কথা আনিয়া ফেলিলে! আমি শপথ করিয়া বলিতে পারি যে, আন্তর্জাতিক আচারে ব্যবহারে আমাদের কাহারও চরিত্রে লেশমাত্র মহত্ত্ব ফুটিয়া উঠিবার অবসর পায় না। তখনও পাইত না,—আজ এই ওয়াশিংটন জেনোয়া জেনিভার দিনেও নয়। বেশ তুমি গল্প বলিতেছিলে, হঠাৎ রসভঙ্গ কর কেন? আমি ভাবুক নহি; কল্পনাপ্রবণতার মধ্যে যদি কিছু দৌর্ব্বল্য থাকে, তা' বোধ করি, আমাতে নাই। আমার মনে হইতেছিল যেন, কোন এক সুদূর অতীতে এই রকম আর এক আসন্ন সন্ধ্যায় এই কলস্বন মহাম্বুধিতীরে একাকী দণ্ডায়মান ছিলাম। যেন আমারই নাম ছিল কমোডোর পেরি; যেন ঐ চঞ্চল জলধি তা'র কল কল ছল ছল ভঙ্গীতে আমায় ডাকিল—চল্ চল্ চল্; মনে হইল যেন, সে ঐ মন্দ্রস্বরে অনাদিকাল হইতেই ডাকিতেছিল; যেন কোথায় উহার বুকের মাঝে সাত রাজার ধন একটি মাণিক লুকায়িত ছিল,—তাহাকে উদ্ধার করিয়া আনিতে হইবে; যেন তোমাদের এসিয়ার কবি রবীন্দ্রনাথ-বর্ণিত কোন এক অচলায়তন দুর্গমধ্যে রুদ্ধ ক্লিষ্ট মানবাত্মা গুমরিয়া গুমরিয়া ক্রন্দন করিতেছিল, তাহাকে মুক্তি দিতে হইবে' বাহিরে আনিতে হইবে; যেন আমি সাগরের

আহ্বান ভাল করিয়া বুঝিতে পারিতেছিলাম না, তাই যখন সে ডাকিল—চল্ চল্ চল্, আমি মূঢ়ের মত প্রশ্ন করিলাম—ওরে রহস্যময়, আমায় কি করিতে হইবে, বল্ বল্ বল্; যেন সে খল্ খল্ করিয়া পিছু হঠিতে লাগিল, আর আমি মোহাবিষ্টের মত তাহার অনুসরণ করিয়া তরণীতে উঠিয়া বসিলাম; যেন কোন এক প্রত্যুষে কোন এক অপরূপ রূপকথার রাজ্যে আমার তরীখানি ভিড়িল; যেন পরক্ষণেই সেই সহস্রসুবর্ণ-দেউলশীর্ষ রাজপুরীর সিংহদ্বার আমার তর্জ্জনী-সঙ্কেতে খুলিয়া গেল; যেন—"

"ক্ষমা কর ভাই, দেখো, যেন তোমার কবিত্বপ্রবাহের ঘূর্ণাবর্ত্তের মধ্যে এই অত্যন্ত গদ্যময় নিরীহ জীবটির প্রাণ-সংশয় না হয়। আর এক পেয়ালা কাফি হইলে মন্দ হয় না,—কি বল? কিন্তু আমাকে তুমি আসল কথাটা ভুলাইতে পার নাই। তোমার মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতেছিলাম, তুমি বাধা দিয়া তোমার কবিপ্রতিভার ফেনিল উচ্ছ্বাসে সমস্তটা ঘুলাইয়া দিবার ব্যবস্থা করিলে।...ক্ষতিপূরণ-স্বরূপ প্রাপ্ত টাকা সকলেই নিশ্চিন্তমনে আত্মসাৎ করিলেন; কিন্তু উনিশ বৎসর পরে তুমি তোমার অংশের সমস্ত টাকা আমাদিগকে ফিরাইয়া দিলে! কেমন? আমাদের প্রথম পরিচয়ের কাহিনীটা কেমন লাগিল?"

"কেমন লাগিল, তাহা যদি আমি আমার এই অত্যন্ত নীরস ভাষায় বর্ণনা করিবার চেষ্টা করি, তাহা হইলে তুমি আবার গদ্য-পদ্যের উল্লেখ করিয়া পরিহাস করিবে। কিন্তু যদি বলি—'আচ্ছা, তা'র পর?' তাহা হইলে বোধ হয়, আপত্তি করিবার তোমার কিছু নাই।"

"তার পরে কেমন করিয়া শোগানের হাত হইতে সমস্ত রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা স্খলিত হইল, এবং কিরূপেই বা আমাদের সমস্ত নেশনের ইতিহাস নবীন সম্রাট্ মৎসুহিতোর জীবনের সহিত জড়িত হইয়া গঠিত হইয়াছে, সে সব ত জানা আছে। সে সব কথা লইয়া মধ্যে মধ্যে আমরা আলোচনা করিয়াছি।"

"হাঁ, সে কথা এখন থাক্। কিন্তু রুশের সহিত তোমাদের যুদ্ধ-কাহিনীটা একবার বল না। সঙ্গে সঙ্গে কাফির এই দ্বিতীয় পেয়ালার সদ্ব্যবহার করা যাক্।"

ঘনায়মান সন্ধ্যার অন্ধকারের মধ্যে সেই দীপালোকিত কক্ষে বসিয়া দু'জনে কিছু কালের জন্য অন্য সকল বিষয় বিস্মৃত হইলেন। সেই ক্রিস্যান্থি-মাম-গুচ্ছ পবনহিল্লোলে দুলিতে লাগিল।

"আমরা ফরাসীর কাছে অস্ত্রবিদ্যা শিখিতে আরম্ভ করিলাম। য়ুরোপীয়দিগের মত পোষাক-পরিচ্ছদ ও বেশবিন্যাস আমাদের একটা ফ্যাশন দাঁড়াইল। ফরাসীও খুব আগ্রহ সহকারে আমাদিগকে যুদ্ধবিদ্যা শিখাইতে লাগিল। এমন সময়ে সম্রাট্ তৃতীয় নেপোলিয়ন প্রুশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ-ঘোষণা করিলেন। ফরাসী সৈনিক পুরুষগণ স্বদেশে ফিরিয়া গেলেন। পরে যাহা ঘটিল, তাহাতে ফরাসীর রণকৌশলের উপর আমাদের আর শ্রদ্ধা রহিল না। যুদ্ধের অবসানে জার্ম্মান সেনাপতি মেকেল আমাদের দীক্ষাগুরু হইলেন। আজ ভক্তিবিনম্র চিত্তে সেই মৃত মহাত্মার উদ্দেশে আমাদের নেশনের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিবার উপযুক্ত ভাষা খুঁজিয়া পাইতেছি না। ও কি ? তোমার মুখে মৃদু হাসির রেখা !"

"ভাবিতেছি, সাধে কি তোমার উপর শনির দৃষ্টি পড়িয়াছে ? সে দিন লর্ড নর্থক্লিফ অষ্ট্রেলিয়াবাসীদিগকে বুঝাইয়া দিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, তোমরা প্রাচ্য জর্ম্মন ! কথাটা নেহাৎ মিথ্যা নয় তবে।"

"শিষ্য কি কখনও সর্ব্বতোভাবে গুরুর মত হইবার স্পর্দ্ধা করিতে পারে ? বিশেষতঃ আমাদের ইতিহাস ইহার পরে এত জটিল হইয়া গেল যে, কালক্রমে এক দিন আমরা ভারতবর্ষের পৌরাণিক সব্যসাচীর মত আচার্য্যকেই ধরাশায়ী করিবার চেষ্টা করিলাম। আমার নবজীবনের প্রারম্ভেই ত তুমি দেখিলে, আমার জন্মপত্রিকার অন্তরাল হইতে শ ন

বক্রদৃষ্টি করিতেছেন! কিন্তু উহার কথা পরে হইবে। আমরা উৎসাহের সহিত যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা করিলাম।

"এইবার আমরা আমাদের ঘরের বাহিরে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিবার অবসর পাইলাম। আমরা দেখিলাম যে, রুশ শনৈঃ শনৈঃ সমস্ত সাইবিরিয়া দখল করিয়া বসিয়াছে। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দের মধ্যেই তাহারা কোরিয়ার গা ঘেঁসিয়া দাঁড়াইল, একেবারে প্রায় আমাদের দ্বীপপুঞ্জের সম্মুখে; অল্প দিনের মধ্যেই ব্লাডিবোষ্টক নগরী স্থাপিত করিয়া, তথায় একটি প্রকাণ্ড নৌবাহিনী-রক্ষার ব্যবস্থা করিল। যে রুশিয়া য়ুরোপের কুত্রাপি বারো মাসের ব্যবহারোপযোগী জলপথ ও বন্দর পায় নাই—বলটিক্ সাগরেও নয়, ভূমধ্য-সাগরেও নয়,—সে এই মহাসাগরের উপর এমন একটি স্থান অধিকার করিল, যেখান হইতে অন্ততঃ বছরের মধ্যে সাত মাস তাহাদের রণতরী অথবা বাণিজ্যতরণী অবাধে সর্ব্বত্র যাতায়াত করিতে পারিবে; চার পাঁচ মাস মাত্র বরফে তাহাদের গতিরোধ করিবে। কিন্তু কোথায় মস্কো, পিটর্স্‌বর্গ্‌—আর কোথায় ব্লাডিবোষ্টক! ইহাদের পরস্পরের সংযোগবিধান না করিতে পারিলে চলে না। রেল পাতিতে হইবে। টাকা কোথায়? মিত্র ফরাসী—ত্রিশ কোটি পাউণ্ড কর্জ্জ দিলেন। ১৮৯১ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসে রুশ-সম্রাট্ আজ্ঞা দিলেন, সাইবিরিয়ার উপর দিয়া রেল পাতা হউক। চার হাজার মাইল রেলপথ প্রস্তুত করিতে রুশের পূর্ত্তবিভাগ উঠিয়া পড়িয়া লাগিল। দুই দিক্ হইতেই কাজ আরম্ভ হইল, পশ্চিমে উরাল পর্ব্বত-শ্রেণীর মধ্যে পাথর কাটিয়া রেল বসান হইল,—আর পূর্ব্বে ব্লাডিবোষ্টকে প্রথম মাটি কাটিলেন যুবরাজ নিকোলাস। কখনও কি তিনি স্বপ্নেও ভাবিয়াছিলেন যে, এই রেলেরই একটি অতি ক্ষুদ্র শাখায় উরাল পর্ব্বতের পাদমূলে অবস্থিত গণ্ডগ্রামে তাঁহাকে সবংশে নিহত হইতে হইবে!

"তখন বার্লিনে আমাদের রাজপ্রতিনিধির সহচর Attache ছিলেন

সেনাপতি ফুকুশিমা। তাঁহার কার্য্যকাল ফুরাইয়া আসিলে, ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে তিনি স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। বার্লিন হইতে ব্লাডিবোষ্টক কত হাজার মাইল দূর বল ত? তিনি এই সমস্ত পথটি অশ্বপৃষ্ঠে অতিক্রম করিলেন! তাঁহার প্রধান লক্ষ্য ছিল, রুশিয়ার এই নূতন রেলপথটা আগা-গোড়া ভাল করিয়া দেখিয়া লইতে হইবে, কোথায় কি আয়োজন হইতেছে, সামরিক উপযোগিতা ইহার কিরূপ, তাহা নিজের চোখে দেখা প্রয়োজন;—কারণ, এক দিন এই রুশের সঙ্গে আমাদের বলপরীক্ষা অবশ্যম্ভাবী। তিনি অশ্বপৃষ্ঠে জর্ম্মনির প্রান্তসীমা অতিক্রম করিলেন, সমগ্র য়ুরোপীয় রুশিয়া পার হইয়া, উরাল পর্ব্বতের সানুদেশে উপস্থিত হইলেন। এবার তাঁহার অশ্বের গতি মন্দীভূত। তিনি ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া দেখিলেন, দীর্ঘ-বিসর্পিত লৌহবর্ত্মের দুই ধারে অনেকগুলি গ্রামে রুশ আসিয়া চির-স্থায়িত্বের বন্দোবস্ত করিয়াছে। রেল কুর্গা গ্রামের পাশ দিয়া ওমস্কের সহিত টোমস্কের সংযোগবিধান করিয়া, বৈকাল হ্রদের দক্ষিণ দিয়া দূরে বন্ধুর গিরিসঙ্কটের ভিতর দিয়া চলিয়াছে। হ্রদ ও নদ-নদীগুলিতে কত ষ্টীমার চলাফেরা করিতেছে এবং ভবিষ্যতে তাহাদের সংখ্যাবৃদ্ধির সম্ভাবনা কিরূপ, তাহা তিনি একপ্রকার হিসাব করিয়া লইলেন। যে দিন তিনি স্বদেশে পদার্পণ করিলেন, সে দিন সমস্ত নেশন যেন আনন্দোৎসবে মাতিয়া উঠিল।

"পরবৎসর ঘটনাচক্রে চীনের সহিত আমাদের যুদ্ধ বাধিয়া গেল। চীন আমাদিগকে অতিশয় ঘৃণার চোখে দেখিত। লাই-হাং-চাং রুশের সহিত মিতালি করিতে প্রস্তুত ছিলেন; রুশের হাতে মাঞ্চুরিয়া এক প্রকার ছাড়িয়াই দিয়াছিলেন; কিন্তু কোরিয়ায় আমাদের প্রতিপত্তি বিস্তারের চেষ্টা করিলেই তিনি ত বাধা দিতেনই, রুশও বাধা দিত; এক হিসাবে চীনের মধ্যে লর্ড সল্‌স্‌বেরির sphere of influence নীতি সকলেই মানিয়া

লইয়াছিল। ক্রমশঃ উহা আরও ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হইল। তোমরা দূর হইতে তাহা লক্ষ্য করিতেছিলে ; কিন্তু তখন তোমরা কিছু বলিতে পার নাই। ওয়াশিংটনে ও জেনোয়ায় তোমরা মুখ ফুটিয়া কথা কহিয়াছ। এখন সকলের চোখ আমাদের উপরে পড়িয়াছে,—যেন চীন এখন একমাত্র আমাদের sphere of influenceএর অন্তর্গত।

"১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে পরাজিত চীন শিমনোসেকিতে আমাদের সহিত সন্ধি করিতে বাধ্য হইল। ফর্ম্মোজা ও সমগ্র লিয়াও-টং প্রদেশ এবং কিছু টাকা পাওয়া গেল। রুশ চমকিয়া উঠিল। পোর্ট আর্থর জাপানীর হইল! মাঞ্চুরিয়া—সাইবিরিয়ার রেল—কোরিয়ার প্রান্তভাগে ইয়ালু নদীর তীরে বিপুল বন-সম্পত্তি—এ সকল রক্ষা হইবে কিসে? ফরাসী চঞ্চল হইল। সে বোধ হয় ভাবিল যে, আমরা আর্থর বন্দরে থাকিলে তার ত্রিশ কোটি টাকা মারা যাইবে। যে জর্ম্মনিকে আমরা গুরুর মত ভক্তি করিতাম, সেও বিরূপ হইল। ইঁহারা তিন জনেই আমাদিগকে পরামর্শ দিলেন যে, চীনের খাস-দখল হইতে এসিয়া ভূখণ্ডের জমি কাড়িয়া লইলে ভাল হইবে না। আমরা অগত্যা লিয়াও-টং প্রদেশ ছাড়িয়া দিলাম ; অদূরবর্ত্তী ওয়াই-হাই-ওয়াই দ্বীপ হইতেও প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম। তিন বৎসর অতিবাহিত হইতে না হইতেই শুনিলাম যে, চীন গভর্ন্মেণ্ট রুশিয়াকে লিয়াও-টং প্রদেশটা নিরানব্বই বছরের জন্য ইজারা দিলেন। আমরা বুঝিলাম, বিনা যুদ্ধে আমাদের নিপ্পন দ্বীপপুঞ্জের সমীপবর্ত্তী সাগর-পারে সূচ্যগ্রপ্রমাণ ভূমিও রুশিয়ার কবল হইতে উদ্ধার করিতে পারিব না।

"ইংরাজও নিশ্চেষ্ট রহিলেন না। তিনি বাক্যব্যয় না করিয়া ওয়াই-হাই-ওয়াই দখল করিয়া, তথায় বৃটিশ পতাকা উড়াইয়া দিলেন। জর্ম্মনি চীনকে জানাইলেন যে, তাঁহার দু'জন নিরীহ মিশনরীকে চীনেরা হত্যা করিয়াছে, অতএব উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ না হইলে এ অপমানের প্রতিশোধ

লইতে হইবে। চীন টাকা দিতে চাহিল। জর্ম্মনি গায়ের জোরে কিয়াও-চাও বন্দর আয়ত্ত করিয়া সমগ্র শান্-টাং প্রদেশে নিজ আধিপত্য বিস্তার করিল। অল্প দিনের মধ্যেই আর্থর বন্দরকে রুশিয়া এক দুর্ভেদ্য দুর্গে পরিণত করিল; কিয়াও-চাও বন্দরও প্রশান্ত মহাসাগরে জর্ম্মনির প্রবল প্রতাপের পরিচায়ক সুরক্ষিত দুর্গরূপে বিরাজ করিতে লাগিল। ইহাদের নিকটে ওয়াই-হাই-ওয়াইএর তেজ ম্লান হইয়া গেল। আমরা নির্ব্বাক্ হইয়া আমাদের ঘরের অতি নিকটে য়ুরোপের এই বিপুল সামরিক আয়োজন দেখিতে লাগিলাম; আর একটি একটি করিয়া দিন গণিতে লাগিলাম। চীন কিন্তু ধৈর্য্যরক্ষা করিতে পারিল না। আমাদের এই প্রশান্ত মহাসাগরের টর্ণেডো ঝটিকার ন্যায় একটা বিপ্লবের ঝড় তাহার উপর দিয়া বহিয়া গেল। য়ুরোপীয় শক্তিপুঞ্জের সহিত মিলিত হইয়া আমরা সেই বক্সার-বিদ্রোহ দমন করিলাম।

"কিন্তু ভাল করিলাম, কি মন্দ করিলাম, বলিতে পারি না। জর্ম্মন সেনাপতি কাউন্ট্ ফন্ ওয়াল্ডারসীকে আমরা সকলেই এই অভিযানের অধিনায়ক বলিয়া মানিয়া লইলাম। কৈশর উইলহেল্‌ম্ প্রিন্স হেন্‌রিকে বিদায় দিবার কালে বলিলেন,—'তুমি চীনে যাইতেছ; দেখিও, আমার জর্ম্মন সেনা এমন ভাবে যেন কাজ করে, যাহাতে জর্ম্মনির নামে সমগ্র এসিয়া সন্ত্রস্ত হইয়া উঠে। আর একটি কথা,—কাহাকেও বন্দী করিও না, কাহারও প্রতি করুণা প্রকাশ করিও না!'—মার্কিণও ত তখন আমাদের সঙ্গে অনেকটা জড়িত হইয়া পড়িয়াছিলেন। বোধ করি, তুমি সে কথা একেবারে ভুলিয়া যাও নাই। কেন না, এ ক্ষেত্রেও তোমার বদান্যতার পরিচয় আমরা পাইয়াছি। চীনের প্রদত্ত খেসারতের টাকা তুমি ফিরাইয়া দিয়াছ।"

জাপ্ চেয়ার পরিত্যাগ করিয়া দাঁড়াইলেন। "এই ছবিটি আর কখনও

দেখিয়াছ কি? উইল্‌হেল্‌ম্‌ শিল্পীকে ডাকাইয়া, এই ছবি নিজের তত্ত্বাবধানে অঙ্কিত করাইয়াছিলেন। তাঁহার বিকৃত-মস্তিষ্কজাত পীতভীতি চিত্রে কিরূপ প্রতিফলিত হইয়াছে দেখ। সমুদ্রতীর,—দূরে লেলিহান অগ্নিশিখা আকাশমার্গ আচ্ছন্ন করিয়াছে,—ঐ সাগরব্যোমব্যাপী অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে কে যেন মৌন ধ্যানমগ্ন! এ দিকে পর্ব্বতশিখরের প্রান্তদেশে স্বর্গলোক হইতে দেবদূত মাইকেল অবতীর্ণ! তাঁহার বিশাল বক্ষঃ যেন প্রলয়-নিঃশ্বাসে স্পন্দিত হইতেছে; পক্ষদ্বয় বিস্ফারিত; সমগ্র খৃষ্টীয় শক্তিপুঞ্জের প্রতি তাঁহার প্রদীপ্ত দিব্য চক্ষু নিবদ্ধ; বাম হস্ত ঐ অগ্নিময় পূর্ব্বদিগন্তের দিকে প্রসারিত; দক্ষিণ হস্তে জ্বলন্ত হুতাশনপ্রতিম অসি ধারণ করিয়া তিনি দণ্ডায়মান! অগ্রণী ফরাসীশক্তিরূপিণী বীরাঙ্গনা, দক্ষিণ হস্তে আয়ুধধারিণী, ত্রস্তা, চকিত-নয়না, আভরণহীন বাম হস্তের দ্বারা যেন চক্ষু ঈষৎ আবৃত করিতেছেন। তাঁহার পশ্চাতে জর্ম্মনি, বিস্ফারিতলোচনা; শিরোদেশে অবেণীসংবদ্ধ কেশরাশির উপর উপবিষ্ট পক্ষিরাজ ঈগল; দক্ষিণ হস্তে মুষ্টিবদ্ধ নিষ্কোষিত অসি; দক্ষিণ পদ যেন অগ্রসর হইবার জন্য প্রস্তুত। তাঁহার দক্ষিণ স্কন্ধে নিজ দক্ষিণ হস্ত স্থাপিত করিয়া, বাম হস্তে অস্ত্র ধারণ করিয়া রুশিয়া দণ্ডায়মানা। রুশিয়ার পশ্চাতে দাঁড়াইয়া অষ্ট্রিয়া নিজ দক্ষিণ হস্তের দ্বারা বৃটানিয়ার বাম প্রকোষ্ঠ দৃঢ়ভাবে ধারণ করিয়া যেন বলিতেছেন,—'এস, আমাদের সঙ্গে এস।' উহাদের উভয়ের মধ্যে দাঁড়াইয়া—ইটালী; তাঁহার কটিদেশে অসি ঝুলিতেছে।—শূন্যে দেখ, খৃষ্টের ক্রুশ ঝুলিতেছে।

"এই অমূলক আতঙ্কের সৃষ্টি করিয়া উইলহেল্‌ম্‌ আমাদিগকে অত্যন্ত ব্যস্ত করিয়া তুলিলেন। এসিয়ার পীত জাতি কি য়ুরোপের পক্ষে এতই ভয়ঙ্কর হইয়াছে! বরঞ্চ ঘটনাপরম্পরায় যাহা দাঁড়াইল, তাহাতে মনে হইল যে, এসিয়ার শ্বেতাতঙ্ক বাস্তবিকই ভীষণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আমরা

এক প্রকারে সে বিপদ্ হইতে উদ্ধার পাইয়া, এত দিন পরে আজ সেই কৈশরি পীতাতঙ্কের এক অভিনব ইংরাজি সংস্করণ দেখিতেছি মাত্র। জর্ম্মন্য ভাব দমন করিতে গিয়া ইংরাজ ঐ ভাবের দ্বারা অভিভূত হইয়াছে। লর্ড নর্থক্লিফের এই ধার-করা জিনিষ দেখিয়া আমরা বিচলিত হইব কেন?—জর্ম্মনি যাই বলুন, ইংরাজ আমাদের সহিত রীতিমত সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইলেন। হাউস্ অব্ লর্ডস্এ যখন পররাষ্ট্র-সচিব লর্ড ল্যান্সডাউন ১৯০২ খৃষ্টাব্দে এই সন্ধির কথাটি প্রকাশ করেন, তখন লর্ড রোজবেরি ঘৃণার সহিত বলিয়াছিলেন,—'ইংরাজ কি এতই হেয় যে, পৃথিবীর পথে ঘাটে, অলিতে গলিতে ঘুরিয়াও সে একটি ভদ্র খৃষ্টান মিত্র পাইল না! একটা পীত জাতির সহিত মিত্রতা করিতে হইল!' এই সন্ধির একটা সর্ত্ত এই ছিল যে, উভয় পরাক্রমশালী মিত্রের মধ্যে কোনও একটি যদি এসিয়ায় একাধিক আততায়ী কর্ত্তৃক আক্রান্ত হন, তাহা হইলে মিত্রশক্তি আক্রান্তকে সাহায্য করিবেন। তখন এসিয়া ভূখণ্ডে ইংরাজের ও আমাদের একমাত্র আশঙ্কার বিষয় ছিল—রুশিয়ার নাতিগূঢ় দুরভিসন্ধি। যদি রুশিয়া ইংরাজকে অথবা জাপানকে একাকী আক্রমণ করেন, তাহা হইলে ইংরাজ অথবা জাপানকে একাকীই আত্মরক্ষার চেষ্টা করিতে হইবে; মিত্রশক্তি শুধু দেখিবেন, যেন আর কেহ রুশিয়ার সঙ্গে যোগ না দেয়। যদি আর কেহ রুশিয়ার সাহায্যকল্পে এসিয়ার যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হ'ন, তাহা হইলে আমরা দুই বন্ধু মিলিত হইয়া যুদ্ধ চালাইব। এইরূপে য়ুরোপের মত এসিয়াতেও দুই পরস্পর-বিরোধী সশস্ত্র শক্তিপুঞ্জ পরস্পর সম্মুখীন হইয়া দাঁড়াইল।

"সাইবিরিয়ার এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত রুশিয়ার রেলপথ তখন নির্ম্মিত হইয়া গিয়াছে। ব্লাডিবোষ্টক বন্দরে একটি প্রকাণ্ড নৌ-বাহিনী অবস্থিত। এ দিকে মাঞ্চুরিয়ার দক্ষিণে, লিয়াও-টংএর প্রান্তভাগে

আর্থর বন্দর ও ড্যাল্‌নি নগর দুর্ভেদ্য ব্যূহে পরিণত হইল। বাকি ছিল কেবল সাইবিরিয়ার রেল-লাইনের সঙ্গে আর্থর বন্দরের সংযোগ;—তাহাও ১৯০৩ খৃষ্টাব্দের মধ্যেই সংঘটিত হইল। মাঞ্চুরিয়ার এই রেলপথ নির্ম্মাণের সময় বহু সুদক্ষ জাপানী এঞ্জিনীয়র, স্বরূপ গোপন করিয়া দীনবেশে চীনা কুলী-মজুরের মত কাজ করিয়া, উক্ত রেলপথের সমস্ত খুঁটিনাটি যত কিছু গোপন রহস্য জানিয়া লইল।

"এমন সময়ে কোরিয়ার উত্তর-পশ্চিম প্রান্তসীমায় ইয়ালু নদীর তীরে রুশের সহিত আমাদের গোল বাধিল। আলেক্সিফ তখন প্রাচ্য রুশিয়ার রাজপ্রতিনিধি। তিনি কিছুতেই ভ্রূক্ষেপ করিলেন না। তাঁহার অনুচরগণ বলিল,—'আমরা এই প্রকাণ্ড জঙ্গলে কাঠের ব্যবসা করিবার জন্য আসিয়াছি; মনের মধ্যে আমাদের অন্য কোনও দুরভিসন্ধি নাই।' আমরা বলিলাম—'বেশ; আমরা তা'তে আপত্তি করিব কেন? কিন্তু তোমরা যে ইয়ালু নদীর এ পারে, কোরিয়ার মধ্যে প্রবেশ করিতেছ! সমস্ত জঙ্গলটাই কি তোমাদের দরকার?' রুশ আমাদের কথায় কান দিল না, আরও অগ্রসর হইতে লাগিল। আমরা বলিলাম,—'তবে এক বন্দোবস্ত করা যাক্‌;—কোরিয়ার পশ্চিম অংশে তোমরা থাক, পূর্ব্বার্দ্ধে আমরা থাকি।' আমাদের এ আবেদনও রুশিয়া গ্রাহ্য করিল না।

"যুদ্ধ বাধাইবার জন্য রুশ যখন বদ্ধপরিকর, তখন আমরাও কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া বসিয়া রহিলাম না। ইংরাজকে বলিলাম,—'জর্ম্মনি ও ফরাসীর উপর নজর রাখিও; রুশের বিষয় তোমাকে ভাবিতে হইবে না।' ১৯০৪ খৃষ্টাব্দের ৫ই ফেব্রুয়ারি রুশিয়ার রাজধানী হইতে আমাদের রাজপ্রতিনিধি চলিয়া আসিবার সময় ইংরাজ প্রতিনিধি লর্ড হার্ডিঞ্জের হস্তে সমস্ত কাগজপত্র রাখিয়া আসিলেন; বলিলেন,—'জাপানের মিত্রের যাহা কর্ত্তব্য, আপনি করিবেন।' টোকিও হইতে রুশ-রাজ-প্রতিনিধিও বিদায়

লইলেন ; বিদায়কালে ফরাসী রাষ্ট্রপ্রতিনিধিকে সকল কাগজপত্র বুঝাইয়া দিলেন। তখনও কিন্তু যুদ্ধ-ঘোষণা প্রচারিত হয় নাই। সম্রাট্ টোগোকে সমগ্র নৌ-বাহিনীর নায়কত্বে বরণ করিলেন।

"পরদিন ৬ই ফেব্রুয়ারি। টোগো সমস্ত টর্পেডো-বাহিনীকে আদেশ দিলেন যে, তাহারা যেন এলিয়ট দ্বীপপুঞ্জে তাঁহার সহিত মিলিত হয়। মনে রাখিও, তখন ডুব-জাহাজ আবিষ্কৃত হইয়াছিল বটে, কিন্তু তখনও সমুদ্রগর্ভে তাহার নিরাপদ্ কার্য্যকুশলতা সম্বন্ধে সকলেরই ঘোর সন্দেহ ছিল। টর্পেডো-বোট ও রণতরী জলের উপর দিয়াই চলিত। এখনকার মত এয়ারোপ্লেনও তখন ছিল না।

"৮ই ফেব্রুয়ারি, রাত্রিকাল—ঘন অন্ধকার। আমাদের চারিখানি টর্পেডো-বোট সেই অন্ধকার ভেদ করিয়া আর্থর বন্দরাভিমুখে দ্রুতবেগে অগ্রসর হইল। টোগো তাহাদিগকে বলিয়াছিলেন,—'আজ তোমাদের উপর আমাদের দেশের সমস্ত ভাল মন্দ নির্ভর করিতেছে। মনে রাখিও, তোমাদের দেশকে আর তোমাদের সম্রাট্‌কে। তোমাদের আগমন প্রতীক্ষা করিব—পোর্ট আর্থর হইতে ত্রিশ মাইল দূরে এলিয়ট দ্বীপপুঞ্জে'। ফিরিতে পারা যাইবে কি না, সে ত পরের কথা ; এখন ত কার্য্য উদ্ধার করিবার চেষ্টা করা যাক্। দূরে দুইখানা বৃহত্তর রুশ ক্রুজার পাহারা দিতেছিল! তাহদিগকে কেমন করিয়া এড়াইয়া যাইবে? আজিকার দিনে এই কার্য্যের গুরুত্ব তোমরা উপলব্ধি করিতে পারিবে না। গত মহাসমরে জর্ম্মন ডুবজাহাজ 'ডয়টশল্যাণ্ড' কীল্ খাল হইতে বাহির হইয়া ডুব দিয়া, আট্‌লাণ্টিক মহাসাগর অতিক্রম করিয়া, একেবারে এই তোমাদের মুল্লুকে ভাসিয়া উঠিল ; চকিত ইংরাজ ভাবিল যে, জাহাজখানা যদি ফিরিতে চেষ্টা করে, তবে সে নিশ্চয় ধরা পড়িবে। কিন্তু আবার এক ডুবে মহাসাগর পার।

ক স্তু আমি ১৯০৪এর কথা বলিতেছি, ১৯১৪'র নহে।

"ক্রুজার দুইটার নজর পড়িল—টর্পেডো-বোট কয়খানির উপর। দীপ্ত তাড়িতালোকে প্রশ্ন হইল—'কে তোমরা? কোথা হইতে আসিতেছ?' আমরা রুশিয়ার এই গোপন কোডের ভাষা শিখিয়া লইয়াছিলাম;—রুশ-সেনানীর অজ্ঞাতসারে আমাদের গুপ্তচররা রুশিয়ার এই রহস্যময় সাঙ্কেতিক ভাষার কোড অপহরণ করিয়াছিল। কাজেই টর্পেডো বোট হইতে উত্তর দিতে বিলম্ব হইল না—'আমরা ড্যালনি হইতে আসিতেছি, সেখানকার সব মঙ্গল।' রুশ ভাবিল, এরা আমাদের লোক; বোধ করি, আজ দুর্গেশ-পত্নীর জন্মোৎসবে যোগ দান করিবার প্রবল বাসনা এই গভীর নিশীথে ইহাদিগকে ঘরছাড়া করিয়াছে। তাহারা পথ ছাড়িয়া দিল। অন্ধকারে টর্পেডো-বোটগুলি অদৃশ্য হইয়া গেল।

"দূরে দুর্গশিখর আলোকমালায় বিভূষিত। অ্যাডমিরাল ষ্টোয়েসেলের পত্নীর জন্মদিন উপলক্ষে উৎসব। ছোট বড় সমস্ত রণতরীর ছোট বড় কর্ম্মচারীরা আজ সন্ধ্যার পর হইতে আনন্দে মত্ত। আসন্ন বিপদের লেশ-মাত্র আশঙ্কা কাহারও মনে ছিল না; নহিলে অত্যন্ত মোটামুটি সাধারণ বিষয়েও সতর্ক হওয়া কেহ প্রয়োজন বিবেচনা করে নাই কেন? বন্দরের বাহিরে বীচিভঙ্গবিহীন উপকূলে বড় বড় তরীগুলি নিশ্চলভাবে দণ্ডায়মান। টর্পেডো-বোটগুলি তাহাদের অত্যন্ত নিকটবর্ত্তী হইল; মুহূর্ত্তমধ্যে সবগুলা টর্পেডো প্রক্ষিপ্ত হইল। ভীমদর্শন প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড রণতরী,—রেটভিজান্, পল্টাভা, জার্‌উইচ, প্যালাডা, বিদীর্ণ দ্বিখণ্ডিত-তলদেশ হইয়া সেই স্বল্পতোয় উপকূলের তটদেশে অর্দ্ধনিমজ্জিতাবস্থায় হেলিয়া পড়িল। আনন্দোৎসবের কি দশা হইল, জানি না। নিমেষের মধ্যে বজ্রনির্ঘোষে দুর্গপ্রাচীর হইতে কামান গর্জ্জিয়া উঠিল। টর্পেডো-বোটগুলি কোথায় অন্তর্হিত হইয়া গেল।

"পরদিন অতি প্রত্যূষে আমাদের একটি ক্ষুদ্র নৌ-বাহিনী কোরিয়ার

১৪

চেমল্‌ফো বন্দরে দুইখানি ছোট রুশ-জাহাজকে যুদ্ধে আহ্বান করিল। সেখানে তখন ইংরাজের, ফরাসীর, জর্ম্মণীর ইটালীর ও তোমাদের এক একখানা জাহাজ ছিল। সকলেই রুশ কাপ্তেনকে বারণ করিল—তিন মাইলের গণ্ডীর বাহিরে যাইতে। রুশ কিন্তু বারণ শুনিল না; বাহিরে আসিয়া যুদ্ধ দিতে প্রস্তুত। আমাদের জাহাজগুলি ক্ষিপ্রগতিতে তোমাদের বর্ণমালার এস্ (S) অক্ষরের মত ব্যূহ রচনা করিয়া, সেই দুখানা জাহাজকে দূর হইতে ঘিরিয়া গোলাগুলী বর্ষণে তাহাদিগকে বিপর্য্যস্ত করিয়া ফেলিল। রুশকাপ্তেন কোনও প্রকারে জাহাজ দু'খানাকে বন্দরে ফিরাইয়া লইয়া ডুবাইয়া দিলেন। মজ্জমান নাবিকগুলিকে তোমরা সকলে জল হইতে উঠাইলে। আমরাও অনেকগুলিকে উঠাইলাম। ওদিকে পোর্ট আর্থরের অনতিদূরে টোগোর অধিকাংশ জাহাজ পাহারা দিতে লাগিল। চার পাঁচ খানি বড় ক্রুজারকে তিনি জখম করিলেন। ব্লাডিবোষ্টক হইতে রুশের জাহাজ যাহাতে বাহিরে আসিতে না পারে, তজ্জন্য টোগো অ্যাড্‌মিরাল কামিমুরাকে ভার দিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন। এই রকমে আমাদের যুদ্ধ আরম্ভ হইল। আর কি শুনিবে!"

জাপ্‌ চুপ করিলে মার্কিণ চমকিয়া উঠিলেন। "আর কি শুনিব? বোধ করি, আরও যাহা শুনিবার আছে, তাহা তোমার বর্ণিত বীর্য্যকাহিনী অপেক্ষা কম বিস্ময়কর নহে।"

জাপ্‌ হাসিলেন। "তুমি আমাকে স্মরণ করাইয়া দিলে আমাদের দীক্ষাগুরু জর্ম্মণ সেনাপতি মেকেল্‌-এর ভবিষ্যদ্বাণী। বৃদ্ধ সেনাপতির কয়েক জন বন্ধু যখন আমাদের নৌ-সমর-কুশলতার প্রশংসা করিতেছিলেন, তিনি নাকি বলিয়াছিলেন,—'একটু অপেক্ষা কর; জাপ্‌-সৈন্যের রণকৌশল জগৎকে স্তম্ভিত করিবে।'

"ইতোমধ্যে সেনাপতি কুরোকি প্রথম সৈন্য-বিভাগের অধিনায়ক হইয়া

চেমাল্‌ফো বন্দর দিয়া কোরিয়ায় প্রবেশ করিলেন। কয়েক দিনের মধ্যেই তিনি কোরিয়া হইতে সমস্ত রুশ-সৈন্য বিতাড়িত করিয়া, ইয়ালু নদী পার হইয়া মাঞ্চুরিয়ায় প্রবেশ করিলেন। সংবাদ আসিল যে, রুশিয়ার সমর-সচিব কুরোপ্যাট্‌কিন্‌ মাঞ্চুরিয়ায় প্রধান সেনাপতি হইয়া আসিলেন।

"কয়েক দিনের মধ্যেই দ্বিতীয় বাহিনীর অধিনায়ক সেনাপতি ওকু লিয়াওটং ভূখণ্ডের এক প্রান্তে অবতীর্ণ হইলেন। আর্থর দুর্গ দখল করা তাঁহার উদ্দেশ্য। বন্দরের মুখে কয়েকখানা পুরাতন জাহাজ ডুবাইয়া ছিপি আঁটিয়া দিয়া টোগো অনেকটা নিশ্চিন্ত হইলেন।"

মার্কিণ বলিলেন,—"ও বিদ্যাটি বোধ হয়—" তাঁহার কথা সমাপ্ত হইতে না দিয়া জাপ্‌ বলিলেন,—"হাঁ, ওটা তোমাদের দেখিয়া আমাদের শিক্ষা। কিউবায় কেমন করিয়া তোমাদের লেফ্‌টেনাণ্ট হব্‌সন্‌ সান্টিয়াগো বন্দরের মুখে জাহাজ ডুবাইয়া স্পেনের নৌ-সেনাপতি অ্যাড্‌মিরাল সার্ভেরাকে তোমাদের অ্যাড্‌মিরাল্‌ ডিউয়ির কাছে আত্মসমর্পণ করাইতে বাধ্য করাইয়াছিল, তাহা আমরা ভাল করিয়া বুঝিয়া লইয়াছিলাম। আর্থর বন্দরের সম্মুখে যিনি হব্‌সনের অনুকরণ করিতে গিয়াছিলেন, তাঁহার পবিত্র স্মৃতি আমরা শ্রদ্ধার সহিত রক্ষা করিতেছি।" মার্কিণ জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কে? টোগো?" জাপ্‌ বলিলেন,—"না; লেফ্‌টেন্যাণ্ট হিরোসি। গভীর নিশায় যখন আর্থর দুর্গও সুপ্তিমগ্ন বলিয়া বোধ হইল, হিরোসি কয়েকখানি জীর্ণ তরী লইয়া বন্দরাভিমুখে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইলেন। গন্তব্য স্থানে পৌঁছিবার পূর্ব্বেই দুর্গপ্রাচীরের চঞ্চল তাড়িত আলোক তাঁহাদের উপর নিপতিত হইল। পরক্ষণেই গোলাবৃষ্টি। হিরোসি কালবিলম্ব না করিয়া পাথর-বোঝাই ভাঙ্গা নৌকাগুলা একে একে জলমগ্ন করিলেন। কিন্তু বোধ হয়, ঠিক যে জায়গায় সেগুলাকে ডুবাইবার তাঁর ইচ্ছা ছিল, সেখানে ডুবাইতে পারেন নাই। স্রোতের বেগ অপেক্ষা-

ক্বত কিছু প্রবল হওয়ায় দু' একখানি নৌকা ঠিক মাঝখানে ডুবিল না, পার্শ্বে গিরিগাত্রে ঠেকিয়া হেলিয়া রহিল। এখন হিরোসির ক্ষুদ্র তরীখানির উপর গোলা পড়িতে লাগিল। ছোট ছোট দু'খানি লাইফ্‌বোট জলে নামাইতে তিনি আদেশ দিলেন। সহচর নাবিকগুলিকে ঐ দুইখানি নৌকায় জোর করিয়া উঠাইয়া দিয়া তিনিও একখানিতে উঠিতে যাইতে-ছেন, এমন সময়ে তাঁহার স্মরণ হইল যে, তরবারি তাঁ'র ক্যাবিনে রহিয়া গিয়াছে। তিনি আবার তাঁ'র জাহাজে ফিরিয়া আসিলেন। তরবারি লইয়া নৌকায় উঠিলেন। নৌকা ছাড়িয়া দিল। তিনি বলিলেন,—'কই? আমাদের এঞ্জিনীয়রকে দেখিতে পাইতেছি না কেন? তাঁ'কে কি জাহাজে ফেলিয়া আসিলাম?' নাবিকদিগের বিষম আপত্তি সত্ত্বেও তিনি তাঁহার পরিত্যক্ত মজ্জমান জাহাজখানাতে ফিরিয়া গেলেন। নিমেষের মধ্যে একটা শেল পড়িয়া তাঁহার দেহ শত খণ্ডে বিভক্ত করিয়া দিল। তাঁহার দেহাবশেষ যতটুকু পাওয়া গেল, তাহা লইয়া সমস্ত টোকিও নগরী নগ্নপদে মৌনশ্রদ্ধায় অবনতমস্তকে সমাধিস্থ করিল।

"যুদ্ধের পূর্ব্বে হিরোসি কিছুকাল রুশিয়ার রাজধানীতে অভিজাত-সমাজের মধ্যে পরম সমাদর লাভ করিয়া বাস করিয়াছিলেন। এক দিন তিনি মল্লযুদ্ধ দেখিতে গেলেন। ইতর ভদ্র অনেক লোক সেখানে সমবেত হইয়াছিল। ভীমকায় রুশীয় মল্লগণের ক্ষিপ্রতায় ও ভুজবলে সকলে চমৎ-কৃত হইল। সহসা দেখা গেল যে, এক খর্ব্বকায় জাপানী প্রাঙ্গণমধ্যে মল্লগণকে যুদ্ধে আহ্বান করিতেছে। তাহার ক্ষীণ দেহযষ্টি দেখিয়া তাহারা হাসিয়া উঠিল। তাহার বন্ধুগণ তাহাকে ফিরিয়া আসিতে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিলেন। যুবকের খর্ব্বদেহ দেখিয়া সকলে যেন কিছু আমোদ বোধ করিল। তিনি বলিলেন,—'আপনারা আমাদের দেশের যুযুৎসু দেখেন নাই, তাই এই সকল পালোয়ানের কুস্তিতে বাহবা দিতেছেন।

তিনি একে একে চার পাঁচটি পালোয়ানকে এমন জখম করিলেন যে তাহারা অকুণ্ঠিতভাবে পরাভব স্বীকার করিল। সকলে বিস্মিত স্তম্ভিত হইয়া গেল। জনতা ক্রমশঃ কমিয়া গেলে একটি প্রবীণ ভদ্রলোক আনন্দে তাঁহার করমর্দ্দন করিয়া বলিলেন,—'যুবক, তোমার বীরত্বে আমি মুগ্ধ হইয়াছি। আমার এই তিনটি কন্যাও তোমার প্রতি তাহাদের আন্তরিক শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিতেছে। আমার একান্ত ইচ্ছা, তুমি ইহাদের মধ্যে একটিকে বিবাহ কর। দেখ, তিনটিই সুন্দরী ; তুমি কাহার পাণিগ্রহণ করিবে, বল।' যুবক অত্যন্ত বিচলিত হইলেন ; কিন্তু মুহূর্ত্তমধ্যে আত্ম-সংবরণ করিয়া বলিলেন,—'এখন ক্ষমা করিবেন ; কাল আপনাকে উত্তর দিব।' পরদিন অপরাহ্ণে ঐ প্রবীণ ভদ্রলোকটি বোধ করি, হিরোসির আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। অপরাহ্ণে একখানি পত্র তাঁহার হস্তগত হইল। তাহাতে লিখা ছিল,—'মহাশয়, আপনার প্রস্তাবে আমি পুলকিত ও গৌরবান্বিত হইয়াছি। অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত আমার চিত্ত চঞ্চল ছিল। কিন্তু ক্রমশঃ মনকে সংযত করিলাম। আমি ভাবিয়া দেখিলাম যে, রুশরমণীর পাণিগ্রহণ করা আমার পক্ষে অসম্ভব। আজ না হয় কাল, আপনাদের সঙ্গে আমাদের বিরোধ অবশ্যম্ভাবী। রুশ-রমণীকে বিবাহ করিয়া যদি আমি আমার জন্মভূমির বিপৎকালে কর্ত্তব্যবিমুখ হই! আপনার কন্যাকে এমন অশান্তি হইতে ভগবান্ রক্ষা করুন। আমার চিত্ত আজ উদ্‌ভ্রান্ত। আমি চলিলাম। আপনি আমাকে ক্ষমা করিবেন।' রুশিয়া হইতে হিরোসি স্বদেশে ফিরিলেন।...নিস্তব্ধ নিশীথে, আর্থর বন্দরের মুখে তাঁহার জীবনলীলার পর্য্যবসান হইল।

"আজ এইখানে এই যুদ্ধ-কাহিনী সমাপ্ত করি। কেমন করিয়া তৃতীয় বাহিনীর সেনাপতি নড্‌জু মাঞ্চুরিয়ার রেলপথে রুশ-সেনার গতিবিধি বন্ধ করিলেন ; কেমন করিয়া মার্শ্যাল ওয়ামা কুরোপ্যাটকিনকে পদে পদে

পরাজিত করিলেন; কেমন করিয়া সেনাপতি নগি'র হস্তে ষ্টোয়েসেল আর্থর দুর্গ সমর্পণ করিলেন; কি উপায়ে নবাগত রুশ-নৌবাহিনীকে টোগো চুশিমা-সমীপে জলমগ্ন করিলেন, সে সকল কথা বিবৃত করিতে আজ আর ইচ্ছা হইতেছে না। শেষে তোমরা মধ্যস্থ হইয়া বিবাদ মিটাইয়া দিলে। পোর্ট আর্থর ও ট্যালিয়েনওয়ান্ আমরা ফিরাইয়া পাইলাম। স্যাঘালীন্ দ্বীপের দক্ষিণার্দ্ধ আমাদের হস্তগত হইল। মাঞ্চুরিয়া রেলের কিয়দংশও রুশ আমাদিগকে দিতে বাধ্য হইলেন।...আজকয় দিন হইল, গত ৩১এ মে আর্থর বন্দর হইতে সমস্ত লড়াইয়ে জাহাজ সরাইয়া লওয়া হইয়াছে। আর উহাকে naval base করা হইবে না। কিসের কি পরিণাম হইল দেখ।

"গত মহাসমরে রুশ ও জর্ম্মণ অধঃপাতে গিয়াছে। কিয়াওচাউ হইতে ব্লাডিবোষ্টক্ পর্য্যন্ত সমস্ত সমুদ্রতটে আমরা শান্তিরক্ষা করিতেছি। দক্ষিণে মার্শ্যাল ও কেরোলাইন দ্বীপপুঞ্জ হইতে জর্ম্মণীকে তাড়াইয়া আমরা ঐ সকল স্থান অধিকার করিয়াছি বলিয়া অষ্ট্রেলিয়ার গাত্রদাহ হইতেছে। লর্ড নর্থক্লিফ্ তাহাদের মুখরোচক কথাই বলিয়াছেন। কোরিয়া শনৈঃ শনৈঃ কত উন্নত হইয়াছে, তাহা তুমি জান।"

মার্কিণ উঠিয়া দাঁড়াইলেন, বলিলেন,—"দেখ, আমাদের এই প্রশান্ত মহাসাগরের শান্তি-বৈঠকে তোমার আসা চাই। তুমি না এলে, এই হনোলুলু যজ্ঞ শিবহীন হবে। চীন, শ্যাম, বোর্ণিও, অষ্ট্রেলিয়া, ক্যানাডা প্রভৃতি অনেককেই আমাদের ওয়াশিংটন গভর্মেণ্ট আহ্বান করিয়াছেন। কিন্তু সেখানে আমরা কোনও কর্ত্তৃত্ব করিবার স্পর্দ্ধা করি না।" তিনি বিদায় হইলে পরে জাপ্ দেরাজের ভিতর হইতে একখানি ছোট নোট-বুক বাহির করিয়া তাহাতে ডায়ারি লিখিলেন,—'মার্কিণ আজ খুব সরল বন্ধুত্বের ভাণ করিয়া ইংরাজের সম্বন্ধে আমার মনের ভাব

জানিতে আসিয়াছিলেন। আমি আমাদের দেশের একটু ইতিহাস শুনাইয়া ও দুই পেয়ালা কাফি পান করাইয়া তাঁহাকে আপ্যায়িত করিলাম।'

* * * * *

মার্কিণ সমুদ্রের তীরে আসিয়া দাঁড়াইলেন। আলোকস্তম্ভ হইতে তাড়িতালোক অন্ধকার বিদীর্ণ করিয়া বহুদূর পর্য্যন্ত বিচ্ছুরিত হইয়াছে। সহসা কে যেন তাঁহার স্কন্ধদেশ স্পর্শ করিল। তিনি চমকিয়া উঠিলেন। আগন্তককে দেখিয়া বলিলেন,—"তুমি এখানে?" "আমি অনেক দিন হইতেই তোমার পিছু লইয়াছি। উইল্‌সন্‌ যে দিন হইতে স্ব-তন্ত্রীকরণের কথা তুলিয়াছিলেন, সে দিন হইতে আমি তোমার দ্বারে করাঘাত করিতেছি। কিন্তু তোমার সাড়া পাই না। ওয়াশিংটনে তোমাদের চতুঃশক্তি-সম্মিলন ব্যাপারও কিছু দূর হইতে দেখিলাম; সেখানেও তোমার নাগাল পাইলাম না। জেনোয়ার বড় ব্যাপারটার সঙ্গেই যখন তুমি কোনও সম্পর্ক রাখিলে না, তখন আমাদের নিপীড়িত-প্রাচ্য-জাতি-সম্মিলনের খবর বোধ করি, তুমি কিছু রাখিতে ইচ্ছা কর না। চীনের দিকে অনেক দিন হইতেই তুমি নজর রাখিয়াছ, কিন্তু আমার দিকে কখনও ভাল করিয়া তাকাও নাই। এখন দেখিতেছি, জাপের সঙ্গে তোমার বন্ধুত্ব কিছু অতিরিক্ত মাত্রায়।"

"সে কথায় তোমার কাজ কি? আমি তোমাকে লক্ষ্য করি নাই, কেমন করিয়া তুমি বুঝিলে? আমি তোমাকে কয় বৎসর দেখিতেছি,— তুমি ন্যাশনলিষ্ট্‌ কোরিয়ার মূর্ত্তিমান্‌ বিদ্রোহ। আমার কাছে কি চাও?"

"কিছু চাই না। শুধু আমাদের কথাটা একবার তোমাকে শুনাইতে চাই।" "আর পারি না। য়ুরোপের ছোট বড় সকলেই দিনান্তে এক-বার আমাকে তাহাদের নিজ নিজ কাহিনী শুনাইতে ব্যস্ত। এইমাত্র

জাপ্ কত কথাই বলিল। তোমার জন্যই তা'র যত মাথাব্যথা। তাহাদের সাম্রাজ্যভুক্ত হইয়া শুনিলাম, তোমরা শনৈঃ শনৈঃ উন্নত হইতেছ?"

"আমরা অত্যন্ত অবনত ছিলাম বুঝি? আমাদিগকে উন্নত করাইতে কে তাহাদিগকে ডাকিয়াছিল?" "না হয় তা'দের নিজেদেরই একটু স্বার্থ ছিল! কিন্তু সে ত তোমাদের যথেষ্ট উপকার করিয়াছে। আর তোমরা কি নিজে সম্পূর্ণ স্বাধীন থাকিতে পারিতে? জাপানের অধিকারভুক্ত না হইলে তোমরা রুশের হাত এড়াইতে পারিতে কি?" "হয় ত' পারিতাম না; কিন্তু সে কি এত খারাপ হইত? এ যে আমাদের সমস্ত জাতিটাকে নষ্ট করিতেছে।"

মার্কিণ বলিলেন,—"আচ্ছা, তুমি স্বীকার কর কি না যে, দশ বার বছর আগে,—এই ধর ১৯১০ খৃষ্টাব্দে যখন তোমরা জাপ সাম্রাজ্যভুক্ত হইলে,—তোমাদের দেশে বড় রাস্তা পাঁচ শ' মাইলের বেশী ছিল না। কেমন, ঠিক কি না?"

উত্তর হইল—"তা হ'বে।"

মার্কিণ—"এই কয় বছরের মধ্যে আট হাজার মাইল রাস্তা পাকা হইয়াছে।"

উত্তর—"উহাদেরই সৈন্যের ও রাজকর্ম্মচারীদের যাতায়াতের সুবিধা ও ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার বৃদ্ধি হইয়াছে। আমাদের কতটুকু সুখ বাড়িল?"

মার্কিণ—"এঃ, দেখিতেছি, তোমরা সহজে স্বীকার করিবে না যে তোমাদের সুখী হওয়া অন্ততঃ উচিত ছিল। নূতন নূতন শিল্প প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে?"

উত্তর—"তা'তে আমাদের সুখ বাড়িয়াছে কি?"

মার্কিণ—"তোমাদের কোনও কুঠি ফ্যাক্টরি ছিল না; এখন দেখ, আট শত ফ্যাক্টরি বিরাজ করিতেছে। সেখানে কত হাজার কোরিয়া-বাসী জীবিকা অর্জ্জন করিতেছে, বল দেখি?"

উত্তর—"হুঁ; জাপ্-এর ফ্যাক্টরিতে আমরা কুলি-মজুর কেরাণীর কাজ করিতেছি। আমাদের সুখী হওয়া উচিত ছিল!"

মার্কিণ—"কৃষিকার্য্য কতটা বৃদ্ধি পাইয়াছে, বল দেখি? ফলের চাষ, তূলার চাষ, বীটচিনি, তামাকু, রেশমের গুটিপোকা—"

উত্তর—"এ সব কি আমাদের ছিল না? আমাদের দুই কোটি নর-নারীর অভাব-মোচন হইয়াও পর্য্যাপ্ত পরিমাণে রপ্তানী হইত না কি?"

মার্কিণ—"অবশ্যই কিছু হইত। কিন্তু উদ্যমশীল জাপ্এর হাতে এ সমস্ত কতগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে, বল দেখি? যে পাহাড়ের গাত্রে একটিও গাছ ছিল না, সেখানে লক্ষ লক্ষ বড় গাছ মাথা তুলিয়াছে—"

উত্তর—"হুঁ; আর যে দেশে লক্ষ লক্ষ নর-নারী সুখে স্বচ্ছন্দে ঘর-করণা করিতেছিল, সেখান হইতে বিতাড়িত হইয়া সহস্র সহস্র কর্ম্মক্ষম বলিষ্ঠ পুরুষ চীনে, মাঞ্চুরিয়ায় সাইবিরিয়ায় ছড়াইয়া পড়িয়াছে; বলশেভিক রুশিয়ার সহিত যোগ দিয়া ব্লাডিবোষ্টকের নিকটে পাঁচ ছয় শত জাপ্‌কে বন্দী করিয়াছে।"

মার্কিণ—"তোমাদের রাজা ও মন্ত্রিবর্গ যদি মানুষের মত হইতেন, যদি তাঁ'রা স্বদেশের কল্যাণকামনায় নিজ নিজ শক্তি প্রয়োগ করিতেন, তাহা হইলে এ সব ঘটিত না। জাপানের সর্ব্বাপেক্ষা প্রতিভাবান্ নানাগুণালঙ্কৃত রাজনীতিজ্ঞ মার্কুইস্ ইটোকে তোমাদের দেশ শাসন করিবার জন্য পাঠান হইয়াছিল। তিনি সব দিক্ লক্ষ্য করিয়া সুশাসন করিতেছিলেন, ইহা সকলের মুখেই শুনিয়াছি। বোধ করি, তুমিও অস্বীকার করিবে না যে, তিনি কায়মনোবাক্যে তোমাদের মিত্র

ছিলেন। কিন্তু ১৯০৭ খৃষ্টাব্দের মাঝামাঝি তোমাদের বৃদ্ধ সম্রাট্ তিন জন দূতকে হেগ্ শান্তি-সভায় পাঠাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, যাহাতে য়ুরোপ তোমাদের কথায় কান দেয়। কেহ কিন্তু তোমাদের অভয় দিল না। জাপ্ তোমাদের গুপ্ত ষড়যন্ত্রের উচ্ছেদসাধন করিতে লাগিল। তোমাদের মধ্যে কাহারও কাহারও তাহা ভাল লাগিল না। কোরিয়ার একমাত্র বন্ধু মার্কুইস্ ইটোকে কোন কাপুরুষ হত্যা করিল। ফলে ১৯১০ খৃষ্টাব্দের ২২এ আগষ্ট তারিখে কোরিয়া রীতিমত জাপ্ সাম্রাজ্যভুক্ত হইল। তোমাদের কেহ কেহ মনে করিয়াছিল যে, জাপ্-দিগকে খুন করিলেই স্বাধীনতার পথ সরল ও সুগম হইবে। এখন বোধ হয়, তাঁহারা তাঁহাদের বিষম ভুল বুঝিতে পারিতেছেন।”

উত্তর—“কিন্তু জাপান যে পথ অবলম্বন করিল, সেটা যে বক্র ও কুটিল, তাহা সে স্বীকার করুক আর নাই করুক, বিদেশের পরিব্রাজকগণ জাপানের সরকারী কাগজ হইতেই তাহা প্রমাণ করিতেছেন। তুমি যে সে-সব লেখা পড় নাই, তাহা বলিতে পার না। ইটোর মৃত্যুর পর, দুর্দ্দান্ত সৈনিক পুরুষ কাউণ্ট টেরাউচি পুলিসের ও সৈন্তের সাহায্যে কোরিয়াবাসীদিগকে জাতিচ্যুত করিয়া জাপ্-এর এক অভিনব সংস্করণ করিবার চেষ্টা করিলেন। একটা কথা মনে রাখিও ;—সে বিজেতা, আর আমরা পরাভব স্বীকার করিয়া তাহার অধীনে আসিয়াছি, ইহা যেন কেহ মনে না করেন। অথচ তাহারা আমাদের মাতৃভূমির নাম পর্য্যন্ত পরিবর্ত্তিত করিল। জাপ তোমাকে এইমাত্র বলিয়াছে যে, আমরা শনৈঃ শনৈঃ উন্নত হইতেছি! একজন মার্কিণ পরিব্রাজক, মিঃ আলেক-জাণ্ডার পাউয়েল, সম্প্রতি আমাদের দেশ পর্য্যটন করিয়া কি মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা এই রাত্রির অন্ধকারে, এই সমুদ্রতীরে তাঁহার ভাষায় তোমাকে শুনাইতে পারিলাম না। কিন্তু তাঁহার মন্তব্যটা মোটামুটি শুন।—

প্রথমতঃ,—আইনের দ্বারা মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা, বাক্যের স্বাধীনতা, সভা-সমিতি করিবার স্বাধীনতা হইতে আমাদিগকে বঞ্চিত করা হইল। ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে সমস্ত দেশের মধ্যে কুড়িখানি সংবাদপত্র মুদ্রিত হইত; তন্মধ্যে ১৮টি জাপানী ভাষায়, একটি ইংরাজী ভাষায়, আর একটি আমাদের মাতৃভাষায়।

দ্বিতীয়তঃ,—বিদ্যালয়ে, আপিসে, আদালতে, জাপ্ ভাষার প্রাধান্য হইল। স্কুলের পাঠ্য পুস্তকগুলি ঐ ভাষায় মুদ্রিত করা হইল। শিক্ষকগণের অধিকাংশই জাপানী, অথবা জাপ্-ভাষাবিৎ কোরিয়ান্। তাঁহারা যখন অধ্যাপনা করিতেন, তাঁহাদের কোমরে তরবারি ঝুলিত। স্বদেশের ইতিহাস পড়ান একেবারে বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল। যাহারা বিদেশে পড়িতেছিল, তাহাদিগকে আর দেশে ফিরিতে দেওয়া হইল না। যদি কাহাকেও টোকিও বিশ্ববিদ্যালয়ে কোনও বিশেষ শাস্ত্রে পারদর্শিতা লাভের জন্য পড়িবার অনুমতি দেওয়া হইত, সে সহজে ইতিহাস, বার্ত্তাশাস্ত্র, রাষ্ট্রনীতি অথবা আইন অধ্যয়ন করিতে পাইত না।

তৃতীয়তঃ,—কোনও ধর্ম্মসভায় পাঁচ জনের বেশী লোক উপস্থিত হইতে হইলে পুলিসের অনুমতি লওয়া প্রয়োজন। 'এগোও এগোও খৃষ্টের সেনা' গীতটি পুলিস বন্ধ করিয়া দিল; কারণ, ইহাতে সেনা- অগ্রসর হওয়ার কথা আছে। একজন পাদরী ছেলেদের ধূমপানের অপকারিতা বুঝাইবার জন্য এক বক্তৃতা করেন; তজ্জন্য তাঁহাকে রাজদ্রোহী বলিয়া আদালতে দাঁড় করান হইল। সরকারী উকিল বুঝাইলেন যে, সিগারেটের বিরুদ্ধে মত প্রচার করা, অর্থাৎ গভর্মেণ্টের একটা একচেটিয়া ব্যবসায়ের বিরুদ্ধে কথা কহা, অর্থাৎ গভর্মেণ্টের ক্ষতি করা, অর্থাৎ গভর্মেণ্টের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হওয়া রাজদ্রোহ নয় ত কি?

চতুর্থতঃ,—অধিকাংশ জাপ্ সামাজিক আচরণে আমাদিগকে তাহাদের পায়ের তলার ধূলা অপেক্ষা অধিকতর নীচ মনে করিতে লাগিল।

পঞ্চমতঃ,—অধিকাংশ জমি কাড়িয়া লইয়া জাপ্‌দিগের মধ্যে বিলি করিয়া দেওয়া হইল। মিঃ পাউয়েল বলেন,—'যখন আমি শুনি, কোনও জাপানী বলিতেছে যে, তাহারা কোরিয়ার উপকারের জন্য তথায় প্রবেশ করিয়াছে, তখন ইংরাজদের রাজা প্রথম জর্জ্জএর একটা গল্প আমার মনে পড়ে। হ্যানোভর হইতে ইংলণ্ডে তিনি পদার্পণ করিয়া তাঁর নূতন প্রজাদিগকে ভাঙ্গা ভাঙ্গা ইংরাজী ভাষায় বলিলেন,—'I am here for your own good—for all your goods.'

"এমনই করিয়া বছরের পর বছর অতিবাহিত হইল। শেষে আমাদের নেতৃবর্গ স্থির করিলেন, জাপানীর প্রতি সম্পূর্ণভাবে বিমুখ হইয়া তাঁহারা এমন একটা বিপ্লবের সৃষ্টি করিবেন, যাহাতে প্রজাবর্গের দিক্ হইতে কিছুমাত্র বলপ্রয়োগ বা লেশমাত্র রক্তপাত না হয়। আদেশ হইল যে, কাহারও প্রতি কোনও প্রকার জুলুম করা যেন না হয়; পুলিসের অত্যাচার নীরবে সহ্য করিতে হইবে। অম্লানবদনে মার খাইতে হইবে, জেলে যাইতে হইবে, এমন কি, জীবন বিসর্জ্জন করিতে হইবে। এক দিনে, একই সময়ে, সমস্ত গ্রামে, নগরে, দুই কোটি নর-নারী একেবারে জাপ্‌ সরকারের দিক্ হইতে মুখ ফিরাইয়া দাঁড়াইবে। ১৯১৯ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে সিংহাসনচ্যুত বৃদ্ধ সম্রাটের মৃত্যু হইল। মাসখানেক পরে তাঁহার শ্রাদ্ধ উপলক্ষে সহস্র সহস্র লোক রাজধানী সাউল নগরীতে আগমন করিল। সমবেত দুই লক্ষ লোকের সম্মুখে ধর্ম্ম সাক্ষী করিয়া তেত্রিশ জন নেতা স্বদেশের স্বাধীনতাবার্ত্তা ঘোষণা করিয়া পুলিসকে টেলিফোনে খবর দিলেন এবং জানাইলেন যে, তাঁহারা জেলে যাইতে প্রস্তুত। তাঁহারা ধৃত হইলে, কেহ পুলিসের প্রতি কিছুমাত্র বিদ্বেষ প্রকাশ করিল না।

"তখন ভার্সাইল সন্ধিপত্রে সহি করিবার জন্য জাপ্‌ প্রতিনিধি প্যারী

নগরীতে অপেক্ষা করিতেছিলেন। কোরিয়ার জাপ্-কাহিনী প্রচারিত হইলে পাছে তাঁহার ক্ষতি হয়, সেই জন্য জাপ্ গভর্মেণ্ট শাসন-ব্যবস্থার কিছু পরিবর্ত্তন করিলেন। যথাসময়ে ভার্সাইল-সন্ধি জাপ কর্ত্তৃক স্বাক্ষরিত হইল। ১৯১৯ খৃষ্টাব্দের ২০এ আগষ্ট তারিখে জাপ-সম্রাট্ তাঁহার কর্ম্মচারীদিগকে আদেশ দিলেন যে, বিদ্যালয়ে, শিল্পে ও রাজকার্য্যে কোরিয়াবাসীকে জাপানীর সমান অধিকার যেন দেওয়া হয়; আরও জানান হইল যে, কালক্রমে সমস্ত বিষয়ে আমাদিগকে জাপ-এর সহিত সমান বিবেচনা করা হইবে।

"কিন্তু আমাদের জাতিগত নিগূঢ় শক্তি আমাদিগকে আমাদের গন্তব্য স্থানে একদিন পৌঁছাইয়া দিবে। অনেক দিন তোমাদের দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়াছি। এখন বুঝিয়াছি, ভিক্ষায়াং নৈব নৈব চ। তবে আমাদের দুঃখে তোমাদের সমবেদনা আছে, শুনিলে সুখী হইব।

"আর একটি কথা শুনিয়া রাখ। এটি আমাদের বড় সাধের, বড় আশার কথা। এক দিন হিমালয়ের পরপারে ভারতবর্ষের গৌতম বুদ্ধ ত্যাগের মাহাত্ম্য প্রচার করিয়া অহিংসা ধর্ম্ম প্রাচ্য জগৎকে শিখাইয়াছিলেন। আজ সেখানে আর একজন মহাপুরুষ অহিংসার দ্বারা হিংসাকে জয় করিবার মহামন্ত্র সাধন করিয়া স্বরাজলাভের উপায় নির্দ্দেশ করিবার জন্য কঠোর ধ্যানে বসিয়াছেন। তোমাদের ওয়াশিংটন, জেনোয়া, হেগের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা নাই। যিনি আমাদের সুপ্ত আত্মাকে প্রবুদ্ধ করাইয়া শক্তি-উপাসকদিগের হাত হইতে মুক্তি দিবেন, তাঁহার বাণীর জন্য আমরা উন্মুখ হইয়া আছি।"

পরদেশী কথা

জেনোয়ায় বিশেষ কিছু হইল না। ব্যাপারটা যেরূপ দাঁড়াইয়াছিল, তাহাতে বিশেষ কিছু না হইবার কথা। ফরাসীর মেজাজ প্রথম হইতেই গরম ছিল; কিন্তু লয়েড জর্জ্জের মোহিনী শক্তি বার্টুকে প্রায় অভিভূত করিয়া যখন সাফল্যের দিকে অগ্রসর হইবার চেষ্টা করিল, প্যারি হইতে পোঁয়াকারে ফরাসী প্রতিভূর রাশ টানিয়া ধরিলেন,—জর্ম্মণী ৩১এ মে'র মধ্যে reparationএর এক কিস্তি টাকা দিতে বাধ্য, নচেৎ সামরিক চাপ দেওয়া হইবে; আর রুশকে কোনও নূতন প্রস্তাব করিতে দেওয়া হইবে না। ফরাসীকে ঠাণ্ডা করিবার জন্য লয়েড জর্জ্জ ইহাতে সম্মতি দিলেন। ইঙ্গফরাসীর মতের সহিত মত মিলাইয়া রুশ হয় ত চলিতে পারিতেন; কিন্তু বেলজিয়মের প্রতিনিধি জ্যাস্পার যখন রুশিয়ার মধ্যে বিদেশীয়দিগের ভূসম্পত্তির কথা তুলিলেন, তখন মিলনের আর কোনও সম্ভাবনাই রহিল না। ইংরাজ চুপ করিয়া গেলেন; ফরাসী বেলজিয়মের সহিত যোগ দিলেন;—জেনোয়া পণ্ড হইয়া গেল।

রুশ বলিলেন, তাঁহারা বেলজিয়মের এই আব্দার অন্যায় বিবেচনা করেন। রুশিয়ার মধ্যে যখন কোনও ব্যক্তিবিশেষের বা কোনও সঙ্ঘবিশেষের নিজস্ব ভূসম্পত্তি বলশেভিক গভর্মেণ্ট স্বীকার করেন না, সেখানে ষ্টেটের বা রাষ্ট্রেরই একমাত্র সার্ব্বভৌম অধিকার, অন্য কাহারও কোন প্রকার স্বত্ব স্বামিত্ব ভূমিসম্বন্ধে যেখানে স্বীকৃত হয় না, সেখানে কেমন করিয়া বেলজিয়মের বা অন্য কাহারও ভূস্বামিত্ব স্বীকার করা যাইতে পারে? তবে এই পর্য্যন্ত করা যাইতে পারে যে, গভর্মেণ্ট নির্দ্ধারিত সময়ের জন্য জমি পত্তনি দিতে পারেন। বিশেষতঃ যাঁহারা

পূর্ব্বে কোনও কোনও জমি ভোগদখল করিতেন, তাঁহারা সেই সকল ভূমি কিছু দিনের জন্য ষ্টেটের নিকট হইতে বন্দোবস্ত করিয়া লইতে পারেন। এই পর্য্যন্ত চলে, ইহার অধিক চলিতে পারে না। ব্যবসা-বাণিজ্য সম্বন্ধেও বিদেশীয়দিগকে কিছু সুযোগ দেওয়া যাইতে পারে। কিন্তু অপর সকলকে সব রকম সুবিধা করাইয়া দিয়া চিচারিণের দল কি রিক্তহস্তে দেশে ফিরিতে পারেন? যখন দেশের লোক বলিবে,—তোমরা কি আনিলে? তখন কি উত্তর দেওয়া যাইবে? জেনোয়ার আসরে রূশের পালা শেষ হইলে, টাকাকড়ি সাহায্যের প্রতিশ্রুতি পর্য্যন্তও না পাইয়া, সে কি তাহার বাদ্যযন্ত্র ও হুঁকাটি ফেলিয়া মানে মানে ফিরিয়া যাইবে? লোকে জিজ্ঞাসা করিবে,—"কি হে, এবার জেনোয়ার আসরে তোমাদের পালা কেমন জম্‌ল?" উত্তর হইবে,—"চমৎকার! চারদিক থেকে সাধুবাদ (অর্থাৎ লোষ্ট্র-নিক্ষেপ)।" "কি পেলেথুলে?" "আঃ, খুব মিষ্ট ব্যবহার, আরো পাবার আশা আছে।" "তোমাদের সব বাদ্যযন্ত্রগুলো কোথায়?" "ফের গাইতে হবে কি না, তাই যদি আমরা না যাই, ওরা বাজনাগুলো নিয়ে রেখে দিয়েছে।" "তবে এখনও কিছু পয়সাকড়ি পাও নি! ফের কোথায় গাওনা হবে?" "হেগ্‌-এ"।

রূশ চাহিয়াছিল যে, বলশেভিক গভর্মেণ্টকে সকলে সুপ্রতিষ্ঠিত গভর্মেণ্ট বলিয়া স্বীকার করিয়া লউক, আর তাহাকে কিছু বেশী টাকা ঋণ দেওয়া হউক্। এ দুইয়ের কোনওটাই হইল না। সুপ্রতিষ্ঠিত গভর্মেণ্ট বলিয়া স্বীকৃত না হইলে কেহ তাহার সহিত দেনাপাওনার কারবার করিতে চাহিবে না। তবে একটা কথা উঠিয়াছিল, য়ুরোপ ও মার্কিণের ধনকুবেরগণ মিলিত হইয়া একটা consortium করিয়া রুশিয়ার যথাসর্ব্বস্ব বন্ধক রাখিয়া কিছু ধার দিতে পারে। রুশিয়া অবশ্যই সে বিষয়ে যথেষ্ট সতর্ক ছিল। কাযেই কিছু হইল না।

কিন্তু একটা কিছু ত হওয়া চাই! যাহা হইল, তাহার ইংরাজী নামকরণ—Non-aggression pact অর্থাৎ আক্রমণ-না-করা সর্ত্ত। কেহ কাহারও প্রতি বলপ্রয়োগ করিবে না। এই আক্রমণ-না-করা'র অর্থ কি, ইহা লইয়া ইহার মধ্যে অনেক প্রশ্ন উঠিয়াছে। ভার্শাইল্ সন্ধি অনুসারে রাষ্ট্রীয় সীমানাগুলি ঠিক আছে ত? সে সম্বন্ধে বোধ করি আর কোনও কথা উত্থাপিত হইতে পারে না। অন্ততঃ বড় বড় মোড়লদের এই মত। তাহাই যদি হয়, তবে কিসের জোরে পোলাণ্ড রিগা দখল করিয়া বসিয়া আছে? ওটা ত ভার্শাইল্ নিরূপিত সীমানার মধ্যে নাই। রুশিয়ার বেসারাবিয়া দেওয়া হইয়াছে রুমানীয়াকে; কিন্তু যত দিন পর্য্যন্ত রুশ গভর্মেণ্ট তাহাতে স্বীকৃত না হয়, তত দিন কি তাহা সম্পূর্ণরূপে পাকা বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে? বল্টিক সাগর হইতে কৃষ্ণসাগর পর্য্যন্ত সমগ্র মধ্য-য়ুরোপে এই রকম অনেক গোলযোগ রহিয়াছে। তবে এই সমস্ত ভুখণ্ডগুলির স্বামিত্ব লইয়া বিরোধের সম্ভাবনা আছে। পোল্ রিগায় রহিল, ইহা aggression, না non-aggression? পুনশ্চ,—সশস্ত্র হইয়া অন্যের সীমানা অতিক্রম করিলেই কি এই সর্ত্ত ভঙ্গ করা হইবে? না, সীমানার সম্মুখে সামরিক আয়োজন করিবামাত্র এই সর্ত্ত ভঙ্গ করা হইবে? পররাষ্ট্রের মধ্যে বিদ্রোহীদিগকে অস্ত্র যোগাইলে কি এই সর্ত্তের ব্যতিক্রম হয় না? আগামী ৩১এ অক্টোবর জাপান সাইবিরিয়া পরিত্যাগ করিবে; কিন্তু যত দিন না করে, তত দিন কি বলিব—aggression না non-aggression?

রুশ গৃহে প্রত্যাবর্ত্তনের পূর্ব্বে ইটালী ও চেকো-শ্লভাকের সঙ্গে পৃথক পৃথক্ সন্ধি করিলেন। য়ুরোপ যে আশা করিয়া জেনোয়ায় মিলিয়াছিল, তাহা নিষ্ফল হইল।

এখন হেগ্। ঐ নামটার সঙ্গে হতভাগ্য রুশ-সম্রাট নিকোলাসের

নাম ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। তিনিই ওখানে প্রথম Peace Tribunal স্থাপিত করেন। যাহাতে আর যুদ্ধ-বিগ্রহ না হয়, জগতে শান্তিরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহার ব্যবস্থা তিনি করিলেন। বিরোধের কোনও সম্ভাবনা হইলেই এই শান্তি-ধর্ম্মাধিকরণ তাহা মিটাইয়া দিবে। কিছুদিন পরে, রুশ-সম্রাট টেলিগ্রাফ করিলেন জর্ম্মণ-সম্রাট উইল্‌হেল্‌ম্‌কে—"প্রশান্ত-মহাসাগরের অ্যাড্‌মিরাল্‌ আট্‌লান্টিক মহাসাগরের অ্যাড্‌মিরাল্‌কে অভিবাদন করিতেছেন!" অল্পকাল পরেই উক্ত প্রশান্ত-মহাসাগরের অ্যাড্‌মিরাল্‌ জাপানের সহিত যুদ্ধ বাধাইলেন। তাঁহার হেগ্‌ ধর্ম্মাধিকরণ তখন কোথায় ছিল?

ইহারই মধ্যে যে সকল দুর্লক্ষণ দেখা যাইতেছে, তাহাতে অনেকেই মনে করিতেছেন যে, হেগ্‌ জেনোয়ার একটি নূতন সংস্করণ মাত্র হইবে। মিছামিছি সময়ের এই অপব্যবহার করিয়া য়ুরোপের ক্ষতিবৃদ্ধির যথেষ্ট সম্ভাবনা।

বাজে কথায় এখন আর শিক্ষিত চিন্তাশীল য়ুরোপীয় আশ্বস্ত থাকিতে পারেন না। তাঁহারা হতাশভাবে অনেক কথাই বলিতেছেন। কোথায় তাঁহাদের জীবনের মূলসূত্র ছিন্ন হইয়াছে, এক একবার তাহারই অনুসন্ধান করিবার ব্যর্থ চেষ্টায় তাঁহারা ছট্‌ফট্‌ করিতেছেন। তাঁহারা ভাবিতেছেন যে, একটা অত্যন্ত ভীষণ আকস্মিক উৎপাতে খৃষ্টীয় ধর্ম্মের প্রেম-মন্ত্র লুপ্ত হইয়াছে, অথবা লুপ্তপ্রায় হইয়াছে। তাই সমগ্র য়ুরোপের মধ্যে মানব-জীবনের মূলমন্ত্র হারাইয়া গিয়াছে। একজন লিখিতেছেন,—এ যুগে মানুষ কিছুতে বুঝিতেই পারিতেছে না, কেমন করিয়া বাঁচিতে হইবে। যুদ্ধের পূর্ব্বে সে মনে করিত যে, কায জুটিলেই তাহার মোক্ষলাভ হইল, ধনই একমাত্র কাম্য। এখন যা' হউক, আবশ্যক কায-কর্ম্ম চলিতেছে; কিন্তু স্ফূর্ত্তি নাই, আগ্রহ নাই, সমাজে অনাচার ও কদাচার দেখা দিয়াছে।

যে য়ুরোপের পুরুষ নানা অবস্থায় নানা বিচিত্র কার্য্যে নিজেকে অনায়াসে নিয়োজিত করিত, আজ সে একেবারে হাল ছাড়িয়া দিয়াছে (European man, with his variety and adaptability seems to have given up, like a sick animal); কিন্তু তাই বলিয়া কি জেনিভা, ওয়াশিংটন, জেনোয়া, হেগ্-এ সভা করিলেই তাহার রুগ্ন দেহে বলসঞ্চার হইবে? বিজেতৃ শক্তিপুঞ্জ জর্ম্মণীর ঘাড়ে সমস্ত পাপের বোঝা চাপাইয়া আপনাদিগকে নিষ্কলঙ্ক ও নিষ্পাপ স্থির করিয়া বসিয়া আছে। ইংরাজ পত্র 'নেশন্ বলিতেছেন,—জর্ম্মণীকে বর্ব্বর, পরস্বগৃধ্নু ও সমরদর্পী বলা হয়;—কিন্তু য়ুরোপের মধ্যে রুশিয়া ছিল সর্ব্বাপেক্ষা বর্ব্বর, আমরা ইংরাজ সর্ব্বাপেক্ষা পরস্বগৃধ্নু, আর ফরাসী সর্ব্বাপেক্ষা সমরদর্পী। খৃষ্টান য়ুরোপের হৃদয় আজ কঠিন। সে অন্যের পাপ-পুণ্যের বিচার করে, এক দিন তাহারও বিচার হইবে। It will go on judging others till in turn it is judged and destroyed, living for self till every creed and continent turn against the common nuisance of 'Christian' Europe,... professing righteousness and flouting every Christian test and canon of it; and crucifying any Son of Man or God who arises to tell it the truth about itself. অর্থাৎ একদিন এই স্বার্থান্ধতা শ্বেতকায় "খৃষ্টান" য়ুরোপের বিরুদ্ধে সমস্ত জগৎকে বিদ্রোহী করিয়া তুলিবে; ধর্ম্মপ্রাণতার ভাণ করিয়া ধর্ম্মকে সে পদদলিত করিবে; এবং যদি ধর্ম্মের গ্লানি বা অধর্ম্মের অভ্যুত্থান সম্বন্ধে সত্যবাণী শুনাইবার জন্য কোনও মহাপুরুষের আবির্ভাব হয়, সে তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে ক্রুশবিদ্ধ করিবে।

কিন্তু "খৃষ্টান" য়ুরোপের হৃদয় কিরূপ কঠিন হইয়াছে, তাহা এই 'নেশন' পত্রের সম্পাদকমণ্ডলী যতটা বুঝিতে পারিয়াছেন, আমরা বোধ হয়

তদপেক্ষা কিঞ্চিৎ অধিক হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতেছি। উহার যে সংখ্যায় এই ধর্ম্মভাবের উচ্ছ্বাসটুকু পাওয়া যায়, সেই সংখ্যাতেই মহাত্মা গন্ধীকে বুজ্‌রুক বলা হইয়াছে,—India chose this engaging charlatan when she had better men for her service…চক্ষু রগড়াইয়া পুনশ্চ আমরা পাতা উল্টাইয়া পড়িয়া দেখি—যদি তাহাকে সত্যবাণী শুনাইবার জন্য কোনও মহাপুরুষের আবির্ভাব হয়, সে তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে ক্রুশবিদ্ধ করিবে। এই শ্রেণীর লেখকের কাছে সত্য সহসা ধরা দেয় না। অথচ য়ুরোপীয় সামাজিক জীবন কেন হতশ্রী হইয়া পড়িল, কবে এই দুর্গতি আরম্ভ হইল, তাহা জানিবার চেষ্টা অনেকেই করিতেছেন।

খ্যাতনামা অধ্যাপক জিমার্ণ্‌ বলেন, যেদিন হইতে য়ুরোপ ইকনমিকস্‌এর অর্থ বুঝিতে ভুল করিল, সেই দিনই সর্ব্বনাশের সূত্রপাত হইল। পলিটিক্‌স্‌ বা রাষ্ট্রনীতির উদ্দেশ্য বুঝিতে লোকের কষ্ট হইল না; কিন্তু ইকনমিকস্‌ বা বার্ত্তাশাস্ত্র মানবকে প্রভূত লাভবান্‌ হইবার উপায় দেখাইয়া দিবে, উনবিংশতি শতাব্দীতে এই ধারণা সমাজের সকল স্তরে বদ্ধমূল ছিল। সমাজের ব্যবহারোপযোগী আবশ্যক সামগ্রী প্রস্তুত করা, ও সেই সকল দ্রব্য সমাজের সর্ব্বত্র যথোচিত বণ্টন করা কি উপায়ে প্রকৃষ্ট-রূপে সিদ্ধ করিতে পারা যায়, ইহাই ইকনমিক্‌স্‌এর মুখ্য উদ্দেশ্য হওয়া উচিত ছিল;—এই গ্রীক শব্দটির ব্যুৎপত্তিলব্ধ অর্থ,—গৃহস্থালীবিধি। সামাজিক মানবের দৈনন্দিন অভাব-মোচনের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া ষ্টেট্‌কে সেই অভাব-মোচনের চেষ্টা করিতে হইবে, এই জন্য এই শাস্ত্র পলিটিক্যাল। এখানে profiteering বা প্রচুর লাভ করার কোনও কথাই নাই। এই লাভের চেষ্টায় অর্থের চেয়ে অনর্থের বৃদ্ধি হইল। ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে ক্যান্টা-বেরির পাদরি-লাট একটা কমিটী গঠিত করিয়াছিলেন, যাহাতে কারবারে ব্যবসায়ে খৃষ্টীয় নীতি পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিতে পারা যায়, এরূপ কোনও

উপায় উদ্ভাবন করা যায় কি না। কমিটীর রিপোর্টে সমাজ-সেবা বা serviceএর উপর জোর দেওয়া হইয়াছিল। কিন্তু পলিটিক্স্এর সঙ্গে সঙ্গে ইকনমিক্স্ অগ্রসর হইতে পারে নাই। পলিটিক্স্এ এই সমাজসেবা বা service ভাব অল্পে অল্পে প্রাধান্য লাভ করিতেছে; ইকনমিক্সএ কিন্তু ইহার একান্ত অভাব। যত কিছু গোল বাধিয়াছে এইখানে। এ অভাব মোচন করিতে পাদরীরা পারেন নাই; জেনোয়া হেগ্ পারিবে কি?

আপাততঃ এ সকল কূট-তত্ত্বের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইবার ইচ্ছা ফরাসীর আদৌ নাই। সে মনে করে, তাহার অবস্থা ভীষণ সঙ্কটাপন্ন। ক্ষতি-পূরণের দাবি মিটাইয়া না পাইলে সে কিছুতেই সামলাইতে পারিবে না। জর্ম্মণী যখন বলেন যে, গত এপ্রিল মাসের মধ্যে সর্ব্বসমেত অন্যূন পঁয়তাল্লিশ সহস্র কোটি স্বর্ণ মার্ক মূল্যের সম্পত্তি বিজেতৃদিগের হস্তগত হইয়াছে, ফরাসী বিরক্তির সহিত তাহার উত্তরে বলেন যে, তন্মধ্যে মাত্র এক শত ত্রিশ কোটি স্বর্ণ-মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে,—আর সমস্তই রেল, জাহাজ, কয়লা, ভূসম্পত্তি, গাড়ী, এয়ারোপ্লেন প্রভৃতি বাবদে একটা কাল্পনিক মূল্য হিসাব করিয়া দেনা-পাওনা মিটাইবার চেষ্টা করা হইতেছে। টাকা পাওয়া গেল না; অথচ ফ্রান্সের নষ্ট প্রদেশগুলার পুনর্গঠন-কল্পে প্রচুর অর্থব্যয় প্রয়োজন। ফরাসীকে নয় সহস্র কোটি ফ্রাঙ্ক ঋণ করিয়া উক্ত কার্য্য সম্পন্ন করিবার চেষ্টা করিতে হইয়াছে। ফলে যাহা দাঁড়াইয়াছে, তাহা অতীব ভয়ানক। গত বৎসরে ফরাসী রাষ্ট্রের আয় ছিল প্রায় আড়াই হাজার কোটি ফ্রাঙ্ক; রাষ্ট্রীয় ঋণের সুদের পরিমাণ হইল প্রায় তের শত কোটি! অথচ যে বৎসর যুদ্ধ আরম্ভ হয়, সেই ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে রাষ্ট্রীয় ঋণের সুদ আয়ের এক-চতুর্থাংশ পরিমাণ ছিল।

কিন্তু নিরপেক্ষভাবে বিচার করিতে বসিলে জিজ্ঞাসা করিতে হয়—ফ্রান্সের পূর্ব্বাঞ্চল বিধ্বস্ত হইয়া গিয়াছিল বটে, কিন্তু তাহাকে পুনরায়

গড়িয়া তুলিবার জন্য ফরাসী গবর্মেণ্ট ঋণ করিতে গেলেন কেন? অন্য কোনও উপায় ছিল না কি? ছিল বৈ কি; এবং অনেকে তাহা সমীচীন বলিয়া বিবেচনা করিলেও পোঁয়াকারের দল তাহা গ্রাহ্য করিলেন না। জর্ম্মণ সচিব র‍্যাথেনাউ ফরাসী প্রতিনিধি লুশিয়ারের সঙ্গে diplomatic আলাপ করিয়া গত বৎসর যে প্রস্তাব করিয়াছিলেন, তাহার সার মর্ম্ম এই:—ফ্রান্স ও বেলজিয়মের সমস্ত বিধ্বস্ত প্রদেশের পুনর্গঠনের ভার জর্ম্মণ গভর্মেণ্ট লইবেন; ফরাসী গভর্মেণ্ট যে রকম বাড়ী, ঘর, বাগান, পথ, ঘাট প্রভৃতি প্রস্তুত করাইতে চাহেন, জর্ম্মণ রাষ্ট্র নির্দ্ধারিত সময়ের মধ্যে তাহাই করিয়া দিবে; কিন্তু সমস্ত মজুর, মিস্ত্রী, মাল-মসলা জর্ম্মণ হওয়া চাই; উৎকৃষ্ট শিল্পী কর্ত্তৃক উত্তম উপকরণে ফরাসী গভর্মেণ্টের আদেশ অনুসারে গঠনকার্য্য সুসম্পন্ন করা হইবে। অথচ নগদ স্বর্ণমুদ্রা ফরাসীকে দিবার জন্য জর্ম্মণীর দুশ্চিন্তা উপস্থিত হইবে না। মার্ক-বিনিময় যন্ত্র বিকল হইবার সম্ভাবনা থাকিবে না। বাস্তবিক reparation হইবে, অথচ সব দিক বজায় থাকিবে।

এই প্রস্তাবে লুশিয়ার সম্মতি দিয়াছিলেন। পাশ্চাত্য য়ুরোপ এই র‍্যাথেনাউ-লুশিয়ার বন্দোবস্তের সংবাদে আশ্বস্ত হইল। কিন্তু ফ্রান্সের একটা প্রবল দল এই ব্যবস্থাকে উড়াইয়া দিল। তাঁহারা বলিলেন,—এ ব্যবস্থায় জর্ম্মণীর যত সুবিধা, ফরাসীর তত সুবিধা নাই। জর্ম্মণীর মাল-মসলার কাটতি হইবে ফ্রান্সে। আর আমাদের দেশের লক্ষ লক্ষ লোক অকর্ম্মণ্য হইয়া বসিয়া থাকিবে, কিন্তু জর্ম্মণীর কুলী মজুর, এঞ্জিনীয়র প্রভৃতি সকলেই কায পাইবে আমাদের দেশে। এ reparation আমরা চাই না। তা'র চেয়ে আমরা ঋণ করিয়া আমাদের দেশের লোক খাটাইয়া আমাদের স্বদেশ-জাত দ্রব্যাদির সাহায্যে কার্য্যোদ্ধার করি; শেষে সুদ সুদ্ধ জর্ম্মণীর নিকট হইতে আদায় করিয়া লইব। কেন

জর্ম্মণী দিবে না? সে দরিদ্র, না আমরা দরিদ্র? কে বলিল যে, তাহার ধনবৃদ্ধি দ্রুততর হইতেছে না? গত বৎসরে আমাদের খনি ও কারখানা হইতে যত লৌহ ও ইস্পাত বাহির হইয়াছিল, জর্ম্মণীর প্রায় তদপেক্ষা তিন গুণ অধিক হইয়াছিল। সে বহুসংখ্যক নূতন বাণিজ্যপোত নির্ম্মাণ করিয়াছে ও করিতেছে। কিন্তু জর্ম্মণী নিজের অক্ষমতা জ্ঞাপন করিয়া জেনোয়ায় বলিল যে, সুবর্ণ-মুদ্রা না পাইলে এখন ফরাসীর অবস্থা খুবই খারাপ হইবার সম্ভাবনা বটে; তবে জর্ম্মণীর পক্ষে যাহা অসম্ভব, তাহা আর পাঁচ জনে মিলিয়া ব্যবস্থা করিয়া দিতে পারেন। অর্থাৎ জর্ম্মণীকে কয়েক বৎসর সময় দেওয়া হউক; সেই কয় বৎসরের মধ্যে কেহ তাহার কাছে ঋণ পরিশোধের কথা তুলিবে না; এবং ফরাসীকে ত্রিশ পঁয়ত্রিশ কোটি টাকা কর্জ্জ দিয়া আপাততঃ পাঁচ জনে তাহাকে দায় হইতে মুক্ত করুক; ফরাসীর এই নূতন ঋণ জর্ম্মণী কালক্রমে পরিশোধ করিবে। জেনোয়ায় অবশ্যই জর্ম্মণীর এ সকল কথা টিকিল না। র‍্যাথেনাউ তিন-বার লয়েড জর্জ্জের বাড়ীতে গিয়া তাঁহার সহিত দেখা করিবার চেষ্টা করিলেন; কিন্তু দেখা হইল না। ইহার পরেই বল্‌শেভিক চিচারিণের সঙ্গে র‍্যাথেনাউ ও ওয়ার্থ সন্ধি করিলেন। অতঃপর রুশিয়া ও জর্ম্মণী পরস্পর পরস্পরের নিকট হইতে কোনও হিসাবে কিছুমাত্র টাকাকড়ির দেনা-পাওনা দাবী করিতে পারিবে না।

ফরাসীর ক্রোধের সীমা রহিল না। তাঁহার বিরুদ্ধপক্ষীয়েরা এই ক্রোধের কয়েকটি কারণ নির্দ্দেশ করেন। তাঁহারা বলেন,—

১। জর্ম্মণী সোভিয়েট রুশিয়ার সঙ্গে সন্ধি করায় দাঁড়াইল এই যে, যে গভর্মেণ্টকে আমরা কেহই ন্যায়-সঙ্গত রাষ্ট্র বলিয়া স্বীকার করিতেছি না, সেই গভর্মেণ্টকে মিত্র বলিয়া যদি জর্ম্মণী স্বীকার করিয়া লয়, তাহা হইলে আজ না হয় কাল আর সকলকেই স্বীকার করিতেই হইবে।

(কিন্তু যখন ব্রেষ্ট্ লিটভ্স্কে রুশ-জর্ম্মণ সন্ধি হইয়াছিল, তখন এ কথা উঠে নাই কেন ?)

২। বল্শেভিক রুশিয়া যখন একটা বড় রাষ্ট্রের সঙ্গে দেনা-পাওনা উড়াইয়া দিয়া সন্ধি করিতে পারিলেন, তখন ফরাসী কিংবা অন্য কাহারও সহিত মিত্রতা করিবার সময় ঐ রকম দেনা মুছিয়া ফেলিবার কথা থাকিবার সম্ভাবনা বেশী হইল। সে ক্ষেত্রে ফরাসী রূঢ়ভাবে কিছু বলিলে সুশোভন হইবে কি ?

(জেনোয়ায় সুপণ্ডিত ডাক্তার বণ্ জর্ম্মণীর তরফ হইতে ঋণ-পরিশোধের যে ব্যবস্থাপত্র পেশ করিয়াছিলেন, তাহাতে ঋণ উড়াইয়া দিবার কথা ছিল না। ফরাসীর আবশ্যকমত টাকা পাঁচ জনে আপাততঃ ফ্রান্সকে কর্জ্জ দিক্; পরে জর্ম্মণ রাষ্ট্র ঐ নূতন ঋণের বোঝা নিজের স্কন্ধে বহন করিবে।)

বস্তুগত্যা কিন্তু হেগ্-এ রুশ প্রতিনিধি সমস্ত দেনা শোধ করিবার জন্য প্রস্তুত আছেন, যদি তাঁহাকে বাজারে প্রচুর কর্জ্জ করিবার সুবিধা দেওয়া হয়।

৩। ভার্শাইল সন্ধি-পত্রের ১১৬ ধারায় আছে যে, পরে যখন রুশিয়া জর্ম্মণীর সহিত সন্ধি করিবে, তখন সে জর্ম্মণীর নিকট হইতে যথোপযুক্ত ক্ষতি-পূরণের দাবী করিতে পারিবে, তাহাতে ইঙ্গ-ফরাসী-ইটালী মিত্র-শক্তিগণ রুশিয়ার পক্ষসমর্থন করিবে। চিচারিণ র‍্যাথেনাউএর এই র‍্যাপালো সন্ধি ভার্শাইল-বিরোধী। অতএব ইহা ন্যায়ানুমোদিত বলিয়া কিছুতেই স্বীকার করা যাইতে পারে না।

(তাই না কি ? অথবা ইহার মধ্যে আরও কিছু গুপ্ত রহস্য আছে ? রুশিয়া যদি ফরাসীকে বলে যে, রোম্যানফ্-ঘটিত ঋণ পরিশোধ করিবার সামর্থ্য তাহার একেবারে নাই, তখন ত রুশিয়াকে বলা হয়—"কেন ?

১১৬ ধারা অনুসারে তুমি ত যত ইচ্ছা খেসারৎ জর্ম্মণীর কাছ হইতে আদায় করিতে পার! সেই টাকাটা আমাদের নামে লিখিয়া দাও না কেন? আমরা তাহা জর্ম্মণীর নিকট হইতে ঠিক আদায় করিয়া লইব; তোমাদেরও সাবেক দেনা অনায়াসে শোধ হইয়া যাইবে।” ফরাসীর কাছে ঋণ-পরিশোধের এমন সহজ উপায় অবলম্বন না করিয়া র‍্যাপালোয় রুশিয়া জর্ম্মণীকে সম্পূর্ণরূপে ঋণ-মুক্ত করিয়া দিল!)

৪। এই সন্ধির নিশ্চয়ই একটা অপ্রকাশিত সর্ত্ত আছে যদ্দ্বারা উভয়ে উভয়কে যুদ্ধ-বিগ্রহে, অর্থে ও সামর্থ্যে সহায়তা করিবে।

(বার্লিন ও মস্কো পুনঃ পুনঃ ইহা অস্বীকার করিলেও ফরাসী তাহাদের কথা বিশ্বাস করিলেন না। জর্ম্মণীর গুপ্তসভার ও সামরিক আয়োজনের বিস্তারিত বিবরণ কাগজে প্রকাশিত হইতে লাগিল। সম্প্রতি এক জন জর্ম্মণ জালিয়াৎ ধরা পড়িয়াছে; সে অর্থলোভে জর্ম্মণীর শত্রুপক্ষের কাছে কাল্পনিক গুপ্ত-সমিতির ও সামরিক আয়োজনের বিবরণ চালাইয়া দিত। লোকটার নাম ডাক্তার আন্স্প্যাশ্। ফরাসী ও ফরাসী-প্রেমিক বিদেশীয় কাগজগুলা আপাততঃ এ সম্বন্ধে চুপ করিয়া গিয়াছে।)

এ সকল তর্ক-বিতর্কে মানুষের পেট ভরে না। স্বার্থান্ধ ফরাসী ক্রোধ-বশতঃ গত বৎসর র‍্যাথেনাউর যে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন, এত দিন পরে একটু রকম-ফের করিয়া তাহাই আদর করিয়া লইতেছেন। এখন তিনি বুঝিতে পারিয়াছেন যে, ইহাতেই তাঁহার স্বার্থ-সিদ্ধি হইবে। অন্য কিছুতে হইবে না। এই শুভ সংবাদ বার্লিনে পৌঁছিবার অল্পকাল পূর্ব্বেই র‍্যাথেনাউ গুপ্ত ঘাতকের হস্তে নিহত হইলেন। অদৃষ্টের এই পরিহাসে অনেকেই ব্যথিত হইয়াছেন। কেহ কেহ বলিতেছেন, হিণ্ডেন-বর্গের দল জর্ম্মণীতে পুনরায় কৈশরী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠীত করিবার জন্য উদ্যোগ করিতেছে; র‍্যাথেনাউএর মত প্রতিভাশালী গণতন্ত্র-নেতাকে সরাইয়া

দেওয়া আবশ্যক ; সম্প্রতি নানাস্থানে ট্যানেন্‌বর্গ-বিজয়োৎসবে হিণ্ডেন্‌বর্গের সামরিক দল মত্ত হইয়াছিল। প্রেসিডেণ্ট এবার্ট এই উৎসব বন্ধ করিয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। যুদ্ধের প্রারম্ভে পূর্ব্ব প্রুশিয়ার অন্তঃপাতী ট্যানেন্‌বর্গে একটা প্রকাণ্ড রুশ-সৈন্যকে সেনাপতি হিণ্ডেন্‌বর্গ ধ্বংস করিয়াছিলেন। তাহার পরে কোনও রুশ-সৈন্য আর প্রুশিয়ার মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে নাই। সেই বিজয়-স্মৃতি জাগাইয়া রাখিবার জন্য এই উৎসবের আয়োজন। জেনোয়ায় রুশ-জর্ম্মণ সন্ধির পরে এ উৎসব উভয় গভর্মেণ্টের পক্ষে অত্যন্ত অপ্রীতিকর। গভর্মেণ্টের সঙ্গে প্রুশিয়ার সামরিক দলের এই বিরোধের ফলে র‍্যাথেনাউ প্রাণ হারাইলেন। কিন্তু তিনি যদি reparation সমস্যা ভাল করিয়া সমাধান করিতে পারিতেন, তাহা হইলে জর্ম্মণীর মধ্যে সামরিক কিংবা অন্য কোনও দল গভর্মেণ্টের বিরুদ্ধে মাথা তুলিতে পারিত না। প্রেসিডেণ্ট এবার্ট বলেন যে, যদি য়ুরোপের বিরুদ্ধ শক্তিপুঞ্জ দেনা-পাওনা সম্বন্ধে উদার না হইতে পারেন, তাহা হইলে পরিণাম আরও ভয়ঙ্কর হইবে।

কিন্তু উদারতার কোনও লক্ষণ দেখা যাইতেছে না। হেগ্‌ সভায় আলোচ্য বিষয় সম্বন্ধে ফরাসী গভর্মেণ্ট যে প্রকার কড়া ব্যবস্থা করিতেছেন, তাহাতে কোনও সুফল আশা করা যায় বলিয়া মনে হয় না। বিরুদ্ধ মিত্রশক্তিদের উপর রুশিয়া যে ক্ষতি-পূরণের দাবী জেনোয়ায় উপস্থাপিত করিয়াছিল, তাহা প্রত্যাহার করিতে হইবে ; ঋণ পরিশোধ করা রুশিয়ার প্রথম কর্ত্তব্য ; ভূসম্পত্তি রুশ গভর্মেণ্ট বাজেয়াপ্ত করিতে পারিবে না ;—এ সকল স্বীকার করিয়া রুশ যদি কায করিতে চাহেন, তবেই ফরাসী প্রাজ্ঞরা উপায় চিন্তা করিতে হেগ্‌-বৈঠকে উপস্থিত হইতে পারেন ; নচেৎ উপস্থিত হইয়া কোনও লাভ নাই। ক্রমশঃ ফরাসী সুর একটু নরম করিলেন। হেগ্‌ বৈঠকে উপস্থিত হওয়া সুযুক্তি বলিয়া বিবেচিত হইল।

রুশের সঙ্গে বুঝাপড়া করিতে হইবে; জেনোয়ার মত কোনও গোলযোগ যাহাতে না হয়, আগে হইতেই তাহার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। এই জন্ম দু-টা স্বতন্ত্র কমিশন বসিল ;—প্রথমটায় রুশ-প্রতিনিধির প্রবেশ নিষিদ্ধ। রুশকে বাদ দিয়া বাকি সকলে একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হইবেন। কয়েক দিবস পরে রুশ-কমিশনের কার্য্যারম্ভ হইবে। তখন দুই কমিশনে আলাপ হইবে। রুশের সহিত টাকা কড়ি জমি সম্বন্ধে কোনও কিছু সুমীমাংসা হয় কি না, তাহা চেষ্টা করা উভয় কমিশনের উদ্দেশ্য। কিন্তু উদ্দেশ্য সফল করিতে হইলে, অন্য উপায় অবলম্বিত হইলে ভাল হইত। লড়াইয়ের পর সম্মিলিত ইঙ্গ-ফরাসী-ইটালী একটা মহাসংসদ্ সুপ্রীম কাউন্সিল গঠিত করিয়া য়ুরোপের ভাঙ্গা-গড়া করিলেন। উহার ফল,—ভার্শাইল্। ক্লেমেসোঁ বলিলেন—এই সন্ধি যুদ্ধের রূপান্তর মাত্র। জর্ম্মণ শক্তি লুপ্ত করিতে গিয়া য়ুরোপ জর্জ্জরিত হইল। মার্শাইল্ বণিক্-সমিতি ভল্গা প্রদেশের সহিত বাণিজ্যসূত্রে বহুকাল মেলা-মেশা করিয়া সমৃদ্ধিশালী হইয়াছিল। যুদ্ধের কয় বৎসর সেই সূত্র ছিন্ন হইয়া যায়; যুদ্ধের পরেও রুশকে বৈরিভাবে ফরাসী গভর্মেণ্ট দেখিতে লাগিল। মন্ত্রিবর ব্রিয়ঁার নিকটে মার্শাইল্ চেম্বর অফ্ কমার্শ আবেদন করিল, রুশের সহিত আদান প্রদান না হইলে তাহারা মারা যায়। ইহার ফলে,—ক্যাণে বৈঠক...গল্‌ফ খেলা...রুশকে জেনোয়ায় নিমন্ত্রণ করা...ফরাসীর বিস্ময় ও ব্রিয়ঁার পদত্যাগ। ক্যাণে সভায় সেই সুপ্রীম কাউন্সিলের ছাপমোহর অঙ্কিত রহিয়াছে। জেনোয়ায় লয়েড্ জর্জ্জের ডিনার টেবলে সেই গোপন কথাবার্ত্তা, সেই সুপ্রীম কাউন্সিলের পুনরভিনয়। চিচারিণ র‍্যাথেনাউ সেখানে প্রবেশ করিতে পাইলেন না। সব ব্যর্থ হইল। হেগ্-এ রুশকে বাদ দিয়া যে কমিশন বসিয়াছে, তাহাও সেই ভূতপূর্ব্ব সুপ্রীম কাউন্সিলের ছায়া।...ততঃ কিম্?

প্যালেষ্টাইন্

(১৩২৯)

প্যালেষ্টাইন্ লইয়া ইংরাজকে বড়ই বিব্রত হইতে হইয়াছে। অনেক টাকা-কড়ি খরচ হইতেছে, অথচ চারিদিকে অশান্তি। ঘরে অশান্তি; কারণ, করভার-নিপীড়িত ইংরাজ বলিতেছেন, ওখানে সৈন্য-সামন্ত লইয়া পাহারা না দিলে, যদি ইহুদীর একটা "হোম" করিয়া দিবার সুবিধা না হয়, তবে না হয় না-ই হইল। স্বদেশের বড় বড় সমস্যার কোনও সমাধান হইল না; আয়র্লণ্ড, মিশর, ভারতবর্ষ লইয়া যথেষ্ট ব্যস্ত থাকা গিয়াছে; জনকতক পোলিটিশ্যান ইরাক্—প্যালেষ্টাইন্—আরবের ভূতের বোঝা ব্রিটিশ করদাতৃগণের ঘাড়ে চাপাইয়া সকলকে আরও অস্থির করিয়া তুলিয়াছেন। অনেক কষ্টে ইরাণকে ঘাড় হইতে নামাইতে পারা গিয়াছে;—বল্‌শেভিকদের সঙ্গে তাহার সখ্য নিবিড়তর হউক, সাধারণ শ্রমজীবী ইংরাজের তাহাতে কিছুমাত্র আপত্তি নাই। কিন্তু রাজনীতিজ্ঞরা গত শতবর্ষের ইতিহাস কি সহজে ভুলিতে পারেন? পারস্য উপসাগরে এতদিন ধরিয়া পাহারা দেওয়া গেল, তাহার কি এই পরিণাম? বাহিরেও অশান্তি; কারণ, প্যালেষ্টাইন্—ইরাক্—আরব ইংরাজের প্রতি একেবারে বিমুখ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। উইন্‌ষ্টন্, চর্চ্চিল্‌বংশের এক এবং অদ্বিতীয় উইন্‌ষ্টন্, ইংরাজের one and only Winston কিন্তু বিচলিত হইবার পাত্র নহেন। ইরাণকে বল্‌শেভিকের হাত হইতে রক্ষা করা গেল না, সে দোষ তাঁহার নহে। তিনি চেষ্টার ত্রুটি করেন নাই;—যুদ্ধ-সমাপ্তির পরেও তিনি না কি ভল্গাপ্রদেশে, ডন্‌প্রদেশে, বল্‌টিকোপকূলে, ইরাকে, ইরাণে অনেকগুলি শ্বেতহস্তী ছাড়িয়া দিয়াছিলেন; বিলাতের

শ্রম-সম্প্রদায় বিদ্রোহী হইয়া উঠিলে অধিকাংশ white elephant সরাইয়া আনা হইল। সে দেশের গৌরীসেন টাকা দিতে রাজি হইল না। ইরাণে তেল আছে, ইংরাজ কোম্পানীও আছে; ইরাক্ পারস্যোপসাগরের মুখরক্ষা করিতেছে, ভারতবর্ষের উপকারের জন্য; আরবকে স্বাধীনতাদান করিতেছেন ইংরাজ নিঃস্বার্থভাবে,—অথচ রাজা হুসেন অথবা আমীর ফয়শুল তাহা বুঝিতেছেন না কেন? প্যালেষ্টাইনে ইংরাজের স্বার্থ কি, বলুন দেখি? যে ইহুদী এতকাল ভবঘুরে ছিল, সেই wandering Jewকে যদি ওখানে একটা ন্যাশনাল হোম করিয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে কত বড় কায করা হয়। না করিয়া দিলে সত্যভ্রষ্ট হইতে হয়, উইন্‌ষ্টন্ কি সত্যভঙ্গ করিয়া জগতের সমক্ষে ইংরাজ জাতিকে কলঙ্কিত করিতে পারেন?

আসল কথাটা যাহাই হউক, সে দিন হাউস অফ্ কমন্সএ যখন প্যালেষ্টাইনের কথা উঠিল, মিঃ চর্চ্চিল্ উচ্ছ্বাসের সহিত বলিলেন যে, এ বিষয়ের আলোচনা করা নিরর্থক; কারণ, ব্যাল্‌ফোরপ্রস্তাবে সম্মতি দিবার সময় তাঁহারা কি একবারও ভাবিয়া দেখেন নাই যে, একদিন সেই প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত হইতে পারে? আজ যখন সেই শুভমুহূর্ত্ত উপস্থিত, তখন তাহাতে বাধা দিবার চেষ্টা করা উচিত নহে। লর্ড র‍্যাণ্ডলফ্ চর্চ্চিলের উপযুক্ত পুত্রের উপযুক্ত কথা বটে। বাগ্‌দত্ত ইংরাজ গভর্মেণ্ট তিলমাত্র সত্যবিচ্যুত হইতে পারেন কি? আর লোকে যা বলে বলুক্, যিনি নিজের বিধবা জননীকে গির্জ্জাঘরের বেদীসম্মুখে স্বহস্তে দ্বিতীয় ভর্ত্তার করে সমর্পণ করিয়া কন্যাদান অপেক্ষা অধিক পুণ্যসঞ্চয় করিয়াছিলেন, সেই উইন্‌ষ্টন্ ইহুদীর হাতে প্যালেষ্টাইন্ দিয়া অধিকতর পুণ্যসঞ্চয় করিতে পশ্চাৎপদ হইবেন কেন? সত্যরক্ষা করিবার মত চরিত্রবল কয়জনের থাকে? এই যে সম্প্রতি আফ্রিকায় কেনিয়া উপনিবেশে তিনি এক

দল শ্বেতাঙ্গ খৃষ্টান ভবঘূরেকে উচ্চ স্বাস্থ্যকর মালভূমির উপর "হোম" করিয়া দিবার জন্য বাগদান করিয়াছেন, এ সম্বন্ধে ভারত গভর্মেণ্ট অবাক্ হইয়া দেখুক, কেমন করিয়া মার্লবরো-কুলপ্রদীপ পশ্চিম এসিয়া হইতে পশ্চিম আফ্রিকা পর্য্যন্ত অর্দ্ধজগৎ তাঁহার স্নিগ্ধ কিরণে উজ্জ্বল করিয়া দিতেছেন। কমন্স সভার "ভাবিতে উচিত ছিল প্রতিজ্ঞা যখন"। উইনষ্টনের এখন "মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর-পতন"। সত্যের মর্য্যাদা না বুঝিয়া সেদিন প্যালেষ্টাইনের মুসলমান ও খৃষ্টান অধিবাসিগণ দোকান-পাট বন্ধ করিয়া একটা দেশব্যাপী হরতাল করিল! এ স্থলে মনে রাখিলেই যথেষ্ট হইবে যে, সে দেশের লোকসংখ্যার অনুপাতে শতকরা ৮০ জন মুসলমান ও ১০ জন খৃষ্টান; বাকি ১০ জন ইহুদী। সেই ১০ জন ইহুদীর ন্যাশনাল হোম হইবে প্যালেষ্টাইন্;—ব্যাল্‌ফোর-প্রতিজ্ঞার ইহাই না কি পরিষ্কার অর্থ। বড় বড় রাষ্ট্রনীতিজ্ঞ ইহুদী ধনকুবেরগণ মিঃ (ইদানীন্তন আর্ল) ব্যাল্‌ফোরের কাছে আবেদন করিয়াছিল যে, ইংরাজ এমন কোনও প্রতিশ্রুতি দিতে প্রস্তুত আছেন কি না যে, যুদ্ধে জয়ী হইলে প্যালেষ্টাইনে ইহুদীর ন্যাশনাল হোম তিনি প্রতিষ্ঠিত করিবেন? মিঃ ব্যাল্‌ফোর স্বীকৃত হইয়া তদুত্তরে যে পত্র লিখেন, তাহাই Balfour Declaration বলিয়া সর্ব্বত্র গৃহীত হইল।

সে আজ পাঁচ বৎসরের কথা,—১৯১৭ খৃষ্টাব্দ। যুদ্ধ তখন ভীষণভাবে চলিতেছে। ইহুদী ইংরাজকে ভাল করিয়া সাহায্য করিতে প্রস্তুত হইল। কিন্তু কাহার সাহায্যে প্যালেষ্টাইনের উপর ইংরাজ mandate পাইলেন? ইহুদীর, না ভারতবর্ষীয় হিন্দু-মুসলমানের? লর্ড অ্যালেন্‌বি কি বলেন? কে অকাতরে অর্থদান করিয়াছিল? ইহুদী, না ভারতবর্ষের হিন্দু-মুসলমান? অথচ এ দেশের হিন্দু-মুসলমানের সম্মুখে কোনও প্রলোভনের সামগ্রী ছিল না। আজ প্যালেষ্টাইন্ ইহুদীর "হোম" হইবে।

আচ্ছা, এই ব্যাল্‌ফোর-ইহুদী পত্র-ব্যবহারের কয়েক মাস পরে আর কোনও ইংরাজ সচিব আর কাহারও সম্বন্ধে কোনও প্রতিজ্ঞা করিয়া ছিলেন কি ? যদি করিয়া থাকেন ত সে প্রতিজ্ঞাকেও ইংরাজের বাগ্দান বলিয়া মনে করা বোধ হয় অসঙ্গত হয় না। তুর্কী সম্বন্ধে অমাত্যশ্রেষ্ঠ মিঃ লয়েড্‌ জর্জ্জ এমন কিছু বলিয়াছিলেন কি, যাহাতে জগতের মুসলমান-সমাজ আশ্বস্ত হইয়াছিল যে, ইংরাজ তুর্কীসাম্রাজ্য অক্ষুণ্ণ রাখিবেন ? এখন শুনিতেছি নাকি, মিঃ জর্জ্জের উক্তির প্রকৃত অর্থ আমরা কেহই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি নাই। কিন্তু ভারতবর্ষের হিন্দু-মুসলমানের প্রভূত অর্থ পশ্চিম এসিয়ার মুসলমানাধ্যুষিত "তাতল সৈকতে বারিবিন্দুসম" যখন অদৃশ্য হইয়া গেল, তখন হইতে এই অনর্থের সৃষ্টি হইল।

যুদ্ধের পূর্ব্বে, সমগ্র সীরিয়া যখন তুর্কীসাম্রাজ্যের অন্তর্গত ছিল, তখন কিন্তু প্যালেষ্টাইনে যে সকল জাতির আবাস ছিল, তাহাদের মধ্যে বিশেষ কোনও তারতম্য ছিল বলিয়া মনে হইত না। তুর্কী-শাসনকর্ত্তা বেইরুৎ-এ অবস্থান করিতেন। শুধু ইহুদীর নয়, জেরুসালেম খৃষ্টান ও মুসলমানের নিকটে পুণ্যভূমি বলিয়া পরিগণিত হয়। খৃষ্টানের পূততম সমাধির (Holy Sepulchre) দ্বাররক্ষক এক জন মুসলমান ;—এই মুসলমানের পূর্ব্বপুরুষরা বহুকাল ধরিয়া এই দৌবারিকের কার্য্য করিয়া আসিতেছেন, খৃষ্টান তাহাতে আপত্তি করিবার কোনও বিশেষ কারণ দেখেন নাই। তথায় সাধারণতঃ আরব ভাষা কথিত হয়। কিন্তু প্রাচীন ইহুদী অধিবাসী স্পেনীয় ভাষায় কথাবার্ত্তা কহিয়া থাকে। তাহার সঙ্গে বিশেষ কোনও বিরোধ খৃষ্টান অথবা মুসলমানের ছিল না। কিন্তু ইদানীং রুশিয়া, রুমানিয়া, অষ্ট্রীয়া প্রভৃতি দেশ হইতে দলে দলে ইহুদী প্যালেষ্টাইনে প্রবেশ করিতে লাগিল ; তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ তথায় প্রাচীন জায়নের (Zion) পুনঃ প্রতিষ্ঠার জন্য বদ্ধপরিকর হইল। অনেক দিন হইতে

তাহারা এই ভাব হৃদয়ে পোষণ করিয়া আসিতেছিল। ইস্রায়েল জ্যাঙ্গুইল্ প্রমুখ অনেক প্রতিভাবান্ লেখক য়ুরোপে মার্কিণে গল্পে ও প্রবন্ধে এই কথা ঘোষিত করিয়া আসিতেছিলেন। ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে এক জন জর্ম্মণ ইহুদী, থিয়োডোর হার্জল, একখানি বই লিখিলেন। বইখানির নাম—'Der Juden Staat' অর্থাৎ ইহুদী-রাষ্ট্র। ইংরাজ তখন সবেমাত্র আফ্রিকায় উগাণ্ডা দখল করিয়াছেন। য়ুরোপের Zionist ইহুদীদিগকে তিনি বলিলেন,—"তোমরা এইখানে একটা উপনিবেশ কর; তোমাদের ইহুদী ষ্টেট্ এইখানে গঠিত করিয়া তুলিতে দিতে আমাদের আপত্তি নাই।" ইহুদী এ প্রস্তাবে সম্মত হইল না। তাহার সন্দেহ হইল যে, ইংরাজ ইহুদীর টাকায় নবাধিকৃত উগাণ্ডা প্রদেশ উন্নত (develope) করাইয়া লইতে চায়। জেরুসালেমের আশা ইহুদী Zionist কিছুতেই ত্যাগ করিতে পারিল না। একদল ইহুদী কিন্তু এই নেশন-রাষ্ট্রগঠনের বিরুদ্ধে বরাবর মতপ্রচার করিয়া আসিতেছেন। তাঁহারা বলেন যে, ইহুদীর স্বতন্ত্র রাষ্ট্র-স্থাপন-চেষ্টা কিছুতেই ফলবতী হইতে পারে না; অন্ততঃ কিছুতেই ফলবতী হওয়া উচিত নহে; কারণ, লাভ লোকসানের খতিয়ান করিলে, বোধ হয়, ক্ষতির মাত্রা বেশী হইবে। মাঝে মাঝে এখানে ওখানে 'পগ্রম্' হইলেও ইহুদীর ক্ষমতা কোনও স্থানবিশেষে সীমাবদ্ধ না থাকায় সর্ব্বত্র অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। তবে এ চেষ্টা করিয়া লাভ কি? কিন্তু Zionist ইহুদীগণ এ কথায় বিচলিত হইবার পাত্র নহেন। তাঁহারা নানা উপায়ে স্বজাতিকে উদ্বোধিত করিবার চেষ্টা করিলেন। উগাণ্ডা-প্রস্তাব প্রত্যাখ্যানের পর কিছুদিন অতিবাহিত হইল। বুয়র-যুদ্ধের মধ্যে ইংরাজ ইহুদীর কথা ভুলিয়া গেলেন। ভারতবর্ষের কুলী, মজুর, কেরাণী, এঞ্জিনীয়র লইয়া ইংরাজ উগাণ্ডা develope করিতে লাগিলেন। বুয়র-যুদ্ধ শেষ হইতে না হইতেই চীন লইয়া সমস্ত য়ুরোপ ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। ইহুদী-রাষ্ট্রের কথা তখন কে ভাবিতে পারে?

কৈশর উইল্‌হেলম একটু ভাবিতেছিলেন। তখন আর বিস্‌মার্ক জীবিত নাই যে, কোনও প্রকার চক্ষুলজ্জা হইবার সম্ভাবনাও কল্পনা করা যাইতে পারে। কোনও কালে যে তাঁহার চক্ষুলজ্জা ছিল, এমন কথা বলা যায় কি না, সন্দেহ। অনেক কথাই মনে পড়ে। যখন তাঁহার পিতামহ সিংহাসনে আরূঢ় ছিলেন, বালক উইল্‌হেল্‌ম বিস্‌মার্ককে এক-খানি পত্র লিখিয়া জানাইলেন যে, বিভিন্ন জর্ম্মণ-রাষ্ট্রের রাজন্যবর্গকে রাষ্ট্রীয়-সভায় সম্মিলিত হইবার জন্য শীঘ্রই আহ্বান করা হউক্; প্রিন্স উইল্‌হেল্‌ম তাঁহাদিগকে প্রকাশ্য সভায় জানাইবেন, তিনি প্রুশিয়ার রাজা হইলে কি ভাবে রাজ্যচালনা করিবেন। বিস্‌মার্ক তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলেন —"প্রিন্স, এ পত্র আপনি আমায় লিখিয়াছেন, যদি কেহ ঘুণাক্ষরে ইহার মর্ম্ম জানিতে পারে, তাহা হইলে কি লজ্জার কথা! যদি ইহার কোনও প্রতিলিপি আপনার নিকটে থাকে, তাহা নষ্ট করিয়া ফেলুন। আপনার পিতামহ রাজা; পিতা এখনও ক্রাউন্ প্রিন্স; আপনি রাজা হইয়া কি কি করিবেন, তাহা এখনই প্রকাশ্যভাবে ঘোষিত করিবেন?" পিতামহের তিরোভাব হইল। পিতা ফ্রেড্রিক্ ৯৯ দিন সিংহাসন অলঙ্কৃত করিয়া ইহধাম হইতে অপসৃত হইলেন। যথাকালে তিনি কৈশর হইলেন। কিছুদিন গেল। এক দিন বিস্‌মার্কের নিকটে তিনি একটি প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন। বৃদ্ধ চান্সেলর কঠোরস্বরে তাঁহাকে বলিলেন —"এ কি! ইহুদীর ও রোমান ক্যাথলিকের সুবিধা করিয়া দিবার জন্য সহসা আপনি আইন পরিবর্ত্তন করিবার চেষ্টা করেন কেন?" উইল্‌হেলম নিরস্ত হইলেন। কাউন্ট ফন ওয়ালডার্শী রাজাকে বলিলেন—"মহারাজ! পুণ্যশ্লোক ফ্রেড্রিক কখনও Der Gross (The Great) হইতে পারিতেন না, যদি তাঁহার রাজা হইবার সময় এক জন পরাক্রান্ত চান্সেলর জীবিত থাকিতেন, কিংবা থাকিলেও, যদি সেই চান্সেলরকে কার্য্য হইতে

মুক্তি দেওয়া না হইত!"...আরও অল্প কয়েকদিন গেল। ১৮৯০ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে কারখানার শ্রমিক আইনের তর্ক বিতর্কের অজুহতে বৃদ্ধ চান্সেলরকে কার্য্য হইতে মুক্তি দেওয়া হইল।...আরও ১০ বৎসর গেল। জর্ম্মণ জীবন-নাট্য নব নব রঙ্গে অঙ্কে অঙ্কে লীলায়িত হইয়া চলিল। বিস্‌মার্ক আর নাই। ওয়ালডার্শী চীনে বক্সার-বিদ্রোহ দমনে ব্যস্ত। উইলহেলম-ভ্রমর "সহলে সহলে" তুর্কী "কমলে"র মধ্যে "পশিল"। আনাতোলিয়ার রেল-লাইন শুধু আঙ্গোরা পর্য্যন্ত যাইয়া থামিবে কেন? দক্ষিণে সাগরোপকূল পর্য্যন্ত লইয়া যাওয়া চলে না কি? গ্রীক্, আর্ম্মিণীয়, ইহুদী সকলেই যুগপৎ উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারিবে। কিন্তু সে ভ্রমরগুঞ্জনে ইহুদী মজিল না। ১৯০১ খৃষ্টাব্দে কৈশর বলিলেন—"সীরিয়ার দক্ষিণ-প্রান্তে, মিশরের সন্নিধানে এল্-আরিশ্-এ তোমরা তোমাদের ন্যাশনাল ষ্টেট্ গঠিত করিতে পার।" Zionist ইহুদীগণ তাহাতে সম্মত হইলেন না। কৈশর আর ও-কথা উত্থাপিত করিলেন না। তিনি কি উদ্দেশ্যে ঐ প্রস্তাব করিয়াছিলেন, তাহা কাহাকেও বুঝিতে দিলেন না। ইংরাজ যখন ইহুদীকে লইয়া আফ্রিকায় উপনিবেশের বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন, তখন জর্ম্মণীর সহিত রাষ্ট্রীয় অথবা বাণিজ্যসম্পর্কীয় কোনও প্রকার প্রতিদ্বন্দ্বিতা প্রকটিত হয় নাই। জর্ম্মণী যখন এশিয়ার প্রান্তভাগে ইহুদীরাষ্ট্র স্থাপনের আয়োজন করিলেন, তখন ইংরাজের সঙ্গে নৌ-প্রতিযোগিতা আরব্ধ হইয়াছে। ক্রমে নানা কূট রাষ্ট্র সমস্যার আলোড়নে এই Zionist সমস্যা কিছুকালের জন্য লোকচক্ষুর অন্তরালে গিয়া পড়িল। ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে বৃটিশ ইহুদী-যুবকরা ইংরাজের স্বপক্ষে যুদ্ধ করিল। যে রুশিয়ায় 'পগ্রম' বিভীষিকা ইহুদীকে অতিষ্ঠ করিয়া তুলিয়াছিল, সেখানে অন্যূন ৩০ হাজার ইহুদী-যুবক রুশের পক্ষ অবলম্বন করিয়া লড়াই করিতে অগ্রসর হইল। জর্ম্মণী ও অষ্ট্রীয়াতে এইরূপ হইল। কার্য্যগতিকে ইহুদী জাতি

দুই বিরুদ্ধ শক্তিপুঞ্জের মধ্যে বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল বটে ; কিন্তু Zionistগণ আসল কথা কিছুতেই ভুলিল না। ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে যখন সাইক্‌স্-পিকো সর্ত্তে সীরিয়া তিন খণ্ডে বিভক্ত করা হইল, তখন তাহাদের মনে একটু আশার সঞ্চার হইল ; তাহারা ভাবিল, অন্ততঃ ইংরাজ এইবার তাহাদের মনস্কামনা সিদ্ধ করাইবেন। কিন্তু তখনও সেই সীরিয়া-বিভাগ-ব্যাপার অনেকটা কালনেমির লঙ্কাভাগের মত অনিশ্চিত ছিল। কাগজে-কলমে ইংরাজ ও ফরাসী স্থির করিলেন যে, সীরিয়ার মধ্যে তিনটি স্বতন্ত্র অধিকার spheres of influence হইবে। প্যালেষ্টাইন্ ইংরাজের হাতে থাকিবে; দামস্কস্ আরবের অধীন হইবে ; বাকি সমস্ত সীরিয়া ফরাসীর অধিনায়কত্বে শাসিত হইবে। পরবৎসর, ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে, ব্যাল্‌ফোরোক্তি ইহুদী-রাষ্ট্র প্রসঙ্গটাকে অনেক দূর অগ্রসর করাইয়া দিল। কোনও এক শুভলগ্নে ইহুদী গৃহ-প্রবেশের আয়োজন করিতে ব্যস্ত হইল।

প্যালেষ্টাইনে একটি Zionist কমিশনের আবির্ভাব দেখিয়া আরবগণ ক্রুদ্ধ হইয়া নানা কথা বলিল। কমিশনের সঙ্গে বৃটিশ পার্লামেণ্টের সভ্য মেজর গোর (Major The Hon. W. Ormsby Gore) সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তাঁহারা দেখিয়া শুনিয়া চলিয়া যাইবার পর দলে দলে ইহুদি সৈনিক গার্ড গঠিত হইল। আরবভাষার মত হিব্রুভাষাও সরকারী অফিশ্যাল্ ভাষা বলিয়া পরিগণিত হইল।

১৯১৯ খৃষ্টাব্দে প্যালেষ্টাইনের আরব-কংগ্রেস এই নবীন ইহুদী-রাষ্ট্র-নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিল। কোনও ফল হইল না। তা'র পর ?

১৯২০ খৃঃ অব্দের এপ্রিল মাসে দু' এক দিন অন্তর এই দুইটি সংবাদ পাওয়া গেল,—

(প্রথমে)—The San Remo Conference has re-affirmed

the Balfour Declarattion, অর্থাৎ সান রেমো সন্ধি ব্যাল্‌ফোর-প্রতিজ্ঞা সমর্থন করিয়াছে।

(পরে)—There is a serious outbreak in Jerusalem জেরুসালেমে ভয়ানক গোলমাল।

গোলযোগ অবশ্যই থামিয়া গেল। সর হার্‌বার্ট স্যামুয়েল হাই-কমিশনর নিযুক্ত হইয়া জেরুসালেমে পদার্পণ করিলেন। সর হার্‌বার্ট খুব ভাল লোক। কিন্তু সম্মিলিত মুসলমান-খৃষ্টান-সঙ্ঘ একবাক্যে বলিল, ছিঃ, এই গোলযোগের সময় একজন ইহুদী ভদ্রলোককে প্যালেষ্টাইনের হাই-কমিশনর নিযুক্ত করিয়া এখানে পাঠাইতে ইংরাজের একটুও সঙ্কোচ হইল না?

আবার ১৯২০ খৃষ্টাব্দে প্যালেষ্টাইনের আরবগণ কংগ্রেসে সম্মিলিত হইয়া নানা অত্যাচার অভিযোগের আলোচনা করিলেন। সীরিয়ায় যখন তুর্কী গভর্মেণ্ট প্রতিষ্ঠিত ছিল, তখন ইস্তাম্বুলের রাজসভায় জাতিধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে সীরিয়ার নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিগণ আসন গ্রহণ করিতেন। দেশের ভিতরকার শাসন-ব্যবস্থা অনেকটা সেখানকার অধিবাসিবর্গের স্বায়ত্ত ছিল; অত্যল্পসংখ্যক তুর্কী রাজকর্ম্মচারী, নামমাত্র শাসনভার বহন করিত। রাজ-কার্য্য-পরিচালনায় অপরিমিত অর্থ-ব্যয় হইত না। যখন যুদ্ধ বাধিল, ইংরাজ অথবা ফরাসীর প্রতি তাহাদের কোনও প্রকার অপ্রীতির ভাব প্রকটিত হয় নাই। জাহাজের জন্য নূতন নূতন বন্দর প্রস্তুত করিবার উদ্দেশে বৃটিশ পূর্ত্ত-বিভাগ উদ্যোগী হইয়া শ্রেষ্ঠিগণকে আহ্বান করিল। ধনী Capitalistরা প্যালেষ্টাইন্ দেখিয়া আসিল। তখনও আরবগণের বিশেষ কোনও চিন্তার কারণ উপস্থিত হয় নাই। যুদ্ধ বাধিল, ১৯১৪ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে। এক বৎসর যাইতে না যাইতেই, অর্থাৎ ১৯১৫ খৃষ্টাব্দের জুলাইমাসে মক্কার শরিফ হুসেন ইংরাজকে

জানাইলেন যে, এডেন বাদ দিয়া সমগ্র আরবদেশের স্বাধীনতা ইংরাজ কর্তৃক স্বীকৃত হওয়া প্রয়োজন। অক্টোবর মাসের মধ্যেই বৃটিশ গভর্মেণ্ট প্রতিজ্ঞা পাশে বদ্ধ হইলেন। প্যালেষ্টাইনের আরবগণ হুসেনের এই সন্ধিতে উল্লসিত হইল কি না, সে সম্বন্ধে হয় ত মতদ্বৈধ থাকিতে পারে। কিন্তু ৫ বৎসর পরে, যখন সার স্যামুয়েল হার্‌বার্ট হাই-কমিশনর হইলেন, তখন প্যালেষ্টাইনে আরবগণকে নানা প্রকারে চাপিয়া রাখিবার ব্যবস্থা হইল,—ইহাই আরবগণের প্রধান অভিযোগ। আরবদেশের বিষয় চিন্তা করিবার অবসর তাহাদের বেশী ছিল না।

নানা গোলযোগের ভিতর দিয়া ১৯২০ খৃষ্টাব্দ শেষ হইল। ১৯২১ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে পরে পরে এই কয়েকটী সংবাদ পাওয়া জেল,—

(প্রথমে)—The Colonial Office takes over the mandatory areas from the Foreign Office অর্থাৎ সীরিয়া ইরাক্‌ প্রভৃতির রক্ষণাবেক্ষণভার বৃটিশ পর-রাষ্ট্র-বিভাগের হাত হইতে সরাইয়া লইয়া উপনিবেশ-বিভাগের হাতে ন্যস্ত করা হইল। মিঃ উইন্‌ষ্টন্‌ চর্চ্চিল কর্ত্তা হইলেন।

(পরে)—মিঃ চর্চ্চিল মিশর পরিদর্শন করিতে গেলেন। প্যালেষ্টাইনের আরবগণ জনকতক ভদ্রলোককে ইহুদী ন্যাশনাল হোম সম্বন্ধে আবেদন করিবার জন্য তাঁহার কাছে পাঠাইয়া দিল। তিনি তাঁহাদের সহিত দেখা করিলেন না।

(আরও পরে)—উইন্‌ষ্টন্‌ প্যালেষ্টাইনে আসিলেন। Zionist deputation cordially received...Popular demonstration at Haifa... অর্থাৎ Zionist ইহুদীদের কথা তিনি যত্নসহকারে শুনিলেন ; হায়ফার অধিবাসিগণ অসন্তোষ প্রকাশ করিল।

কয়েক দিবসের মধ্যে, ১লা মে তারিখে, যাফ্‌ফায় যে দাঙ্গা হাঙ্গামা

হইল, তাহাতে বহুসংখ্যক আরব ও ইহুদী প্রাণ হারাইল। তদন্ত করিবার জন্য ইংরাজ এক কমিশন বসাইলেন। তাঁহাদের মন্তব্যে প্রকাশ যে, সমগ্র অ-যুডীয় অধিবাসী (non-Jewish population) ইহুদী-বিরোধী।

আরও এক বৎসর কাটিয়া গেল। বিগত ২২এ জুলাই তারিখে রয়টারের সংবাদে প্রকাশ যে, প্যালেষ্টাইনে ইংরাজের রক্ষকতায় নেশন-সঙ্ঘ (League of Nations) সম্পূর্ণ সম্মতি-জ্ঞাপন করিয়াছেন।

মিঃ লয়েড জর্জ্জ

মিঃ লয়েড জর্জ্জকে কেহই আজ পর্য্যন্ত ভাল করিয়া চিনিতে পারিল না। তিনি নাকি একটি জীবন্ত প্রহেলিকা। তাঁহার মতিগতি কখন্ কিরূপ হইবে, তাহা নাকি স্থির করা বড় শক্ত। তিনি কোন্ দলভুক্ত, তাহা বলা কঠিন। নয় দশ বৎসর পূর্ব্বে তিনি লিবার্‌ল অগ্রণীগণের অন্যতম ছিলেন। ইংলণ্ডের অবাধ বাণিজ্যনীতি কোনও প্রকারেই ক্ষুণ্ণ করিতে তখন্ তিনি প্রস্তুত ছিলেন না। স্বদেশের ও বিদেশের পণ্য-প্রবাহের গতিরোধ করা তাঁহার কল্পনাতীত ছিল। আরও অনেক বৎসর পূর্ব্বে যখন মিঃ জোসেফ চেম্বার্‌লেন্ ক্যাবিনেটের আসন পরিত্যাগ করিয়া সার্ব্বভৌম অবাধ-বাণিজ্যের অপকারিতা বুঝাইয়া দিবার জন্য কয়েক মাস অনবরত বক্তৃতা করিয়া বেড়াইলেন, তখন লিবারলদিগের মধ্যে যাঁহারা অত বড় প্রচণ্ড কন্সার্ভেটিভের পণ্যনীতির প্রতিবাদ করিতে সাহসী হইয়াছিলেন, মিঃ জর্জ্জ তাঁহাদের অন্যতম। মিঃ (অধুনাতন আর্ল) আর্থর ব্যালফোর রাষ্ট্র-পরিষদের কর্ণধার হইয়া গম্ভীর দার্শনিকের মত স্থিরভাবে বসিয়া রহিলেন। মিঃ চেম্বারলেন্‌কে তিনি কিছুতেই ছাড়িতে চাহেন নাই। কিন্তু জোসেফ বলিলেন—"আপনি কিছুমাত্র বিচলিত হইবেন না। আমার বিচ্ছেদে আপনার চঞ্চল হইবার কোনও কারণ নাই। আপনার ক্যাবিনেটের পণ্য policyকে বলবত্তর করিবার জন্য আমি সদস্যপদ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইতেছি। রাষ্ট্র-সচিব থাকিয়া ত খোলসা করিয়া বক্তৃতা করা চলে না। সচিব হিসাবে যতটুকু বৃটিশ সাম্রাজ্যের কায করিবার সামর্থ্য আমার ছিল, ততটুকু আমি অকুণ্ঠিত

চিত্তে করিয়াছি। সমুদ্রপারের বৃটিশ উপনিবেশগুলিকে এতকাল Colony বলা হইত; আপনি জানেন, আমি আমাদের রাষ্ট্রীয় আলাপে পরিচয়ে ঐ শব্দ প্রয়োগ একেবারে বন্ধ করিয়া দিয়াছি। তাহাদিগকে Dominions beyond the Seas আখ্যা দিয়াছি; ভাবিয়া দেখুন, তাহাতে তাহাদের ও আমাদের গৌরববৃদ্ধি হয় নাই কি? এত দিন তাহাদিগকে ইংলণ্ডের দুহিতৃ-পরিচয়ে Daughter Countries বলা হইত; আমিই ত তত্তদ্দেশবাসীদিগকে সোদর সম্ভাষণে Sister Nation আখ্যা দিয়া প্রথমে আহ্বান করিলাম। এখন সেই Sister Nation-দিগকে আরও কাছে টানিয়া আনিতে হইবে;—তাই আমি Imperial Preferenceএর দিকে ঝুঁকিয়াছি। কিন্তু কবডেন্-পন্থীরা আমায় বৃথা অপবাদ দিতেছে। আমি ফ্রীট্রেড-এর বিরুদ্ধে আন্দোলন করিতেছি না। অন্য সব নেশনের চেয়ে আমাদের সাম্রাজ্যের অন্তর্গত নেশনগুলির দিকে আমরা বিশেষ করিয়া লক্ষ্য রাখিব। বাণিজ্যের সুবিধা তাহাদিগকে এমন ভাবে দিতে হইবে যে, তাহারা রাষ্ট্রীয় প্রীতিবন্ধনে তাহাদের স্বার্থসিদ্ধির অনুকূল ব্যবস্থা দেখিয়া পুলকিত হইবে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্য দৃঢ়তরভাবে জগতে প্রতিষ্ঠিত হইবে।" তাহার পর জোসেফ অমিতবিক্রম ঝড়ের মত একটা hurricane campaign চালাইলেন। রোজবেরি অ্যাস্কিথ-প্রমুখ মহারথগণ কম্পিত হইলেন। তাঁহাদের পশ্চাতে থাকিয়া মিঃ জর্জ্জ আগ্নেয়াস্ত্র বর্ষণ করিতে লাগিলেন। খুব বেশী লোক শ্রদ্ধার সহিত তাহা শুনে নাই; কিন্তু তাঁহার মুষ্টিমেয় র‍্যাডিক্যাল বন্ধুবর্গ তাঁহাকে বাহবা দিল।

১৯২২ খৃষ্টাব্দের টোরিলিবারল্ গভর্মেন্টের অমাত্যবর কি সেই লয়েড জর্জ্জ? যিনি ইংলণ্ডের কয়েকটি শিল্পরক্ষা করিবার প্রয়াসে এক হস্তে Antidumping Bill ও অপর হস্তে Safeguarding of Industries Act লইয়া ইংরাজের সম্মুখে দাঁড়াইয়াছেন, ইনি কে? জোসেফ

চেম্বারলেনের পুত্র! জর্ম্মণীর রংএর আমদানী ইংলণ্ডে যদি অবাধে চলিতে থাকে, তাহা হইলে কয়েকটি নবজাত বৃটিশ শিল্প নষ্ট হইয়া যাইবে। আরও অনেক জিনিষ আসিতেছিল, তাহাতে বৃটিশ ধনী capitalist ক্ষতিগ্রস্ত হইবার আশঙ্কা করিলেন। আইনের দ্বারা ইহার নিরাকরণ প্রয়োজন। অবাধ-বাণিজ্য-নীতি একটা ভুল ধারণা মাত্র। বিশ বৎসর পূর্ব্বে মিঃ জর্জ্জ এত বড় একটা ভুল ধরিতে পারেন নাই; তাই আজ জোসেফের পুত্র মিঃ অষ্টেন্ চেম্বারলেনের সম্মুখে তাহার প্রায়শ্চিত্ত করিতেছেন। দুষ্ট লোক বলে যে, তিনি চাকরি রাখিবার জন্য অষ্টেনের মন জোগাইতেছেন। অষ্টেন্ এখন সর্ব্ববাদিসম্মত টোরীদিগের নেতা। হাউস্ অব্ কমন্সেও অষ্টেন্ নেতা ও গভর্মেণ্টর মুখপাত্র। Co-alition দলের মধ্যে টোরীগণকে সন্তুষ্ট না রাখিতে পারিলে মিঃ জর্জ্জকে পদত্যাগ করিতে বাধ্য হইতে হইবে। অতএব তাঁহাকে ভুলিতে হইবে যে, কখনও তিনি ফ্রী-ট্রেডের পক্ষপাতী একজন অগ্নিশর্ম্মা র‍্যাডিক্যাল ছিলেন। জাহাজ বোঝাই করিয়া জর্ম্মণ বণিক এক রকম দস্তানা fabric gloves ইংলণ্ডে পাঠাইতেছিলেন; জনকতক ধনী ইংরাজ কল-কারখানাওয়ালা বিপদে পড়িয়া গভর্মেণ্টের শরণাপন্ন হইলেন। ক্যাবিনেটের মধ্যে একটু মতদ্বৈধ বোধ হয় হইয়াছিল। হুকুম জারি হইল,—আমদানি বন্ধ করা হউক। সমগ্র ল্যাঙ্কাশায়ার কিন্তু কাঁপিয়া উঠিল। তবে ত তাহাদের সূতা আর জর্ম্মণী লইবে না! গভর্মেণ্ট তাহাদের এত বড় অনিষ্ট করিল? একে ত তাহারা অত্যন্ত দুরবস্থায় পড়িয়াছে; তাহার উপরে এ কি নূতন বিপদ্! এখনও পার্লামেণ্টের কাছে এ প্রশ্ন উপস্থাপিত করা হয় নাই; একটা পরামর্শ-কমিটীর ভিতর দিয়া বোর্ড অফ্ ট্রেডের নিকটে ঐ শুল্ক বসান'র কথা আসিয়া পৌছিল। শেষোক্ত পণ্যকর্ত্তৃপক্ষীয়েরা গভর্মেণ্টের প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। ল্যাঙ্কাশায়ার মিঃ জর্জ্জকে চাপিয়া ধরিল।

বেগতিক দেখিয়া তিনি পুনরায় ঐ প্রস্তাবটি ক্যাবিনেটের কাছে পাঠাইয়া দিলেন। যদি ক্যাবিনেট্ আগেকার হুকুম রদ করিয়া দেয়, তাহা হইলে টোরীদিগের মুখপাত্র মিঃ ব্যালডুইন পদত্যাগ করিতে বাধ্য হইবেন। আর তাঁহার সাধের Antidumping Bill ও Safeguarding of Industries Actএর কি দশা হইবে?

দো-টানার মধ্যে মিঃ জর্জ্জের ক্যাবিনেট্-তরী বৃটিশ রাষ্ট্রনীতিক খাতের ভিতর দিয়া জয়পতাকা উড়াইয়া চলিয়া আসিতেছিল। তিনি দর্পভরে কমন্স সভায় দাঁড়াইয়া বলিলেন—"আমার মত এত দিন কেহ কখনও সম্মিলিত Co-alition গভর্মেণ্ট চালাইতে পারিয়াছে কি?" কে এক জন বলিয়া উঠিল—"কেন, লেনিন?" তিনি বিদ্রূপ করিয়া কথাটা উড়াইয়া দিলেন। একদিন পার্লামেণ্টে তাঁহার 'একাতপত্রং জগতঃ প্রভুত্বং' দেখিয়া 'নেশন'-পত্র জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—Under which George, Bezonian? আমরা কোন্ জর্জ্জ-এর রাজ্যে বাস করিতেছি? লয়েড জর্জ্জ, না রাজা পঞ্চম জর্জ্জ? টোরীরা ইঁহাকে মাথায় করিয়া রাখিয়াছিল; জন কতক লিবারলও ইঁহার দলপুষ্টি করিতেছে। টোরীঋণ ইনি কেমন করিয়া শুধিবেন? আইরিশ ফ্রী ষ্টেট ব্যাপারে টোরীগণ ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল। এখন কি করিলে তাহাদিগকে সন্তুষ্ট করা যায়, ইহাই তাঁহার প্রধান লক্ষ্য। আলষ্টারের কার্সন্ তাঁহার প্রধান সহায় ছিলেন। আজ তিনি বিষম বিরক্ত। একদিন লর্ড র‍্যাণ্ডলফ্ চর্চ্চিল উচ্ছ্বাসভরে বলিয়াছিলেন,—Ulster will fight, and Ulster will be right, আলষ্টার লড়াই করিবে, বেশ করিবে। ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে সার এড্ওয়ার্ড কার্সন্ আদালতে ওকালতী বন্ধ করিয়া আলষ্টারে লক্ষাধিক নাগরিক সৈন্য সশস্ত্র ও সুসজ্জিত করিলেন। উইনষ্টনের আবাল্য সুহৃদ্ সোদরোপম মিঃ স্মিথ (অধুনাতন লর্ড

বার্কেন্‌হেড) কার্সনের সন্দেশবহ হইয়া অশ্বপৃষ্ঠে ইতস্ততঃ ধাবমান হইতে লাগিলেন; লোকে তাঁহার নাম রাখিল Galloping Smith। মিঃ অ্যাস্কিথের ক্যাবিনেট্‌ কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিতে পারিলেন না। ক্রমে আয়র্লণ্ডের অন্তর্দ্রোহ অত্যন্ত ভীষণ হইয়া দাঁড়াইল। দক্ষিণ আয়র্লণ্ডের সাহায্যার্থ এক জাহাজভরা গুলী-গোলাবন্দুক-বারুদ লইয়া, স্বদেশপ্রেমিক সার রজার কেস্‌মেণ্ট জর্ম্মণী হইতে আসিবার সময় ইংরাজ কর্ত্তৃক ধৃত হইলেন। আলষ্টার সন্তুষ্ট হইল। কিছুদিন পরে মিঃ অ্যাস্কিথ পদত্যাগ করিতে বাধ্য হইলে মিঃ জর্জ্জ তাঁহার আসন অধিকার করিলেন। দুই এক বৎসরের মধ্যে ব্ল্যাক্‌-অ্যাণ্ড-ট্যান্‌ নামধেয় সহস্র সশস্ত্র গুণ্ডা দক্ষিণ আয়র্লণ্ডের ক্যাথলিক গৃহস্থের উপর অত্যাচার আরম্ভ করিল। আলষ্টার আরও সন্তুষ্ট হইল। অত্যাচার অবাধে চলিতে লাগিল। * মহাসমুদ্র পারে মার্কিণ চঞ্চল হইয়া উঠিল। ওয়াশিংটন বৈঠকে উপস্থিত হইবার

* In a statement published on June 24 Mr. De. Valera had the hardihood to say; "I know that women have been outraged, men and women have been murdered, whole families have been wiped out, and I share the common belief that a cynical Imperialism has instigated these outrages, and provided the means for carrying them through."

—The Quarterly Review, July 1922. P 204.

In an open letter to the people of Great Britain from Mrs. Mac Swiney occurs the following paragraph—

"Look at the state of Belfast to-day. It is the doing of your Government, encouraged by your Government, for the express purpose of giving England an excuse to send extra battalions to reconquer the 'Mere Irish.' Your money is paying the brutal 'Specials' whose savagery is a blot on

পূর্ব্বে এমন একটা কিছু করা চাই—যাহাতে মার্কিণের চাঞ্চল্য প্রশমিত হইতে পারে। ব্ল্যাক্-অ্যাণ্ড-ট্যান্ আয়র্লণ্ড হইতে সরাইয়া আনা হইল। আর কার্সনের সম্মতি না লইয়াই আইরিশ ফ্রী-ষ্টেট্ গঠিত করা হইল। আল্ষ্টারের ক্রোধের সীমা রহিল না। কার্সনের দলকে ঠাণ্ডা করিবার জন্য তাঁহাদের লর্ড চ্যান্সেলর বন্ধু অনেক মিষ্ট কথা বলিলেন। কোনও বিশেষ ফল পাওয়া গেল না। তখন পার্লামেণ্টে দাঁড়াইয়া উইন্‌ষ্টন্ বলিলেন—যদি নবগঠিত আইরিশ ফ্রী ষ্টেট নিজের রাষ্ট্রকে সুশাসনে রাখিতে না পারেন, তাহা হইলে উক্ত রাষ্ট্রসম্বন্ধে বৃটিশ পার্লামেণ্টকে পুনরায় বিবেচনা করিতে হইবে, কি করা উচিত। ইংরাজী ভাষা হইতে বাছিয়া বাছিয়া অনেক শব্দ উইন্‌ষ্টন্ ব্যবহার করিলেন; কিন্তু ফ্রী ষ্টেট সম্বন্ধে experiment শব্দটি প্রয়োগ করেন নাই। তাহা তাঁহার মাতব্বর মোড়ল মিঃ জর্জ্জ অন্য ক্ষেত্রে প্রয়োগ করিবেন বলিয়া বোধ হয় তুলিয়া রাখিয়াছিলেন। যাহা হইক, আলষ্টার কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইল। পরে যখন ফ্রী ষ্টেটের মধ্যে অন্তর্বিদ্রোহ জ্বলিয়া উঠিল, আল্ষ্টার পুলকিত হইল। ডি ভ্যালেরা বলিলেন,—আয়র্লণ্ডের রঙ্গমঞ্চে মিঃ কলিন্সের দল ইংরাজের সঙ্কেতানুসারে স্বাধীনতার পুতুল-নাচ নাচিতেছেন। মিঃ জর্জ্জ কাহাকেও তুষ্ট করিতে পারিলেন না,—আল্ষ্টারকে নয়, দক্ষিণ আয়র্লণ্ডকেও নয়। কিন্তু তবুও তাঁহার ক্যাবিনেট্-তরী অনুকূল ও প্রতিকূল

---

civilization. Your sons and your brothers stand by, whilst these savages murder women and little children ; but when the maddened victims of their savagery retaliate, they join in at the command of those same brutes, and use the 'resources of your civilization' to help in the extermination of the victims." —The Nation & the Athenæum,—July 15, 1922, P. 535.

পবনে পাল তুলিয়া হেলিয়া দুলিয়া চলিল। তাঁহাকে সরাইবার শক্তি লিবারল্‌দিগের নাই ; তাঁহার সাহায্যে হাউস্ অভ লর্ডস্‌এর সংস্কারসাধন না করাইয়া টোরীরা তাঁহাকে সরিয়া যাইতে দিবেন না। কয়েক মাস পূর্ব্বে যখন পার্লামেণ্টের নূতন করিয়া প্রতিনিধি বাছাই করিবার জন্ম আর একটা General Electionএর কথা হয়, সার জর্জ্জ ইয়ঙ্গার স্পষ্টই বলিলেন যে, টোরীরা এ প্রস্তাবে কিছুতেই সম্মত হইবে না যতদিন মিঃ লয়েড জর্জ্জ বর্ত্তমান Coalition majority'র সাহায্যে হাউস্ অভ লর্ডস্‌এর এমন ভাবে সংস্কার না করেন—যাহাতে উক্ত হাউস্ পুনরায় তাহার রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ফিরাইয়া পায়। ১৫।১৬ বৎসর পূর্ব্বে যখন মিঃ জর্জ্জ রাজস্ব-সচিব ছিলেন, তখন তাঁহারই চেষ্টায় লর্ডস্‌এর আপত্তি করিবার, বাধা দিবার, Veto করিবার ক্ষমতা লুপ্ত হয়। তদবধি দ্বিতীয় চেম্বার আপত্তি করিতে পারে, কিন্তু হাউস্ অভ্ কমন্সের আগ্রহাতিশয্যে বাধা দিবার শক্তি তাহার রহিল না। অথচ সকলেই জানেন যে সব সময়েই যে কমন্স খুব সুবুদ্ধির পরিচয় দিয়া দৃঢ়তার সহিত কার্য্য করেন, তাহা নহে। যে মিশ্র Coalition দলের উপর মিঃ জর্জ্জ নির্ভর করিতেছিলেন, তাহারা অনেক অবিবেচনার কায করিয়া স্বল্পসংখ্যক বিরুদ্ধবাদীকে পার্লামেণ্টে চাপিয়া রাখিবার চেষ্টা করিতেছিল। মধ্যে মধ্যে দুএকটা ভাল কথা কিন্তু হাউস্ অভ্ লর্ডস্ হইতে শুনা গেল। টোরীরা মনে করিতেছিলেন যে, যদি আর একটা পার্লামেণ্ট নির্ব্বাচনের ফলে তাঁহাদের Co-alition পরাজিত হইয়া নূতন কোনও উদার শ্রমিক Liberal Labour Majority'র মত লইয়া চলিতে বাধ্য হন, তাহার পূর্ব্বে লর্ডস্ সম্বন্ধে একটা কিছু ব্যবস্থা করা চাই।

শ্রমিক-উদারনীতিক দল জিজ্ঞাসা করেন—কি ব্যবস্থা করিতে চাও? অষ্টাদশ শতাব্দীর রাষ্ট্রীয় ভ্রম-প্রমাদ হইতে আমাদের Constitutionকে

মুক্ত করিতে চাহ না? আগে স্থির কর দেখি, দ্বিতীয় চেম্বারের উপকারিতা ও উপযোগিতা কি? যাট বৎসর পূর্ব্বে ব্যাজহট্ এই প্রসঙ্গে যে তর্কজাল বিস্তার করিয়াছিলেন, তাহাতে আসল কথা ঢাকা পড়িয়া গেল; কেবল আভিজাত্যগৌরব কিঞ্চিৎ স্ফীত হইয়া উঠিল মাত্র। আরও পূর্ব্বে ১৮৩১ খৃষ্টাব্দে যখন লর্ড জন্ রাসেল্ ধনী জমিদারের কুক্ষিগত কমন্সকে মুক্ত করিবার প্রয়াস পান, তখন ধনী অভিজাতসমাজ চীৎকার করিয়া উঠিল,—বাস্তুসম্পত্তির উপর হস্তক্ষেপ করা হইতেছে, Propertyর সর্ব্বনাশ হইবে। প্রায় শতবর্ষ পরে, আজও অনেক টোরী ঐ ভাবে কথা কহিতেছেন। তাঁহারা বলেন, মিঃ জর্জ্জ Property'র সর্ব্বনাশ-সাধন করিতে অনেক দিন হইতেই বদ্ধপরিকর। যাহা ভাঙ্গিয়াছেন, আবার তাহা গড়িয়া তুলুন। Chancellor of the Exchequer মিঃ জর্জ্জ কি উদ্দেশ্যে লর্ড্স্এর বীর্য্য অপহরণ করিয়াছিলেন, তাহা কাহারও অবিদিত নাই; কিন্তু Prime Minister মিঃ জর্জ্জ কি তাহার জন্য কোনও প্রায়শ্চিত্ত করেন নাই? এই যে এখন দ্বিতীয় চেম্বারে সাত শত সাঁইত্রিশ জন Peers আছেন, ইঁহাদের মধ্যে শতাধিক কি মিঃ জর্জ্জের সৃষ্ট নহে? সম্প্রতি মিঃ ল্যাস্কি এ সম্বন্ধে যে কয়টি তালিকা প্রস্তুত করিয়াছেন, তাহা অনুধাবন করিলে মন্ত্রিবরের কৃতিত্ব সহজেই অনুমিত হইবে। প্রথম দফা দেখুন :—

গভর্মেণ্ট		নূতন লর্ড	পদবীর উন্নতি-বশতঃ যাঁহারা লর্ড হইলেন	মোট সংখ্যা
বীকন্সফীল্ড	১৮৮০—	১১	৩	১৪
গ্ল্যাড্‌ষ্টোন	১৮৮০—৮৫	৩০	৪	৩৪
সল্‌স্‌বেরী	১৮৮৫—৮৬	১৩	১	১৪

গ্ল্যাড্ষ্টোন	১৮৮৬—	...	৮	...	১	...	৯
সল্স্বেরী	১৮৮৬—’৯২	...	৪২	...	৭	...	৪৯
গ্ল্যাড্ষ্টোন	১৮৯২—’১৪	...	৪৯	...	০	...	৪৯
রোজবেরী	১৮৯৪—’৯৫	...	৯	..	২	...	১১
সল্স্বেরী	১৮৯৫-১৯০২	...	৫০	...	১০	...	৬০
ব্যাল্ফোর	১৯০২—’০৫	...	১৮	...	৫	...	২৩
ক্যাম্বেল-ব্যানার্ম্যান	১৯০৫-০৮	...	২১	...	—	...	২১
অ্যাস্কিথ	১৯০৮—’১৬	..	৮৯	...	১৭	...	১০৬
লয়েড জর্জ্জ	১৯১৬—২২	...	৮৭	...	২১	...	১০৮
			৩৮৭		৭১		৪৫৮

ইহার মধ্যে একটু রহস্য আছে। মিঃ অ্যাস্কিথ আট বৎসরের মধ্যে এক জন সংবাদপত্র পরিচালককে “পীয়র” করিয়াছেন; কিন্তু মিঃ জর্জ্জ ছয় বৎসরের মধ্যে পাঁচ জনকে উক্ত গৌরবে মণ্ডিত করিয়াছেন। আরও একটু মজার কথা আছে। এক দিন যিনি হাউস্ অভ্ লর্ড স্এর Beerage and Peerageএর উদ্দেশে বিদ্রূপ করিয়াছিলেন, কয়েক বৎসরে তিনি মগুব্যবসায়ীদিগের মধ্য হইতে বাছিয়া বাছিয়া তিন জনকে Peer করিয়াছেন; মিঃ অ্যাস্কিথ কিন্তু এক জনকেও করেন নাই। এই গভর্মেণ্টের উপাধিবিতরণ (অথবা বিক্রয়?) উপলক্ষে কত কথা শুনা গেল ইহার ভিতরকার আসল কথা এই যে, লয়েড জর্জ্জের স্বপক্ষে একটা প্রবল দল বরাবর রক্ষা করা প্রয়োজন,—নহিলে Co-alition গভর্মেণ্ট টিকিতে পারে না। লোকে বলিল যে, সার রবার্ট ওয়াল্পোলের পর আর এমন ব্যবস্থা ইংরাজের রাষ্ট্রনীতিক্ষেত্রে দেখা যায় নাই। আপাততঃ অন্য সকল অবান্তর কথা না তুলিয়া শুধু

হাউস্ অভ্ লর্ডস্এর কি করা উচিত, তাহাই মিঃ জর্জ্জের একটা বড় সমস্যা দাঁড়াইল। কমন্সদিগের মধ্য হইতে বাছাই করিয়া দেড় শত কিংবা দুই শত যোগ্য ব্যক্তিকে অপর চেম্বারে পাঠাইয়া দিলে লর্ডস্এর সংস্কার হয় কি না, মিঃ জর্জ্জ তাহাই বিচার করিতে লাগিলেন। কিন্তু টোরীরা সে রকম সংস্কার চাহে না। হাউস্ অভ্ লর্ডসএর ক্ষমতা ছিল, তাহার পুনঃ-প্রতিষ্ঠা না হইলে তাহারা সন্তুষ্ট হইবে না। ১৯১১ খৃষ্টাব্দের লয়েড জর্জ্জ ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে কি করিবেন ? লর্ডসদিগের Veto উঠাইয়া দেওয়া একটা experiment মাত্র আর কিছু নয়,—এ কথা বলা চলে না কি ? চাকরি রাখিতে হইলে সময়ে সময়ে কত রকম কথাই বলিতে হয়। যাঁহারা বলিতে সঙ্কোচ বোধ করেন, তাঁহাদিগকে চাকরির মায়া পরিত্যাগ করিতে হয়। মিঃ অষ্টেন চেম্বারলেন, ডক্টর অ্যাডিসন, মিঃ মণ্টেগু,—ইঁহারা সকলেই পদত্যাগ করিলেন। কয় বৎসরের মধ্যে মিঃ জর্জ্জ কত রকম কথাই বলিলেন। গণতন্ত্রশক্তি অক্ষুণ্ণ থাকিবে—The world made safe for democracy; হাতে হাতে ইংরাজ ফল পাইয়াছে...ইংলণ্ডে democracy আছে কি না, সে সম্বন্ধে অনেকের সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে। কৈসর উইল্হেলমের মাথাটা লইতে হইবে...“ধরণীর রাজ-বংশে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শির,” অ্যামারঙ্গেণ-প্রবাসে উইলহেলমের কবন্ধদেহ কোনও জর্জ্জীয় পত্রিকার বিশেষ সংবাদদাতার নয়নগোচর হইয়াছে বলিয়া জানা নাই। Reparation স্বর্ণমুদ্রায় সিন্দুক বোঝাই হইয়া ইংলণ্ড অধমর্ণ হইবে...কাণে, ওয়াশিংটন, জেনোয়া, হেগ্, লণ্ডন তাহার সাক্ষী। দশ বৎসর পূর্ব্বে, ভাদ্র মাসে, তাঁহার ক্যাবিনেট্ ভারতবর্ষ-শাসন সম্বন্ধে কি একটা নূতন প্রতিজ্ঞায় না কি আবদ্ধ হইয়াছিল। সম্রাটের বাণী না কি ভারতবর্ষকে স্বরাজ-বার্ত্তা শুনাইয়াছিল। দরিদ্র ভারতের সমস্ত দৈন্যের

বুঝি এইবার অবসান! যেখানে রিক্ততা ছিল, সেখানে পরিপূর্ণ গৌরবশ্রী বিরাজ করিবে। কিন্তু হায়! মিঃ লয়েড্ জর্জ্জের নূতন ভাষ্য পাঠ করিয়া লিবারল-ন্যাশনালিষ্টের আক্ষেপের সীমা রহিল না।

আজ সে আক্ষেপের কথা না তুলিলেও চলিত। ইংরাজ সহসা কোনও ব্যক্তিবিশেষের কার্য্যকলাপ লইয়া আক্ষেপোক্তিতে কালক্ষেপ করেন না; কিন্তু মিঃ লয়েড্ জর্জ্জ শ্রেণীবিশেষের পক্ষে মর্ম্মান্তিক বেদনার কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছেন। সেই টোরি-লিবারল্-সমন্বয় গভর্মেণ্ট্ অতীতের গর্ভে বিলীন হইয়া গিয়াছে। লিবারল্ দল অত্যন্ত ক্ষীণবল হইয়া গেল। সম্প্রতি নানা কারণে দলের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হইয়াছে। দলপুষ্টির জন্য যে অর্থ সংগৃহীত হইয়াছিল, সে সমস্ত টাকা লয়েড্ জর্জ্জের হাতে। পার্লামেণ্টের অথবা মিউনিসিপ্যালিটির সদস্য নির্ব্বাচনের জন্য টাকা খরচ করা বিশেষ আবশ্যক; কিন্তু লয়েড্ জর্জ্জ প্রসন্ন না হইলে ঐ অর্থকোষ হইতে টাকা পাওয়া যাইবে না। লিবারল দলের মধ্যে ফিরিয়া আসিতে তাঁহাকে বিশেষ বেগ পাইতে হইয়াছিল। সেই দলের মধ্যে যদি তিনি আধিপত্য করিতে না পাইলেন, তবে কি হইল? লর্ড গ্রে প্রমুখ কয়েক জন প্রাচীন লিবারল তাঁহার ব্যবহারে ক্ষুব্ধ হইয়া আর একটি স্বতন্ত্র দল গড়িলেন। ভূমি সম্বন্ধে আইনের কিরূপ পরিবর্ত্তন হওয়া উচিত তাই লইয়া বিরোধ উপস্থিত হয়। কোনও কিছুর প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া তিনি ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে নানা স্থানে বক্তৃতা করিয়া বেড়াইলেন। লিবারল দল ভাঙ্গিয়া গেল। ঐ টাকাটার কথা প্রকাশ্যে কোনও সভা সমিতিতে আলোচিত হইল না বলিলেও চলে। কিন্তু লর্ড রোজবেরি জিজ্ঞাসা করিলেন,—লয়েড্ জর্জ্জ যখন প্রধান মন্ত্রী ছিলেন, তখন টাইটেল্ বিক্রয় করিয়া যে টাকা পাইয়া ছিলেন, লয়েড্ জর্জ্জের হাতে কি সেই টাকা গচ্ছিত রহিয়াছে? উত্তর হইল,—হাঁ, সেই টাকা।

অনেক দুঃখে এতদিন পরে লর্ড রোজবেরি পলিটিক্স সম্বন্ধে মুখ ফুটিয়া কথা কহিলেন। তিনিও একদিন লিবারল দল হইতে সরিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। যখন তিনি স্যর হেনরি ক্যাম্পবেল-ব্যানারম্যানকে বলিয়াছিলেন,—আমি আপনার সঙ্গে এক মন্দিরে পূজা করিব না (I will not worship in your tabernacle), তখন কেবল মাত্র ব্যক্তিগত অভিমান প্রকাশ পাইয়াছিল, দল ভাঙ্গিবার সম্ভাবনা ছিল না। এখন লিবারল দল চুরমার হইয়া যাইতেছে। কথা না কহিলে চলে না; কিন্তু তবুও সব দিক রক্ষা হইল না। সে দোষ কাহার?

দোষ গুণ বিচার করা অনেক সময়ে বড় কঠিন হইয়া পড়ে। জটিল রাষ্ট্র সমস্যার মধ্যে চঞ্চলচিত্ত মন্ত্রিপ্রবর ভারতবর্ষের শাসন যন্ত্রের ষ্টীল ফ্রেমের উল্লেখ করিয়া যেদিন সিবিল সার্ব্বিসের গৌরব বৃদ্ধি করিলেন, ভারতবর্ষের নবীন শাসন প্রণালী কেবলমাত্র একটা experiment বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেন, সে দিন আমরা ভাবিলাম, একি হইল। কেন এমন হইল? আমরা কি তবে ইংরাজকে ভুল বুঝিয়াছিলাম? এতদিন তাঁহার সঙ্গে আমার আদান প্রদান চলিতেছে, অথচ আমরা পরস্পর যেন সম্পূর্ণ অপরিচিত। হৃদয়ের যোগসূত্র কোথায়? আমাদের উভয়ের মাঝখানে একটা নিরবচ্ছিন্ন শূন্য রহিয়া গেল কেন? এই বিরাট শূন্যতার জন্য অন্য কাহাকেও দোষী করিবার চেষ্টা বৃথা। প্রতি বৎসর আমি নিজের হাতে আমার সোনার ধান সেই অপরিচিতের সোনার তরীতে তুলিয়া দিতেছি,—কেন বলিব যে, তিনি আমার স্বদেশকে develope করিবার জন্য আমাকে exploit করিতেছেন? অষ্ট্রেলিয়ার, কানাডার, আফ্রিকার শ্বেতাঙ্গ নাবিকগণ ঐ তরণীটি বাহিতে পারেন, ওখানে আমার স্থান হইবে কেন? শূন্য নদীর তীরে আমার শূন্য মন্দির লইয়া আমাকে বসিয়া থাকিতে হইবে। নিশ্চয়ই আমাদের

সাধনার ত্রুটি হইয়াছে। বর্ষায়, বসন্তে, শরতে, শীতে, পূর্ণিমায়, অমাবস্যায় সমস্ত দৈন্যের মাঝে একাগ্রচিত্তে নিশিপালন করিতে করিতে এক দিন হয় ত শুনিতে পাইব—কো জাগর্ত্তি, কে জাগে রে! সেই কোজাগর আহ্বানে আমাদের স্বদেশ-লক্ষ্মীকে তখন হয় ত আমরা ফিরিয়া পাইব। আজ আক্ষেপ করিয়া কোনও লাভ নাই। যিনি চিরকাল আমার অপরিচিত রহিয়া গেলেন, যাঁহার কাছে আমি চিরদিন রহস্যময় রহিয়া গেলাম; যিনি নিজের পণ্য লইয়া এত ব্যস্ত যে, আজ পর্য্যন্ত আমার দৈন্য তাঁহার চোখে পড়িল না; আমার কিছু বলিবার আছে কি না, তাহা শুনিবার জন্য যাঁহার কিছুমাত্র আগ্রহ আছে কি না, কে জানে? তাঁহার এবং আমার মাঝখানে কুহেলিকাচ্ছন্ন আকাশের কি বিপুল মর্ম্মান্তিক ব্যবধান! তিনি সুদূর, তিনি মহান্। আজ তরী হইতে তিনি আমার শূন্য মন্দিরের বাহিরে সহস্রাধিক লৌহকঙ্কালের অট্টহাস্যমুখরিত প্রান্তরের দিকে তর্জ্জনী নির্দ্দেশ করিয়া যদি বলিয়া থাকেন,—উহারাই নিত্য, সত্য, ঐখানে তোমাদের শিব, ঐখানেই তোমাদের শক্তি; তাহা হইলে আমরা বিচলিত হইব কেন? বোধ হয়, আমরা এত দিন আমাদের মন্দিরের বাহিরে শিবের ও শক্তির আরাধনা করিয়াছিলাম, তাই ঐ অভ্রচূড় Steel frame আমাদের দৃষ্টিরোধ করিয়া একমাত্র সত্য বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে। মিঃ জর্জ্জ বলিলেন—ভারতবর্ষের রাষ্ট্রসংস্কার একটা experiment মাত্র, আর কিছু নহে। টোরী সংবাদপত্রসম্পাদকদিগের অগ্রণী মিঃ গার্ভিণ্ ঘাড় নাড়িলেন—মিঃ জর্জ্জ ঠিকই বলিয়াছেন, ওটা একটা experiment মাত্র। কিন্তু কয়েক দিন পূর্ব্বে সার ভ্যালেণ্টাইন্ চিরল বিলাতের একটি ত্রৈমাসিক পত্রিকায় লিখিলেন,—"The question which we have got to face—and it presents itself under a variety of forms—is whether we are determined to go

through with the constitutional experiment upon which we have entered and to accept the implications of Parliamentary institutions in India even if they carry us further and faster than we had originally contemplated. Indians who sincerely desire to maintain the British connection do not regard their new constitution as an experiment, but as an irrevocable charter···The gravest note of warning which Mr. Srinivasa Sastri sounded, was, however, addressed to British Ministers, whom he knows, and who all know him. He had never known, he said, such profound distrust of Government as existed to-day, such absolute lack of sincerity, such a rooted tendency to put aside all pledges, promises and declarations as of no value whatever." অর্থাৎ এই খানেই কি এই experimentএর পর্য্যবসান, না ইহার সহজ চরম পরিণতি পর্য্যন্ত ইহাকে অগ্রসর করিবার জন্য সচেষ্ট থাকিতে হইবে? যেসকল ভারতবাসী ইংরাজের সহিত সম্বন্ধ রক্ষা করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা ইহাকে কেবলমাত্র একটা সাময়িক রাষ্ট্রীয় পরীক্ষাব্যাপার মনে করেন না। শ্রীযুক্ত শ্রীনিবাস শাস্ত্রী ইংরাজের কথার উপর ভারতবাসীর অবিশ্বাসের উল্লেখ করিয়া ব্রিটিশ রাষ্ট্রনীতিজ্ঞকে সতর্ক করিয়াছিলেন। ইংরাজ প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করেন, এই বিশ্বাস তাহার মনে বদ্ধমূল। ইংরাজ ইহা উপেক্ষা করিতে পারেন কি না, এই প্রশ্ন ইংরাজের সম্মুখে উপস্থিত। সে যাহা হউক, লয়েড্ জর্জ্জের ইস্পাৎ-ফ্রেম বক্তৃতার পর কয়েক বৎসর অতিবাহিত হইয়াছে। রাষ্ট্রসংস্কার সম্বন্ধে ইংরাজের

প্রতিজ্ঞা অটল, এই ভাবের উক্তি প্রায়ই শুনা গিয়া থাকে! লয়েড্ জর্জ্জ এখন আর অমাত্যমণ্ডলীর মধ্যে নাই; কিন্তু তাঁহার সেই বক্তৃতাটি কেহ ভুলে নাই। যাঁহাকে দায়িত্বপূর্ণ অনেক কাজ করিতে হয়, তাঁহার মুখে অনেক সময়ে এমন অনেক কথা শুনা যাইবার সম্ভাবনা যাহাতে বিস্ময় ও ক্ষোভ উৎপাদন করে। ১৯২৭ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে ব্রিটিশ পত্রিকাগুলি ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল। কয়েক দিন পূর্ব্বে মহাচীন সম্বন্ধে একটি বক্তৃতায় তিনি খৃষ্টান মিশনরিদিগের প্রতি দোষারোপ করিয়াছিলেন। প্রাচ্য ভূখণ্ডে খৃষ্টান মিশনের সঙ্গে শ্বেতাঙ্গের সাম্রাজ্যবিস্তার ঘনিষ্ঠ ভাবে জড়িত, এই ধারণা অনেকের মনে বদ্ধমূল হইলেও কোনও কোনও ইংরাজ ইদানীং মহাচীনের অন্তর্দ্রোহে পাদরির উপর কটাক্ষপাত প্রকাশ্যভাবে করেন নাই। সত্য হউক, মিথ্যা হউক, লয়েড্ জর্জ্জের বক্তৃতা ইংরাজকে বিচলিত করিল। কিন্তু ইংরাজের প্রতি চীনে মর্ম্মান্তিক আক্রোশ কি কেবল মাত্র মিশনরি ঘটিত? অথবা বল্‌শেভিক রুশের প্ররোচনা জনিত? শুধু পাদরির নিন্দা করিলে ইংরাজ আত্মগ্লানি হইতে মুক্তি পাইবেন কি? রুশের ঘাড়ে কাহার পাপের বোঝা চাপাইয়া তিনি নিশ্চিন্ত হইবেন? চীনের সদ্যোজাত স্বদেশপ্রেমের গুরু কি বল্‌শেভিক রুশ? এই স্বদেশ-প্রেম কি সাতাইশ বৎসর পূর্ব্বে বক্সার-সমিতিকে অনুপ্রাণিত করে নাই? যে সকল সাম্রাজ্য-দৃপ্ত নেশন বক্সারের উচ্ছেদ সাধন করিল, রুশ তাঁহাদের অন্যতম। তখন মহাচীনে শুল্কবিভাগের ইন্‌স্পেক্টর জেনারল ছিলেন স্যার রবার্ট হার্ট্। জর্ম্মণ প্রমুখ দ্বাদশ আদিত্য (তন্মধ্যে এগারটা য়ুরোপীয় শক্তি) মহাচীনকে দগ্ধ করিল। ১৯০০ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে উহারা পিকিং নগর অধিকার করিল। আগষ্ট-সেপ্টেম্বর মাসে স্যার রবার্ট্ কয়েকটি প্রবন্ধ লিপিবদ্ধ করেন। পরবৎসর ঐগুলি "These from the land of Sinim" নামে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়।

তিনি বলেন—The Boxer association was patriotic in its origin and justifiable in much that it aimed at,—বক্সার সমিতি স্বদেশপ্রেম হইতে উৎপন্ন। বাহিরের ধাকায় সেই স্বদেশপ্রেম দলিত পিষ্ট হইয়াও একেবারে বিলুপ্ত হইয়া যায় নাই। কয়েকটি ঘটনা বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য।

৪ঠা আগষ্ট, ১৯১৪—য়ুরোপে মহাসমর বাধিল।

৭ই ও ৯ই মে, ১৯১৫—মহাচীনের প্রেসিডেণ্ট য়ুয়ান্ শি-কাই জাপানের একুশটি প্রস্তাব স্বীকার করিতে বাধ্য হইলেন। এখনও চীন ছাত্রগণ প্রতিবৎসর ঐ দুই দিবস তাহাদের সমগ্র জাতির অপমানসূচক বলিয়া স্মরণ করে।

১৪ই আগষ্ট, ১৯১৭— ইংরাজ-ফরাসীর প্ররোচনায় চীন গভর্মেণ্ট জর্ম্মণি ও অষ্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিল।

২০এ এপ্রিল, ১৯১৯— শানটাং প্রদেশের অন্তর্গত চিনান্ নগরে মহাসভা হয়। চীন চাহিয়াছিল,—তাহাদের আদালতে বিদেশীর বিচার হইবে; শুল্ক সম্বন্ধে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা; বিদেশীর প্রাদেশিক প্রভুত্বের তিরোভাব; বিদেশীর সৈন্য, ডাকঘর, টেলিগ্রাফ, তারহীন বার্ত্তাব্যবস্থা প্রভৃতি উঠাইয়া লওয়া; বিদেশীয়কে ভূমি ও অধিকার দানের প্রত্যাহার। আরও চাহিয়াছিল,

	জর্ম্মণ কবলমুক্ত শান্টং প্রদেশ জাপান চীন্‌কে ফিরাইয়া দিক্। বিজেতৃ শক্তিপুঞ্জ কোনও প্রার্থনা গ্রাহ্য করে নাই। তাই এই সভায় একটা বড় গোছের প্রতিবাদ করা হইল। বহুপূর্ব্বে দুইজন জর্ম্মণ মিশনরিকে হত্যা করা অপরাধে মহাচীনের এই প্রদেশটী জর্ম্মনি খেসারৎ স্বরূপ লইয়াছিল।
৪ঠা মে, ১৯১৯—	পিকিং-এ মহাসভা।
৩রা জুন, ঐ	পিকিং সভায় ছাত্ররা বলিল—ভার্শাইল্ সন্ধিপত্রে সহি করা হইবে না।
১৬ই জুন, ঐ	মহাচীন ছাত্র-সঙ্গ গঠিত হইল।
২৮এ জুন ঐ	চীন গভর্মেণ্ট সন্ধিপত্র স্বাক্ষর করিতে অস্বীকৃত হইলেন।

তা'র পর? সন্ধি হইয়া গেল। জাপানের বিরুদ্ধে চীনের আন্দোলন চলিল। শান্টাং ফিরাইয়া দেওয়া হইল। ইংরাজ পুলিশ শ্যাংহাই-এ এক ছাত্রসভার উপর গুলি চালাইল (৩০এ মে, ১৯২৫)!—সেইদিন হইতে চীনের আক্রোশ ইংরাজের উপর পড়িল।...এখন লয়েড্ জর্জ্জ খৃষ্টান মিশনরির ঘাড়ে সমস্ত দোষ চাপাইতেছেন।

কোথা যাও ?

(১৩২৯)

আজ শরতের আকাশে বাতাসে আগমনীর সুর ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে। বাঙ্গালী হিন্দুর হৃদয়-দেবতা উমারাণীর শুভাগমনবার্ত্তা দিকে দিকে ঘোষিত হইতেছে। বৃষভবাহন শঙ্কর ভোলানাথের কথা ক্ষণেকের জন্য মনে পড়ে। শিব ও শক্তি অর্দ্ধনারীশ্বর, অবিচ্ছিন্ন। এমন কি, শক্তিকে অশিব কল্পনা করা আমাদের পক্ষে অসম্ভব। কিন্তু য়ুরোপে ?

আজ ভাবিতেছি, কে সেই ককুভস্কন্ধ বৃষরূপী দেবতা, যিনি সৃষ্টির আদিম যুগে মোহিনী য়ুরোপাকে অপহরণ করিয়া কোন এক অনির্দ্দেশ্য রহস্য-লোকে অদৃশ্য হইয়াছিলেন। সাগর অতিক্রম করিয়া দ্বীপ হইতে দ্বীপান্তরে, উত্তরে দক্ষিণে পশ্চিমে, ভ্রাতা তাঁহার অন্বেষণ করিলেন; রূপসীর সন্ধান পাওয়া গেল না। বহু যুগ পরে, ফিনীশিয়ায়, মিসরে, ক্রীটে বৃষরূপী দেবতার শত শত পাষাণ-মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া গেল; কিন্তু সেই মোহিনী কোথায় ?

যিনি আজ য়ুরোপা বলিয়া পরিচিতা, তিনি কি সেই দেবভোগ্যা সুন্দরী! বঞ্চিতা, পরিত্যক্তা,—আজ তাঁহার ভাইয়ের কথা মনে পড়ে কি ? তাঁহার সন্তানগণ প্রত্যেকেই নিজেকে দেবতার অংশ বলিয়া গৌরব বোধ করেন; অথচ পরস্পর মর্ম্মান্তিক বিরোধে পরস্পরের প্রতি যে ভাষা প্রয়োগ করিতেছেন, তাহা তাঁহার পরিচিত ছিল না। কলহ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে। তিনি সব দেখিতেছেন, শুনিতেছেন;

কিন্তু নিবৃত্তির কোনও উপায় তিনি ভাবিয়া পাইতেছেন না। যিনি স্বীয় ভ্রাতাকে ছলনা করিয়া উদ্দাম প্রবৃত্তির বশে দেবতার সঙ্গে পথে বাহির হইয়া পড়িয়াছিলেন, তাঁহার পুত্রগণের মধ্যে ছলনা ও বিরোধ যে মূর্ত্তিমান্ অভিশাপের মত দেখা দিবে, ইহাতে তিনি বিস্মিত হইবেন কেন? তিনি ভাবিতেছেন কৈলাস-গেহিনীর কথা···কঠোর ব্রতধারিণী, তপঃক্লিষ্টা উমা কাহাকেও ছলনা না করিয়া বৃষবাহন শিবকে লাভ করিয়াছিলেন······আজ উমার পার্শ্বে লক্ষ্মী সরস্বতী·········আর সুদূর প্রাচ্য দিগন্ত হইতে কোটি কণ্ঠ-নিঃসৃত আগমনী গান ধ্বনিত হইতেছে। বর্ষে বর্ষে এমন গান তাঁহার ছেলেরা কই গায় না ত! যে সভ্যতার তাহারা উত্তরাধিকারী, তাহার মর্ম্মকথা উপলব্ধি করিবার জন্য তাহাদের কোনও আগ্রহ দেখা যায় না ত! শ্মশানবাসিনী উমার লক্ষ্মী আছেন, সরস্বতী আছেন। কিন্তু য়ুরোপের পরিচয় দাঁড়াইয়াছে অলক্ষ্মীর সঙ্গে; আর সমস্ত য়ুরোপীয়ের স্কন্ধে দুষ্ট সরস্বতী চাপিয়াছেন। গো-রূপিণী বাগ্‌দেবতার অনুসরণ করিয়া ভ্রাতা ক্যাডমস্ তাঁহাকে খুঁজিতে খুঁজিতে গ্রীসে আসিয়া না কি বর্ণজ্ঞানহীন গ্রীককে লিপিকলা শিখাইয়াছিলেন; দেবভোগ্যা য়ুরোপা সে দিকে ভ্রূক্ষেপ করেন নাই। আজ সেই লিপি-চাতুর্য্যের ফলে তাঁহার সন্তানগণ পরস্পরের প্রতি যে শব্দভেদী বাণ নিক্ষেপ করিতেছেন, তাহার নিরাকরণের কোনও উপায় দেখা যায় না। প্রাচ্যে আগমনীর গান, আর বিজয়োদ্ধত প্রতীচ্যে বিসর্জ্জনের করুণ সুর! তিনি সব শুনিতেছেন, দেখিতেছেন;—তাঁহার সন্তানগণের ভীষণ দৈন্য ও রিক্ততা সত্ত্বেও কি মত্ততা!

গ্রীক বলিতেছেন,—"থ্রেস্ পরিত্যাগ করিয়া এশিয়া ছাড়িয়া আমি চলিয়া আসিব কেন? আমার রাজকোষ শূন্য; কিন্তু আমি বিনা যুদ্ধে সূচ্যগ্র প্রমাণ ভূমি ছাড়িব না। টাকার সন্ধান করিয়াছিলাম; কিন্তু

কেহই আমাকে ঋণ দিতে স্বীকৃত হইল না। ইংরাজ আমাকে যথেষ্ট সাহস দিয়াছিলেন। বস্‌ফোরস্‌ ডার্ডানেল্‌স্‌এ প্রবেশ করিয়া আমাদের রণতরী তুর্কীনগর বিধ্বস্ত করিবার প্রয়াস পাইল; ইংরাজ তাহাতে আপত্তি করেন নাই। গাজী কেমাল পাশা neutrality'র কথা তুলিলেও সে আপত্তি গ্রাহ্য করেন নাই। কিন্তু যখন টাকা চাহিলাম, ইংরাজ কিছুকাল ইতস্ততঃ করিয়া অবশেষে কথাটা একেবারে চাপা দিলেন। আমাদিগকে টাকা ধার দিবার জন্য যতটুকু সাহসের প্রয়োজন, সেটুকুরও অভাব দেখা গেল। আজ আমাদের দুর্গতির সীমা নাই।"

ইংরাজ বলিলেন—"আজ আমার সাহসের কিঞ্চিৎ অভাব দেখিতেছ? তোমাকে তুর্কীর কবল হইতে মুক্ত করিতে কে অগ্রসর হইয়াছিল? আমাদের জর্জ্জ ক্যানিং না থাকিলে গত শতবর্ষের ইতিহাস তোমাদের কিরূপ দাঁড়াইত একবার ভাবিয়া দেখিয়াছ কি?"

রুশ হাসিয়া উঠিলেন—"তোমাদের ক্যানিং কি গ্রীসকে স্বাধীন করিয়া দিলেন? তুর্কীর বিরুদ্ধে রুশের অভিযান, রণক্ষেত্রে তুর্কীর পরাজয়, সন্ধি-পত্রিকায় গ্রীসের মুক্তির কথা ইংরাজ একেবারে বিস্মৃত হইয়াছেন। অত দিনের পুরাতন প্রসঙ্গ মনে রাখা কিছু শক্ত। যাহা হউক, ক্যানিং পত্র লিখিলেন, আর গ্রীসের ভবিষ্যৎ ইতিহাস অন্যদিকে চালিত হইল,—এ রহস্য মন্দ নয়।"

ইংরাজ অবজ্ঞাভরে ইহার উত্তর দিলেন না। গ্রীকও চুপ করিলেন। রুশ আবার কথা কহিলেন;—এবার তাঁহার কণ্ঠস্বর তীব্র ও কঠোর। "গ্রীস্‌ পশ্চিম এশিয়ার তুর্কী প্রদেশ অধিকার করিবেন ইংরাজের সাহায্যে! তাই স্মার্ণা প্রদেশের নাম পরিবর্ত্তিত হইল; কোন এক বিস্মৃত যাবনিক যুগের নাম স্মরণ করিয়া উক্ত প্রদেশের নাম রাখা হইল—যবনিয়া (Ionia); ইংরাজ জোর করিয়া কিছু বলিতেছেন না। আজ

যখন তুর্কীর গাজী কেমাল পাশা গ্রীক সেনাকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া আনাতোলিয়া হইতে বিতাড়িত করিতেছেন, ইংরাজ আর কিছু করিতে না পারুন, গ্রীক বীর্য্যের ও সৌজন্যের প্রশংসাবাদ করিয়া সকলকে চমৎকৃত করিয়াছেন। আরও চমৎকার ব্যাপার এই যে, রাজকোষ শূন্য হইলেও বিপুল বাহিনী সমভিব্যাহারে রাজা কন্‌ষ্ট্যাণ্টাইন্‌ ইস্তাম্বুল দখল করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন। পুরাকালে এক কন্‌ষ্ট্যাণ্টাইন্‌ যে নগরের প্রতিষ্ঠাতা, আজ আর একজন কন্‌ষ্ট্যাণ্টাইন্‌ তাহা অধিকার করিবেন, ইহাতে বোধ করি ঐতিহাসিক সামঞ্জস্য রক্ষা করা হইবে!”

উত্তেজিত স্বরে গ্রীস বলিলেন—“না, তা কেন? সামঞ্জস্য রক্ষা হইত, যদি পীটরের কন্‌ষ্ট্যাণ্টিনোপাল-স্বপ্ন গত আড়াই শ’ বৎসরের মধ্যে সফল হইত। আজ রুশ তুর্কীর বন্ধু! জর্জ্জিয়া, ককেশিয়া, আর্ম্মেনিয়া অ্যাজার্ব্বাইজান্‌ সম্বন্ধে তুর্কীর সঙ্গে রুশের আদান-প্রদানে যে প্রীতি ও মৈত্রীর পরিচয় পাওয়া যায়, তাহাই আপাততঃ যথেষ্ট মনে না করিয়া স্মার্ণা-প্রদেশের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করা বলশেভিক রুশ সঙ্গত বিবেচনা করিতে পারেন; কিন্তু...”

“রাষ্ট্রবহিষ্কৃত ভেনিজেলোস-এর স্মার্ণা দুঃস্বপ্ন সফল করিবার জন্য ইঙ্গ-ফরাসী-শক্র প্রবাস হইতে প্রত্যাগত কন্‌ষ্ট্যাণ্টাইনের প্রচেষ্টায় ইংরাজের সাহায্য-প্রার্থনা সঙ্গত হইয়াছে বোধ হয়!”

“ভুলিয়া গিয়াছ বোধ করি, গত ১৯১৭ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে গ্রীস ইঙ্গ-ফরাসীর সহিত মিত্রতা সূত্রে আবদ্ধ হইলেন।”

“কিছুই আমি ভুলি নাই। ঠিক সেই সময়ে আমরা রাষ্ট্রবিপ্লবের আবর্ত্তে পড়িয়াছিলাম। যখন তোমার সঙ্গে মিত্রতার কথা ওঠে, আমরা সে কথা শুনিবার অবসর পাই নাই। কিন্তু তোমাকে মিত্রশক্তি বলিয়া গণ্য করিবার কিছু পূর্ব্বে, ঐ ১৯১৭’র এপ্রিল মাসে আমরা ইংরাজ ও

ফরাসীর সহিত মিলিত হইয়া স্মার্ণা ও আদালিয়া প্রদেশ ইটালীকে সমর্পণ করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলাম। আমরা প্রতিশ্রুত হইয়াছিলাম, এ কথা বলিলে হয় ত ঐতিহাসিক সত্যের অপলাপ হইতে পারে। ঘটনাচক্রে আমরা যথাসময়ে উপস্থিত হইয়া চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করিতে পারি নাই। আজ স্মার্ণা সম্পর্কে ইটালীর নামগন্ধ নাই!"

"বল্‌শেভিক্ কর্তৃপক্ষীয়েরা বুঝি রুশিয়া-রাষ্ট্রের প্রাচীন দপ্তরখানা হইতে ঐ সন্ধির ছিন্নপত্রটুকু বাহির করিতে পারিয়াছেন। আর ১৯১৮ খৃষ্টাব্দের ৩০এ ডিসেম্বর ভেনিজেলোস্ ভার্সাইল সন্ধি-বৈঠকে যে memorandum উপস্থাপিত করিয়াছিলেন; স্মার্ণা থ্রেস্ প্রভৃতিতে আমাদের জন্মগত অধিকার বুঝাইয়া দিয়া সম্মিলিত শক্তিপুঞ্জের সম্মতি লইয়া ১৯১৯ খৃষ্টাব্দের মে মাসে যাহার বলে এসিয়া ভূখণ্ডে আমরা সসৈন্যে অবতীর্ণ হইলাম;— তাহার কোনও সন্ধান বোধ করি বল্‌শেভিক্ রুশ রাখেন নাই!"

"একটু একটু রাখি বৈ কি! এশিয়ায় গ্রীকের শুভাগমনের ফলে আর্জরুমে মুস্তাফা কেমালের ইস্‌লাম শক্তি সংহত করিবার চেষ্টা; কনষ্ট্যান্টিনোপল্ গভর্মেণ্টের তরফ্ হইতে ফরিদ্ পাশা কর্তৃক কেমাল্‌কে বিদ্রোহী বলিয়া ঘোষিত করা; কেমালের অ্যাঙ্গোরা গভর্মেণ্ট প্রতিষ্ঠা,— সবই লক্ষ্য করিয়াছি।"

"স্যান্ রেমোয় স্মার্ণা প্রভৃতি কয়েকটি প্রদেশ আমাদিগকে দেওয়া হইবে, ইংরাজ ও ফরাসীর এই প্রতিশ্রুতি সেভ্রে সন্ধিতে বজায় রহিল। ইটালীর কথা বলিতেছ;—তাঁহাকেও বঞ্চিত করা হয় নাই।"

"জানি, তাঁহাকেও বঞ্চিত করা হয় নাই; কিন্তু কেমাল পাশা তোমাদের কোনও সন্ধির কোনও সর্ত্তে আবদ্ধ হইতে সম্মত হইলেন কি? আর ইটালী……"

ইটালী বলিলেন—"বল্‌শেভিকের মুখে আমার নাম কেন?

সোশ্যালিষ্ট বল্‌শেভিকের জ্বালায় আমার মাথা খারাপ হইবার জোগাড় হইয়াছে। এক দিকে communistদিগের ধর্ম্মঘট, অন্যদিকে ফ্যাসিষ্ট-বিভীষিকা ;—নগরে নগরে শ্রমিক-বিদ্রোহ, আর সেই বিদ্রোহদমনের ছলে ফ্যাসিষ্টদিগের ভীষণ অত্যাচার। এই দুইয়ের মাঝখানে পড়িয়া ফ্যাক্টা পদত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। কিন্তু অর্ল্যাণ্ডো অথবা বণমি কোনও ক্যাবিনেট গঠিত করিতে পারিলেন না। অবশেষে ফ্যাক্টা কোনও প্রকারে জোড়াতাড়া দিয়া একটা সোশ্যালিষ্ট-ফ্যাসিষ্ট গভর্মেণ্ট খাড়া করিয়াছেন। কিন্তু তোমরা আমাদের কথা কি বলিতেছিলে ?”

রুশ ও গ্রীক্ সে কথার জবাব দিলেন না। অষ্ট্রীয়া বলিলেন—“আমাকে তোমরা বাধা দিতেছ কেন ? তোমরা কেহ কিছু করিলে না, আমার দুরবস্থার কথা একবারও ভাবিয়া দেখিলে না। ইটালী এইমাত্র আমাকে পরামর্শ দিতেছিলেন যে, তিনি আমাকে টাকা ধার দিবেন। হঠাৎ তিনি উঠিয়া গিয়া গ্রীস ও রুশিয়ার সঙ্গে কথা কহিতে প্রবৃত্ত হইলেন দেখিতেছি। কোথাও টাকা পাওয়া যাইতেছে না......”

ইংরাজ প্রতিবাদ করিলেন। “সাত আট মাস হইল, আমরা তোমাকে বিশ লক্ষ পাউণ্ড দিয়াছিলাম ; যাহাতে তাহার অপব্যবহার না হয়, তাহারও ব্যবস্থা করিয়াছিলাম। খরচের তত্ত্বাবধান করিতে মিঃ ইয়ঙ্গ প্রেরিত হইলেন। কিন্তু আমাদের ষ্টার্লিং-এর সঙ্গে তোমাদের ক্রোণ্ মুদ্রার parity সমতা রক্ষা করিবার চেষ্টা করিতে গিয়া তিনি ভরাডুবি হইলেন। এখন বলিতেছ, কোথাও টাকা পাওয়া যাইতেছে না।”

“বিশ লক্ষ পাউণ্ডে আমাদের দেশের অবস্থা ফিরাইবার চেষ্টায় তোমার বদান্যতা প্রকাশ পাইয়াছিল বটে, কিন্তু আমাদের আসল রোগের নিরাকরণের সম্ভাবনা কিছুমাত্র ছিল না। বিদেশী ধনী শ্রেষ্ঠিগণের চেষ্টায় যদি ভিয়েনাতে একটা বড় ব্যাঙ্ক স্থাপিত হইত, তাহা হইলে আমাদের এ দুর্গতি

হইত না। অধিকাংশ খাদ্যদ্রব্য আমদানি করিতে হয়; কারণ আমাদের জীবনধারণোপযোগী সমস্ত জিনিষ দেশের মধ্যে পাওয়া এখন অসম্ভব। কয়লা আমাদের দেশের খনিজ পদার্থ নহে; বিদেশ হইতে না আনিলে এক দণ্ড চলিবে না। শিল্পকার্য্যের জন্য অধিকাংশ আবশ্যক উপকরণ পাইতে হইলে বিদেশের উপর নির্ভর করিতে হয়। জিনিষ কিনিলে দাম দিতে হইবে; কিন্তু বিক্রেতা আমাদের কাগজের ক্রোণ মুদ্রা লইতে চাহেন না। যুদ্ধের পূর্ব্বে এক ষ্টার্লিং পাউণ্ডের পরিবর্ত্তে চব্বিশটা ক্রোণ্ দিলেই চলিত; এখন কিন্তু দু লক্ষ ক্রোণ্ মুদ্রা দিলেও ষ্ট্যার্লিং-এর সহিত parity রক্ষা করা সম্ভবপর হইতেছে না। সুতরাং বিদেশীয় পণ্যের মূল্য দিতে হইলে আমাকে ডলার অথবা ষ্টার্লিং অথবা চেকোশ্লভাক ক্রাউণ কিনিয়া দাম চুকাইয়া দিবার চেষ্টা করিতে হয়। যত বেশী ডলার অথবা ষ্ট্যার্লিংএর উপর টান পড়িল, তত বেশী দামে তোমাদের ঐ সব বিদেশী মুদ্রা বাজারে কিনিতে হইল; কাজেই অধিক সংখ্যায় কাগজের ক্রোণ মুদ্রিত করিতে হইল। যত বেশী কাগজের মুদ্রা বাজারে ছড়াইয়া পড়িল, তত তাহার দাম কমিয়া যাইতে লাগিল। ক্রোণের দাম যতই কমিয়া যাইতে লাগিল, ততই অধিকসংখ্যক ক্রোণ নোট মুদ্রিত করা আবশ্যক হইল। এমনি করিয়া সমস্তটা চক্রাকারে ঘুরিতে লাগিল। এই circulus vitiosusএর আবর্ত্তে আমরা ঘুরপাক খাইতেছি;—ইহার শেষ কোথায়? তুমি বিস্মিত হইতেছ যে, তোমাদের বিশ লক্ষ পাউণ্ড সেই আবর্ত্তে কোথায় তলাইয়া গেল! একবার স্থির হইয়া বিবেচনা করিতে পারিলে না যে, আমাদের ক্রোণের এই চাঞ্চল্য আমাদের প্রাণান্তকর হইয়াছে; ইহাকে দৃঢ়ভাবে বাজারে ধ্রুব অর্থাৎ stabilise করিতে না পারিলে আমাদের সমস্ত কাযকর্ম্ম, ব্যবসা-বাণিজ্য, আদান-প্রদান অচল হইয়া পড়িবে; আমরা যদি অচল হইয়া পড়ি, তোমরা সচল হইয়া কত

দিন থাকিবে? এই কিছুক্ষণ হইল, ইটালীর সঙ্গে এই বিষয় লইয়া আমার তর্ক-বিতর্ক হইতেছিল। আমি বলিতেছিলাম যে, অগত্যা আমাকে জর্ম্মণীর শরণ লইতে হইবে। ইটালী আপত্তি জানাইলেন; কুটিল ভ্রূকুটি নিক্ষেপ করিলেন; অসমাপ্ত কথা বলিতে বলিতে আমার নিকট হইতে সরিয়া গিয়া গ্রীস ও রুশের সঙ্গে কি কথা বলিতে সহসা ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন। তাই বলিতেছিলাম, আমাকে যখন কেহ এই ঘূর্ণি-চক্রের আবর্ত্ত হইতে উদ্ধার করিতে চেষ্টা করিলেন না, তখন আমার চোখের উপর ভার্সাইল সন্ধিপত্রখানা ঝুলাইয়া রাখায় তোমাদের কাহারও লাভ অথবা পৌরুষ-বৃদ্ধি হইতেছে কি? জর্ম্মণীর সহিত আমাকে মিলিত হইতে দাও না কেন?”

ফরাসী বলিলেন—“কখনই না।”

চেকো-শ্লভাক।—অসম্ভব, হইতে দিব না।

ইটালী।—ছি ছিঃ! ও কথা মুখে আনিও না।

যুগো-শ্লাভ।—দ্রব্যাদি কিনিতে পার না বলিয়া জর্ম্মণীর আনুগত্য স্বীকার করিতে চাহিতেছ? স্পষ্ট করিয়া সব কথা আমাদিগকে পূর্ব্বে জানাও নাই কেন?

অষ্ট্রীয়া।—তোমাকে জানাইব? যদি বলি, তোমার জন্যই আমার আজ এ দশা হইয়াছে! সারাজেভোয় আমার রাজপুত্রকে বলি দিয়া যিনি রণচণ্ডিকার বোধন করিয়াছিলেন, আজ তাঁহার শরণাপন্ন হইব কি করিয়া?

ইটালী।—হাঁ, সে কথা বলিতে পার বটে; কিন্তু আমার কাছে তোমার দুঃখের কথা ভাল করিয়া বল নাই কেন?

অষ্ট্রীয়া।—তোমার ত দেখিতেছি অবসর নাই। এই মাত্র ত কত

কি বলিতেছিল...সোশ্যালিষ্ট, ফ্যাসিষ্ট, ছাইভস্ম ;—আর, তুমি টাইরল পাইয়াছ ; আমার সঙ্গে সম্পর্ক রাখিয়া আর তোমার লাভ কি ?

হঙ্গেরি।—কেন, অষ্ট্রীয়া, তুমিও ত বার্গেনল্যাণ্ড পাইয়াছ, তোমার আর ভাবনা কি ? তোমার জন্যই আমাকে যুদ্ধে ঝাঁপ দিতে হইয়াছিল ; যুদ্ধের অবসানে তোমার বেশী ক্ষতি হইল, না আমার বেশী ক্ষতি হইল ? ভাবিয়া দেখ দেখি একবার সব কথাগুলা। যে রাষ্ট্রের নাম ছিল অষ্ট্রো-হঙ্গেরি, আজ এ দশা তার কে করিল ? ইটালির পিয়াভ্ নদীর তীর হইতে রণে ভঙ্গ দিয়া তোমার আমার প্রত্যাবর্ত্তন ; যুদ্ধস্থগিত-বার্ত্তাও armistice ঘোষণা,—চার বৎসর এখনও পূর্ণ হইয়াছে কি ? কাউন্ট্ টিস্‌যাকে কে খুন করিল ? রাজা কার্ল সুইটজর্ল্যাণ্ডে পলায়ন করিলেন। কাউন্ট্ কেরোলাই একটা ক্যাবিনেট গঠিত করিয়া হঙ্গেরির territorial অক্ষুণ্ণতা রক্ষা করিবার প্রয়াসী হইলেন।

অষ্ট্রীয়া।—আমার territorial integrity রক্ষা করিবার বাসনা কাহারও মনে হইয়াছিল কি ? সহসা আমার রাষ্ট্রদেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া বোহেমিয়া-গ্যালিসিয়া স্বাধীন চেকো-শ্লভাক রাষ্ট্রে রূপান্তরিত হইল।

হঙ্গেরি।—সে ত উইলসনের self-determination নীতির ধুয়া তুলিয়া রাজনীতিজ্ঞেরা সমর্থন করিল ; কিন্তু আমার উত্তরপশ্চিম প্রদেশ কাড়িয়া লইয়া উহারা নিজ রাষ্ট্রদেহের সহিত সংযুক্ত করিয়া দিল কেন ?

অষ্ট্রীয়া।—সব 'কেন'র কি উত্তর আছে ? নবজাত যুগোশ্লাভ রাষ্ট্র আমার অঙ্গচ্ছেদ করিয়া ক্রোশিয়া-শ্লাভোনিয়া অধিকার করিয়া লইল কেন ?

হঙ্গেরি।—সে যেন মনে করা যাইতে পারে, এ ক্ষেত্রে জাতিগত বর্ণগত পার্থক্য আছে। কিন্তু আমার দক্ষিণে বেণাৎ ও বাক্স্কা প্রদেশ কোন্ ছলে চেকো-শ্লভাক কাড়িয়া লইল বল দেখি ! armistice পত্রে

সহি করিতে না করিতে নভেম্বর মাসের মধ্যেই এই সমস্ত ব্যাপার চুকিয়া গেল। মাসকাবার হইতে না হইতেই রুমানিয়া পহেলা ডিসেম্বর ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে, আমার ট্র্যান্সিলভ্যানিয়া প্রদেশটা আত্মসাৎ করিল। তুমি, বোধ হয়, তখন আড়ষ্ট হইয়া বসিয়াছিলে; বার্গেণল্যাণ্ডের উপর নজর দাও নাই। তা'র পর? ১৯১৯এর মার্চ্চ মাসে কেরোলাই-এর পদত্যাগ; বলশেভিক্ বেলাকুণের শুভাগমন ও মস্কোর সহিত প্রীতিবন্ধন; চেকো-শ্লভাক ও রুমানিয়ার যুগপৎ আমাকে আক্রমণ; রাজধানী বুডা-পেস্থে রুমাণীয় সৈন্যের প্রবেশ; বেলা-কুণের পলায়ন; নভেম্বর মাসে রুমাণীয় সৈন্যের বুডা-পেস্থ পরিত্যাগ ও এক দল ন্যাশনাল গার্ড লইয়া অ্যাডমিরাল নিকোলস্ হর্টির নগরে প্রবেশ। হর্টি শাসনকর্ত্তা নির্ব্বাচিত হইলেন ১৯২০ খৃষ্টাব্দের গোড়ায়। আর তোমরা বার্গেণল্যাণ্ড দখল করিয়া লইলে। গত্যন্তর না দেখিয়া হর্টি সম্মতি দিতে বাধ্য হইলেন। আমাদের রহিল কি?"

অষ্ট্রীয়া। তোমার কি আছে! তোমাকে বাঁচাইয়া রাখিবার উপকরণের অভাব আছে কি? দ্রব্যসামগ্রীর খুব বেশী অভাব না থাকার দরুণ তুমি ক্রোণ লইয়া ব্যস্ত হইতেছ না। আর আছে তোমার তীব্র প্রতিহিংসাবৃত্তি। কেবলই ভাবিতেছ, তোমার ভূ-সম্পত্তি পরে লুঠ করিয়া লইয়া দিব্য আরামে বাস করিতেছে; এক দিন ইহার প্রতিশোধ লইতে হইবে। তোমার শিল্পী এই ভাবকে জীবন্ত করিয়া রাখিবার জন্য উত্তরে দক্ষিণে পূর্ব্বে পশ্চিমে যে চারিটি পাষাণ-মূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, তাহারা তোমার সমগ্র ম্যাজ্যার জাতিকে Der Tag "সেই দিন"-এর জন্য প্রতীক্ষা করিয়া থাকিতে বলিতেছে। এত দিন আমরা ইটালির Irredentism লইয়া ব্যস্ত ছিলাম; এখন আবার এই দুর্গতির মধ্যে তোমাদের এই নূতন জিঘাংসাবৃত্তি-প্রণোদিত Irredentism কথা

ভাবিতে হইলে মধ্য য়ুরোপে নূতন বিপ্লবের সৃষ্টি হইবে না কি? তুমি ত তোমার ইতিহাস আমাকে শুনাইলে; আমার এখন অবস্থা এমন যে, আমার কাহিনী শুনাইবার প্রবৃত্তি তিরোহিত হইয়াছে। এখনও তোমাদের বুডা-পেস্থে আমাদের ক্রোণ চলিতেছে; এখনও চেকো-শ্লভাক ও বার্লিন আমাদের ক্রোণ লইতেছে। কিন্তু যেদিন লইতে অস্বীকৃত হইবে!

ইংরাজ।—ঘুরিয়া ফিরিয়া তুমি তোমার ঐ ক্রোণ মুদ্রার কথাই বলিতেছ শুনিতেছি। গত ২৬এ জুলাই তোমার পার্লামেণ্টে স্থির হইয়াছিল যে, একটা বড় নূতন ব্যাঙ্ক স্থাপিত হইবে; সব নোট, সমস্ত কাগজের টাকা সেই ব্যাঙ্ক লইবে; সোনা-রূপার জন্য সমগ্র দেশের উপর একটা জবরদস্ত ঋণভার বসাইয়া দেওয়া হইবে। সে প্রোগ্রামের কি হইল?

অষ্ট্রীয়া।—অন্য সব প্রোগ্রামের যা' হইতেছে, এ ক্ষেত্রেও তাই হইল। ঐ জুলাই মাসেই জর্ম্মণীর Reparation লইয়া একটা বিষম গোলযোগ উপস্থিত হইল;—তিন কোটি বিশ লক্ষ স্বর্ণ মার্ক জুলাই মাসের মধ্যে দিতে সে বাধ্য, নচেৎ তাহার রক্ষা নাই। ভিয়েনায় জর্ম্মণীর যথেষ্ট ক্রোণ পাইবার সুবিধা আছে। সেই creditএর তিনি সদ্ব্যবহার করিলেন। তাঁহার ব্যাঙ্কে প্রচুর ক্রোণ মুদ্রা সঞ্চিত আছে। রাশি রাশি ক্রোণ মুদ্রা লইয়া তিনি ভিয়েনার বাজারে উপস্থিত হইলেন; ডলার, ষ্ট্যার্লিং প্রভৃতি ক্রোণের পরিবর্ত্তে তিনি কিনিলেন। দেখিতে দেখিতে স্বর্ণমুদ্রা এতই মহার্ঘ্য হইয়া গেল যে, এক মাসের মধ্যে ক্রোণ একেবারে অতলে ডুবিয়াছে। এক ষ্ট্যার্লিং পাউণ্ডের পরিবর্ত্তে এক মাস আগে ৬৬০০০ ক্রাউণ দিলেই চলিত; আগষ্ট মাসে প্রথম সপ্তাহে দাঁড়াইল এক লক্ষ পঁয়ষট্টি হাজার ক্রাউণ। পরে দাঁড়াইল আড়াই লক্ষ ক্রাউণ। এ অবস্থায় আমার

পক্ষে ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠার চেষ্টা বৃথা। তোমরা পার; মার্কিণ পারেন। কিন্তু তোমরা নিজের কথা লইয়া এত ব্যস্ত যে, আমার ভালমন্দের সঙ্গে তোমাদের ভাল-মন্দও যে কতকটা জড়িত আছে, তাহা ভাবিতে পারিতেছ না।

ইংরাজ।—তোমরা কেবলই হা-হুতাশ করিতেছ; কিন্তু সঞ্চয় করিবার চেষ্টা কর নাই কেন? দুর্দ্দিনের আশঙ্কা ছিল না। না-ই বা রহিল?

অষ্ট্রীয়া।—আশঙ্কা করি নাই? লয়েড জর্জ্জ যখন আমার ramshackle Empire নষ্ট করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়া তোমাদের পার্লামেণ্টে বক্তৃতা করিলেন, তখন আমরা আমাদের কানে তুলা দিয়া বসিয়া ছিলাম না। আজ তোমার মুখে হিতোপদেশ শুনিয়া আমার এত দুঃখের মধ্যেও হাসি আসে। আমাকে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া নূতন নূতন স্বাধীন রাষ্ট্র গঠিত করিয়া তোমরা নিশ্চিন্ত রহিলে না; আমার অন্য সমস্ত সম্পত্তির উপর তোমরা সকলে এমন একটা দাবি রাখিলে যে, সেগুলা বন্ধক রাখিয়া কাহারও নিকট হইতে কিছু কর্জ্জ লইব, এমন সম্ভাবনা রহিল না। চার বৎসর তোমরা আমাদের customs শুল্ক প্রভৃতি কতকগুলো আয় একেবারে আটকাইয়া রাখিলে; আর কেন আমরা indemnity দিতে পারিতেছি না, তাহার জন্য অনুযোগ দিতে লাগিলে। এত দিন পরে, তোমরা বোধ হয় বুঝিতে পারিয়াছ যে, আমার নিকট হইতে indemnity পাইবার প্রত্যাশা করা বাতুলতা মাত্র। সম্প্রতি তোমরা আমাকে ঐ দুরন্ত পরিহাস হইতে নিষ্কৃতি দিয়াছ; কিন্তু এমন সময়ে দিয়াছ যে, এমন কোনও উত্তমর্ণ দেখিতেছি না, যিনি আমাকে টাকা ধার দিতে অগ্রসর হইতে পারেন। ইটালীর কাছে টাকা ধার চাহিলে, চেকো-শ্লভাক আমাকে ভয় দেখাইতেছেন। আমাদের প্রধান মন্ত্রী ডক্টর সাইপেল চেকো-শ্লভাক সচিবশ্রেষ্ঠ ডক্টর বেনিসএর সঙ্গে পরামর্শ করিলেন; ইটালি আমার প্রতি কুটিল ভ্রূকুটিপূর্ণ বক্রদৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন।

যুগো-শ্লাভ আমার দক্ষিণে দুইটা প্রদেশ হস্তগত করিবার চেষ্টা না কি করিতেছে—

যুগো-শ্লাভ।—মিথ্যা কথা! ষ্টীরিয়া ও করিন্থিয়া আমাদের সহিত মিলিত হইবার জন্য পীড়াপীড়ি করিতেছে; আমরা তাহাতে সম্মত হইব কেন?

অষ্ট্রীয়া—কে মিথ্যাবাদী? ছোট-আঁতাৎ-এর অন্তর্ভুক্ত হইয়া আজ তোমার স্পর্দ্ধা বাড়িয়াছে।

যুগো-শ্লাভ। জেনোয়ার পূর্ব্বে তোমার সুর খুব নরম ছিল; এখন দেখিতেছি একটু পরিবর্ত্তন!

অষ্ট্রীয়া।—জেনোয়ার পূর্ব্বে আমার আশা ছিল; লণ্ডনের পরে আর আমার কোনও আশা নাই। তখন সত্য কথা বলিতেও ইতস্ততঃ করিয়াছি; আজ আর ভয় করিবার কিছু নাই। ষ্টীরিয়া ও করিন্থিয়া তোমার সঙ্গে মিলিত হইবার জন্য তোমাকে পীড়াপীড়ি করিতেছে, এ কথা আমাকে শুনাইতে তোমার মুখে একটু বাধিল না। অথচ তোমরা সকলে খুব ভাল রকমই জান যে, আমার সাতটা প্রদেশই জর্ম্মণীর সহিত মিলিত হইবার প্রস্তাবে ভোট দিয়া সম্মতি প্রকাশ করিয়াছে। বার্লিনে কথাবার্ত্তা চালাইবার জন্য আমার প্রতিনিধি যখন ভিয়েনা হইতে বাহির হইলেন, ইটালী ও যুগো-শ্লাভ, রুমানিয়া ও চেকো-শ্লভাক অস্থির হইয়া উঠিলেন কেন? এই মাত্র একটু আগে এই প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইয়াছিল; সকলে বলিয়া উঠিলেন—না, না, না। এখন তুমি আমাকে বুঝাইতে চাও যে, তোমার সঙ্গে মিলনের জন্য আমাদের কেহ কেহ উৎসুক হইয়াছে। যাহারা বাধ্য হইয়া মিলিত হইয়াছে, তাহাদের সঙ্গে তোমরা কি এতই মিষ্ট ব্যবহার করিতেছ যে, অন্যে তোমাদের রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হইতে আগ্রহ প্রকাশ করিবে? মিথ্যাবাদী কে?

ইংরাজ।—তোমরা কিছু গরম হইয়া উঠিতেছ। তোমরা দু'জনেই দেখিতেছি, বর্ত্তমান অবস্থা ভুলিয়া গিয়াছ। বল্‌কানে অনেক দিন অষ্ট্রীয়ার ও রুষিয়ার প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল; রাষ্ট্রীয় সতরঞ্চের ছক্‌-এর উপর রুষিয়া একটা চাল দিলে অষ্ট্রীয়া আর এক চালে মাৎ করিবার চেষ্টা করিত। তুমি অষ্ট্রীয়া ভাবিতে যে, অন্ততঃ সার্ভিয়া—মণ্টিনিগ্রোর মধ্যে তোমার প্রতাপ প্রবল থাকা উচিত; রুষ স্থির করিলেন, রুমানিয়া ও বুলগেরিয়ার মধ্যে তাঁহার ইঙ্গিতে পররাষ্ট্র সচিব চলিবেন। শেষে একদিন তুমি, অষ্ট্রীয়া ভয় পাইলে। তোমাকে অভয় দিবার জন্য তোমার মিত্রবর উইল্‌-হেল্‌মের বর্ম্মপরিহিত মূর্ত্তির বিভীষিকা আমার এখনও মনে পড়ে; সেই কঠোর বাণী—My place will be beside my ally in shining armour। আজ সমগ্র য়ুরোপ একটা মহা-বলকানে পরিণত হইয়াছে। তুমি ইটালীর সহিত সদ্ভাব স্থাপন করিতে চাও; ছোট আঁতাৎ তাহাতে বাধা দিবে; জর্ম্মণীর সহিত মিলিত হইবার চেষ্টা কর,—আমাদের তাহাতে কিছুমাত্র আপত্তি নাই, কিন্তু ফরাসী ছোট আঁতাৎ ও পোল্যাণ্ড গর্জ্জিয়া উঠিবে। জর্ম্মণী রুষের সঙ্গে র‍্যাপালোয় একটা সন্ধি করিলেন; ফরাসী ক্রুদ্ধ হইলেন, পোল্যাণ্ড ও ছোট আঁতাৎ ভয় দেখাইলেন, কনফারেন্সের মধ্যে রুষ ও জর্ম্মণের দেখ-শুনা বন্ধ হইল। পরস্পরের মিষ্ট-শিষ্ট ব্যবহারের কথা উত্থাপন না হওয়াই ভাল। এ অবস্থায় অন্য কাহাকেও দোষ না দিয়া নিজে সামলাইয়া চলিবার চেষ্টা কর না কেন?

অষ্ট্রীয়া।—কি করিয়া সামলাইব? তুমি আমাকে সঞ্চয় করিবার জন্য উপদেশ দিতেছিলে। তোমার কথা শুনিয়া আমার হাসি আসে। কি সঞ্চয় করিব? খাদ্যদ্রব্য? ধনীরা যদি যুদ্ধের শেষভাগ হইতে প্রচুর খাদ্য সংগ্রহ করিতে চেষ্টা করিত, তাহা হইলে আজ পাঁচ বৎসর

পূর্ব্বে আপামর সাধারণের কি অবস্থা হইত, বল দেখি? তোমাদের গভর্মেণ্টও কড়া আইন করিয়া ঐ প্রকার সঞ্চয় বন্ধ করিয়া দিয়াছিল। উপন্যাসরচয়িত্রী মেরী করেলিকে তোমাদের আদালত শাস্তি দিয়াছিল। টাকা সঞ্চয় করার কথা বলিতেছ? তবে একটা গল্প বলি শুন। যুদ্ধ চলিতেছিল। একজন ধনী বণিক দশ লক্ষ ক্রোণ মুদ্রা রাখিয়া মারা গেলেন। তাঁহার দুই ছেলে। প্রত্যেকে পাঁচ লক্ষ টাকা পাইলেন। ছেলে দুটির মধ্যে একটির স্বভাব-চরিত্র ভাল ছিল; অপরটি উচ্ছৃঙ্খল। ভাল ছেলেটি সেভিংস্ ব্যাঙ্কে সমস্ত টাকা জমা রাখিয়া সুদে জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে লাগিল। ক্রমশঃ ক্রোণের অধঃপতন আরম্ভ হইল। আজ হিসাব করিয়া দেখ, তাহার পাঁচলক্ষ ক্রোণের মূল্য ষ্টার্লিং হিসাবে তিন পাউণ্ডেরও কম দাঁড়াইয়াছে; আর সুদ বাবদে সে দু'শিলিং আন্দাজ পাইতেছে। তাহার দুশ্চরিত্র ভাই সমস্ত টাকা মদ্যপানে উড়াইয়া দিল। খালি বোতলগুলা সে রাখিয়া দিয়াছিল। সম্প্রতি সে সেই বোতলগুলা বিক্রয় করিয়া আশী লক্ষ ক্রোণ পাইয়াছে।

ইংরাজ।—তাই, কয়েক মাস পূর্ব্বে আমি বলিয়াছিলাম, আমাদের য়ুরোপীয় সভ্যতা টল্‌মল্ করিতেছে। ভাল-মন্দের তারতম্য, সঞ্চয়-অপচয়ের উপকারিতা বা অপকারিতা, কিছুই আর বুঝা যাইতেছে না। এখন কে কাহাকে দোষ দিতে পারে? যুদ্ধ শেষ হইল; কিন্তু ঝগড়া মিটিতেছে না।

ফরাসী।—মিটিবে কি করিয়া? এইমাত্র তুমি যে য়ুরোপের Balkanisation-এর কথা বলিলে, তাহাতে বোধ হইল যেন পোলাণ্ড ও আমরা প্রধানতঃ দোষী। পোল্যাণ্ড এদিকে নিজের জ্বালায় অস্থির। পশ্চিমে জর্ম্মণী ও অষ্ট্রীয়া সম্বন্ধে তাহাকে যথেষ্ট সতর্ক হইতে হইয়াছে;

পূর্ব্বে রুষের জন্য সে ব্যস্ত হইয়াছে। তাহার নিজের আভ্যন্তরীণ অবস্থাও এখন এমন নয় যে, সে অন্য কাহারও উপর জুলুম করিতে পারে। মার্শ্যাল পিল্‌সুড্‌স্কির গভর্মেণ্ট প্রায় অচল হইয়াছিল, যখন সেনাপতি কর্ফ্যান্টি প্রধান মন্ত্রী হইলেন।

ইংরাজ।—এই অচলতার কারণ বোধ করি তোমরা জান না; আমরা অন্ততঃ এইটুকু জানি যে, পোঁয়াকারের গভর্মেণ্ট কর্ফ্যান্টিকে যতটা স্নেহের চোখে দেখেন, প্রেসিডেণ্ট পিল্‌সুডস্কিকে ততটা দেখেন না। উভয়ের মধ্যে কেহই যে বিশেষ শান্তিপ্রিয়, এমন নহে। দু'জনেই Militarist ভাবাপন্ন। কিন্তু কর্ফ্যান্টির সাইলেশিয়া অভিযান তোমাদের বেশ মনের মত হইয়াছিল। প্রেসিডেণ্ট যখন দেখিলেন যে কর্ফ্যান্টি প্রধান মন্ত্রী হইবার জন্য ঝুঁকিয়াছেন, অথচ দুজনে এক সঙ্গে কাজ করা অসম্ভব, তখন তিনি পদত্যাগ করিলেন। দিনকতক পোল্যাণ্ডে প্রেসিডেণ্ট, ক্যাবিনেট, প্রধান মন্ত্রী কিছুই ছিল না। প্রেসিডেণ্ট তাঁহাকে প্রধান মন্ত্রী বলিয়া স্বীকার করিলেন না; নিজেও পদত্যাগ করিলেন, কাজেই রাষ্ট্র অচল হইবার জোগাড়। ক্রমে কর্ফ্যান্টির দল ভাঙ্গিয়া গেল। মার্শ্যাল পিল্‌সুডস্কি আবার গদিতে বসিয়াছেন।

ফরাসী।—অদৃষ্টের পরিহাস বই ত নয়! অন্য কোনও দেশের প্রধান মন্ত্রীর দল ভাঙ্গিয়া গেলে য়ুরোপের কল্যাণ হইত।

ইংরাজ। আমিও তাই ভাবিতেছিলাম। কিন্তু প্রেসিডেণ্টের সঙ্গে প্রধান মন্ত্রীর বিরোধ ত সব দেশে হয় না!

ফরাসী।—রাজা ত আর প্রধান মন্ত্রীর উপর রাগ করিয়া সিংহাসন পরিত্যাগ করিতে যাইবেন না; প্রধান মন্ত্রীর দল ভারী ত সব জায়গায় থাকে। রাজ্যরক্ষার জন্য মন্ত্রীকে পরিত্যাগ করা সব দেশেই রাজনীতির অনুমোদিত।

ইংরাজ।—রাজার কথা আনিতেছ কেন? প্রেসিডেণ্ট আর মন্ত্রীর কথা হইতেছে।

ফরাসী।—ওঃ, ভুলিয়া গিয়াছিলাম, তোমরা রাষ্ট্রীয় প্রসঙ্গে রাজার নাম তুলিতে চাও না। প্রেসিডেণ্ট ও প্রধান মন্ত্রীর বিরোধ হইলেই কি অপর রাষ্ট্রের খুব সুবিধা হইবে মনে কর?

ইংরাজ।—সব সময়ে মনে করি না। হইতে পারে যে, 'মহিষের দুই শিং বাঁকা, কিন্তু যুঝিবার সময় একা'।

ফরাসী।—পোঁয়াকারে সরিয়া দাঁড়াইলে তোমরা কি মনে কর ব্রিয়াঁকে পাইবে?

ইংরাজ।—লয়েড জর্জ্জ সরিয়া গেলে, তুমি কি ফ্রান্সবন্ধু লর্ড গ্রে তাঁহার কার্য্যভার গ্রহণ করিবেন আশা কর? নর্থক্লিফ্ ত এখন জীবিত নাই। থাকিলেও···

ফরাসী।—মৃত ব্যক্তির নাম করিয়া পরিহাস করিতেছ কেন? জেনোয়ার পরে তাঁহাকে যেন তোমরা আমাদের সঙ্গে বেশী জড়াইয়া ফেলিতে চেষ্টা করিয়াছিলে। কিন্তু তিনি যে ইংরাজের কত বড় হিতৈষী ছিলেন, তাহা তোমরা ভুলিয়া যাও।

ইংরাজ।—ভাল। তুমি বোধ হয় ভুলিয়া যাও নাই যে, লর্ড নর্থক্লিফের উত্তেজনায় মিঃ অ্যাস্কিথ পদত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন, আর ইংরাজের এত বড় হিতৈষী প্রধান মন্ত্রী হইলেন।

ফরাসী।—জেনোয়া বৈঠকের সময়ে পোঁয়াকারের বার্‌লে-দিউ বক্তৃতা তোমাদের কানে ভাল শুনায় নাই। তোমরা স্পষ্টই বলিয়াছিলে, ঐ রকম বক্তৃতাই ত আন্তর্জাতিক মিলনের প্রধান অন্তরায়। এবার লণ্ডন বৈঠকের প্রাকালে তোমাদের ব্যাল্‌ফোর নোট আমাদের কর্ণে মধুবর্ষণ করে নাই।

ইংরাজ।—হয় ত লর্ড ব্যাল্‌ফোরের যে সব কথা বলিবার ইচ্ছা ছিল, তাহা একটা পত্রের মধ্যে বলা সহজ নয়। কিন্তু তিনি কি করিবেন? মার্কিণ তাহার পাওনা টাকা চাহিয়া বসিল। অগত্যা আমরাও য়ুরোপীয় রাষ্ট্রগুলির নিকট হইতে আমাদের পাওনা টাকা চাহিয়াছি। সব টাকাটাই এখনই দিতে হইবে, এমন কথা বলা হয় নাই। যতটা না পাইলে আমাদের পক্ষে মার্কিণের ঋণ পরিশোধ করা শক্ত হয়, সেইটুকু মাত্র চাওয়া হইয়াছে। আপাততঃ পঁচাশী কোটি পাউণ্ড পাইলেই আমরা মার্কিণের দেনা মিটাইয়া দিতে পারি। পঁচাশী কোটির তিন গুণেরও অধিক টাকা আমাদের পাওনা আছে।

ফরাসী।—তা' সত্য; কিন্তু এমন উপায় রাখ নাই যে, আমরা এ সময়ে তোমার প্রাপ্য টাকা দিতে পারি। জর্ম্মণী চায় দীর্ঘকালের জন্য দেনা দেওয়া বন্ধ রাখিতে; সে রকম moratorium হইলে আমাদের দুর্দ্দশার শেষ থাকিবে না। একে ত ফ্রান্সের দলিত প্রাচ্য প্রদেশগুলার পুনঃ প্রতিষ্ঠার জন্য রাশি রাশি টাকা ঢালিতে হইতেছে; আবার লক্ষ লক্ষ নর-নারীর পেন্সন্‌ আমাদের গভর্ণমেণ্ট জোগাইতেছে; অথচ reparation এর জন্য জর্ম্মণীকে পীড়াপীড়ি করিবার জো নাই; তোমরা ঠিক তাহা পছন্দ করিতেছ না।

ইংরাজ।—অতএব লণ্ডন বৈঠকে কোন্‌ও মীমাংসাই হইল না। আবার একটা কন্‌ফারেন্স চাই? এবার কোথায়? ব্রসেল্‌সে?

ফরাসী।—আমাদের প্রাণ লইয়া টানাটানি; আর তোমরা দিব্য নিশ্চিন্ত মনে মধ্য ও প্রাচ্য য়ুরোপে তোমাদের ব্যবসা-বাণিজ্য বিস্তারের চেষ্টা করিতেছ।

ইংরাজ।—তোমরা তর্জ্জন-গর্জ্জন করিতেছ; কাফ্রিসৈন্য বসাইয়া রাইণ প্রদেশ শাসন করিতেছ; কিন্তু এক একটা কন্‌ফারেন্স ভাঙ্গিয়া

যাইতেছে, আর জর্ম্মণ মার্ক কত নামিয়া যাইতেছে, তাহা দেখিয়াও দেখিতেছ না। মার্ক ছুটিতেছে অষ্ট্রীয়ার ক্রোণের পিছনে, আর ক্রোণ ছুটিতেছে রুষিয়ার রুব্‌লের পিছনে। আর তোমরা reparation, reparation করিয়া গগণ বিদীর্ণ করিতেছ। ব্যবসা-বাণিজ্য-বিস্তারের কথা বলিতেছ ;—আন্তর্জাতিক কারেন্সি যদি বিপর্য্যস্ত হইয়া যায়, তাহা হইলে কে কাহার সহিত ব্যবসা করিবে?

ফরাসী।—কিন্তু যতক্ষণ না জর্ম্মণী আমাদিগকে টাকা দিতেছে, ততক্ষণ আমরা আমাদের ঋণ-পরিশোধের চেষ্টা করিতে পারিব না।

ইংরাজ।—ঋণটা উড়াইয়া দিতে পারিবে না ত? আমরা মার্কিণের কাছে ঋণ করিয়াছিলাম,—তোমার জন্য, ইটালীর জন্য, অপর ছোট ছোট মিত্রশক্তির জন্য। আমরা জামিন হইয়া...

ফরাসী।—মার্কিণের নিকট হইতে টাকা পাইবার সুবিধা করিয়া দিয়াছিলে? মার্কিণ সেক্রেটরি মিঃ মেলো কি বলিয়াছেন, জান ত? তোমার জামিন লইয়া অন্য রাষ্ট্রকে টাকা ধার দেওয়া হয় নাই। তুমি নিজের খরচের জন্য মার্কিণের নিকট হইতে টাকা ধার করিয়াছ।

ইংরাজ।—আমার রাজকোষ শূন্য করিয়া তোমাকে ও অন্যান্য মিত্র শক্তিকে টাকা দিয়াছিলাম; কাজেই মার্কিণের কাছে আমাকে হাত পাতিতে হইয়াছিল। আজ তোমার "তাং" পত্রিকা একটি ইংরাজি বচন উদ্ধৃত করিয়া তোমার গভর্মেণ্টকে উপদেশ দিতেছে যে, যদি ইংরাজ টাকা চায়, তাহা হইলে হাটের মাঝে ফলের বাজরা উল্টাইয়া দাও,—Upset the apple-cart!

ফরাসী।—উত্তেজনা ত' তোমাদের প্রেসের। কাহাকেও দোষ

দিবার আগে নিজের ঘরের দিকে একবার তাকাইয়া দেখ। একটু আগেই আমি বলিতেছিলাম যে, য়ুরোপের Balkanisationএর জন্য তোমরা প্রধানতঃ আমাকেই দোষী সাব্যস্ত করিয়াছ।

ইংরাজ।—আল্‌সাস্ লোরেণের শত শত জর্ম্মণ গৃহস্থকে তাড়াইয়া দিবার ভয় দেখাইয়াছ কি? তাহাদের কি দোষ?

ফরাসী।—দোষ-গুণ বিচার করা আমাদের কাজ নয়। জর্ম্মণীর নিকট হইতে প্রাপ্য আদায় করিতে হইবে। আয়র্লণ্ডের ব্ল্যাক্-অ্যাণ্ড-ট্যান্, ভারতবর্ষের অমৃতসর, যাঁহাদের কীর্ত্তিধ্বজা তুলিয়াছে; তাঁহার আল্‌সাস্ লোরেণের কথা শুনিয়া দোষ-গুণের বিচার করিতে বসেন!

ইংরাজ।—তুমি অ্যাঙ্গোরার বন্ধু!

ফরাসী।—গ্রীক তোমার আদরের তুলাল!

ইংরাজ।—মরক্কো-টিউনিসিয়ার ইংরাজ অধিবাসিগণকে তুমি ফরাসী ন্যাশনাল বলিয়া পরিগণিত করিতে চেষ্টা করিতেছ!

ফরাসী।—মিশরে স্থদানে তোমরা শান্তি স্থাপিত করিতে পার নাই। মরক্কো-টিউনিসিয়া শান্তি বিরাজ করিতেছে। আমরা শান্তি-রক্ষক নহি। ইংরাজকে ন্যাশনাল বলিয়া আইন-হিসাবে আমরা গণ্য করিতে পারি কিনা, তাহা নেশন-সঙ্ঘ (League of Nations) বিচার করুন।

ইংরাজ।—তুমি যদি আমাদের পাওনা টাকা না দাও, তাহা হইলে বাজারে তোমাদের Credit থাকিবে কি?

ফরাসী। সে ভাবনায় তোমাদের নিদ্রা হইতেছে না। বাজারে Credit থাকিবে কি না, ভাবিয়া দেখিবার পূর্ব্বে আমরা জর্ম্মণীর Creditor সে কথা ভুলিয়া যাও কেন?

ইংরাজ। তোমাদের বাজারে Credit না থাকিলে, তোমাদের ফ্রাঙ্ক জর্ম্মণীর মার্কের পিছনে ছুটিবে।

ফরাসী। তোমাদের ষ্টার্লিং অবশ্যই স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিবেনা; সেও ফ্রাঙ্কের পিছনে ছুটিবে।

* * * * *

য়ুরোপ মাথায় হাত দিয়া ভাবিতেছেন। প্রাচ্য-ভুবনের whispering galleryর ভিতর দিয়া আগমনীর স্নিগ্ধ মধুর সুর ধ্বনিত হইয়া আসিতেছে। প্রাচী নব-জীবনের গান গাহিতেছে। কে যেন প্রতীচীকে বলিতেছে, ওগো, কোথায় যাইতেছ! Quo Vadis!

তৃতীয় স্তবক

গীতাঞ্জলি

রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলি বিলাতে প্রকাশিত হইয়াছে; নানা প্রকার আলোচনাও দেখা দিয়াছে। আমাদের দেশে কে কি বলিতেছেন, এখন সে কথার উত্থাপন করিতেছি না। বিলাতের সাহিত্যিক সমালোচকবর্গ কি কথা বলিতেছেন, কবি ইয়েট্‌স মুখবন্ধে কি বলিলেন, তাহাই দেখা যাউক।

ইয়েট্‌স্ বলেন—"the work of a supreme culture;" সুপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক পত্রিকা এথিনিয়মের সমালোচক বলেন—"the product of a century of culture"। এথিনিয়মের কথায় প্রথমটা যেন আমাদের একটু রাগ হয়। এই সব ইংরাজ সমালোচক কি মনে করেন যে, যেদিন হইতে ইংরাজ

বণিকের মানদণ্ড দেখা দিল,
পোহালে শর্ব্বরী, রাজদণ্ড রূপে,

সেইদিন হইতে আমাদের cultureএর সূত্রপাত হইয়াছে? রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলি এই বিদেশী সভ্যতাপ্রসূত cultureএর ফল? ইঁহারা জানেন না যে গীতাঞ্জলি এক শতাব্দীর নহে, বহুশতাব্দীর cultureএর ফল। আমাদের দেশে যখন বৈষ্ণব কবিরা গান গায়িয়াছিলেন; যখন হাটে, মাঠে, ঘাটে সেই সকল গান গীত হইত, তখনকার cultureএর কথা ইঁহারা অবগত নহেন। সে culture বিগত এক শতাব্দীর coterie culture নহে; তাহাই যথার্থ National culture ছিল। সমস্ত জাতির মধ্যে যে ভাব স্ফূরিত হইয়াছিল, তাহাই বৈষ্ণব সাহিত্যে উচ্ছ্বসিত হইয়া বঙ্গের প্রাঙ্গনে প্রাঙ্গনে উদ্বেলিত হইয়াছিল। ইংরাজের যন্ত্রবদ্ধশিক্ষাপ্রণালীতে আমাদিগের মধ্যে যে culture সৃষ্ট হইল, সেটার

সহিত সমস্ত বাঙ্গালী জাতির হৃদয়তন্ত্রী ঝঙ্কৃত হয় নাই; যে সাহিত্য গড়িয়া উঠিল, তাহাতে পুরাতন বাঙ্গলা সাহিত্যের ভাবপ্রবাহ পরিলক্ষিত হয় নাই। পাশ্চাত্য মদ্য প্রাচ্য সাহিত্যভাণ্ডে ফেনাইয়া উঠিল মাত্র; বাঙ্গালী সাহিত্যিক তান্ত্রিকের মত সেই কারণভাণ্ড সম্মুখে রাখিয়া প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের কঙ্কালের উপর উপবেশন করিয়া শবসাধনায় নিযুক্ত হইলেন। সাধনার ফল ফলিল;—শ্মশানের চিতাভস্মের মধ্য হইতে উত্থিত হইল দুর্গেশনন্দিনী, চন্দ্রশেখর, সীতারাম, পলাশীর যুদ্ধ, বৃত্রসংহার, মেঘনাদবধ। বৈষ্ণব কবিদিগের সময় হইতে আরম্ভ করিয়া ভারতচন্দ্র ও রামপ্রসাদ সেনের যুগের মধ্য দিয়া সাহিত্যের যে ভাবপ্রবাহ অপ্রতিহতভাবে চলিয়া আসিতেছিল, হঠাৎ ঈশ্বরগুপ্তের যুগে তাহা শুকাইয়া গেল। সেই বালুতটে নব্যতন্ত্রী কাপালিক পুরাতন ভাবপ্রবাহকে উৎসারিত করিতে চাহিলেন না; তাঁহার হস্তে পাশ্চাত্য শ্যাম্পেন ঢল ঢল করিতে লাগিল। তাঁহার স্নায়ুতরঙ্গে যে আনন্দ হিল্লোলিত হইয়া উঠিল, যন্ত্রবদ্ধশিক্ষাপ্রণালীতে শিক্ষিত মুষ্টিমেয় বাঙ্গালীর হৃদয়েও সে আনন্দ পঁহুছিল; কিন্তু সমস্ত বাঙ্গালী জাতি সাড়া দিল না, নাচিয়া উঠিল না, তালে তালে পা ফেলিল না। সে যে coterie cultureএর জিনিষ, সমগ্র জাতির সহিত তাহার নাড়ির যোগ কোথায়?

আমি এই নব্যতন্ত্রী সাহিত্যরথগণের নিন্দা করিতেছি না। তাঁহারা বাঙ্গালা সাহিত্যকে যে সম্পদ দিয়াছেন, তাহা অমূল্য; যে গৌরবে মণ্ডিত করিয়াছেন, তাহা অপরিমেয়। কিন্তু যখন এই নূতন সাহিত্যলক্ষ্মীটিকে সাত সমুদ্র তের নদীর পারের দেশ হইতে আনয়ন করিয়া আমাদিগের আচার্য্যগণ বঙ্গসারস্বতকুঞ্জে প্রতিষ্ঠিত করিলেন, তখন পুরাঙ্গনাগণ হুলুধ্বনি দেন নাই, বন্দী ও চারণগণের গীত শ্রুত হয় নাই, গ্রামে গ্রামে মঙ্গলশঙ্খ বাজিয়া উঠে নাই।

সে কি বিষম দিন—যখন মনীষী ব্যারিষ্টার মনোমোহন ঘোষ বীটন সোসাইটির (Bethune Society) এক অধিবেশনে দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলিলেন,—আমাদের দেশে যে পাশ্চাত্য শিক্ষা যথার্থ ই প্রসারলাভ করিয়াছে, এমন ত বোধ হয় না; যতদিন না দেখিতেছি যে অশনে, বসনে, ভূষণে আমরা য়ুরোপীয়দিগের মত হইয়াছি, তত দিন পর্য্যন্ত আমরা জোর করিয়া বলিতে পারিনা যে আমরা শিক্ষিত। সিবিলিয়ন রমেশচন্দ্র দত্ত বলিতেন, আমরা প্রতিবৎসরে বাড়ির বারাণ্ডায় দাঁড়াইয়া দেখিতাম বিজয়া দশমীর দিন প্রতিমা গঙ্গাভিমুখে বিসর্জ্জনের জন্য লইয়া যাইত; সর্ব্বসমেত কতগুলি প্রতিমা গেল, তাহাই গণিতাম। যদি দেখিতাম যে পূর্ব্ববৎসরের চেয়ে দু এক খানা কম, তাহা হইলে মনে বড় আনন্দ হইত; বুঝিতে পারিতাম যে ইংরাজি শিক্ষার সুফল হইতেছে।

রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলি কি সেই century of cultureএর ফল? সমাজের সেই বিষম দুর্দ্দিনে কিশোর কবি ভানুসিংহ বৈষ্ণব কবির পদাঙ্ক অনুসরণ করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন, সফলকাম হন নাই।

"বাঁশরি বাজাতে গিয়ে, বাঁশরি বাজিল কই!" রবীন্দ্রনাথ পরে তাহা বুঝিতে পারিয়াছিলেন, তাই পঞ্চাশৎ বর্ষে পদার্পণ করিয়াও তিনি ভানুসিংহের পদাবলীর জন্য গৌরববোধ করেন নাই। কিন্তু আমার বেশ মনে আছে যে পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গালার পল্লিতে পল্লিতে—

গহন কুসুম কুঞ্জমাঝে
মৃদুল মধুর বংশী বাজে

গান শোনা যাইত। ভাগ্যদোষে রবীন্দ্রনাথ এই century of cultureএ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, এই আবহাওয়ায় পড়িয়া তিনি বৈষ্ণব-কবির মধুররস নূতন পাত্রে বণ্টন করিয়া দিতে পারিলেন না; তাঁহার মধ্যে দ্বৈতভাব পরিলক্ষিত হইল; যে দ্বৈতভাবের সহিত বিবেকানন্দ ও

নিবেদিতা প্রাণপণে সংগ্রাম করিয়াছেন, সেই প্রাচ্য প্রতীচ্যের duality'র হাত তিনি এড়াইতে পারিলেন না। তাই—

বাঁশরি বাজাতে গিয়ে, বাঁশরি বাজিল কই ?

তাই এতদিন পরে শ্রীযুক্ত অজিতকুমার চক্রবর্ত্তী, ব্রাউনিং, শেলি, হুইটম্যানের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের কবি হিসাবে filiation সাব্যস্ত করিবার প্রয়াস পাইতেছেন ; পাশ্চাত্য চিন্তা স্রোতের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের ভাবপ্রবাহ কোনও এক জায়গায় আসিয়া মিশিয়াছে, এই রকম একটা কিছু যেন তিনি দেখিতে পাইতেছেন ; এবং সেই হিসাবে জগতের সাহিত্যক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের স্থান নির্দ্দেশ করিবার প্রয়াস পাইতেছেন। ইহার মধ্যে যে আংশিক সত্য নিহিত আছে, তাহা অস্বীকার করা না যাইতেও পারে ; কিন্তু তাহাই যদি সম্পূর্ণ সত্য হইত, তাহা হইলে রবীন্দ্রনাথের দীনতা অত্যন্ত রূঢ়ভাবে আমাদের চক্ষুর সমক্ষে প্রকট হইয়া উঠিত। কিন্তু আমি যে দ্বৈতভাবের কথা বলিলাম, তাহা অনুধাবন করিয়া দেখিলে, এই পাশ্চাত্যভাবপ্রবণতা কবিহৃদয়ে কতটুকু চাঞ্চল্য দান করিয়াছিল, তাহার পরিমাপ করা যাইতে পারে। তাঁহার এই চমৎকার duality 'গোরায়' প্রতিবিম্বিত হইয়াছে। 'গোরা' এই century of cultureএর চরম কাব্য।

বৈষ্ণব কবির বাঁশি রবীন্দ্রনাথের হাতে ঠিক বাজিল না বটে, কিন্তু সে কাহার দোষ ? যে সপ্তস্বরা বীণায় তিনি ঝঙ্কার দিয়াছেন, তাহাতে বিদ্যাপতি চণ্ডীদাসের মধুর রস ফুটিয়া উঠিল না বটে, কিন্তু যে রসধারা উৎসারিত হইয়াছে তাহাতেই সাহিত্যের মরাগাঙ্গে জোয়ার আসিয়াছে। তাহার কণামাত্র পাইয়া দেবকুমার, প্রমথনাথ, মুনীন্দ্রনাথ, রমণীমোহন, যতীন্দ্রমোহন, করুণানিধান, কালিদাস কবি হইয়া উঠিয়াছেন ; কণামাত্র আস্বাদ করিয়া ইংরাজ কবি ইয়েট্‌স্ চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছেন ; ইংরাজ

সাহিত্যসমালোচক একেবারে দু হাজার বৎসর অতিক্রম করিয়া হিব্রু ডেভিড ও সলোমানের গানের কথা স্মরণ করিতেছেন, সমগ্র মধ্যযুগের য়ুরোপীয় সাহিত্যের মধ্যে একমাত্র সেণ্ট ফ্রান্সিসের ভগবৎপ্রেম এই গীতাঞ্জলির ভগবৎপ্রেমের কতকটা কাছাকাছি বলিয়া অনুমান করিয়াছেন। কোথায় রহিল ব্রাউনিং, শেলি, হুইটম্যান? আর সেই duality, সেই প্রাচ্যপ্রতীচ্যের দ্বন্দ্ব ইহার মধ্যে ধরা পড়ে কি?

তাই বলিতেছিলাম, এথিনিয়মের কথায় প্রথমটা যেন আমাদের একটু রাগ হয়; বিদ্রোহী মন বলিয়া উঠে—"নহে, নহে, নহে, কখনই নহে।" কিন্তু যখনই আমি রবীন্দ্রনাথের ভাবপ্রবাহের দ্বৈততরঙ্গের বিষয় স্মরণ করি, তাঁহার মধ্যে প্রাচ্যপ্রতীচ্যের দ্বন্দ্ব দেখি, প্রবীণ কবি রবীন্দ্রনাথ কিশোর কবি ভানুসিংহকে কেন চাপা দিতে চাহিয়াছিলেন তাহা বিশ্লেষণ করিতে চেষ্টা করি, তখনই যেন বুঝিতে পারি এথিনিয়মের শব্দভেদী বাণ লক্ষ্যে পৌঁছিয়াছে; কিন্তু লক্ষ্য বিঁধিতে পারিয়াছে কি? গীতাঞ্জলির মধ্যে সেই দ্বন্দ্বের কোনও আভাস নাই কি? খেয়া ও নৈবেদ্য বিপুল বিশ্বের মানবের সামগ্রী; কিন্তু সেখানে উচ্চ নীচ, প্রাচ্যপ্রতীচ্য, সাদা-কালোর দ্বন্দ্ব ঘুচিয়া গিয়াছে কি? পাশ্চাত্য কবি ইয়েট্স্ যেন কোন স্বপ্নরাজ্যে গিয়া পড়িতেছেন—a world I have dreamed of all my life long। আমাদের সৌভাগ্য যে বাঙ্গালী কবির সহিত ইংরাজের প্রথম পরিচয় এই অধ্যাত্মক্ষেত্রে হইল। তাপস কবির—

এ যে সঙ্গীত কোথা হতে উঠে,
এ যে লাবণ্য কোথা হতে ফুটে,
এ যে ক্রন্দন কোথা হতে টুটে
অন্তরবিদারণ,

তাহা ষ্টপফোর্ড ব্রুক বা ইয়েট্স্ ভাল করিয়া বুঝিতে পারিয়াছেন কি?

তাঁহারা বলেন—বাঙ্গালীর নব অভ্যুদয় হইতেছে; একটা নবীন Renaissance এর ভরা জোয়ারে বাঙ্গালী গা ভাসাইয়াছে। আমরা তাহার ভাষা জানি না; শুধু লোকমুখে এই নবজীবনের বার্ত্তা শুনিয়া চুপ করিয়া থাকিতে হইবে।

এই Renaissance এর কথাটা আমার কেমন কেমন লাগে। যে Renaissance এর য়ুরোপ এত গর্ব্ব করে, সেটা লইয়া এক একবার লাভ লোকসানের খতিয়ান করিতে বসি। সমগ্র মধ্যযুগব্যাপী সাধনার ফলে য়ুরোপ যাহা লাভ করিয়াছিলেন, তাহার অধিকাংশই বর্জ্জন করিয়া সাহিত্যে, চিত্রকলায় ভাস্কর্য্যে pagan সৌন্দর্য্যের প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য তিনি ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন; অধ্যাত্মজীবনের সৌন্দর্য্য যেটুকু অবশিষ্ট ছিল, লুথার তাহা সাবাড় করিয়া দিলেন। সেইদিন হইতে সমগ্র য়ুরোপের মধ্যে সেণ্ট ফ্রান্সিসের মত ভগবদ্ভক্ত পুরুষ দুর্ল ভ হইল। তাই ইংরাজের মনে সেণ্ট ফ্রান্সিসের ভগবৎপ্রেম ব্যতীত আর কাহারও প্রেম রবীন্দ্রনাথের প্রেমের সহিত তুলনীয় হইল না।

আমাদের দেশেও অনেকবার Renaissance দেখা গিয়াছে। যখনই ধর্ম্মের গ্লানি ও অধর্ম্মের অভ্যুত্থান হইয়াছে, তখনই মহাপুরুষের আবির্ভাব হইয়াছে। আমাদের Reniassance এর বৈশিষ্টই ঐ—ধর্ম্মের সহিত তাহার নিবিড় সম্পর্ক। সুন্দর যদি সত্য না হয়, যদি শিব না হয়, তবে তাহা অসুন্দর। ভারতের সাহিত্যে, চিত্রকলায়, ভাস্কর্য্যে গ্রীকদিগের pagan সৌন্দর্য্যের স্থান থাকিতে পারে, কিন্তু সে কখনও ভারতের নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ আত্মাকে প্রকাশ করিবার স্পর্দ্ধা করে না। যে সভ্যতালোক ভারতের তপোবন হইতে বিকীরিত হইয়াছে, যুগে যুগে তাহারই নব নব কিরণসম্পাতে নব নব Renaissance অভ্যুদিত হইয়াছে। ভোগে নহে, ত্যাগে; অর্জ্জনে নহে, বর্জ্জনে; সৌন্দর্য্য-

পিপাসায় নহে, কঠোর সন্ন্যাসে সেই নবজীবনের প্রতিষ্ঠা করিতে হইয়াছে।

তাই ভাবিতেছি, বাঙ্গালী কি একটা নবীন Renaissanceএর ভরা জোয়ারে গা ভাসাইয়াছে? গীতাঞ্জলি দেখিয়া কবি ইয়েট্‌স্ যদি এইরূপ মনে করিয়া থাকেন, তাহা হইলে এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে তিনি ভারতের ঠিক মর্ম্মস্থানে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতে পারিয়াছেন; ভারতের Renaissance এর মূলে সাধকের সাধনা, সন্ন্যাসীর ত্যাগ, যোগীর প্রবুদ্ধ চৈতন্য থাকা চাই। তাই ইংরাজ কবি ভাবিয়াছেন যে যখন বাঙ্গালী কবির হৃদয় হইতে এমন সুন্দর, সরল, গভীর প্রেম উচ্ছ্বসিত হইয়াছে, তখন নিশ্চয়ই বাঙ্গালীর সুপ্ত আত্মা প্রবুদ্ধ হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলিতে গেলে, তিনি "আসিবে সে দিন আসিবে" বলিয়া বহুপূর্ব্বে যে ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছেন, যে দিন "তরুণ তপন নূতন জীবন করিবে বপন," সেই দিন আসিয়াছে।

কিন্তু সত্যই কি আসিয়াছে? রেলওয়ে, কলকারখানা, আপিস জবর-দস্ত প্রাথমিক শিক্ষা, হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়, Industrialism ইত্যাদি হৈচৈ ব্যাপারের মধ্যে আমরা আমাদের হারাণ জিনিষের সন্ধান পাইয়াছি কি? এত বড় প্রকাণ্ড নাট্যশালার মধ্যে তপোবনের "স্বচ্ছ পবন" আমাদিগের সুষুপ্ত আত্মাকে জাগাইয়া তুলিতেছে কি? আমরা নিজেকে সত্যই কি সম্পূর্ণভাবে চিনিতে পারিয়াছি? সমস্ত জাতিটা একটা রঙ্গিন নেশায় মাতিয়া উঠে নাই ত?

এ সকল প্রশ্নের সদুত্তর কেহ দিতে পারিবেন, এমন আশা এখন করি না।

বিলাতের কথা লইয়া এতক্ষণ আলোচনা করিলাম, কিন্তু আসল কথাই বলা হইল না। গীতাঞ্জলি ইংরাজের এত ভাল লাগিল কেন?

হৃদয়দেবতার সম্মুখে দাঁড়াইয়া কবি বলিতেছেন,—

মাতৃস্নেহ-বিগলিত স্তন্য ক্ষীররস
পান করি হাসে শিশু আনন্দে অলস,—
তেমনি বিহ্বল হর্ষে ভাবরসরাশি
কৈশোরে করেছি পান; বাজায়েছি বাঁশি
প্রমত্ত পঞ্চম সুরে; প্রকৃতির বুকে
লালন-ললিত চিত্ত শিশুসম সুখে
ছিনু শুয়ে; প্রভাত-শর্ব্বরী-সন্ধ্যা-বধূ
নানা পাত্রে আনি দিত নানাবর্ণ মধু
পুষ্পগন্ধে মাখা।
আজি সেই ভাবাবেশ
সেই বিহ্বলতা যদি হয়ে থাকে শেষ,
প্রকৃতির স্পর্শমোহ গিয়ে থাকে দূরে—
কোন দুঃখ নাহি। পল্লী হতে রাজপুরে
এবার এনেছ মোরে—দাও চিত্তে বল!
দেখাও সত্যের মূর্ত্তি কঠিন নির্ম্মল!

কঠিন নির্ম্মল সত্যের মূর্ত্তি দেখাইতে হবে, ভক্তি দাও। কিন্তু

যে ভক্তি তোমারে লয়ে ধৈর্য্য নাহি মানে,
মুহূর্ত্তে বিহ্বল হয় নৃত্যগীতগানে
ভাবোন্মাদমত্ততায়, সেই জ্ঞানহারা
উদ্ভ্রান্ত উচ্ছল-ফেন ভক্তিমদধারা
নাহি চাহি নাথ!

"বৈরাগ্যসাধনে মুক্তি, সে আমার নয়।"

গীতাঞ্জলিতে যদি খুঁজিতে যাওয়া যায় বৈষ্ণব কবির সুর অথবা রাম-

প্রসাদ কি অন্য কোনও সাধকের সুর, তাহা হইলে বিফলমনোরথ হইতে হইবে। দাস্য, সখ্য, মধুর রসের সমাবেশ আছে বটে, কিন্তু কতকটা সংযত; ভক্তের অভিমান, আব্দার, জুলুম এখানে নাই।

উপনিষদের কথা তুলিয়া কবি বলিতেছেন,—

তোমারে বলেছে যারা পুত্র হতে প্রিয়,
বিত্ত হতে প্রিয়তর, যা কিছু আত্মীয়
সব হতে প্রিয়তম নিখিল ভুবনে,
আত্মার অন্তরতর, তাঁদের চরণে
পাতিয়া রাখিতে চাহি, হৃদয় আমার!
সে সরল শান্ত প্রেম গভীর উদার,—
সে নিশ্চিত নিঃসংশয়, সেই সুনিবিড়
সহজ মিলনাবেগ, সেই চিরস্থির
আত্মার একাগ্রলক্ষ, সেই সর্ব্ব কাজে
সহজেই সঞ্চরণ সদা তোমামাঝে
গম্ভীর প্রশান্ত চিত্তে, হে অন্তরযামী,
কেমনে করিব লাভ?

গীতাঞ্জলির বিরহ, মিলন ও প্রতীক্ষায় বেশ একটি সংযম আছে; ভক্ত ও ভগবানের মধ্যে যথেষ্ট ব্যবধান আছে। এই সংযম, এই ব্যবধান বৈষ্ণব সাধকদিগের ছিল না; কিন্তু ক্যাথলিক সেন্টদিগের ছিল। তাই মনে হয়, এখানেও রবীন্দ্রনাথ সেই duality'র, সেই প্রাচ্য প্রতীচ্যভাব-দ্বন্দ্বের হাত এড়াইতে পারেন নাই। তাই পাশ্চাত্য পণ্ডিতের মনে গীতাঞ্জলি হিব্রু বাইবেলের অধ্যায়বিশেষের কথা স্মরণ করাইয়া দিয়াছে। তাই বিলাতে উহা অত আদরের সামগ্রী হইয়াছে।

য়ুরোপের আদরের সামগ্রী হইয়াছে, শুধু এই টুকু বলিলেই কি যথেষ্ট

বলা হইল? এইটুকু লইয়াই কি আমরা গৌরব বোধ করিব? এমন song offering আর কোনও বাঙ্গালী কবি কি ভগবানকে গত শতাব্দীর মধ্যে দিতে পারিয়াছেন? যে নৈবেদ্য মাথায় করিয়া লইয়া বঙ্কিম বাবুর সমসাময়িক প্রবীণ সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার আনন্দে নৃত্য করিতে পারেন, তাহার তুলনা আমাদের সাহিত্যে মিলে কি? রূপসনাতন রামানন্দ, জ্ঞানদাসের বৈষ্ণবী প্রীতির কথা উত্থাপন করিবার আবশ্যকতা নাই; বৈষ্ণব কবির সহিত তুলনা করিয়া হয়ত রবীন্দ্রনাথের প্রতি অবিচার করিতেছি। তিনি যে দেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, সেই দেশের মাটির রস তাঁহার সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ভরিয়া গ্রহণ করিয়াছেন; ভারতের যুগ যুগান্তরের জন্মজন্মান্তরের সুখদুঃখপ্রবাহের বিচিত্র বিপুল স্পন্দন তাঁহার হৃদয়বীণায় ঝঙ্কার তুলিয়াছে: তাঁহার ভয় হয়, পাছে তিনি এই বাংলার মাটিতে পুনর্ব্বার জন্মগ্রহণ করিতে না পান; তিনি বলেন "আমি প্রায় রোজই মনে করি, এই তারাময় আকাশের নীচে আবার কি কখনো জন্ম-গ্রহণ করব? আর কি কখনো এমন প্রশান্ত সন্ধ্যাবেলায় এই নিস্তব্ধ গোরাই নদীটির উপর বাংলাদেশের এই সুন্দর একটি কোণে এমন নিশ্চিন্ত মুগ্ধমনে জলিবোটের উপর বিছানা পেতে পড়ে থাকতে পাব? হয়ত আর কোনো জন্মে এমন একটি সন্ধ্যাবেলা আর কখনো ফিরে পাব না। তখন কোথায় দৃশ্য পরিবর্ত্তন হবে—আর, কি রকম মন নিয়েই বা জন্মাব? এমন সন্ধ্যা হয়ত অনেক পেতেও পারি, কিন্তু সে সন্ধ্যা এমন নিস্তব্ধভাবে তার সমস্ত কেশপাশ ছড়িয়ে দিয়ে আমার বুকের উপরে এত সুগভীর ভালবাসার সঙ্গে পড়ে থাক্‌বে না। আমি কি ঠিক এম্‌নি মানুষটি তখন থাক্‌ব! আশ্চর্য্য এই, আমার সব চেয়ে ভয় হয় পাছে আমি য়ুরোপে গিয়ে জন্মগ্রহণ করি।"

আপনাতে আপনি সম্পূর্ণ, আত্মনিমগ্ন, ধ্যানাবস্থিত কবি

ভাবিতেছেন—"এক সময়ে যখন আমি এই পৃথিবীর সঙ্গে এক হয়েছিলুম, যখন আমার উপর সবুজ ঘাস উঠ্‌ত, শরতের আলো পড়্‌ত, সূর্য্যকিরণে আমার সুদূরবিস্তৃত শ্যামল অঙ্গের প্রত্যেক রোমকূপ থেকে যৌবনের সুগন্ধি উত্তাপ উত্থিত হতে থাকৃত—আমি কত দূরদূরান্তর কত দেশদেশান্তরের জল স্থল পর্ব্বত ব্যাপ্ত করে উজ্জ্বল আকাশের নীচে নিস্তব্ধ ভাবে শুয়ে পড়ে থাকতুম, তখন শরৎসূর্য্যালোকে আমার বৃহৎ সর্ব্বাঙ্গে যে একটি আনন্দরস একটি জীবনশক্তি অত্যন্ত অব্যক্ত অর্দ্ধচেতন এবং অত্যন্ত প্রকাণ্ডভাবে সঞ্চারিত হতে থাকৃত, তাই যেন খানিকটা মনে পড়ে।" কত যুগ ধরিয়া এই আনন্দ প্রবাহ চলিয়া আসিতেছে। গীতাঞ্জলিতে সেই আনন্দের নৈবেদ্য লইয়া ভবনদীর খেয়ায় পাড়ি দেওয়া হইয়াছে; সোনার তরী এক প্রকাণ্ড রহস্যাভিমুখে চলিয়াছে! কবি বলিতেছেন—আমি একটা সজীব পিয়ানো যন্ত্রের মত—ভিতরে অন্ধকারের মধ্যে অনেকগুলো তার এবং কলবল আছে—কখন কে এসে বাজায় কিছু জানিনে—কেন বাজে তাও সম্পূর্ণ বোঝা শক্ত—কেবল কি বাজে, সেইটেই জানি—সুখ বাজে কি ব্যথা বাজে, কড়ি বাজে কি কোমল বাজে, তালে বাজে কি বেতালে বাজে এই টুকুই বুঝ্‌তে পারি। আর জানি আমার অক্টেভ নীচের দিকেই বা কতদূর উপরের দিকেই বা কতদূর। না—তাও কি ঠিক জানি?" কবি যেন বলিতেছেন—আমার এই 'রাত্রিদিন ধুকধুক, তরঙ্গিত দুঃখ সুখ"-পূর্ণ বুকের ভিতরে রহস্যময়ের বিচিত্র লীলা যেন কতকটা অনুভব করিতে পারি! যখন আমার জীবন দেবতা রাজার দুলাল আমার ঘরের সমুখ পথ দিয়া চলিয়া গেলেন, আমার বুকের হার ছিঁড়িয়া একটি মণি তাঁহার চরণতলে নিক্ষেপ করিলাম; কিন্তু

মোর হারছেঁড়া মণি নেয় নি কুড়ায়ে,
রথের চাকায় গেছে সে গুঁড়ায়ে,

তবু এই ত্যাগটুকুতেই আমার আনন্দ। যখন তিনি মহারাজের ঐশ্বর্য্যে মণ্ডিত হইয়া গভীর নিশীথে সুপ্ত পুরীর মধ্যে আমার কুটীরদ্বারে আঘাত করিলেন, তখন কোথায় শঙ্খ, কোথায় সিংহাসন! রিক্ত দরিদ্র ভক্তের জীর্ণ আসনে তাঁহাকে উপবেশন করাইলাম। বৈষ্ণব কবির বৈরাগ্যপূর্ণ ভাবোন্মাদের সহিত তুলনা করিয়া দেখিনাই, কিন্তু আমিও কি বালিকাবধূর মত, দাসীর মত, নায়িকার মত তাঁহার প্রেম ভিক্ষা করি নাই? যে দিন তিনি বাসরশয্যার তাঁহার তরবারিখানি রাখিয়া গেলেন, ভক্তিবিনম্রচিতে অবনতমস্তকে আমি সেই দান কি শিরোধার্য্য করিয়া লই নাই?

"জনম অবধি হাম রূপ নেহারিনু
নয়ন না তিরপিত ভেল"

এমন কথা আমি বলিতে পারি না বটে, কিন্তু আমার

ফেলিতে নিমেষ,
দেখা হোলো শেষ,

এই টুকুতেই আমার প্রেম চরিতার্থ হইয়াছে।

লাখ লাখ যুগ হিয়া পর রাখনু,
তবু হিয়া জুড়ন না গেল,

প্রেমের এই তীব্র অতৃপ্তির সৌভাগ্য হইতে হয় ত আমি বঞ্চিত; কিন্তু আমি তাঁহাকেই যেন শতরূপে শতবার দেখিয়াছি ও ভালবাসিয়াছি; সেই শান্ত আনন্দটুকু চিরদিন একমাত্র আমার নিতান্ত আপনার জিনিষ হইয়া আছে।

আর যাহা আছে তাহা প্রকাশের নয়
সখি, বহে যাহা মর্ম্মমাঝে রক্তময়
বাহিরে তা' কেমনে দেখাব!

মাঘ, ১৩১৯।

ছিন্নপত্র

রবিবাবুর 'ছিন্নপত্র' পড়িলে সাধনার কথা মনে পড়ে। তখন সাধনা ও সাহিত্য বাংলার মাসিক পত্রিকার সর্ব্বোচ্চস্থান অধিকার করিয়াছিল। প্রতিমাসে ঐ দুইখানি পত্রিকা আগাগোড়া পড়িত না, এমন শিক্ষিত বাঙ্গালী কলিকাতায় খুব কম ছিল। ছিন্নপত্র ও জীবনস্মৃতি সে দিনের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়. কিন্তু কৌতূহল চরিতার্থ করে না। যাহা বলা হইয়াছে, তাহার চেয়েও আরো অনেক কথা শুনিতে ইচ্ছা করে। কিন্তু এই পত্রাংশগুলি তাঁহার কাব্যজীবনের অংশবিশেষের উপর যে আলোকরশ্মি নিক্ষেপ করিতেছে, তাহার বিচিত্র সৌন্দর্য্য আমাদিগকে মুগ্ধ করে।

১৮৯৪ সালের ২৫শে ফেব্রুয়ারীর পত্রে তিনি লিখিতেছেন 'সাধনার জন্য লিখ্‌তে লিখ্‌তে অন্যমনস্ক হয়ে যাই।" এবার তাঁহার বিলাত-গমনের কিছু পূর্ব্বে একদিন তাঁহাকে সাধনার কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। আমি বলিলাম, "আপনার যখন সাধনা প্রকাশিত হইতেছিল, সে সময় আপনার greatest intellectual expansion হইতেছিল, এই রকমটা আমার বোধ হয়।" রবিবাবু বলিলেন "হ্যাঁ, প্রকৃত পক্ষে তখন আমার সাধনাই ছিল! নৌকার উপরে থাকিতাম। সঙ্গে যে লোক ছিল, সে প্রত্যহ প্রত্যুষে একবাটি ডাল সিদ্ধ করিয়া আমার টেবিলের উপর ঢাকা দিয়া রাখিয়া যাইত। আমি সেই ডালটুকু খাইয়া লিখিতে বসিতাম: সমস্তদিন লিখিতাম; কোনও রূপ চিত্তবিক্ষেপ হইত না। অপরাহ্নে পাঁচটা কি সাড়ে পাঁচটার সময় খানকতক লুচি খাইতাম. তাহার পর বাহিরে 'ইজি' চেয়ারে শয়ন করিতাম; নৌকা নদীর উপরে অশ্রান্তভাবে চলিতে থাকিত। এক sitting এই পাঞ্চভৌতিক ডায়ারি, গল্প, কবিতা অনর্গল

লিখিয়া যাইতাম, ক্লান্তিবোধ করিতাম না। এবার যে আবার নদীবক্ষে কয়দিন বিচরণ করিলাম, মনে হইল, যদি আমাকে সমস্ত বিষয়কর্ম্ম হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া আবার সেই রকম নদীবক্ষে ছাড়িয়া দিতে পারি, তাহা হইলে আবার বোধ হয় সাধনার যুগ ফিরাইয়া আনিতে পারি।”

১৮৮৮ সালের একখানি পত্রে রবিবার লিখিয়াছেন “বঙ্কিমবাবু ঊনবিংশ শতাব্দীর পোষ্যপুত্র আধুনিক বাঙালীর কথা যেখানে বলেছেন কৃতকার্য্য হয়েছেন, কিন্তু যেখানে পুরাতন বাঙালীর কথা বল্‌তে গিয়েছেন, সেখানে তাঁকে অনেক বানাতে হয়েছে। চন্দ্রশেখর, প্রতাপ প্রভৃতি কতকগুলি বড় বড় মানুষ এঁকেছেন (অর্থাৎ তাঁরা সকল দেশীয় সকল জাতীয় লোকই হতে পারতেন; তাঁদের মধ্যে জাতি এবং দেশকালের বিশেষ চিহ্ন নেই) কিন্তু বাঙালী আঁক্‌তে পারেন নি। আমাদের এই চিরপীড়িত ধৈর্য্যশীল, স্বজনবৎসল, বাস্তুভিটাবলম্বী প্রচণ্ডকর্ম্মশীল পৃথিবীর এক নিভৃত প্রান্তবাসী শান্ত বাঙালীর কাহিনী কেউ ভাল করে বলে নি।’ এই প্রসঙ্গে একদিন রবিবাবু আমাকে বলিলেন “যখন বঙ্কিমবাবুর আনন্দ-মঠ প্রথম প্রকাশিত হইল, চন্দ্রনাথ বাবু তৎসম্বন্ধে আমার মত জানিতে চাহিয়াছিলেন; আমিও এক বিস্তৃত সমালোচনা করিয়া পাঠাইলাম, দোষ দেখাইতে একটুও কুণ্ঠাবোধ করি নাই। শুনিয়াছি চন্দ্রনাথ বাবু সেই সমালোচনা বঙ্কিমবাবুকে দেখাইয়াছিলেন। আমি বলিয়াছিলাম, বঙ্কিমবাবু যেখানে individualএর চরিত্র ফুটাইয়া তুলিবার চেষ্টা করিয়াছেন, সেখানেই চমৎকার succeed করিয়াছেন, তাঁহার শক্তির যথেষ্ট পরিচয় দিয়াছেন; কিন্তু যেখানে মানুষের সমষ্টি লইয়া নাড়াচাড়া করিয়াছেন, সেইখানেই সমস্তটা একটা পিণ্ডবৎ তাল পাকাইয়া গিয়াছে, কোনও ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্যরক্ষা করিবার চেষ্টা আদৌ দেখিতে পাওয়া যায় না। তাঁহার নগেন্দ্রনাথ, কৃষ্ণকান্ত, ভ্রমর, গোবিন্দলাল, সজীব স্বতন্ত্র মানুষ;

কিন্তু আনন্দমঠে সমস্ত 'আনন্দ' গুলিই যেন এক রকমেরই। একটা প্রকাণ্ড ideaয় যে বিচিত্র মানবপ্রকৃতিকে revolutionএর মধ্যে নিয়ন্ত্রিত ও কেন্দ্রীভূত করিয়াছে, তাহাদের প্রকৃতিগত পার্থক্য, তাহাদের বিচিত্র কর্ম্মপ্রবাহ, বিচিত্র ভাবপ্রবাহ, নব-নব শক্তির উন্মেষ, যে একটা প্রকাণ্ড ideaর আবর্ত্তে পড়িয়া এক direction এ চলিয়াছে, বঙ্কিমবাবু তাহা দেখাইলেন কই ? কেন তিনি তাঁহার 'আনন্দ' গুলিতে স্বাতন্ত্র্য, ব্যক্তিবৈশিষ্ট্য দিলেন না ? সব সন্ন্যাসীগুলিই কি এক কথা বলিবে, এক রকম কাজ করিবে ? একটা অত বড় revolutionary struggleএ তিনি কি এমনটি দেখাইতে পারিতেন না যে, কেহ organise করিতেছেন, কেহ রসদের ব্যবস্থা করিতেছেন, কেহ দীক্ষা দিতেছেন, কেহ মিস্ত্রীর কাজ করিতেছেন, যাঁহার যেটুকু ক্ষমতা তিনি তাহা এই বিপুল কার্য্যে প্রয়োগ করিতেছেন ; সকলের বিচিত্র শক্তি একই কার্য্যে নিয়োজিত হইতেছে। আমার কাছে এই জন্যই ত সমস্তটা একটা unreal phantasmagoria বলিয়া মনে হয় ; জঙ্গলের মধ্যে এই ছায়াবাজীর কোথাও একটু সমাজের সহিত নাড়ির সংযোগ দেখিতে পাই না। স্বীকার করি, এই সন্ন্যাসীবিদ্রোহ ঐতিহাসিক সত্য ; কিন্তু সেই ভিত্তি-টুকুর উপর বঙ্কিমবাবু যে romanceটি গড়িয়া তুলিলেন, কেন তিনি তাহাতে দেখাইতে চেষ্টা করিলেন না যে, কেমন করিয়া কতকগুলা লোক অল্পে অল্পে তিলে তিলে সাংসারিক সমস্ত বিচ্ছেদ ব্যবধান অপসারিত করিয়া একটা ideaয় অনুপ্রাণিত হইয়া পাশাপাশি আসিয়া দাঁড়াইল! একেবারে সমস্তটা খাড়া করিয়া আমাদের চোখের সামনে ধরিলেন। কত অত্যাচার উৎপীড়ন, কত বেদনা, কত নিস্ফল প্রয়াসের ভিতর দিয়া এই বিপ্লববীজ অঙ্কুরিত হইল, তাহার আভাষমাত্রও পাইলাম না। একেবারে বিদ্রোহের ছবি, সংসার হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন। মনে

রাখিবেন, আমি সাহিত্যহিসাবে সমালোচনা করিতেছি। দেবীচৌধুরাণী-তেও এই দোষ দেখিতে পাই।” রবিবাবু একটু হাসিলেন। আমি বলিলাম ‘রাজসিংহ আপনার খুব ভাল লাগিয়াছিল; সাধনায় আপনি যে সমালোচনা করিয়াছিলেন, সেটি ত একটি খণ্ডকাব্যবিশেষ।” তিনি বলিলেন “চষামাঠের উপর দিয়া পাল্কি চড়িয়া যাইবার সময় রাজসিংহ পড়িয়াছিলাম বড় ভাল লাগিয়াছিল; কিন্তু দুঃখের বিষয় বঙ্কিমবাবু তখন মৃত্যুশয্যায়, আমার সমালোচনা পড়িতে পান নাই; আমার কৃষ্ণচরিত্রের সমালোচনা ও তাঁহার পড়া হয় নাই।“

বঙ্কিমবাবুর কথা এই ছিন্নপত্রে ও জীবনস্মৃতিতে এত অল্প বলা হইয়াছে যে, আমার diary হইতে আরো একটি উদ্ধৃত করিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিতেছি না। একদিন কথাপ্রসঙ্গে আমাকে বঙ্কিমবাবু বলিলেন, রবিবাবু, “আপনি (বঙ্কিমবাবু বরাবর আমাকে আপনি বলিয়া সম্বোধন করিতেন) শশধর তর্কচূড়ামণির বক্তৃতা শুনিয়াছেন?” আমি বলিলাম—‘না’। তিনি বলিলেন—‘শুনিবেন। তাহাতে জিনিষ আছে। আপনি আমার বাড়ীতে আসিবেন, এইখানেই তাঁহার কথাবার্ত্তা শুনিবার সুবিধা আপনার হইতে পারিবে।’ কিন্তু শীঘ্রই এইখানেই দেখিতে পাইলাম যে বঙ্কিমবাবুর admiration বড় বেশীদিন স্থায়ী হইল না। ‘কৃষ্ণচরিত্র’ রচয়িতার সহিত তর্কচূড়ামণির মিলন স্থায়ী হইতে পারে না। একবার এলবার্ট হলে আমি তাঁহার বক্তৃতা শুনিতে গিয়াছিলাম। তিনি বুঝাইতে চাহেন যে, উপনিষদের ভূমার পূজায় মানবহৃদয় উদ্দীপিত হয় না। এইটি বুঝাইতে গিয়া তিনি এক গল্পের অবতারণা করিলেন। রাজার হুকুম হইল রাত্রে বিনা আগুণে টিকে ধরাইতে হইবে, আলো চাই; কোথায় আলো! ঘরের বাহিরে ফুটফুটে চাঁদের আলো; টিকে সে আলোয় ধরাইবার চেষ্টা করা হইল, চেষ্টা ব্যর্থ হইল। রাজা আজ্ঞা করিলেন,

—আরো খানিকটা অগ্রসর হইয়া যাও, দেখদেখি টিকে ধরে কি না। এগিয়ে গিয়ে আবার টিকে ধরাইবার চেষ্টা করা হইল, চেষ্টা ব্যর্থ হইল; যতই এগিয়ে যাওয়া যায়, টিকে কিছুতেই ধরে না। তেম্নি যাহা infinityতে অবস্থিত, উপনিষদের ভূমা, সে কি কখনও মানুষের হৃদয়ে আগুন ধরাইতে পারে ?—দেখুন ধর্ম্মের একটা অবস্থা আসে, যখন সাধারণ লোকের বিশ্বাসগুলি আর স্বাভাবিক থাকে না, যখন সেগুলিকে জোর করিয়া তর্কে ও যুক্তিতে খাড়া করিতে চেষ্টা করা হয়; তখন মানুষ কতকটা জাগ্রত হইয়াছে, কতকটা বুঝিতে পারিয়াছে, যে প্রাণহীন আচার ব্যবহারের উপর যে আঘাত আসিয়া পড়িয়াছে, সেই আঘাত হইতে তাহাকে বাঁচাইতে হইলে যুক্তিতর্কের আবশ্যক ; তখন বুঝিতে হইবে সেই সকল মন্ত্রতন্ত্র আচারব্যবহার অনুষ্ঠানের দিন ফুরাইয়া আসিয়াছে। সকল দেশের ইতিহাসেই এইটি প্রত্যক্ষ করা যায়।"

কিন্তু যদি সেই সকল মন্ত্রতন্ত্র আচারব্যবহার অনুষ্ঠান আমাদের আনন্দ জাগাইয়া তোলে যাহার স্পন্দন ভূমাপর্য্যন্ত পৌঁছিতে পারে, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে এখনও সেগুলি প্রাণহীন হয় নাই। ১৮৯৪ সালের ৫ই অক্টোবরের পত্রে দেখি—"আজ সকালের বাতাসে অতি ঈষৎ শীতের সঞ্চার হয়েছে, একটুখানি শিউরে ওঠার মত। কাল দুর্গোৎসব; আজ তার সুন্দর সূচনা। ঘরে ঘরে দেশের লোকের মনে যখন একটা আনন্দ প্রবাহিত হচ্ছে, তখন তাদের সঙ্গে আমার ধর্ম্মসংস্কারের বিচ্ছেদ থাকা সত্ত্বেও সে আনন্দ মনকে স্পর্শ করে। পশু´ দিন স—র বাড়ি যাবার সময় দেখেছিলুম রাস্তার দুধারে প্রায় বড় বড় বাড়ির দালানমাত্রেই প্রতিমা তৈরি করা হচ্চে। দেখে আমার মনে হল, দেশের ছেলেবুড়ো সকলেই দিনকয়েকের জন্যে ছেলেমানুষ হয়ে উঠে একটা বড় গোছের খেলায় লেগে গেছে। ভেবে দেখতে গেলে আনন্দের আয়োজন মাত্রই

পুতুলখেলা—অর্থাৎ তাতে আনন্দ ছাড়া আর কোনো উদ্দেশ্য নেই, লাভ নেই—বাইরে থেকে দেখে মনে হয় সময় নষ্ট। কিন্তু সমস্ত দেশের লোকের মনে যাতে একটা ভাবের আন্দোলন এনে দেয়, তা কি কখনো নিষ্ফল হতে পারে? সমাজের মধ্যে কত লোক আছে, যারা নীরস বিষয়ী লোক—এই উৎসবে তাদেরও মন একটা সর্ব্বব্যাপী ভাবের টানে বিচলিত হয়ে সকলের সঙ্গে মিলে যায়। এমনি করে প্রতিবৎসর কিছু কালের জন্য মনের এমন একটি অনুকূল আর্দ্র অবস্থা আসে, যাতে স্নেহ প্রীতি দয়া সহজে অঙ্কুরিত হতে পারে; আগমনী বিজয়ার গান, প্রিয়সাম্মিলন, নহবতের সুর, শরতের রৌদ্র এবং আকাশের স্বচ্ছতা সমস্তটা মিলে মনের মধ্যে আনন্দকাব্য রচনা করে। ছেলেদের যে আনন্দ, সেইটেই বিশুদ্ধ আনন্দের আদর্শ। তারা তুচ্ছ উপলক্ষকে নিয়ে নিজের মন দিয়ে ভরে তোলে, সামান্য কদাকার পুতুল নিয়ে তাকে নিজের ভাব দিয়ে সুন্দর ও প্রাণ দিয়ে সজীব করে তোলে। এই ক্ষমতাটা যে লোক বড় বয়স পর্য্যন্ত রাখতে পারে, সেই ত ভাবুক। তার কাছে চারিদিকের বস্তু কেবল বস্তু নয়—দৃষ্টিগোচর বা শ্রুতিগোচর নয়, কিন্তু ভাবগোচর—তার সমস্ত সঙ্কীর্ণতা সে একটি সঙ্গীতের দ্বারা পূর্ণ করে নেয়। দেশের সমস্ত লোক ভাবুক হতে পারে না; কিন্তু এই রকম উৎসবের সময় ভাবস্রোত অধিকাংশ লোকের মনকে অধিকার করে। তখন যেটাকে দূরে থেকে সামান্য পুতুল বলে মনে হয়, কল্পনায় মণ্ডিত হয়ে তার সে মূর্ত্তি থাকে না।”

এখানে সাম্প্রদায়িকতা কবিহৃদয়কে আচ্ছন্ন করিতে পারে নাই। কেহ কেহ মনে করিতে পারেন—সে আজ উনিশ বৎসরের কথা তখন রবিবাবু মন্ত্রতন্ত্রে আনন্দ পাইতেন, এখন অচলায়তনের দিনে তাঁহার পরিবর্ত্তন হইয়াছে। ১৩১৮ সালের ৭ই অগ্রহায়ণ তারিখে কথাপ্রসঙ্গে

আমি তাঁহাকে বলিলাম—আপনার 'অচলায়তন' সম্বন্ধে রামেন্দ্রবাবু বলেন যে, যাঁহারা মনে করেন যে আপনি হিন্দুয়ানিকে আক্রমণ করিয়াছেন, তাঁহারা অত্যন্ত ভুল বুঝিয়াছেন। গায়ত্রী কি অন্য কোনও বৈদিক মন্ত্রের উপর কটাক্ষ করা হয় নাই; যেটাকে আঘাত করা হইয়াছে, সেটা নির্ভাজ বৌদ্ধতান্ত্রিক ব্যাপার। ঐ তোটয় তোটয় মন্ত্র, ঐ একজটা দেবী, ও সব হিন্দুর কোন কালেই ছিল না, ও সব বৌদ্ধতন্ত্রের অন্তর্গত; তবে যদি কেহ মনে করেন যে আমাদের হিন্দুধর্ম্মে আঘাত লাগিয়াছে, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে ঐ বৌদ্ধ ক্রিয়াকলাপ হিন্দুধর্ম্মের অঙ্গীভূত হইয়া যাওয়ার দরুণ আঘাতটা হিন্দুয়ানির গায়ে গিয়া লাগিয়াছে। রবিবাবু বলিলেন—"ঠিকই ত। আমি কি গায়ত্রীমন্ত্রকে উপহাস করিতে পারি? সে যে আমার নিজেরই মন্ত্র, আমার নিজের জিনিব। অন্যে কি মনে করেন বলিতে পারি না, কিন্তু আমার মনে, হয় এই গায়ত্রীমন্ত্রে ভগবৎ-সাধনা ভারতবর্ষের বিশেষত্ব। দেখুন, এক একজন ঋষি আজীবন তপস্যা ও কৃচ্ছ্রসাধন করিয়া তাঁহাদের সমস্ত wisdom এক একটি মন্ত্রের কয়েকটী কথায় সঞ্চিত ও সংহত করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। আমাদের সমস্ত জীবনে চেষ্টা হওয়া উচিত যে সে সেই মন্ত্রকে অল্পে অল্পে হৃদয়ঙ্গম করা, তাহাকে সম্পূর্ণভাবে আয়ত্ত করা, আমাদের জীবনের মধ্যে ব্যাপকভাবে ছড়াইয়া দেওয়া; তবে ত সেই মন্ত্রের সার্থকতা আমরা উপলব্ধি করিতে পারিব। আমার সমালোচকেরা গায়ত্রীমন্ত্র জপ করেন কি না জানি না; কিন্তু আমি আমার উপনয়নের সময় পিতৃদেবের নিকট যে গায়ত্রীমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছিলাম, সেই মন্ত্রসাধনে আমি যে কতদূর উপকৃত হইয়াছি, তাহা আপনাকে কি বলিব। আমি কি সেই মন্ত্রের নিন্দা করিতে পারি!" ছিন্নপত্রে দেখিতে পাই যে এই উপনয়নের স্মৃতি তাঁহার মনে আনন্দই জাগাইয়া তোলে। ১৮৯৪ সালের ২৭শে জুন তারিখের পত্রে দেখিতে পাই যে "যখন

পৈতের নেড়া মাথা নিয়ে প্রথমবার বোলপুরের বাগানে গিয়েছিলুম” সেই কথা স্মরণ করিয়া কবি পুলকিত হইতেছেন।

শেষোক্ত চিঠিতে তিনি ছোট গল্প লেখার আনন্দের কথার উল্লেখ করিয়াছেন। “আজকাল মনে হচ্চে, যদি আমি আর কিছুই না করে ছোট ছোট গল্প লিখ্‌তে বসি, তা হলে কতকটা মনের সুখে থাকি, এবং কৃতকার্য্য হতে পারলে হয়ত পাঁচজন পাঠকেরও মনের সুখের কারণ হওয়া যায়। গল্প লেখবার একটা সুখ এই, যাদের কথা লিখব তারা আমার দিনরাত্রির সমস্ত অবসর একেবারে ভরে রেখে দেবে, আমার একলা মনের সঙ্গী হবে, বর্ষার সময় আমার বদ্ধঘরের সঙ্কীর্ণতা দূর করবে, এবং রৌদ্রের সময় পদ্মাতীরের উজ্জ্বল দৃশ্যের মধ্যে আমার চোখের পরে বেড়িয়ে বেড়াবে। আজ সকাল বেলায় তাই গিরিবালা নাম্নী উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ একটি ছোট অভিমানী মেয়েকে আমার কল্পনারাজ্যে অবতরণ করা গেছে।......আজ গিরিবালা অনাহূত এসে উপস্থিত হয়েছেন, কাল বড় আবশ্যকের সময় তাঁর দোদুল্যমান বেণীর সূচ্যগ্রভাগটুকুও দেখা যাবে না। কিন্তু সে কথা নিয়ে আজ আন্দোলনের দরকার নেই। শ্রীমতী গিরিবালার তিরোধান সম্ভাবনা থাকে ত থাক—আজ যখন তাঁর শুভাগমন হয়েছে তখন সেটা আনন্দের বিষয় সন্দেহ নেই।” ঠিক একটি বৎসর পরে রবিবাবু লিখিতেছেন “বসে বসে সাধনার জন্যে একটা গল্প লিখ্‌চি—খুব একটু আষাঢ়ে গোছের গল্প। একটু একটু করে লিখ্‌চি এবং বাইরের প্রকৃতির সমস্ত ছায়া আলোক বর্ণ আমার লেখার সঙ্গে মিশে যাচ্চে। আমি যে সকল দৃশ্য লোক ও ঘটনা কল্পনা করচি তারই চারিদিকে এই রৌদ্র-বৃষ্টি, নদীস্রোত এবং নদীতীরের শরবন, এই বর্ষার আকাশ, এই ছায়াবেষ্টিত গ্রাম, এই জলধারাপ্রফুল্ল শস্যের ক্ষেত ঘিরে দাঁড়িয়ে তাদের সত্যে ও সৌন্দর্য্যে সজীব করে তুল্‌চে! কিন্তু পাঠকেরা এর অর্দ্ধেক জিনিষও

পাবে না। তারা কেবল কাটা শস্যই পায়, কিন্তু শস্যক্ষেত্রের আকাশ বাতাস, শিশির এবং শ্যামলতা সমস্তই বাদ পড়ে যায়। আমার গল্পের সঙ্গে যদি এই মেঘমুক্ত বর্ষাকালের স্নিগ্ধরৌদ্ররঞ্জিত ছোট নদীটী এবং নদীর তীরটী এই গাছের ছায়া এবং গ্রামের শান্তিটি এমনি অখণ্ডভাবে তুলে দিতে পারতুম, তা হলে সবাই তার সত্যটুকু একেবারে, সমগ্রভাবে এক-মূহূর্ত্তে বুঝে নিতে পারত। অনেকটা রস মনের মধ্যেই থেকে যায়, সবটা পাঠককে দেওয়া যায় না। যা নিজের আছে, তাও পরকে দেবার ক্ষমতা বিধাতা মানুষকে সম্পূর্ণ দেন নি।"

বিধাতা কতটুকু ক্ষমতা বাংলার শ্রেষ্ঠ গল্পলেখককে দিয়াছেন, তাহার পরিমাপ করিবার প্রবৃত্তি আমার নাই। তাঁহার লেখায় "বস্তুতন্ত্রতা" প্রবল কি 'মায়িকতা" প্রবল, তাহার ওজন করিবার ভার শ্রীযুক্ত বিপিন-চন্দ্র পাল ও শ্রীযুক্ত অজিতকুমার চক্রবর্ত্তী লইয়াছেন। আমি আপাততঃ শুধু বাহিরের স্থূল ব্যাপারটির আলোচনা করিতেছি। একদিন কথা-প্রসঙ্গে আমি রবিবাবুকে বলিলাম,—"টেনিসনের princess গল্পটি যেন কয়েকজন বন্ধু মুখে মুখে রচনা করিলেন। একজন আরম্ভ করিলেন; খানিক দূর অগ্রসর হইয়া তিনি আর একজনকে বলিলেন, এইবার তুমি গল্পটা চালিয়ে যাও; দ্বিতীয় ব্যক্তি থামিলে, আর একজন গল্পটাকে আরো খানিকটা অগ্রসর করিয়া দিলেন; এই রকম করিয়া যেন গল্পটি রচিত হইয়াছে। কিন্তু বাস্তবিক আগাগোড়াই কবি লিখিয়াছেন। আপনিও নাকি ঐ রকম গল্পরচনার চেষ্টা করিয়াছিলেন?" তিনি বলিলেন,—"হাঁ, আমি অনেকবার চেষ্টা করিয়া দেখিয়াছি, কিন্তু কখনই মনের মত হইল না। আমি আরম্ভ করিয়া দিতাম, কিন্তু বন্ধুরা গল্পটিকে এমন করিয়া দাঁড় করাইতেন যে, আমার মনে হইত সমস্তটা মাটি হইয়া গেল। দার্জ্জিলিংএ একদিন কুচবিহারের মহারাণী বলিলেন,—"আসুন, সকলে

মিলিয়া একটা গল্প রচনা করা যাক্, আগে আপনি আরম্ভ করুন।" আমি আমাদের বাঙ্গালী সমাজ-ছাড়া একটা romantic গল্পের অবতারণা করিবার প্রয়াসে বলিলাম,—"আচ্ছা বেশ।" এই বলিয়া আরম্ভ করিয়া দিলাম,—"দার্জ্জিলিংএ ক্যালকাটা রোডের ধারে ঘন কুজ্ঝটিকার মধ্যে বসিয়া একটি হিন্দুস্থানী রমণী কাঁদিতেছে।" এই বলিয়া আমি ছাড়িয়া দিলাম। কিন্তু দেখিলাম গল্পটা অন্যের মুখে অগ্রসর হইতে চাহিল না। অগত্যা আমাকেই সমস্তটা রচনা করিয়া লইতে হইল। এই রকম করিয়া আমার 'দুরাশা' গল্পটি রচিত হইয়াছে।·········কুচবিহারের মহারাণী ভূতের গল্প শুনিতে বড় ভালবাসিতেন। আমায় বলিতেন, আপনি নিশ্চয়ই ভূত দেখিয়াছেন, একটি ভূতের গল্প বলুন।—আমি যতই বলিতাম যে, আমি ভূত দেখি নাই, তিনি ততই মাথা নাড়িতেন; বলিতেন 'না, কখনই না; নিশ্চয়ই আপনি ভূত দেখিয়াছেন।'—অগত্যা আমাকে একটা ভূতের গল্পের অবতারণা করিতে হইল,—ভাঙ্গা পোড়ো বাড়ী, কঙ্কালের খট্‌খট্ শব্দ, এই সমস্ত অবলম্বন করিয়া আমি মণিমালিকার গল্পটি তাঁহাকে শুনাইলাম। গল্পটি তাঁহার বড় ভাল লাগিয়াছিল। একদিন Woodlandsএ নিমন্ত্রণরক্ষা করিতে গিয়াছিলাম; নাটোরের মহারাজও তথায় উপস্থিত ছিলেন। খাওয়া দাওয়ার পর মহারাণী বলিলেন— "রবিবাবু, এইবার আপনি একটি ভূতের গল্প বলুন; আপনি যে ভূত দেখেন নাই, তা হ'তেই পারে না, আপনাকে ভূতের গল্প বলিতেই হইবে।" অগত্যা আমি বলিলাম,—"আচ্ছা তবে একটা ঘটনা বলিতে পারি; নাটোরের মহারাজ সেই ঘটনা কতকটা অবগত আছেন, তিনি এ সম্বন্ধে কতকদূর পর্য্যন্ত সাক্ষ্য দিতে পারেন। একদিন নিমন্ত্রণপার্টি হইতে ফিরিতে অনেক রাত হইল; নাটোরের মহারাজ বলিলেন,— "রবিবাবু, আমার গাড়ি প্রস্তুত, আসুন, আপনাকে বাড়ি পৌঁছাইয়া

দিয়া যাইতে পারিব। অনেকদূর গিয়া আমি মহারাজের গাড়ি হইতে অবতরণ করিলাম; বলিলাম কোথায় আপনার বাড়ি, আর কোথায় জোড়াসাঁকোয় আমার বাড়ি; অত ঘুরিয়া যাওয়া আপনার পক্ষে নিশ্চয়ই অত্যন্ত অসুবিধাজনক; আমি এইখান হইতে একখানা ভাড়াটিয়া গাড়ি করিয়া বাড়ি যাইতে পারি। মহারাজের সনির্ব্বন্ধ নিষেধ আমি মানিলাম না, কিন্তু পরে অনুতাপ করিতে হইয়াছিল।" ......এই পর্য্যন্ত বলিয়া আমি একটু থামিলাম। মহারাণী সোৎসুকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"তা'রপর ?' আমি বলিলাম—একখানা মাত্র ভাড়াটীয়া গাড়ি রাস্তার চৌমাথায় দাঁড়াইয়াছিল। গাড়োয়ানকে বলিলাম, জোড়াসাঁকোয় অমুক জায়গায় আমায় লইয়া চল। সে কিছুতেই রাজি হইল না। নাটোরের মহারাজ তখন তাহাকে ধমক দিয়া বলিলেন—ভাড়াটিয়া গাড়ির টিকিট লইয়া এখানে রহিয়াছ, নিশ্চয়ই যাইতে হইবে, নহিলে পুলিশের হাতে দিব। এই বলিয়া তাহার গাড়ির নম্বর নোট করিয়া লইলেন। পুলিশের ভয়ে সে রাজি হইল। আমি গাড়ির ভিতরে প্রবেশ করিয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিলাম। মহারাজ চলিয়া গেলেন। আমি নিশ্চিন্ত মনে বসিয়া রহিলাম। গাড়ি চলিতে লাগিল; খানিকক্ষণ পরে বুঝিতে পারিলাম যে আমার পরিচিত বড় রাস্তা দিয়া গাড়ি চলিতেছে না, অপরিচিত অন্ধকার গলির ভিতর দিয়া গাড়োয়ান গাড়ি হাঁকাইয়া চলিয়াছে, কিছু বলিলাম না; ভাবিলাম, বোধ হয় সহজেই বাড়ি পৌঁছাইব। কিন্তু পথ যেন ফুরায় না। হঠাৎ বোধ হইল যেন গাড়ির মধ্যে আমি একাকী বসিয়া নহি, কে যেন আমার গা ঘেঁসিয়া বসিয়া আছে! আমি অন্ধকারে হাত বাড়াইলাম; কিছুই হাতে ঠেকিল না। আবার চুপ করিয়া বসিলাম। আবার সেই রকম যেন মনে হইতে লাগিল; মনটা যেন কেমন ছমছম করিতে লাগিল। গাড়ির পেছনে যে ছোকরা

বসিয়াছিল তাহাকে ডাকিয়া বলিলাম,—ওরে, তুই ভেতরে এসে বোস্। সে বলিল—না, বাবু, আমি ভেতরে যাব না।—যতই আমি তাহাকে আহ্বান করি, ততই জোর করিয়া সে বলিতে লাগিল—না বাবু, আমি ভেতরে যাব না।—এদিকে গাড়ি একেবারে গড়ের মাঠে রেড্ রোডের নিকটে গিয়া উপস্থিত। গাড়োয়ানকে ডাকাডাকি করিলাম, কোনও ফল হইল না। সেই বিস্তৃত ময়দানে, সেই চন্দ্রালোকিত গভীর নিশীথে, গাড়ী ক্রমাগত চক্রাকারে ঘুরিতে লাগিল। আমার গা ঘেঁসিয়া কি একটা যেন জিনিষ রহিয়াছে, অনুভব করিতে পারিলাম ; সবলে দুই হাত দিয়া সেটাকে ঠেলিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিলাম ; সহসা দেখিলাম যেন গাড়ির ভিতরে একটা বিকট হাসি ফুটিয়া উঠিল। আমি চীৎকার করিয়া লাফাইয়া উঠিলাম ; মাথা ঘুরিয়া গেল। খানিক পরে বুঝিতে পারিলাম ভোর হইয়া আসিতেছে, এবং আমাদের বাড়িরও সন্নিকটবর্ত্তী হইয়াছি। পরদিন নাটোরের মহারাজকে রাত্রির কথা বলিলাম। তিনি আমাকে সঙ্গে লইয়া থানায় গেলেন। দারোগা আমাদের কাহিনী শুনিয়া জিজ্ঞাসা করিল, আপনাদের গাড়ির নম্বর কত ? নম্বর শুনিয়া বলিল, আপনারা যদি কাল রাত্রিতে গাড়োয়ানকে ধরিয়া লইয়া থানায় আসিতেন, তাহা হইলে এত হায়রান্ হইতে হইত না। অনেকদিন হইল, একজন কেরাণী আপিস হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার সময় ঐ গাড়ি করিয়া গড়ের মাঠে গিয়া ঐ গাড়িতেই আত্মহত্যা করে। তদবধি রাত্রিকালে ও-গাড়িতে লোক চড়িলেই ভয় পায়। আমরা তাহা জানিতে পারিয়া, পাছে ঐ গাড়ির লাইসেন্স বন্ধ করিয়া দিই, এই ভয়ে গাড়োয়ানটা রাত্রে আর সওয়ার লয় না। এই পর্য্যন্ত বলিয়া থামিলাম। কুচবিহারের মহারাণী বলিলেন, "অ্যাঁ, সত্যি না কি ?" আমি হাসিয়া বলিলাম—"না, মোটেই সত্য নয় ; গল্প করিলাম মাত্র।"এই গল্পটি পরে নূতন করিয়া লিখিয়াছিলাম।

গল্পমাত্র, আর কিছু নহে। যাঁহাদের ইচ্ছা তাঁহারা এটিকে লইয়া পরীক্ষা করিয়া নাড়াচাড়া করিয়া দেখিতে পারেন এটি "মায়িক" না "বস্তুতন্ত্র"; আমার কাছে কিন্তু এটি শুধু গল্পহিসাবেই চরম সার্থকতা লাভ করিয়াছে। সত্য-মিথ্যার কূট তর্কের মধ্যে আমি প্রবেশ করিতেছি না; গোটা কতক স্থূল কথা লইয়াই এই প্রবন্ধ রচিত হইল। ছিন্নপত্রে কবিহৃদয়ের যে রহস্যের উপর আলোকপাত হইয়াছে, সে প্রসঙ্গ তুলিলাম না; অথচ সেইটেই ছিন্নপত্রের আসল সামগ্রী. সেইখানেই কবির যথার্থ আত্মপরিচয়, সেখানে লেশমাত্র মিথ্যা থাকিতে পারে না। তিনি লিখিতেছেন—"যেমনি কবিতা লিখ্‌তে আরম্ভ করি, অমনি আমার চিরকালের যথার্থ আপনার মধ্যে প্রবেশ করি—আমি বেশ বুঝিতে পারি, এই আমার স্থান। জীবনে জ্ঞাতসারে এবং অজ্ঞাতসারে অনেক মিথ্যাচরণ করা যায়, কিন্তু কবিতায় কখনও মিথ্যা কথা বলি নে—সেই আমার জীবনের সমস্ত গভীর সত্যের একমাত্র আশ্রয়স্থান।"

ফাল্গুন, ১৩১৯।

নবীনচন্দ্র

বন্ধু রামকমলের সহিত বিদেশ-ভ্রমণে বাহির হইলাম। তিনি ওকালতি করিয়া যথেষ্ট পসার প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছেন, এই মাত্র জানিতাম; কিন্তু তিনি যে একটি আস্ত কবি, এরূপ সন্দেহ আমার কখনও হয় নাই। আমরা সতীর্থ বটে; কিন্তু বহুদিন ছাড়াছাড়ি হওয়ার দরুণ এ খবরটুকু ভাল করিয়া পাই নাই।

বেঙ্গল নাগপুর রেলের দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরায় যখন আমরা প্রবেশ করি, তখন কেবলমাত্র একজন সাহেব একখানা গদি দখল করিয়া বসিয়া ছিলেন; বাকি দুইখানি আমরা অধিকার করিয়া বসিলাম।

গাড়ি ছাড়িয়া দিল। অপরাহ্ন কাল। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। রামকমল জানালায় করতলে কপোল বিন্যস্ত করিয়া একদৃষ্টে বাহিরের দিকে তাকাইয়া রহিলেন। খানিকক্ষণ পরে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "কি হে, কি ভাবিতেছ?" আমার দিকে মুখ না ফিরাইয়াই তিনি বলিলেন,—

"হৃদয় আমার নাচেরে আজিকে,
ময়ূরের মত নাচেরে,
হৃদয় নাচে রে,—"

আমি ত অবাক্! তিনি বলিলেন, "বাঙ্গালার বর্ষার মত এমন নিবিড় আনন্দের জিনিষ আমি ত আর কিছু দেখি না। কত শত বৎসর পূর্ব্বে আজিকার মত আর একদিন মেঘৈর্মেদুরমম্বরং দেখিয়া জয়দেব গীতগোবিন্দ-পদাবলী গাহিয়াছিলেন; আর বৈষ্ণব কবি "ভরা বাদর, মাহ ভাদর, শূন্য মন্দির মোর" বলিয়া আক্ষেপ করিয়াছিলেন। এই যে আসন্নঝটিকার প্রতীক্ষায় স্তম্ভিতা বিশ্বপ্রকৃতির উপরে "বর্ষা এলায়েছে তার মেঘময় বেণী," ইহার

স্নিগ্ধগম্ভীর শান্তিটুকু তুমি উপলব্ধি করিতে পারিতেছ না, এমন কথা বলিও না ; প্রকৃতির এই বিরাট শান্তিকে উপেক্ষা করিয়া আমাদের এই ট্রেন খানা ঐ দীর্ঘবিসর্পিত লৌহবর্ত্মের উপর দিয়া উন্মত্তের মত হুঙ্কার করিয়া চলিয়াছে ; কোনও দিকে দৃক্‌পাত নাই ; কিছুতেই ভ্রূক্ষেপ নাই ; দুই ধারের বন উপবন, দীঘি নদী সরোবর

"মাঠের পরে মাঠ, মাঠের শেষে
সুদূর গ্রাম খানি আকাশে মেশে,"

দেখিতে না দেখিতে অন্তর্হিত হইয়া যাইতেছে। বুকের মধ্যে রক্তস্রোত একটু দ্রুততর তালে নৃত্য করিতেছে না কি? এতবড় বিপুল শান্ত প্রকৃতির বক্ষ মথিত করিয়া এই যে ট্রেন খানা ছুটিতেছে, ভালে অগ্নি ধক্‌ধক্ জ্বলিতেছে, বলিতে পার কি, কোন নিরুদ্দেশ রহস্যান্ধকারের মধ্যে কিসের অন্বেষণে চলিয়াছে?"

বন্ধুর গতিক দেখিয়া আমি দাঁড়াইয়া উঠিলাম। মাথার উপরকার ইলেকট্রিক পাখা চালাইয়া দিলাম। গাড়ি একটা ষ্টেশনে আসিয়া থামিলে তাঁহার চমক ভাঙ্গিল। আমরা সকলেই একটু নড়িয়া চড়িয়া বসিলাম। ভায়া যেন একটু অপ্রতিভভাবে বলিলেন, "আমি এতক্ষণ আপন মনে কি বকিয়া গেলাম, তুমি বোধ হয় আমাকে পাগল মনে করিতেছ। তুমি ত কই কোনও কথাই কহিলে না; কিন্তু আজ আমি এই ট্রেনের ভিতর হইতে উভয় পার্শ্বের এই দিগন্তবিস্তৃত বর্ষাবারি-সম্পৃক্ত মাঠ, আর মাথার উপরে ঐ ঘনমেঘাচ্ছন্ন আকাশ দেখিয়া যেন কেমন একটু চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছি। সুজলা সুফলা, মলয়জশীতলা, শস্যশ্যামলা বাঙ্গালার ষড়্‌ঋতুর মধ্যে বর্ষার মত এমন সরস-করা, হরষ-ভরা, ঋতু আর আছে কি? "ধন ধান্য পুষ্প ভরা, আমাদের এই বসুন্ধরা"র উপরে যেদিন "গগনে গরজে মেঘ, ঘন বরষা," সেই দিনই ত বঙ্গপ্রকৃতির মহোৎসব।"

এইবার আমি একটু কথা কহিলাম। বলিলাম, "আমি তোমাকে পাগল মনে করিতেছি না। তুমি যে কবি, তাহা বেশ বুঝিতে পারিতেছি। সহজেই যে তুমি এই বহিঃপ্রকৃতির সহিত তোমার অন্তঃপ্রকৃতির সামঞ্জস্য স্থাপিত করিতে পারিয়াছ, তাহাও বুঝিতে পারিতেছি। কিন্তু দোহাই তোমার, আর একটু নীচু সুরে কথা কও, নহিলে আমি তোমার সহিত তাল রাখিতে পারিতেছি না। অনেক বৎসর তোমার সহিত ছাড়াছাড়ি হইয়া গিয়াছে; তুমি যে কেমন করিয়া অল্পে অল্পে এমন কবি হইয়া দাঁড়াইয়াছ, একটু হাল্‌কা রকম ভাষায় তোমার জীবনের সেই অধ্যায়ের ইতিহাসটুকু রচনা কর না কেন। আমার বিশ্বাস, তাহা হইলে নবীন সেনের 'আমার জীবন'এর মত আর একটি উপাদেয় গ্রন্থ রচিত হইয়া উঠিবে।"

রামকমল বলিলেন "ভাই ক্ষমা কর; বিদ্রূপ করিও না।" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "বিদ্রূপ কিসের?" তিনি বলিলেন, "আত্মজীবনকাহিনী বাঙ্গালা সাহিত্যের ধাতে সহিল না। নবীনচন্দ্রের 'আমার জীবন'ই বোধ হয় বাঙ্গালায় শেষ autobiography।" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "কেন?" তিনি বলিলেন,—

চট্টগ্রামের সাহিত্য সম্মিলনের সভাপতি শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার স্বর্গীয় কবি নবীনচন্দ্র সেনের কথা স্মরণ করিয়া অশ্রুবিসর্জ্জন করিয়াছেন। ভালই করিয়াছেন। কিন্তু তিনি একটু ভাবিয়া দেখিলে অত অসামাল হইতেন না। বেদান্তের "অহং" যেমন নির্ব্বিকল্প, অক্ষয়, অব্যয়, তেমনই "আমার জীবন"এর রচয়ীতাও অক্ষয়, অব্যয়; তাঁহার সর্ব্বগ্রাসী "আমি" আজ মৃত্যুর যবনিকা ভেদ করিয়া বৈতরণীর পরপার হইতে নিজেকে এক-মাত্র নির্ব্বিকল্প "সৎ" বলিয়া পরিচিত করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছে। কাহার কাছে পরিচয়? সেই বিরাট্ আমিত্বের বাহিরের সমগ্র

ব্যবহারিক জগৎটার কাছে আবার পরিচয় কিসের? যেটা মায়া, যেটা ছায়া, আমি আছি বলিয়া যেটা আছে, আমি নিমেষে যেটাকে আমার এই বিরাট্ আমিত্বের ভিতর লয় করিতে পারি, তাহার কাছে আমার আবার নূতন করিয়া পরিচয় দিবার বাসনা জাগিয়া উঠিবে কেন?

"কেন, তাহা কে বলিতে পারে? যিনি জীবদ্দশায় রৈবতক, কুরুক্ষেত্র, প্রভাসে মহা আড়ম্বরে নূতন করিয়া ভারতবর্ষের ইতিহাসের ধারা চোখে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া দিলেন, তাঁহার নিকট হইতে আরও অনেক বিষয় শিখিবার বোধ হয় আমাদের বাকি ছিল। কেমন ভক্তিভরে, প্রণতশিরে, আমরা তাঁহার কাছে নূতন দীক্ষা গ্রহণ করিতে লাগিলাম! যখন তিনি "ব্রাহ্মণের প্রতিদ্বন্দ্বী ক্ষত্রিয় দাম্ভিক"-কে দাঁড় করাইয়া অনার্য্য জরৎকারুকে তাঁহাদের সঙ্গে জড়াইয়া দিলেন, তখন plot টা কি কম sensational হইয়া দাঁড়াইল! Epic grandeur এর বোধহয় যেটুকু বাকি ছিল, কএকটি ক্ষত্রিয়রমণীকে এক একটি Florence Nightingale'র মত আদর্শ Sister of Mercy-তে পরিণত করিয়া তিনি তাঁহাদের মুখে বড় বড় বক্তৃতা বসাইয়া দিলেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর মহাকাব্য রৈবতক-কুরুক্ষেত্র-প্রভাসের পশ্চাতে বৃদ্ধ কাশীরামদাসের তথা বেদব্যাসের ছায়া সঙ্কুচিত হইয়া গেল।

"কৃষ্ণ,খ্রীষ্ট, মহম্মদ, বুদ্ধ, ব্যবহারিক জগতের সামাজিক ধর্ম্মজীবনের লোকবিশ্রুত কএকটি মহাপুরুষের কথা তিনি জীবদ্দশায় আমাদিগকে শুনাইয়া কেমন আমাদের দুর্ব্বল হৃদয়কে সবল করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন! কিন্তু যেটি সব চেয়ে বড় কথা, সেটি বলা হয় নাই। কৃষ্ণ, খ্রীষ্ট, মহম্মদ, চৈতন্য, বুদ্ধ, সবগুলিকে একত্র তাল পাকাইয়া লইলেও তাহা যে অহংতত্ত্বের আমিত্বের কাছে হ্রস্ব, খর্ব্ব, ম্লান হইয়া যায়, সেই অতিগভীর ও বিপুল রহস্যপূর্ণ তত্ত্বটি ব্যাখ্যা করা বাকি ছিল।

আধিব্যাধিমণ্ডিত, ষড়্‌রিপুমর্দ্দিত দেহী বোধ হয় সে রহস্যের যবনিকা সম্যক্‌ উদ্‌ঘাটিত করিতে পারে না; তাই মৃত্যুর, এই ব্যবহারিক জগতের দেহীর মৃত্যুর (অহংএর কি মৃত্যু আছে ?) নেপথ্য হইতে, এক, দুই, তিন, চার খানা দিব্য স্থূলকলেবর "আমার জীবন" এই সূক্ষ্ম তত্ত্বটি প্রচারিত করিবার জন্য "অন্নপায়ী বঙ্গবাসী স্তন্যপায়ী জীবের' শিরোদেশে নিক্ষিপ্ত হইয়াছে। মাথা ঘুরিতেছে, শিরায় শিরায় রক্তবেগ প্রবাহিত হইতেছে; অত বড় তত্ত্বকথা ঠিক্‌ যেন ভাল করিয়া বুঝিয়া উঠিতেছি না। কিন্তু একটু স্থির হইলেই বোধ হয় বুঝিতে পারিব। যদি না পারি, ত সে আমাদের দোষ। যে কবিপ্রতিভা বাঙ্গালার সিরাজ চরিত্রকে চিরকালের জন্য কলঙ্কিত করিতে পারিয়াছে, সে যে "আমার জীবনে"র আমিত্বটাকে চিরকলের জন্য ভাস্বর করিতে পারিবে, তাহা আর বিচিত্র কি ?

'ওগো, ভাল করে বলে যাও।
আঁখিতে, বাঁশিতে, যে কথা ভাষিতে,
সে কথা বুঝায়ে দাও।'

"তাহা হইলে বুঝিতে না পারিব কেন ? অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় কিন্তু ভয় দেখাইতেছেন; যে তত্ত্ব স্বয়ং অর্জ্জুন বুঝিতে পারেন নাই, যীশুর শিষ্যগণ বুঝিয়া উঠিতে পারেন নাই, সেটা কি সহজে হৃদয়ঙ্গম করা যায় ? শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, "সর্ব্বধর্ম্মান্‌ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ ;" পার্থ অমনই কৃষ্ণের পা জড়াইয়া ধরিলেন— "মাম্‌" এর মধ্যে বেদান্তের যে 'অহং'-তত্ত্বটুকু নিহিত রহিয়াছে, তিনি তাহা বুঝিতে পারিলেন না। যীশু বলিলেন Have faith in Me and thou shalt be saved, অমনই তাঁহার শিষ্যগণ তাঁহাকেই পূজা আরম্ভ করিয়া দিল, এই 'me'র মধ্যে যে অহং তত্ত্বটুকু নিহিত আছে,

তাহা কাহারও বোধগম্য হইল না। শ্রীকৃষ্ণের বিশ্বরূপ প্রদর্শনের অর্থ কি এই যে, তিনি বিকট মুখব্যাদান করিয়া দেখাইলেন যে সমস্ত বিশ্বটা তিনি গিলিয়া ফেলিবার উপক্রম করিতেছেন? না ইহার অর্থ অহং এর মধ্যেই সমগ্র বিশ্বটা লীন?

"এত বড় তত্ত্বকথাটির বিষয় আমরা এতদিন ভাল করিয়া ভাবিয়া দেখি নাই। আরও অনেকে ত স্ব-স্ব জীবন কাহিনী লিখিয়াছেন ও লিখিতেছেন; কিন্তু এমন করিয়া অহংটীকে বড় করিয়া দেখাইবার স্পর্দ্ধা কাহারও হয় নাই; পূর্ব্বেইত বলিয়াছি যে, দুর্ব্বল দেহীর পক্ষে এ তত্ত্বটি এমন করিয়া প্রকট করা সকলের সাধ্যাতীত। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ যখন ব্রহ্মের সাক্ষাৎকারলাভ বর্ণনা করিয়া নিজকে ব্রহ্মর্ষি নারদের সহিত তুলনা করিয়াছেন, তখন যেন অনেকটা এই বৈদান্তিক কবিবরের কাছাকাছি গিয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয়। আমরা মাথায় হাত দিয়া ভাবিতাম, নারদের কি ব্রহ্মসাক্ষাৎকার লাভ হইয়াছিল? সে কিরূপ? নির্গুণ, নির্বিকল্প, সৎ চিৎ, আনন্দম্, অহং এর জ্ঞানসম্বন্ধে চেতনার নামই কি ব্রহ্মসাক্ষাৎকারলাভ? মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথেরও কি এই অহং-জ্ঞান সম্যক্ জাগ্রত হইয়াছিল? ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন যে দিন প্রকাশ্য সভাস্থলে বলিয়াছিলেন, And yet I am a singular man, তখন তাঁহার অন্তরে কিপ্রকার অহং জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছিল, তাহা ঠিক জানিবার উপায় এখন আর নাই।

"অথচ এই অহং তত্ত্বটি মাঝে মাঝে এক এক মহাপুরুষ অতি সরলভাবে অতি অল্প কথায় বুঝাইবার চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। সপ্তদশ শতাব্দীতে য়ুরোপের চতুর্দ্দশ লুই বলিয়াছেন L'etat? C'est moi, রাষ্ট্র? সে ত আমি! অহংতত্ত্বটি বেশ পরিষ্কার হইয়া গেল। আবার ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে বার্লিণ কংগ্রেসের অধিনায়ক বিস্মার্ক যখন বলিলেন,

Le congress? C'est moi, কংগ্রেস? সে ত আমি! তখন কথাটি বেশ সুস্পষ্ট হইল না কি?

"যাক্, বড় বড় বিদেশীর নাম করিবার আবশ্যকতা নাই। আমাদের স্বদেশীর কথা বলিয়া শেষ করা যায় কি? স্বদেশীর কথা? কোন্ স্বদেশীর কথা? (দেখ, শব্দই ব্রহ্ম; সে বিষয়ে কিছুমাত্র ভুল নাই; in the beginning was the word; আচ্ছা, সেই wordটা কি? 'ওঁ,' না 'অহং'?) এই স্বদেশীর কথা তুলিয়া সেদিন কদমতলার সরকার মহাশয় আমাদিগকে বেশ দুকথা শুনাইয়া দিয়াছেন; আমরা ভারত-মাতাকে বঙ্গমাতায় পরিণত করিয়া গত কয় বৎসর ধরিয়া যে বাৎসারক বারোয়ারি করিতেছি, তাহার বিষময় ফল এখন আমাদিগকে ভোগ করিতে হইতেছে,—রাজধানী বাঙ্গালা মুল্লুক হইতে সরিয়া গিয়াছে। "আমার জীবন" রচয়িতা আর এক স্বদেশী বারোয়ারির কথা বলিয়াছেন; তাহার তুলনা বাঙ্গালীর সাহিত্যে, বাঙ্গালীর রাজনীতিক্ষেত্রে নাই এবং কখনও ছিল না, একথা জোর করিয়া বলা যাইতে পারে।—শোন।

'আজ কাল দেশীয় দ্রব্যের সমাদরের একটা ধুয়া উঠিয়াছে। উহা বাঙ্গালীর নব্যতম হুজুগ। কিন্তু আমিই প্রকৃতপ্রস্তাবে বহুপূর্ব্বে দেশীয় দ্রব্যের সমাদরের সূত্রপাত করিয়াছিলাম। আমি ঢাকাই আমদানি বন্ধ করিয়া নোয়াখালির এক নর্ত্তকীকে পোশোয়াজ পরাইয়া বাই খাড়া করিলাম; এবং বেদেদের মেয়েরা হাটবাজারে গায়িয়া নাচিয়া বেড়ায়, তাহাদের মধ্য হইতে দুটিকে কাউন্সিলের ফাঁকা অনারেবল্ মেম্বরদের নির্ব্বাচন প্রথানুসারে নির্ব্বাচন করিয়া, এবং উনবিংশ শতাব্দীর চতুর্ব্বর্গদাতা সাবানের দ্বারা তাহাদের বাহ্যিক বহুবর্ষসঞ্চিত তৈলজাত অশ্লীলতা বিদূরিত করিয়া যাত্রার দলের একটি গায়কের ও বাদকের হস্তে সমর্পণ করিলাম। সে এক পক্ষের মধ্যেই উভয়কে অতিরিক্ত সাবান সেবার ও শিক্ষার দ্বারা উর্ব্বশী-

মেনকাত্বপ্রদান করিয়া আসরে উপস্থিত করিল। বাইজী তিলোত্তমা, কারণ তিনি একাধারে বাই, খেম্‌টা, যাত্রা ও থিয়েটার্। তিনি সকল প্রকার সঙ্গীতে শিক্ষিতা হইয়াছিলেন। তাহার উপর সোনায় সোহাগা। তিনটিই সুন্দরী ও তিনটিই ষোড়শী। তিনটাই স্থানীয় কীর্ত্তি (Indigenous production)। ঢাকাই আমদানি সম্পূর্ণরূপে পরাজিত ও কেবল ফেণীতে বন্ধ হইল এমন নহে, এ অঞ্চলেই বন্ধ হইল। ইহাদের খুব প্রসার হইল, এবং দেখিতে দেখিতে নোয়াখালি ও কুমিল্লাতে আরো দলসৃষ্টি হইল। অথচ এই মহৎ স্বদেশপ্রেমিকের কার্য্য সম্পাদন করিতে ন্যূনাধিক পঞ্চাশ মুদ্রামাত্র ব্যয় হইয়াছিল।'*

"একটা বড় প্রশ্নের উত্তর পাওয়া গেল। কবে কোথায় সর্ব্বপ্রথম স্বদেশীর সূত্রপাত হইয়াছিল? আমাদের মধ্যে কেহ কেহ অত্যন্ত গভীর ভ্রমে পতিত হইয়াছিলেন; তাঁহারা ঠাহরাইয়াছিলেন যে Dawn Society'র সতীশবাবুই বুঝি সর্ব্বপ্রথম এই কাজটি করিয়াছিলেন; এটা যে কত বড় ভুল তাহা বুঝা গেল! নোয়াখালি সকলকে টেক্কা দিয়াছে!

'নোয়াখালির মাটি, নোয়াখালির জল,
নোয়াখালির হাওয়া, নোয়াখালির ফল,
ধন্য হোক, ধন্য হোক, ধন্য হোক হে ভগবান!

"বিদেশিনী বারাঙ্গনাকে বয়কট্ করা হইল; নোয়াখালির নর্ত্তকীকে পেশোয়াজ পরান হইল; বাজারের বেদিনীর বাহিরের অশ্লীলতা সাবানের দ্বারা বিদূরিত করা হইল; কাউনসিলের ফাঁকা অনারেবল্ মেম্বরদের নির্ব্বাচন-প্রথানুসারে নির্ব্বাচন করা হইল; আমরা মুখে অনেক কথার আবৃত্তি করি, কাগজেও খুব লেখালেখি করি, কিন্তু কাজে কয়জন কৃতিত্ব দেখাইতে পারি? এই যে জন ষ্টুয়ার্ট মিলের

* আমার জীবন" চতুর্থ ভাগ ৮৭ পৃষ্ঠা

কাছে কত কথা শিখিয়াছি, আজও সেই সকল কথাই আওড়াই মাত্র। সে দিন পুনার ফার্গুসন কলেজে মিঃ র‍্যামজে মাক্‌ডোনাল্ড বলিলেন, আমি এই পবলিক্‌ সর্ব্বিস কমিশনে বসিয়া একটা বড় মজা দেখিতেছি —ভারতবাসীরা আমাদের Mid-Victorian period এর বুলি এখনও কপ্‌চাইতেছে। কিন্তু ১৮৯২ সালের পূর্ব্বে ও একজন বাঙ্গালী মনীষী কাউন্‌সিলের ফাঁকা অনারেবল মেম্বরদের নির্ব্বাচন-প্রথানুসারে নির্ব্বাচন করিয়াছিলেন। এখানেও মৌলিকতা।

"একটা সমস্যার সমাধান হইল ; কিন্তু আর একটা সমস্যা উপস্থিত হইয়াছে। চট্টগ্রামের সাহিত্যসম্মিলনের সভাপতি মহাশয় বলিয়াছেন যে, তিনি অনেকবার বঙ্কিমবাবুকে করযোড়ে অনুরোধ করিয়াছিলেন যে, বঙ্কিমবাবু যেন আদর্শ মাতৃচরিত্র অঙ্কিত করেন; কিন্তু দুঃখের বিষয়, বঙ্কিমবাবু তাহাতে কর্ণপাত করেন নাই। আমরা ভাবিতাম যে, সাহিত্যে মাতৃচরিত্রের প্রস্তাবটা আজকালকার সাহিত্যিক ডেঁপোমি; কিন্তু এখন দেখিতেছি তাহা নহে। এ জিনিষটা অনেক দিনের। "আমার জীবনে" ও এ কথার রীতিমত অবতারণা দেখিতে পাইতেছি। তবে একটু প্রভেদ আছে ; এখানে মাতৃমূর্ত্তির উল্লেখ না করিয়া লেখক বাকি যাবতীয় প্রেমের তালিকা দিয়াছেন। তিনি লিখিতেছেন,—

'আমি বলিলাম,—'আমি ত বরাবর আপনাকে বলিয়াছি আপনার বিলাতি পীরিতের পিণ্ড পিণ্ডান্ত আর আমার ভাল লাগে না। কেবল একঘেয়ে সেই ইংরেজি নভেলের পতিপত্নীর পীরিত। আপনাকে এত করিয়া বলিলাম যে, যেসকল প্রেম লইয়া আমাদের জাতীয় জীবন ও জাতীয় সাহিত্য, রামায়ণ ও মহাভারত, পিতৃপ্রেম, ভ্রাতৃপ্রেম, বাৎসল্য, প্রজাপ্রেম, সর্ব্বশেষে ঈশ্বরপ্রেম—এই সকল প্রেমের আদর্শ আঁকিয়া আমাদের মনুষ্যত্বের পথে লইয়া যান। আপনি ত তাহা শুনিলেন না!

ছাই ভস্ম নরনারী-প্রেমের উগ্র ছবি আঁকিয়া আজ আপনি বঙ্গদেশের অর্দ্ধেক নারীহত্যার—বিশেষতঃ নারীদিগের আত্মহত্যার জন্য দায়ী হইতেছেন।.........আমি সেজন্য বলিতেছি, আপনি উপন্যাস ছাড়িয়া ইতিহাসটিতে হাত দিউন।'

"এখন সমস্যাটা কিরূপ দাঁড়াইল দেখ। সাহিত্যে মাতৃচরিত্র অঙ্কিত না করিয়া বঙ্কিমবাবু সর্ব্বনাশের সূত্রপাত করিলেন;—না, পিতৃপ্রেম, ভ্রাতৃপ্রেম, বাৎসল্য, প্রজাপ্রেম, সর্ব্বশেষে ঈশ্বরপ্রেম ইত্যাদি প্রেমের আদর্শ না আঁকিয়া নারীদিগের আত্মহত্যার জন্য তিনি দায়ী হইতেছেন? সরকার মহাশয় মাতৃমূর্ত্তির প্রসঙ্গ আগে উত্থাপিত করিয়াছিলেন, কি সেন মহাশয় বাকি যাবতীয় প্রেমের ফর্দ্দ লইয়া আগে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়াছিলেন, তাহা জানিবার উপায় এখন আর নাই। নারীদিগের আত্মহত্যার কারণ ত অবগত হওয়া গেল, কিন্তু একটা statistics প্রস্তুত করিবার ভার কেহ লইলে ভাল হয় না? সাহিত্যপরিষদ যদি এই কার্য্য ভার গ্রহণ করেন, তাহা হইলে সমাজের প্রভূত কল্যাণ সাধিত হইতে পারে। বহুপূর্ব্বে প্রভূত কল্যাণ সাধিত হইতে পারিত, যদি বঙ্কিমবাবু ইতিহাসটিতে হাত দিতেন! হায়, কেন তিনি সেই ইতিহাসটিতে হাত দিলেন না? বাঙ্গালার উপন্যাসরাজ্যের একছত্র সম্রাট যদি বাঙ্গালার গিবন্ হইতেন"!

বন্ধু একটু চুপ করিলেন। পরক্ষণেই বলিলেন, "আমার এই সমালোচনা তোমার বোধ হয় ভাল লাগিল না; আমিই কি খুব আনন্দের সহিত এই সমালোচনা করিতেছি? আমাদের নবীনচন্দ্র সাহিত্যে যে আনন্দের, করুণার, উদ্দীপনার উৎস খুলিয়া দিয়াছেন, কোন বাঙ্গালী সে কথা ভুলিতে পারে? পলাশীর যুদ্ধে যখন ব্রিটিশের রণবাদ্য বাজিল; রণস্থল কাঁপাইয়া, আম্রবন কাঁপাইয়া, সেই ধ্বনি, কিশোর বয়স্ক পাঠক পাঠিকার

কারণের ভিতর দিয়া মরমে পশিল না কি? আজও থাকিয়া থাকিয়া সেই ধ্বনি মস্তিষ্কের মধ্যে রণিয়া রণিয়া বাজিয়া উঠে না কি? আবার বিধবা উত্তরার ব্যথিত হৃদয়ের করুণ আর্ত্তনাদ স্মরণ করিলে আজও আমাদের হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন দ্রুততর হয় না কি?

'দেব, কহ একবার,
ভাঙ্গিয়াছে কপাল কি তব উত্তরার?
তাহার পুতুল খেলা নাহি ফুরাইতে হায়,
ফুরাইল জীবনের খেলা কি তাহার,
ভাঙ্গিয়াছে কপাল কি তব উত্তরার?
তুমি উত্তরার হাসি বড় যে বাসিতে ভাল,
মুছাইলে এইরূপে সে হাসি কি তার,
ভাঙ্গিয়াছে কপাল কি তব উত্তরার?
সমরে যাইতে আজি শূলাগ্রে ছিঁড়িল হার,
উত্তরা কি সেই হার পরিবে না আর,
ভাঙ্গিয়াছে কপাল কি তব উত্তরার?
মামা যার বাসুদেব, জনক গাণ্ডীবধন্বা,
জননী সুভদ্রা দেবী, এই দশা তার?
ভাঙ্গিয়াছে কপাল কি তব উত্তরার?'

"তাই বলিতেছিলাম, নবীনচন্দ্রের সমালোচনায় আমি আনন্দ বোধ করিতেছি না। কেবলই মনে হইতেছে, বাঙ্গালীর নবীনচন্দ্র কেন "আমার জীবন" লিখিলেন? লিখিলেন ত, মুদ্রিত করিবার সময় কেহ edit করিয়া দিলেন না কেন? যাঁহাদের হাতে তাঁহার কাগজ পত্রগুলি পড়িয়াছিল, তাঁহাদের কি এ সম্বন্ধে কোনও স্বাধীনতা ছিল না?

আমি বলিলাম—"তুমি নবীনচন্দ্রের অহঙ্কারের সমালোচনা করিলে;

কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, 'আমি একটা যে সে লোক নহি' এ জ্ঞান না থাকিলে কেহ আত্ম-জীবনকাহিনী রচনা করিতে বসেন কি? যে ব্যক্তি আপনাকে তৃণ অপেক্ষা সুনীচ বলিয়া মনে করেন, তিনি কেন নিজের জীবনকাহিনী লিখিতে বসিবেন? রুসোই বল, আর রাজনারায়ণই বল; ষ্টুয়ার্ট মিলই বল, আর দেবেন্দ্রনাথই বল, যিনিই এ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন, তাঁহার মধ্যে নিশ্চয়ই তুমি যেটাকে অহংতত্ত্ব বা আমিত্ব বলিতেছ সেটি সম্যক্ জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছে; তিনি নিশ্চয় মনে করেন যে তাঁহার কাহিনী পাঁচ জনকে শুনাইবার উপযুক্ত। ভাবিয়া দেখ দেখি, ব্যাপারখানা কি! আমি আমার জীবনবৃত্তান্ত আমাদের জাতীয় সাহিত্যের অঙ্গীভুত করিয়া রাখিবার প্রয়াস পাইতেছি;—আমি কি নিজেকে কম বড় মনে করি! দীনতম বৈষ্ণবের মন লইয়া কেহ কখনও নিজের জীবনকাহিনীর বিবৃতি করিতে বসে না।"

রামকমল বলিলেন,—"তা কি আমি বুঝি না? কিন্তু সামান্য ডেপুটি-জীবনের প্রত্যেক খুঁটিনাটি লইয়া অত ফেনাইয়া না তুলিলে কি চলিত না? তিনি জীবিত থাকিলে কি নিজের ডায়ারিটি আগাগোড়া মুদ্রিত করিতেন? রবিবাবু তাঁহার জীবনস্মৃতিতে কতটুকুই বা বলিয়াছেন! কিন্তু এত বেশী জিনিষ আভাসে জানাইয়াছেন, পাঠকের মনে কৌতূহল এমন জাগাইয়া দিয়াছেন যে, তাঁহার আগাগোড়া একটা সুস্পষ্ট ছবি গড়িয়া তোলা বিশেষ শক্ত হয় না। তিনি তাঁহার নিজের কবিতায় যতটা ধরা দিয়াছেন, তাহার শতাংশের একাংশও তাঁহার জীবনস্মৃতিতে প্রকটিত হয় নাই। একটা দৃষ্টান্ত দিয়া আমার কথাটা পরিষ্কার করিতে পারি। রবিবাবু ছেলেবেলায় চাকর বাকরের কড়া পাহারায় একপ্রকার কারারুদ্ধ অবস্থায় ছিলেন, এইটি তাঁহার জীবনস্মৃতিতে অবগত হওয়া যায়। তাঁহার একটী গানে

এই অবস্থাটির আভাস যেন একটু পাওয়া যায়, শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার এরূপ অনুমান করেন। গানটি তোমার মনে পড়ে কি?

"বেজে ওঠে পঞ্চমে স্বর,
কেঁপে ওঠে বন্ধ এ ঘর,
বাহির হতে দুয়ারে কর
কেউ ত হানে না।"

"আমার কিন্তু ঐ দাসরাজত্বের কথায় আর একটি জিনিষ মনে পড়িয়া গেল। সে আজ বহু বৎসরের কথা। "ভারতী"তে রবীন্দ্রনাথ যে "নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ" লিখিয়াছিলেন, সেই কবিতাটি আমার স্মৃতিপথে উদিত হইল।

কি জানি কি হোলো আজি, জাগিয়া উঠিল প্রাণ,
দূর হ'তে শুনি যেন মহাসাগরের গান!
ডাকে যেন—ডাকে যেন—সিন্ধু মোরে ডাকে যেন!
আজি চারিদিকে মোর কেন কারাগার হেন!
ওই যে হৃদয় মোর আহ্বান শুনিতে পায়!
"কে আসিবি, কে আসিবি, কে তোরা আসিবি আয়!
পাষাণ বাঁধন টুটি, ভিজায়ে কঠিন ধরা,
বনেরে শ্যামল করি, ফুলেরে ফুটায়ে ত্বরা,
সারাপ্রাণ ঢালি দিয়া জুড়ায়ে জগৎ হিয়া,
আমার প্রাণের মাঝে কে আসিবি আয় তোরা!
আমি যাব—আমি যাব—কোথায় সে, কোন দেশ—
জগতে ঢালিব প্রাণ, গাহিব করুণা গান,
উদ্বেগ-অধীর হিয়া
সুদূর সমুদ্রে গিয়া

সে প্রাণ মিশাব, আর সে গান করিব শেষ।
ওরে চারিদিকে মোর,
একি কারাগার ঘোর!
ভাঙ্, ভাঙ্, ভাঙ্ কারা আঘাতে আঘাত কর!

কত বৎসর অতিবাহিত হইয়াছে; ভাবিয়া দেখ দেখি, কারাগার ভাঙ্গা হইয়াছে কিনা! উদ্বেগ-অধীর হিয়া সুদূরে সমুদ্রে গিয়া, প্রাণ মিশাইয়া, সে গান "গীতাঞ্জলি"তে শেষ করিতেছে কি? কিন্তু এ সকল কথা তাঁহার জীবনস্মৃতিতে বোধ হয় নাই। নবীনচন্দ্র নিজের "স্বপ্ন দিয়ে গড়া, সে যে স্মৃতি দিয়ে ঘেরা" কবিপ্রতিভার উন্মেষের ইতিহাস না দিয়া, কেন ডেপুটিত্ব বিন্দুটির উপর বৃহৎ আমিত্ব পিরামিড্‌টা খাড়া করিয়া তুলিবার প্রয়াস পাইলেন। যদি তিনি একটু চেষ্টা করিতেন, তাহা হইলে আজ আমরা তাঁহার "ঘুমন্ত প্রতিভা-বক্ষে ফুটন্ত সৌন্দর্য্যস্বপ্ন' দেখিতে পাইতাম না কি!"

বন্ধু থামিলেন। ডিবা হইতে পাণ বাহির করিয়া তাঁহার হাতে একটি দিলাম, একটি নিজে লইলাম। সাহিত্যিক আলোচনায় আমি যেন হাঁপাইয়া উঠিতেছিলাম; কথা অন্য দিকে ফিরাইব মনে করিতেছি, এমন সময় তিনি বলিলেন,—"সে দিন টাউনহলে দ্বিজেন্দ্রলালের স্মৃতিসভায় আমি একটা জিনিষ লক্ষ্য করিয়াছিলাম,—পুষ্পমালাবিভূষিত দ্বিজেন্দ্রলালের প্রতিকৃতি। তোমার কি রকম বোধ হইয়াছিল বলিতে পারি না, আমার কিন্তু আর এক জন কবির কথা মনে হইয়াছিল। দৃষ্টি স্থির, স্নিগ্ধ, শান্ত; মুখমণ্ডল গম্ভীর, চিন্তারেখাযুক্ত, বেদনাময়। দান্তের মুখচ্ছবি এইরূপ গম্ভীর, চিন্তারেখাযুক্ত, বেদনাময় নহে কি? যখন হীরেন্দ্রবাবু বলিলেন, 'দ্বিজেন্দ্রলালের হাসির উৎস তাঁহার অশ্রু-প্রস্রবণের অতি সন্নিকটে ছিল,' তখন আর একবার সেই ছবিটিকে দেখিয়া লইলাম।

তাই বটে ; তাঁহার হাসির মধ্যেও বেদনা লুকাইত ছিল ; যিনি যৌবনে হাসির ভাণ করিয়া গাহিয়াছিলেন "এ জীবনটা কিছুই নয়," তিনি পরপারে যাত্রা করিবার সময়েও বোধ হয় তাঁহার মত পরিবর্ত্তন করেন নাই। তিনি যদি আরও বেশীদিন বাঁচিতেন, তাহা হইলেও বোধ হয় বহু-বিস্তারিত ভাবে 'আমার জীবন' রচনা করিতেন না ; তিনি যে তা'র চেয়ে বড় জিনিষ রচনা করিয়া গিয়াছেন,—'আমার দেশ'।"

এমন সময়ে আমাদের ট্রেন উলুবেড়িয়া ষ্টেশনে আসিয়া পৌঁছিল। প্ল্যাটফরমে কএকটি যুবক তখন গাহিতেছে,—'বঙ্গ আমার, জননী আমার, ধাত্রী আমার, আমার দেশ।' আমাদের কামরায় যে সাহেবটি ছিলেন, তিনি হঠাৎ সোজা হইয়া বসিয়া ঈষৎ দুলিতে লাগিলেন ; জুতা-পরিহিত পায়ে গানের সহিত তালে তালে শব্দ করিতে লাগিলেন ; তাঁহার চক্ষুদ্বয় দীপ্ত হইয়া উঠিল। রামকমল বিস্মিত হইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমাদের এই জাতীয় সঙ্গীতটি আপনার ভাল লাগিয়াছে ?" তিনি বলিলেন—'আমি আইরিশ্‌ম্যান্‌ ; আমারও দেশ আছে। ইংরাজ এতদিন পরে আমার দেশকে আমাদিগের হাতেই প্রত্যর্পণ করিতেছেন।' আমরা দুইজনে সরিয়া আসিয়া সাহেবের ঠিক সম্মুখে উপবেশন করিলাম। ট্রেন ছাড়িয়া দিল। সাহিত্যিক আলোচনায় অগাধ জলে গিয়া পড়িয়াছিলাম ; এতক্ষণে তীরে উঠিবার আশা হইল।

সাহেব বলিলেন,—"এতদিন পরে আমাদের 'হোম রুল' পাইবার আশা হইয়াছে ; ইংরাজ আমাদের দুঃখ বুঝিয়া আমাদিগকে সম্পূর্ণ স্বাধীন পার্লামেণ্ট দিতেছেন। মনে রাখিবেন, যে পার্লামেণ্ট আমরা পাইব, সেটি ভিক্ষালব্ধ নহে ; বহুজনের বহুদিনের কৃচ্ছ্রসাধনার ফলস্বরূপ আমরা ইহা লাভ করিতেছি।"

রামকমল বলিলেন,—"যাদৃশী সাধনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী।

পার্লামেণ্ট পাইলেই আপনারা চতুর্বর্গ ফল লাভ করিলেন, এই রকম কিছু একটা মনে করিতেছেন। সমুদ্রমন্থন করিয়াছেন ; বোধ হয় অমৃত উঠিতেছে ; কিন্তু উঠিতে না উঠিতেই যে দেবাসুর সংগ্রামের সূচনা দেখা দিতেছে, আলষ্টারের সহিত যে বিরোধ অবশ্যম্ভাবী, সেটা আপনাদের জাতীয় উদ্বোধনের পক্ষে মঙ্গলকর কি ?”

সাহেব উত্তর দিলেন,—“আলষ্টার যে ভয় করিতেছে, সেটা সম্পূর্ণ অমূলক। প্রটেষ্টাণ্টের উপর অত্যাচার হইবে কেন? সেও কেন নিজেকে আইরিশ্‌ম্যান্‌ বলিয়া পরিগণিত করিতেছে না? ইংরাজের ত ভাবনার কোনও কারণই নাই ;—আমরা কিছু আর ব্রিটিশ্‌ সাম্রাজ্য হইতে নিজেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করিতে চাহিতেছি না। জাতিবিরোধ আছে, সে কথা অস্বীকার করিলে চলিবে না ; কিন্তু এখন বিরোধটাকে বড় করিয়া দেখিব না, মিলনকে নিবিড়তর করিতে হইবে। Revanche প্রতিহিংসাবৃত্তির বশবর্ত্তী না হইয়া আলষ্টারকে প্রেমালিঙ্গনে আবদ্ধ করাই আমাদের উদ্দেশ্য,—এই কথা টাই সে বুঝিতে চাহে না। হইতে পারে, আমরা বহুশতাব্দী ধরিয়া অত্যাচার-প্রপীড়িত হইয়াছি ; কিন্তু”—তাঁহাকে বাধা দিয়া রামকমল হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—

“মেরেছ কলসীর কানা,
তা বোলে কি প্রেম দেব না ?

“আপনাদের এই বৈষ্ণব-প্রীতির প্রতি আলষ্টারের সন্দেহ হইবার যথেষ্ট কারণ আছে। আপনার এই আশা, উৎসাহ, আনন্দ, উদ্দীপনা দেখিয়া আমার বড় কৌতুক বোধ হইতেছে। পলিটিক্সের ভিতর দিয়া যে জাতীয় সাধনা আপনারা করিয়াছেন, তাহার ফলপ্রাপ্তির সময় উপস্থিত ; কিন্তু সেই ফলটা যদি Dead Sea apple হয় !”

সাহেব,—“হইবে কি না, জানি না। আমরা কেণ্ট, আমরা খ্রীষ্টান ;

আপনারা বাঙ্গালী হিন্দু, বোধ হয় বৈষ্ণব। আপনাদিগের সহিত আমাদিগের ভাবগত একটা সাদৃশ্য আছে,—আমাদিগের উভয়ের জাতিগত কল্পনা-প্রাচুর্য্য। একজন বড় আইরিশ্ লেখক সে দিন বিলাতের এক পত্রিকায় লিখিয়াছেন যে, কল্পনা-প্রাচুর্য্য আয়র্লণ্ডকে রক্ষা করিয়াছে এ কথা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না (It is not too much to say that Ireland was saved by her imagination)।* আপনাদের imagination, আপনাদের কল্পনা-প্রাচুর্য্য একদিন আপনাদিগকেও হয় ত রক্ষা করিবে। যাহারা আপনাদের কল্পনাশক্তির কথা তুলিয়া বিদ্রূপ করে, তাহারা মূঢ়।”

রামকমল,—“আপনি কতকটা আমাদিগকে চিনিতে পারিয়াছেন। একদিন আমরা কল্পনা করিয়াছিলাম যে পলিটিক্সের সাধনাই আমাদিগের চরম সাধনা। ইংরাজের পদতলে বসিয়া পলিটিক্স শিক্ষা করিলাম। তাহার ফল কি দাঁড়াইল? আমাদের জাতিগত লাভ লোক্‌সানের খতিয়ান করিয়া দেখি নাই; কিন্তু বোধ হয় ‘অমিয় সাগরে সিনান করিতে সকলি গরল ভেল।’ বড়ই ক্ষোভে রবীন্দ্রনাথ গায়িলেন—

“যৌবরাজ্যে বসিয়ে দে মা
লক্ষীছাড়ার সিংহাসনে।”

ধিক্কার দিয়া বলিলেন,

“এর চেয়ে হ’তাম যদি
আরব বেদুয়িন,
চরণতলে বিশাল মরু
দিগন্তে বিলীন……।”

গভীরমন্দ্রে দ্বিজেন্দ্রলাল বাঙ্গালীকে বলিলেন,—

“আবার তোরা মানুষ হ।”

---

* ব্রিটিশ রিভিউ, জুলাই ১৯১৩।

"বর্দ্ধমানে প্রাদেশিক সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত আশুতোষ চৌধুরী যখন বলিলেন, "পরাধীন জাতির আবার পলিটিক্স কি? A subject nation has no politics," তখন আমরা স্থির হইয়া ভাবিবার চেষ্টা করিলাম; বাস্তবিকই কি আমরা এতদিন—

"কেবলই স্বপন, করেছি বপন,
বাতাসে?"

"আপনারা কি মনে করেন যে আপনাদের নিজের পার্লামেণ্ট হইলেই আপনাদের ধনসম্পদ বৃদ্ধি হইবে? লক্ষ্মী ফিরিয়া আসিবেন?"

সাহেব,—"মনে করি বৈ কি! কেন মনে করিব না? আমাদের দেশের ইতিহাসই যে এ বিষয়ে সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। তবে একটু স্থির হইয়া শুনুন।

"অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগের কথা বলিতেছি। ১৭৮২ সাল। ইংরাজের সহিত যুদ্ধ করিয়া আমেরিকা স্বাধীন হইল। ইংলণ্ডের সেই ঘোর দুর্দ্দিনে হেন্‌রি গ্রাটান, এক লক্ষ ভলণ্টিয়ার সৈন্যের অধিনায়ক হইয়া ইংরাজকে বলিল, 'আমাদিগকে স্বতন্ত্র স্বাধীন পার্লামেণ্ট দাও; নহিলে যুদ্ধ করিব।' ইংরাজ রাজি হইলেন। আয়র্লণ্ড স্বাধীন, স্বতন্ত্র পার্লামেণ্ট পাইল।

"পাইল বটে, কিন্তু ঠিক যতটা স্বাধীন হইতে চাহিয়াছিল, ততটা স্বাধীন হইতে পারে নাই। গভর্মেণ্টের উপর পার্লামেণ্টের কর্ত্তৃত্ব স্থাপিত হইল না। ডবলিন কাস্‌ল্‌ পার্লামেণ্টের অধীন হইল না;—ব্রিটিশ ক্যাবিনেটও ইচ্ছা করিলে পার্লামেণ্টের নূতন আইন রদ করিয়া দিতে পারিত। এত বাধা সত্ত্বেও গ্রাটানের পার্লামেণ্ট নিজেকে সম্পূর্ণ স্বাধীন মনে করিল।

"অল্পকাল পরেই বিরোধের সূত্রপাত হইল। রাজা তৃতীয় জর্জ্জ

পাগল হইলেন। প্রশ্ন উঠিল, কে যুবরাজ হইয়া রাজ্যভার গ্রহণ করিবেন ? ইংরাজের পার্লামেণ্টে এই কথা লইয়া তুমুল আন্দোলন হয়। পিট ও ফক্সের দ্বন্দ্ব ইংরাজের ইতিহাসে বিশদরূপে বিবৃত হইয়া রহিয়াছে। ফক্স্ বলিলেন, 'জ্যেষ্ঠ রাজকুমার প্রিন্স জর্জ্জ, পার্লামেণ্টের অনুজ্ঞার অপেক্ষা না করিয়া যুবরাজ হইয়া রাজ্যভার গ্রহণ করিতে পারেন।' পিট্ বলিলেন, 'নিশ্চয় নহে। পার্লামেণ্টের নিয়োগ ব্যতীত কেহ যুবরাজ হইতে পারিবেন না।' পিটের জয় হইল। গ্রাটানের পার্লামেণ্ট্ তর্ক তুলিল। যিনি ইংলণ্ডের রাজ্যভার গ্রহণ করিবেন, তিনি আয়র্লণ্ডের রাজ্যভার গ্রহণ করিবেন; তাই তাহারাও এমন গুরুতর বিষয়ে তাহাদের বক্তব্য বলিতে চাহিল; তাহারা বলিল "আমরাও ঐ যৌবরাজ্যবিষয়ে পরামর্শ দিতে চাহি।" অনেক কষ্টে তাহাদিগকে ঠাণ্ডা করা হইল; কিন্তু পিট্ প্রতিজ্ঞা করিলেন, যেমন করিয়া হোক্, আয়র্লণ্ডের পার্লামেণ্ট্ বন্ধ করিয়া দিতে হইবে।

"তাহার পর ? তাহার পর যাহা ঘটিল, তাহাতে আমাদেরই জাতীয় কলঙ্ক সর্ব্বত্র বিঘোষিত হইল। ইংরেজ গভর্ণর পার্লামেণ্ট্কে বশীভূত করিয়া ফেলিলেন! গ্রাটান পার্লামেণ্ট হইতে ১৭৯৭ সালে সরিয়া পড়িলেন। সেই বশীকরণমন্ত্র কি, তাহা বোধ হয় আপনারা জানেন না। লেকি তাঁহার ইতিহাসে এইরূপ লিখিয়াছেন :—

"I believe that it is scarcely an exaggeration to say that everything in the gift of the Crown in Ireland, in the Church, the Army, the Law. the Revenue, was at that period uniformly and steadily devoted to the single object of carrying the Union. From the great nobles who were bargaining for their marquisates and their

ribbons; from the Archbishop of Cashel who agreed to support the Union on being promised the reversion of the see of Dublin and a permanent seat in the Imperial House of Lords, the virus of corruption extended and descended through every fibre and artery of the political system. Grattan has left on record his conviction that, of the members who voted for the Union, not more than seven were unbribed."

"১৮০০ খৃঃ অব্দে আয়র্লণ্ডের পার্লামেন্ট, গ্রাটানের পার্লামেন্ট, আত্মহত্যা করিল। সমস্ত গ্রেট ব্রিটেনের ও আয়র্লণ্ডের আয়ের হিসাব করিয়া স্থির হইল যে আয়র্লণ্ড সমগ্র রাজস্বের পনের ভাগের দুই ভাগ টেক্স স্বরূপ ইংরেজকে দিবে। কোনও আপত্তি গ্রাহ্য হইল না। মোটেই ত তিন চার জন আপত্তি করিয়াছিলেন। লর্ড কাস্‌ল্‌রী বলিলেন, 'আমি শপথ করিয়া বলিতে পারি, এই একীকরণের ফলে আয়র্লণ্ডের বাৎসরিক দেড় কোটি টাকা লাভ থাকিবে।"

"হায়! লর্ড কাস্‌ল্‌রী! ১৮০০ খৃষ্টাব্দে আয়র্লণ্ডের সরকারি ঋণ ছিল দুই কোটি পঁচাশী-লক্ষ একচল্লিশ হাজার এক শত সাতান্ন পাউণ্ড; ১৮২৬ খৃঃ অব্দে সরকারি দেনা দাঁড়াইল, চৌদ্দ কোটি দশ লক্ষ পাউণ্ড; এবং ঐ সময়ের মধ্যে টেক্স আড়াই গুণ বাড়িয়া গেল!

একজন হাতুড়ে ডাক্তারের গল্প মনে পড়িয়া গেল। রোগীর হাম হইয়াছে, ডাক্তার ডাকা হইল। রোগীকে দেখিয়া তিনি কিছু ঠাহর করিতে পারিলেন না; বলিলেন, 'এ সকল ব্রণ ফুস্কুড়ির চিকিৎসায় আমি সিদ্ধহস্ত নহি; তবে একটা গুঁড়া দিতেছি, লোকটাকে খাওয়াইয়া দাও; খাইলেই হিক্কা উঠিবে; তখন আমাকে ডাকাইও; আমি হিক্কার যম।

"পিট্ ও কাস্‌ল্‌রী এমন গুড়া সেবন করাইলেন যে রোগীর হিক্কা উপস্থিত হইল।

"কিঞ্চিদধিক শত বৎসর অতীত হইয়াছে। য়ুরোপের অন্যান্য দেশের লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে; আয়র্লণ্ডের কমিয়াছে। ১৮০১ সালে আমাদের দেশের লোক সংখ্যা ছিল চুয়ান্ন লক্ষ; ১৯১০ সালে দাঁড়াইল চুয়াল্লিশ লক্ষ। ইংলণ্ডের লোক-সংখ্যা প্রায় চতুর্গুণ বর্দ্ধিত হইয়াছে। ১৮০১ সালে ছিল প্রায় নব্বই লক্ষ; ১৯১০ সালে দাঁড়াইল প্রায় তিন কোটি ছাব্বিশ লক্ষ! ঘন ঘন দুর্ভিক্ষ দেখা দিল; ১৮৪৭-৪৮ সালের দুর্ভিক্ষে প্রায় পনর লক্ষ লোক মারা গেল; টাইম্‌স্ পত্রিকা মনের আনন্দে লিখিল "The Celts were going with a vengeance."

"কিন্তু যে আঠার বৎসর গ্রাটানের পার্লামেণ্ট্ দেশের শাসনকার্য্যে সহায়তা করিয়াছিল, সে সময়ে দেশের শ্রী ফিরিয়াছিল। লেকি বলেন যে, আয়র্লণ্ড স্বাধীন হইবার পর অনেক বৎসর ধরিয়া দ্রুতভাবে তাহার ধনবৃদ্ধি হইয়াছিল। ১৭৮৮ সালে আয়র্লণ্ডের এমন অবস্থা যে টাকা ধার করিতে হইলে ইংলণ্ডের চেয়ে বেশী সুদ তাহাকে দিতে হইত না।

"বাণিজ্য আশাতিরিক্ত প্রসার লাভ করিল; চাষারও অবস্থা ফিরিল; পরিত্যক্ত কলকারখানাগুলি যেন নবজীবনে স্পন্দিত হইয়া উঠিল; নগরে নগরে বড় বড় সৌধ নির্ম্মিত হইল; টুপি, জুতা, বাতি, সাবান কম্বল, কার্পেট্, পশমি ও সূতার কাপড় তৈয়ারি হইতে লাগিল।

"গ্রাটানের পার্লামেণ্টের অনেক দোষ ছিল, কিন্তু সে আমাদের নিজের পার্লামেণ্ট। দেশের পলিটিক্সের সহিত দেশের সমৃদ্ধির ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে বৈ কি? আপনারা সে কথা অস্বীকার করিলে চলিবে কেন? পলিটিক্সের উপর আপনাদেরই যদি বিশ্বাস না থাকে, তাহা হইলে আপনাদের গভর্ণমেণ্টেরই বা থাকিবে কেন?

"কিন্তু ইংরেজের চরিত্রবলের প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না; সে যদি বুঝিতে পারে যে বাস্তবিকই একটা বড় ভুল করিয়া ফেলিয়াছে, তাহা হইলে সে নূতন পথ অবলম্বন করিতে একটুও কুণ্ঠা বোধ করিবে না।"

* * * *

আমি উঠিয়া পড়িলাম। সাহেব ও রামকমল তর্কবিতর্ক করিতে লাগিলেন। অন্ধকার রাত্রি; বৃষ্টি পড়িতেছিল। আলোটা অর্দ্ধাবৃত করিয়া আমি শয়ন করিলাম। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলাম যে আর কখনও সাহিত্যিক-পলিটিশ্যানের সহিত বিদেশযাত্রা করিব না।

কার্ত্তিক, ১৩২০।

অজিতকুমার

আমাদের মাসিক পত্রিকায় শ্রীযুক্ত অজিতকুমার চক্রবর্ত্তীর প্রবন্ধ যখন প্রথম প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হইল, তখন সেগুলির মধ্যে এমন একটা নূতন কিছুর আস্বাদ পাইয়াছিলাম, অথবা আস্বাদ পাইব বলিয়া আশা করিয়াছিলাম, যাহা ইদানীং অন্য কোনও নবীন সাহিত্যিকের কাছে পাই নাই, অথবা পাইবার আশা করিতেও পারি নাই। মনে মনে বলিলাম—The coming man;—এতদিন পরে বোধ হয় সাহিত্যক্ষেত্রে একটি মনের মতন নূতন মানুষ পাওয়া গেল। কিন্তু কোথায় গোল বাধিল ঠিক বলিতে পারি না;—আমার রসাস্বাদ করিবার শক্তিই কমিয়া থাকুক, অথবা নব নব রসের পরিপাক করা ক্রমশঃই আমার পক্ষে কঠিন হইয়া উঠিতেছে, যে কারণেই হউক এখনও আমার মন বলিতেছে না যে, অজিত বাবু—has arrived! অথচ সরস প্রবন্ধরচনায় তিনি নিপুণ, এ কথা আমি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতেছি। এবং যাঁহারা তাঁহার রচনা পাঠ করিবার সুযোগ পান নাই, তাঁহারা বাস্তবিকই একটা ভাল জিনিষ হইতে বঞ্চিত হইয়াছেন। তিনি নবীন; এখনও যদি তিনি তাঁহার শূন্য আসন অধিকার করিয়া না থাকেন, তাহাতে লজ্জা কিম্বা পরিতাপের কিছু নাই। তাঁহার নবীনতার সমস্ত দোষগুণ লইয়া তিনি আমাদের মনোরঞ্জন করিবার প্রয়াস পাইতেছেন। তাঁহার নবীন, সজীব সরস রচনাভঙ্গি লঘু ললিত গতিতে নগ্ন নিরাবরণ সত্যের সন্ধানে বিশ্ব-সাহিত্যের কক্ষে কক্ষে বিচরণ করিতেছে। কবীরের গান হইতে রামেন্দ্র-বাবুর 'কর্ম্মকথা' পর্য্যন্ত সমস্তই তিনি নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিবার চেষ্টা

করিতেছেন। বাংলা সাহিত্যে কেন, আধুনিক বিশ্ব-সাহিত্যের মধ্যে একমাত্র রবীন্দ্রনাথই নগ্ন নিরাবরণ সত্যকে সাধকের চক্ষে বোধ হয় দেখিবার চেষ্টা করিয়াছেন।—আবরণ তাঁহার দৃষ্টি-শক্তিকে প্রতিহত করিয়া তাঁহার অন্তরাত্মাকে পীড়িত করিয়াছে; তিনি ব্যগ্রভাবে বলিয়াছেন—

ফেল গো বসন ফেল, ঘুচাও অঞ্চল,
পর শুধু সৌন্দর্য্যের নগ্ন আবরণ—
সুরবালিকার বেশ কিরণ-ভূষণ।

কিন্তু সভ্যতার সমস্ত কৃত্রিম আবরণ শ্লথ বসনের মত তাঁহার সম্মুখে খসিয়া পড়িয়াছিল কি? কবিবরের যেমন 'ক্ষ্যাপা খুঁজে খুঁজে মরে পরশ-পাথর,' তেমনি তিনি নিজে তাঁর অন্তরে বাহিরে ঐ নিরাবরণ সত্যের অনুসন্ধান করিয়াছেন। তাঁহার ধর্ম্মসাধনা সম্বন্ধে অজিত বাবু বলিতেছেন, —"রবীন্দ্রনাথ আবাল্য উপনিষদের স্তন্যরসে পরিপুষ্ট ও বর্দ্ধিত;—খৃষ্টীয় স্বর্গমর্ত্ত্যের কল্পিত ব্যবধানের তত্ত্ব...তাঁহার কাছে অত্যন্ত স্থূল ও ভ্রান্ত ভিন্ন আর কি হইতে পারে?...রবীন্দ্রনাথ কেবলমাত্র উপনিষদের অধ্যাত্মযোগতত্ত্বের দ্বারা অনুপ্রাণিত নন্, এবং কেবলমাত্র বৈষ্ণবের লীলা-তত্ত্বের দ্বারাও অনুপ্রাণিত নন্। এই দুই তত্ত্বই তাহার জীবনের সাধনায় জৈব মিলনে মিলিত হইয়া এক অপরূপ নূতন রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে।" —কথাগুলি একটু ভাবিয়া দেখা দরকার। জীবনদেবতার সম্মুখে দাঁড়াইয়া কবি বলিতেছেন—

মাতৃস্নেহ বিগলিত স্তন্য ক্ষীররস
পান করি হাসে শিশু আনন্দে অলস,—
তেমনি বিহ্বল হর্ষে ভাবরসরাশি
কৈশোরে করেছি পান; বাজায়েছি বাঁশী

প্রমত্ত পঞ্চম সুরে ; প্রকৃতির বুকে
লালন-ললিত চিত্ত শিশুসম সুখে
ছিনু শুয়ে ; প্রভাত-সর্ব্বরী-সন্ধ্যা-বধূ
নানা পাত্রে আনি দিত নানাবর্ণ মধু
পুষ্পগন্ধে মাখা। আজি সেই ভাবাবেশ,
সেই বিহ্বলতা যদি হয়ে থাকে শেষ,
প্রকৃতির স্পর্শমোহ গিয়ে থাকে দূরে,—
কোনও দুঃখ নাহি। পল্লী হ'তে রাজপুরে
এবার এনেছ মোরে—দাও চিত্তে বল !
দেখাও সত্যের মূর্ত্তি কঠিন নির্ম্মল !

কবির আত্মকাহিনীর মধ্যে তাঁহার কৈশোরের যে ছবিটি দেখিতে পাই, তাহা ত আবাল্য উপনিষদের স্তন্যরসে পরিপুষ্ট ও বর্দ্ধিত হইবার ছবি নহে। তিনি কঠিন নির্ম্মল সত্যের মূর্ত্তি দেখিতে চাহেন। উপনিষদের ভিতর দিয়া সত্যের মূর্ত্তি যদি তাঁহার সমক্ষে প্রকট হইয়া উঠিত, তাহা হইলে তিনি যে মুক্তিলাভ করিতেন, সে মুক্তি কোনও রাজপুরে পাওয়া যায় না ; তিনি বুঝিতে পারিতেন যে, সে মুক্তির জন্য কোনও পল্লী হতে কোনও রাজপুরে আসিবার দরকার হয় না ; তাঁহার সঙ্গে সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড মুক্ত হইয়া যাইত, দ্বৈতরহস্যের মধ্যে অদ্বয়তত্ত্ব ফুটিয়া উঠিত,—একমেবাদ্বিতীয়ং ; এবং সেই একম্ আর কেহ নহেন —আমি। যে দিন জগতের কোনও ব্যক্তি এই অদ্বয়তত্ত্ব সম্যক উপলব্ধি করিতে পারিবেন, সেদিন তিনি কেন—সমস্ত চরাচর তাঁহার সহিত মুক্তিলাভ করিবে। এ মুক্তি বৌদ্ধের নির্ব্বাণবাদ (Nihilism) নহে। ইহা অত্যন্ত positive, একান্ত সত্য ;—আমি যেমন সত্য, ইহাও তেমনি সত্য ; ইহাই বৈদান্তিক Salvation। কবি এখন পল্লী হইতে রাজপুরে আসিয়া

সত্যের দেখা পাইবেন আশা করিতেছেন। যেরূপ সাধনা করিলেন, সেইরূপ সিদ্ধিলাভও হইল। ব্রহ্মকে রাজবেশে ভগবানরূপে তিনি উপলব্ধি করিলেন ;—সহসা অতর্কিতভাবে ব্রহ্ম তাঁহার আঁধার ঘরের রাজা, তাঁহার দুঃখরাতের রাজার বেশে ভক্তের সম্মুখে আবির্ভূত হইলেন। ইহা উপনিষদের তত্ত্বও নহে, বৈষ্ণব তত্ত্বও নহে; ইহা সাধক কবির mystic স্বানুভূতি। কবি বৈদান্তিক অথবা বৈষ্ণব mystic নন্ বলিয়া তাঁহাকে কম শ্রদ্ধা করিলে চলিবে না। তাঁহার এই দ্বৈতরহস্য একান্ত তাঁহার নিজের জিনিষ; বৈষ্ণব অথবা শাক্তরসপুষ্ট সাধারণ বাঙ্গালী হয়ত আনন্দ-ঘন ব্রহ্মকে রাজভাবে উপলব্ধি করিয়া তৃপ্তি অনুভব করিবে না; কিন্তু আধুনিক ইংলণ্ডের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপন্যাস-রচয়িতা ওয়েল্‌স্ H. G. Wells রবিবাবুর মন্ত্রশিষ্য হইয়া তাঁহার King of the Dark Chamberকে খৃষ্টীয় সমাজে দাঁড় করাইয়া পাদরি-মহলে বিষম গোল বাধাইয়া দিয়াছেন। 'নেশন'-পত্রিকায় ক্রমশঃ প্রকাশিত Mr. Britling sees it through উপন্যাসের শেষ অধ্যায়ে গত ১৯১৬ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে এই তত্ত্বটি ইংরাজ সমাজে প্রথম প্রচারিত দেখা যায়। গত ১৯১৭ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে মিঃ ফ্রেড্রিক হ্যারিসন্ মাসিক পত্রের প্রবন্ধে কথোপকথনচ্ছলে এই আঁধার ঘরের রাজাকে লইয়া সুন্দর আলোচনা করিয়াছেন। এই রাজাকে লইয়া বৈষ্ণব কি করিবেন? রবীন্দ্রনাথ প্রশ্ন করিয়াছেন—'শুধু বৈকুণ্ঠের তরে বৈষ্ণবের গান?' তিনি জানিতেন না যে, বৈকুণ্ঠের তরে বৈষ্ণব কখনও গান করে না। শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী বৈকুণ্ঠের রাজা নারায়ণকে লইয়া বৈষ্ণব কি করিবে? বৈষ্ণব চায়,—বৈকুণ্ঠ নয়,—গোলোক; —বৈকুণ্ঠের বহু উর্দ্ধে অবস্থিত গোলোক। এই গোলোক তাহার বৃন্দা-বনের রূপান্তর মাত্র। এখানে রাজার স্থান নাই। বৈষ্ণবের সখা কখনও বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য পাদমেকং ন গচ্ছতি; রসপরিপুষ্টির জন্য বৈষ্ণব

বিরহমিলন, পরকীয়াপ্রীতি, এমন কি মথুরার রাজার অভিনয়ও করিয়াছেন ; কিন্তু ঐ রাজার অভিনয় বৈষ্ণব সাহিত্যের মর্ম্মান্তিক ট্রাজেডি। বৃন্দাবনের তথা গোলোকের সহিত বৈষ্ণবসখার এই যে নিরবচ্ছিন্ন সম্বন্ধ, আবার ভক্তের সহিত সখাভাবে, বঁধুভাবে, নন্দনন্দনরূপে এই যে আনন্দঘন ব্রহ্মের অবিচ্ছিন্ন সম্পর্ক, এই দ্বৈতাদ্বৈতরহস্যের সহিত বেদান্তের দ্বৈতাদ্বৈতরহস্য সহজেই উপমেয়। বৈষ্ণব করজোড়ে কোনও রাজার সম্মুখে দাঁড়াইতে প্রস্তুত নহেন ; দূরে, বহুদূরে অবস্থিত স্বর্গের কল্পনা করিতেও বোধ করি তিনি হাঁপাইয়া উঠেন ; স্বর্গের রাজার উদ্দেশে প্রণাম করিয়া তিনি সরিয়া পড়িলে বাঁচেন। যিনি অদ্বয়ভাবে ব্রহ্মের সহিত মিশিতে চাহেন, তিনি ষড়ৈশ্বর্য্যশালী ভগবানকে উপাস্য করিয়া কি করিবেন ? রবিবাবুর বিচিত্র mystic moodগুলির ভিতরে দেখা যায় যে ভক্ত ও ভগবানের মধ্যে যথেষ্ট ব্যবধান রহিয়াছে ; এই রাজা-প্রজা ভাবটাই বোধ হয় খুব প্রবল। তাঁহার রাজার দুলাল স্বর্ণশিখর রথে আরোহণ করিয়া রাজপথ দিয়া চলিয়া যান ; দূরে বাতায়ন হইতে ভক্ত তাঁহাকে চকিতের জন্য দেখিতে পান। ভক্তির আবেগে গলার হার ছিঁড়িয়া ভক্ত তাঁহার চরণতলে নিক্ষেপ করিলেন, কিন্তু—

মোর হারছেঁড়া মণি নেয়নি কুড়ায়ে,
রথের চাকায় গেছে সে গুঁড়ায়ে

তবু সেই ত্যাগটুকুতেই ভক্তের আনন্দ। তাঁহার ভগবান মহারাজের ঐশ্বর্য্যে মণ্ডিত হইয়া সহসা ভক্তের কুটীরে আসিয়া দেখা দিলেন,—তখন কোথায় শঙ্খ, কোথায় আসন,—ভক্ত অস্থির হইয়া উঠিলেন। বৈষ্ণবের খুব কাছাকাছি যে রবিবাবু যান নাই এমন নহে : তাঁহার এমন একটি mystic mood দেখিতে পাই যখন ভক্ত বধূভাবে বঁধুর কাছে আসিয়াছেন, কিন্তু—

ওগো বর, ওগো বঁধু,
এই যে নবীনা,

এ তব বালিকা বধূ।

এই বর ও বালিকা-বধূর সম্পর্ক প্রায় 'নববঙ্গ দম্পতির প্রেমালাপ' এর আধ্যাত্মিক সংস্করণ দাঁড়াইল; বৈষ্ণবের মধুর রসের আশা এখানে একেবারেই করা যায় না। পাছে কাম-গন্ধ পাওয়া যায়, এই জন্য কবি সাবধান হইয়াছেন। কিন্তু একটু বিচার করিয়া দেখিলে, এই খানেই বৈষ্ণবের জিৎ। রাধাকৃষ্ণের প্রেমে কামগন্ধ নাই, এ কথা বৈষ্ণবকবি স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন; বোধ হয় না বলিলেও কোনও ক্ষতি ছিল না। কৃষ্ণ বলিতেছেন, আমার দেহ মন প্রাণ লইয়া লীলা করিয়া যদি তুমি সুখী হও, তাহাতেই আমার আনন্দ; শ্রীরাধিকার প্রীতি তদ্বৎ অথবা আরও উচ্চদরের। ৺ক্ষেত্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় এইটি ভাল করিয়া বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। তিনি বলেন—

"বেদান্তের ব্রহ্ম মহাশয় যেমন অটল, নির্ব্বিকার; হ্লাদিনী রাধিকার ভালবাসাও তেমনই ধৈর্য্যচ্যুতিকরী, বিবেকহারিণী, মহোল্লাসকরী। শ্রীমতী জাতিকুল বিসর্জ্জন করিয়া ব্রহ্ম গোবিন্দকে ভালবাসে এবং বিনিময়ে কিছু চাহে না। গোবিন্‌জী বড় ফাঁপরে পড়িয়া গিয়া ঋণী হইয়াছেন। ঠাকুরাণীর নিঃস্বার্থ পীরিতির বিনিময়ে যাহা কিছু তিনি দিতে প্রস্তুত, তাহা ঠাকুরাণী অঙ্গীকার করেন না। সর্ব্বশক্তিমান এবং পরম চতুর হইয়াও গোবিন্দ এমন কিছু বস্তু আবিষ্কার করিতে অক্ষম, যাহাতে দেবীর লোভ হইতে পারে। স্ববশ, স্বতন্ত্র, নির্ব্বিকার গোবিন্দ উপস্থিত অবশে প্রেমপরতন্ত্র ও রাধাবশ। নিরুপায় গোবিন্দ রাধাঋণ পরিশোধ করিবার জন্য, রাধা তাঁহাকে যতটা ভালবাসে, তিনি রাধাকে ততটা ভাল বাসিবার চেষ্টা করেন; পারেন না। ঋণশোধরূপ উদ্দেশ্য ও চেষ্টা এই দুটী বস্তু গোবিন্দের ভালবাসাকে রাধার অহেতুক সহজ ভালবাসা হইতে ন্যূন

করিয়া ফেলে। রাধার গোবিন্দপ্রীতিতে কোনও উদ্দেশ্য বা চেষ্টা নাই—তাহা নিরতিশয় সহজ স্বাভাবিক, সুতরাং গোবিন্দ ঋণী, ঠাকুরাণীই মহাজন। গোবিন্দ ভুবনমোহন বটে, কিন্তু শ্রীমতী ভুবনমনমোহিনী। গোবিন্দও ব্রহ্ম, রাধিকাও ব্রহ্ম, তবে বড় ব্রহ্ম; প্রীতিই, আনন্দই হ্লাদিনী রাধাই ত গোবিন্দের ব্রহ্মত্ব। আশ্রয়জাতীয় প্রীতি বিষয়জাতীয় প্রীতি অপেক্ষা গরীয়সী, অর্থাৎ রাধার কৃষ্ণে প্রীতিটীর তুলনায় কৃষ্ণের রাধাতে প্রীতি কিঞ্চিৎ লঘু। রাধার কৃষ্ণের উপর যে প্রীতি তাহার পরাকাষ্ঠা জাতিকুলবিসর্জ্জন নহে; ততোধিক। যদিই গোবিন্দ অন্য ললনাতে লালাসাবান হয়েন, তাহা জানিতে পারিলে 'সমর্থা' নায়িকা সাক্ষাৎ শুদ্ধ ঘন-স্নেহ-মূর্ত্তি শ্রীরাধিকা, হর্ষ ঈর্ষার অপূর্ব্ব রসমেলন আবিষ্কার করিয়া যে কোন প্রকারে হউক অনুনয় দৈন্য বা সেবার দ্বারা সেই ললনাকে বশীভূত করিয়া গোবিন্দের অঙ্কসিংহাসনে স্থাপিত করিয়া গোবিন্দকে সুখী করিতে পারেন। গোবিন্দ এতটা প্রীতির পরিশোধ সম্ভাবনা ঘটাইতেও অসমর্থ, যেহেতু অন্য দ্বিতীয় পুরুষই নাই যাহাতে রাধিকার অনুরাগ হইতে পারে, এবং গোবিন্দ অঋণী হইবার জন্য সেই পুরুষ সহ রাধার মিলনে আনুকুল্য করিতে পারেন। তজ্জন্য গোবিন্দ বড়ই জব্দ হইয়া আছেন; বড় সুখে মধুরভাবে জব্দ। একটা আসল কথা বলিব, শুন, মন দিয়া শুন। রাধাগোবিন্দ নিত্যতৃপ্ত; লীলা করিয়া তাঁহাদের কোনও নিজতৃপ্তি সম্পাদন করিবার কিছুমাত্র আবশ্যকতা নাই। প্রশ্ন উঠে যে, তবে লীলার হেতু কি? হেতুটী তাঁহার অসীম করুণা। এই যে রাধার জয়ে পরাজিত গোবিন্দের আনন্দলীলা ইহার উদ্দেশ্য এই যে, হতভাগ্য জীবের সৌভাগ্য হউক; জীব এই মধুর হইতে সুমধুর অলৌকিক প্রীতি দেবীর জয়লীলারস চর্চ্চা ও আস্বাদন করুক। যদি অকাম শুদ্ধ প্রীতির উদ্দেশ পাইয়া থাক, তবে

ললিতার মত ঠাকুরাণীর পূজা কর; ঠাকুরাণীকে পাইলেই তত্র তাঁহার প্রিয় তদধীন গোবিন্দকেও পাইবেই পাইবে। ইহা যুগল উপাসনা, চরম ইষ্ট। কামের ক্ষয় ও যুগল প্রীতির উদয় অর্থাৎ রাধাগোবিন্দের কৃপায় রাধাগোবিন্দ সামীপ্যপ্রাপ্তি অপেক্ষা ইষ্টতর সম্পত্তি রাধাগোবিন্দের ভাণ্ডারেও নাই। আত্মসমর্পণ হইতে অধিক দান সর্ব্বশক্তিমানেরও সাধ্যাতীত।"

৺অধ্যাপক মহাশয় এই বৈষ্ণব করুণার, এই গোবিন্দজীর কৃপার, এই বৈষ্ণব Doctrine of Graceএর তত্ত্বটী ভাল করিয়া বলিবার অবসর পাইলেন না। কিন্তু বোধ হয় বৈষ্ণব তত্ত্বটী মোটামুটি বুঝাইতে তিনি সফলপ্রযত্ন হইয়াছেন। বৈষ্ণবধর্ম্ম সেবার ধর্ম্ম, আত্মোৎসর্গের ধর্ম্ম; এখানে অহঙ্কারের স্থান নাই। অহং এখানে ত্বাম্-এতে লীন হইতে পারিলেই পরিতৃপ্ত; এই 'আমি' ও 'তুমি'র লীলা করিবার জন্য 'আমি' হইতে 'তুমি'-কে বিসৃষ্ট করিয়া, সেই 'তুমি'র মধ্যে আমিকে লীন করিবার জন্য এই চিরন্তন বৈষ্ণবলীলা অনাদ্যন্ত চলিতেছে। বেদান্তের অহং বৈষ্ণবের প্রীতিঠাকুরাণীতে রূপান্তরিত হইয়া গোবিন্দজী ত্বম-রূপ রহস্যের মধ্যে আপনাকে উৎসর্গ করিয়া বিসর্জ্জন দিয়া লীলান্বিত হইতেছে। এই জন্যই ক্ষেত্রবাবু বলিয়াছেন গোবিন্দ ও ব্রহ্ম রাধিকাও ব্রহ্ম, তবে বড় ব্রহ্ম। বেদান্তের নির্ব্বিকার নিরুপাধিক অদ্বয় ব্রহ্ম যেমন সাক্ষী ব্রহ্ম ও বিসৃষ্ট ব্রহ্মে দ্বিধা বিভক্ত বলিয়া কল্পিত করা হয়, ইহাও সেইরূপ। তবে বেদান্তের ব্রহ্ম আত্মনির্ভর আত্মপ্রতিষ্ঠ, আপনাতে আপনি সম্পূর্ণ; আমার কল্পিত বিসৃষ্ট ব্রহ্ম আমাতে লীন; আমি বড়, একক, বিরাট, মহান। আমি সেবা করিব কাহাকে? একা আমি ছাড়া আর দ্বিতীয় কিছু নাই; আমার কল্পিত বিসৃষ্ট ব্রহ্মকে লইয়া আমি লীলা করি; সেই তৎ কে অহং-এর মধ্যে আকৃষ্ট ও অহং-হইতে বিসৃষ্ট

করিবার অভিনয় করিতেছি। I am the Lord—যীশুর এই উক্তিটিকে খৃষ্টান ভাল করিয়া বুঝিল না, বোধ হয় কখনও ভাল করিয়া বুঝিবার চেষ্টা করে নাই; তাহা হইলে খৃষ্টধর্ম্ম সেন্ট পলের রচনায় পর্য্যবসিত হইত না। সেন্ট পল যীশু খৃষ্টকে Lord করিয়া দাঁড় করাইলেন। যীশুর I am the Lord,—আমি অহংই একমাত্র ব্রহ্ম, কর্ত্তা, পুরুষ,—বেদান্তের এই চরম সূত্র, এই পরম সত্যটী কদর্থে মাটি হইয়া গেল। লোকে যীশুখৃষ্টকে লর্ড ঠাওরাইয়া তাঁহার পূজা আরম্ভ করিয়া দিল। যীশুর Come unto Me and ye shall be saved —এই Me—এই আত্মানং বিদ্ধি, তাহা হইলেই তোমার মুক্তি হইবে; এত বড় এত মোটা কথাটা কেমন করিয়া যে বিকৃত হইয়া দাঁড়াইল যে, যীশুখৃষ্টের কাছে গেলেই মুক্তিলাভ হইবে তাহা বিস্ময়জনক। শ্রীকৃষ্ণ যখন আপনার মধ্যে বিশ্বরূপ প্রদর্শন করিলেন, তখন তিনি কি বিস্মিত মানবকে এই তত্ত্বটী বুঝাইলেন না যে, কে কাহাকে মারে, কে কাহার হিংসা করে? দিব্যচক্ষে চাহিয়া দেখ, সমগ্র বিশ্ব আমাতে অহং-এতে লীন। যাক, ও সকল কথা। আমি বলিতে চাই যে, বেদান্ত ও বৈষ্ণব তত্ত্ব অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে সম্বদ্ধ; কিন্তু মজা এই যে, বেদান্তে আমি বড়, বৈষ্ণবতত্ত্বে আমি ছোট। জ্ঞানমার্গ অনুসরণ কর, আত্মানং বিদ্ধি, তোমার মুক্তিলাভ হইবে; ভক্তিমার্গ অনুসরণ কর, আপনাকে তৃণা-দপি সুনীচ কর, ভোক্তা না হইয়া ভোগ্য হও, 'অহং'কে 'ত্বম'-এর সেবায় উৎসর্গ কর, তোমার মুক্তিলাভ হইবে।

অজিত বাবুর রচনা পড়িয়া মনে হয় যে তিনি এই তত্ত্বটী বোধ হয় বুঝিয়াছেন, আবার মনে হয় বুঝিতে চেষ্টাও করেন নাই। তাঁহার 'কাব্য-পরিক্রমা'য় লেখা আছে,—"বৈষ্ণবের লীলাতত্ত্বের আভাস উপনিষদের মধ্যে নানা স্থানে থাকিতে পারে, কিন্তু সেই তত্ত্ব উপনিষদের মধ্যে

পরিস্ফুট আকার লাভ করিয়াছে একথা কোন মতেই বলা যায় না। উপনিষদের যোগতত্ত্বে বেদান্ত শাস্ত্র তৈরি হইতে পারে, কিন্তু তাহা হইতে কাব্যকলা সমুৎসারিত হয় না। বৈষ্ণবের লীলাতত্ত্বে অনুভূতির বিচিত্রতা ও প্রসার এমন বাড়িয়া যায় যে কাব্যকলাকে আশ্রয় করিয়া তাহা আত্মপ্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারে না। এইজন্য উপনিষদ হইতে আমরা দর্শন-শাস্ত্র পাইয়াছি, কিন্তু বৈষ্ণব ভক্তিবাদ হইতে কেবল দর্শন-শাস্ত্র নহে অপূর্ব্ব ভক্তিকাব্য সকলও সম্ভাবিত হইয়াছে।" ইহার বিরুদ্ধে বলিবার আমার বিশেষ কিছু নাই। কিন্তু তাঁহার 'বাতায়ন'-গ্রন্থে তিনি লিখিয়াছেন,—"বাংলা দেশের বৈষ্ণব ধর্ম্মের পিছনে সেই নিরাবরণতার কাঠিন্য না থাকাতে তাহা ভক্তিকে বিশ্বপ্রকৃতিতে, মানবের জ্ঞান ও কর্ম্মের সাধনায় বিস্তারিত না করিয়া আপনাতেই আপনি পর্য্যাপ্ত হইবার চেষ্টা পাইয়াছে। ভক্তিই বল, জ্ঞানই বল,—কিছুই আপনাকে আপনি খাইয়া বাঁচিতে পারে না। বিশ্বের মধ্যে তাহাদিগকে প্রসারিত করিয়া না দিলে তাহারা মাদকতার সৃষ্টি করে। কেবলি রাধিকা সাজিয়া, কখনো বিরহ, কখনো মিলন, কখনো মান, কখনো অভিমানের কাল্পনিক লীলায় হৃদয়বৃত্তিকে উত্তেজিত করিয়া যে সাধনা, তাহার সঙ্গে বিশ্বের জ্ঞান বিশ্বমানবের বিপুল ইতিহাসের বিচিত্র সৃজনলীলার কোন যোগ থাকে না। বৈষ্ণব-কাব্যে তাই মাধুর্য্যের উচ্ছ্বাস আছে প্রচুর, কিন্তু সে মাধুর্য্যের মধ্যে কোন বড় সত্যের প্রতিষ্ঠা নাই। তাহা অশান্ত, চির-অপরিতৃপ্ত।" বৈষ্ণব mysticism সম্বন্ধে পূর্ব্বে যাহা বলিয়াছি, তাহার পরে অজিত বাবুর এই মন্তব্য সম্বন্ধে আর কিছু বলা অনাবশ্যক। তিনি ইহার মর্ম্মস্থানে আদৌ পৌঁছাইতে পারেন নাই।

এখন যদি বুঝিতে চেষ্টা করা যায় যে রবিবাবু সম্বন্ধে অজিত বাবুর উক্তিগুলি সমর্থনযোগ্য কি না, তাহা হইলে কিছু মুস্কিলে পড়িতে হয়।

তাঁহার জীবনের সাধনায় বেদান্ততত্ত্ব ও বৈষ্ণবতত্ত্ব জৈব মিলনে মিলিত হইয়া এক অপরূপ নূতন রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে কি না সেই biologico-spiritual processএর বিশ্লেষণ করিবার সামর্থ্য আমার নাই। অজিত বাবু নিজেই বলিয়াছেন,—তাঁহার ভক্তিকাব্যের এই নবরূপকে বিশ্লেষণ করিয়া তাহার কি পরিমাণ অংশ উপনিষদের এবং কি পরিমাণ অংশ ভক্তিতত্ত্বের—তাহা নির্দ্দেশ করিতে যাওয়া ব্যর্থ চেষ্টা মাত্র। অতঃপর সেই খৃষ্টীয় স্বর্গমর্ত্ত্যের কল্পিত ব্যবধানের তত্ত্ব রবিবাবুর কাছে অত্যন্ত স্থূল ও ভ্রান্ত হইতে পারে; কিন্তু স্বর্গের রাজা না হইলেও, রবিবাবুর ভগবান রাজার মত দূর হইতে ভক্তের পূজা গ্রহণ করিয়া থাকেন; এই ভাবই বোধ হয় সাধক কবির স্থায়ী mystic mood; তিনি বৈদান্তিক নন্, বৈষ্ণবও নন্, কিন্তু তাহাতে তাঁহার গৌরব ক্ষুণ্ণ হইবে কেন? অভিসারিকার কুঞ্জে রবিবাবুর লীলাময় পুরুষ মালাগাছটি রাখিয়া চলিয়া যান্ না; সুপ্তোত্থিতা নায়িকা দেখিলেন,—এ ত মালা নয়, 'এ যে তোমার তরবারি!' এই বীরবেশে অভিসার বৈষ্ণব সাহিত্যে নাই, বৈষ্ণব কখনও কল্পনাও করিতে পারে না; কিন্তু তাই বলিয়া কি এই mystic mood এর সম্মুখে আমরা নতশির হইব না? আমরা কি জানি না যে এই mood ও একান্ত সত্য;—লীলাময় পুরুষ বলিতেছেন—I bring thee a sword, not peace—এ উক্তি আমাদের পরিচিত নহে কি?

রামেন্দ্র বাবুর 'কর্ম্মকথা' সম্বন্ধে অজিত বাবু যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, সেখানেও তাঁহার সহিত আমার মতভেদ রহিয়াছে। 'আচার' প্রবন্ধটাই তাঁহাকে বিশেষভাবে পীড়িত করিয়াছে। কিন্তু রামেন্দ্র বাবু বলিতেছেন—"এই সকল কৃত্রিম বিধানে ব্যক্তিগত স্বাধীনতার অযথা সংযম ঘটিতে পারে, সঙ্কীর্ণতার প্রশ্রয় হইতে পারে, এ সকলও আমি অস্বীকার করিতে পারিব না।...সমাজ হইতে এই সকল কৃত্রিম আচার

উঠাইয়া দিলে মানবসমাজ একেবারে পশুসমাজে পরিণত হইবে।... ...বাস্তবিক পশুসমাজে যেমন সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত স্বাধীনতা আছে, মনুষ্য-সমাজে তাহার কিছুই নাই। পশুসমাজের সদস্যগণ কোনরূপ কৃত্রিম অত্যাচারের দাস নহে। এ বিষয়ে তাহাদিগকে ষোল আনা প্রশংসাপত্র দেওয়া যাইতে পারে। লোকাচার ও দেশাচারের যত কিছু খুঁটিনাটি, যত কিছু বন্ধন, সমস্তই এই মনুষ্যসমাজেই বর্ত্তমান।" সমালোচক বলেন—"এই কঠিনতা যতই বিস্ময়কর হোক্, ইহাকে জীবনের পরিচায়ক বলিয়া মনে করিতে পারি না। জীবন কোন এক জায়গায় বাঁধা পড়িতে চাহে না বলিয়াই, তাহাকে অবিরত চলিতে হয় বলিয়াই, বিধাতা তাহাকে কঠিন করিয়া সৃষ্টি করেন নাই।" এখন প্রশ্ন এই যে, কেন ইহাকে জীবনের পরিচায়ক বলিয়া মনে করিব না? পাশ্চাত্য মনীষিরা জড়ত্ব ও জীবন বলিয়া দুটো কল্পিত মাপকাটি লইয়া সমস্ত জিনিষের পরিমাপ করেন বলিয়া আমাদের কাছেও কি ঐ দুটি জিনিষ একান্ত পৃথক ও আবশ্যক? এটা জড়ত্বের পরিচায়ক, ওটা প্রাণের পরিচায়ক, এসব অত্যন্ত সাধারণ পাশ্চাত্য বুকনি ব্রাহ্মণ্য সাহিত্যপুষ্ট বাঙ্গালীর মুখে শোভা পায় না। যে ব্রাহ্মণ্যসভ্যতা জড় ও জীবনের দ্বন্দ্ব ও বিরোধ ঘুচাইবার জন্য একান্ত সাধনা করিয়াছিল; জড় ও জীবনের মধ্যে সমস্ত ব্যবধান লুপ্ত করিয়া দিয়াছিল; নিত্যং, শান্তং আনন্দং-এর প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া সমস্ত মানবজীনটাকে বিধি ব্যবস্থায় নিয়ন্ত্রিত করিয়া কর্ম্মকাণ্ডে ভর দিয়া জীবনটাকে একটা বিরাট যজ্ঞাহুতিতে পরিণত করিয়াছিল; রবিবাবুর বহুসহস্র বৎসর পূর্ব্বে যে ব্রাহ্মণ্য সভ্যতা বৈরাগ্য ও সন্ন্যাসকে হেয় মনে করিয়া স্পষ্ট বলিয়াছিল—'বৈরাগ্যসাধনে মুক্তি, সে আমার নয়'; উপনিষদের বৈদিক যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া অন্ততঃ গীতার পৌরাণিক যুগ পর্য্যন্ত কর্ম্ম-কথা প্রচার করিয়া

আসিয়াছিল; সেই ব্রাহ্মণ্য সভ্যতার শেষ কথা এখনও বলা হয় নাই। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে নানা ভাববিপর্য্যয় ও ধর্ম্ম-বিপ্লবের মধ্যে রামেন্দ্রবাবু বাঙ্গালীকে কর্ম্মরূপ যজ্ঞানুষ্ঠানের কথা শুনাইয়াছিলেন; বেদজ্ঞ ত্রিবেদীর মুখে ইহা অশোভন হয় নাই। নানা ঐতিহাসিক কারণে ব্রাহ্মণ্য সভ্যতা সংসারারণ্যের মাঝখানে লোকচক্ষুর অন্তরালে বিচিত্র আচার ও বিধিব্যবস্থার গণ্ডির মধ্যে হোমাগ্নি জ্বালিয়া রাখিয়াছে; জগতের নাগরিকগণের কলকোলাহল সেখানে পৌঁছায় নাই; হয় ত সে বাহিরের কোনও সংবাদ রাখে নাই; কিন্তু সে ঐ আচার ও বিধিব্যবস্থার সাহায্যে আত্মরক্ষা করিয়া আসিয়াছে; আমাদের পক্ষে ইহাই পরম লাভ। কারণ জগতের সঙ্গে এখনও তাহার বোঝা-পড়া বাকি আছে। একদিন ভারতবর্ষের স্ত্রীপুরুষের শিক্ষা দীক্ষার ভার ভারত-বাসীকে লইতে হইবে। তখন আচার ও বিধি-ব্যবস্থা অনায়াসেই রূপান্তরিত হইবে। ওগুলো ত বহিরাবরণ। পুরাতন আচার ও বিধিব্যবস্থার দিন ফুরাইলে কিন্তু নূতন আচার ও বিধি ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে। কখনও স্বেচ্ছাচার ও স্বৈরাচারের মধ্যে ব্রাহ্মণ্য সভ্যতার চরম বাণী উদ্গীরিত হইবে না। এক সময়ে যে আচার ও বিধিব্যবস্থা সমাজের পক্ষে উপাদেয় ছিল, কালক্রমে তাহা হেয় বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে, এ কথা রামেন্দ্রবাবু ত অস্বীকার করেন নাই। স্বনামখ্যাত ফরাসী লেখক আনাতোল ফ্রাঁস তাঁহার Revolt of the Angels নামক পুস্তকে দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, স্বর্গের রাজা ভগবান বেশী দিন রাজত্ব করিতে করিতে বিগ্‌ড়াইয়া যান, তখন শয়তান তাঁহাকে পদচ্যুত করিয়া ভগবান হইয়া বসেন; কালক্রমে শয়তানও বিগ্‌ড়াইয়া যান, তখন ভগ্‌বান তাঁহাকে পদচ্যুত করিয়া আবার রাজা হইয়া বসেন; অমরাবতীর ইন্দ্রত্ব লইয়া দেবাসুরের চিরন্তন বিরোধের

কথা কালচক্রনেমির ঘর্ঘরশব্দমুখরিত ভারতবর্ষের পৌরাণিক সাহিত্যে ধ্বনিত হইয়া উঠে নাই কি? আচারের নামে শিহরিয়া উঠিলে চলিবে কেন? সমাজরক্ষার্থ আচার আবশ্যক; আচার-রক্ষার্থ সমাজ প্রতিষ্ঠিত বা পরিচালিত হয় না। আচার বিগড়াইয়া গেলে, আচার-পীড়িত হইয়া সমাজ বিগড়াইয়া গেলে বিদ্রোহ হইবেই; কিন্তু সে বিদ্রোহ যেন Revolt of the Angels হয়; তজ্জন্য নূতন শিক্ষার ও দীক্ষার প্রয়োজন।

অজিত বাবু লিখিয়াছেন—"এ কাল যে আবরণ মোচন করিবার কাল—বহুযুগসঞ্চিত সংস্কারের একটি একটী করিয়া আবরণ খসাইয়া সমাজকে, মানুষকে, মানুষের সম্বন্ধগুলিকে, বিশ্বজগৎকে একেবারে তাহার যথাযত মর্ম্মস্থানে দেখিবার জন্য এ কালের মানুষের মন যে চেষ্টা করিতেছে, তাহার প্রমাণ আধুনিক সাহিত্য হইতেই প্রচুর পাওয়া যায়। হেন্‌রিক্ ইব্‌সেন্, মেটর্লিঙ্ক, বার্ণার্ড শ, এচ জি ওয়েল্‌স্, হাউপ্টমান, বদ্‌লেয়ার প্রভৃতি প্রসিদ্ধ সাহিত্যিকগণের যে কোন রচনা পড়িলেই দেখা যইবে যে, হয় সমাজের কোন পাকাপোক্ত সংস্কারের পর্দ্দা তুলিয়া সমাজের ভিতরকার জীবন-নাট্যলীলাকে তাঁহারা উদ্‌ঘাটন করিয়া দেখাইতেছেন, নয় স্ত্রীপুরুষের সম্বন্ধঘটিত সংস্কারকে ছিন্ন করিয়া তাহাদের সম্বন্ধের যথার্থ স্বরূপ নির্ণয়ের জন্য চেষ্টা করিতেছেন!" এ কথা আমি মানি। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে "ভারতবর্ষ" পত্রে আমি দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছিলাম, য়ুরোপীয় সাহিত্যে কেমন করিয়া ইব্‌সেনের আবির্ভাব হইয়াছিল। এইখানে কিন্তু একটি কথা বলা আবশ্যক মনে করি। নিরাবরণ সত্যকে দেখিবার ও দেখাইবার চেষ্টা উনবিংশ শতাব্দীর বহুপূর্ব্বে য়ুরোপে হইয়াছিল। বিলাতের টাইমস্ পত্রিকা কয়েক বৎসর পূর্ব্বে (২রা নভেম্বর ১৯১৭) মার্টিন লুথার সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন :—

"He found himself in a world in which the greatest things in life were smothered by an artificial dress. There were artificial sins, artificial good works, artificial pardons, non-natural ideals, artificial obligations of all kinds." সর্ব্বপ্রকার কৃত্রিমতার বিরুদ্ধে তিনি অস্ত্রধারণ করিয়াছিলেন। আবার কোথা হইতে সভ্য প্রটেষ্টাণ্ট্ জগতে এত নূতন কৃত্রিমতার বন্ধন আসিয়া জুটিল যে গত অর্দ্ধ শতাব্দীর য়ুরোপীয় সাহিত্য সমস্তটাকে লইয়া আবার নাড়াচাড়া করিতে আরম্ভ করিল? সন্ন্যাসী লুথার ত সন্ন্যাসিনী ক্যাথ্রিণ বোরিয়াকে বিবাহ করিয়া গার্হস্থ্য ধর্ম্মের আবশ্যকতা ও পবিত্রতা জগতের সম্মুখে ঘোষণা করিয়াছিলেন। আজ সেই গার্হস্থ্য ধর্ম্মের বিরুদ্ধে প্রটেষ্টাণ্ট জগতের অসংখ্য নরনারী বিদ্রোহী হইয়া দাঁড়াইয়াছে কেন? প্রেমকে অস্বীকার তাঁহারা করেন না; কিন্তু পাশ্চত্য রমণী চিত্রাঙ্গদার মত প্রশ্ন করিয়া বসেন—"এ প্রেমের গৃহ আছে?" বিবাহবন্ধন নহিলে যদি গৃহ না হয়, না হউক; সে বন্ধনে যে ধরা দিয়াছে, সেইত প্রেমকে ক্ষুণ্ণ করিয়াছে। বিবাহ-বন্ধনটার কোনও সংস্কার চলে না কি? প্রেমের সঙ্গে গৃহের সামঞ্জস্যবিধান বোধ হয় সম্ভবপর নয়; তবে বন্ধনে ধরা দিই কেন? ফিওডোর সলোগবের আলোচনা ইংরাজি অনুবাদে দিতেছি:—"Love says 'No' to the world, the lyrical 'No';—marriage says 'Yes' to it, the ironic 'Yes'. To be in love, to strive, yet not to possess,—that is the poetry of love, sweet but illusive. Externally love contradicts the world and conceals its fatal discord. To be together, to say 'Yes' to some one, to yield oneself,—that is the way in which life reveals its irrecon-

ciliable contradictions. And how to be together when we are such solitary souls? And how to yield oneself? Mask after mask falls off, and it is terrible to see Janus-faced actuality. A weariness comes on,—what has become of love which had prided itself on being stronger than death?"

ঠিক আমাদের রবিবাবুর উক্তির রুষীয় সংস্করণ বলিয়া মনে হয় না কি?

এর-ই মাঝে শ্রান্তি কেন আসে?
উঠিবারে করি প্রাণপণ,
হাসিতে আসে না হাসি, বাজাতে বাজে না বাঁশী
সরমে তুলিতে নারি নয়নে নয়ন।
কেন তুমি মূর্ত্তি হয়ে এলে?
রহিলে না ধ্যান ধারণার?
সেই মায়া উপবন. কোথা হ'ল অদর্শন,
কেন হায় ঝাঁপ দিতে শুকাল পাথার?

আরও মনে পড়ে রবি বাবুর সেই—

বাঁশী বেজেছিল, ধরা দিনু যেই
থামিল বাঁশী।
এখন কেবল চরণে শিকল
কঠিন ফাঁসি।

নরওয়ের ইব্‌সেন বলিলেন—গৃহ যখন পুতুল খেলার ঘরে পরিণত হয়, তখন এই চরণে শিকল এই পরাণে ফাঁসি দিয়া মরে—পুরুষ নয়, নারী। নারীকে পুরুষ নিজের বিলাসের সামগ্রী করিয়া exploit করিতেছে। সুইডেনের ষ্ট্রীণ্ড্‌বর্গ পুরুষ ও নারীর কথোপকথনচ্ছলে ইহার

যে উত্তর দিয়াছেন. তাহার কিয়দংশ ইংরাজি অনুবাদেই দিতেছি, বাকিটা বাংলায় ভাষান্তরিত করিলাম।—

স্ত্রী। এল্‌বার্ট, আমি তোমার ওপর নির্ভর কর্‌তে পারি, কেমন? পারি না কি? যে কাজে আমি আমার জীবন উৎসর্গ করেছি, তুমিও সে কাজ কর্‌বে?

স্বামী। সেটা কি কাজ?

স্ত্রী। নিপীড়িতা নারীদিগের জন্য তুমি কিছু কর্‌বে;—কেমন, কর্‌বে না?

স্বামী। সেই নিপীড়িতা নারীরা কোথায়?

স্ত্রী। কি? তুমি কি আমাদের মহদনুষ্ঠান থেকে সরে দাঁড়ালে? আমাদের বিপদে ফেলে ছেড়ে যাচ্ছ না কি?

স্বামী। কোন্ অনুষ্ঠানের কথা বল্‌চ?

স্ত্রী। নারীদিগের উন্নতি,—The Women's Cause!

স্বামী। আমি এর কিছুই জানি নে।

স্ত্রী। তুমি এর কিছুই জান না? ওঃ, বটে! তুমি অবশ্য স্বীকার কর্‌বে যে নিম্নশ্রেণীর স্ত্রীলোকদিগের অবস্থা শোচনীয়।

স্বামী। না, আমি ত দেখি না যে তাঁদের অবস্থা পুরুষদের অবস্থার চেয়ে একটুও খারাপ। পুরুষদের exploiterদের হাতে থেকে পুরুষগুলোকে উদ্ধার কর দেখি, তা'হলে নারীরাও মুক্তিলাভ কর্‌বে।

স্ত্রী। কিন্তু যে সকল অভাগিনীরা আত্মবিক্রয় কর্‌তে বাধ্য হয়, আর যে সকল পাষণ্ড Scoundrels—

স্বামী। The Scoundrels who pay! Has ever a man taken payment for a pleasure which both enjoy?

স্ত্রী। সে কথা হচ্চে না, কিন্তু এটা কি অন্যায় নয় যে আইনে একজন শাস্তি পাবে, আর একজন পাবে না?

স্বামী। There is no injustice in that. The one has degraded herself until she has become a source of infection, and therefore the state treats her as it treats a mad dog. Whenever you find a man degraded to that degree, well, put him under police control, too. Oh, you pure angels, who despise men and look upon them as unclean beasts !......আচ্ছা, ব্যাপারটা কি ? (স্ত্রীর হাতে একখানা পাণ্ডুলিপি দেখিয়া) ওঃ পার্লামেণ্টে একটা বিল্-এর প্রস্তাব করতে হবে ? আমি তোমার যন্ত্রস্বরূপ হব ? Is that moral ? Strictly speaking, is it honest ?

অধিক উদ্ধৃত করা নিষ্প্রয়োজন। ষ্ট্রীণ্ডবর্গ দেখাইলেন কেমন করিয়া এক দণ্ডের মধ্যে দুটো কথা কহিতে না কহিতেই স্ত্রী স্বামীকে exploit করিতে চায়। আধুনিক নাট্যজগতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নাটক-রচয়িতা ব্রিও এই গৃহস্থ-সমস্যার যে নিখুঁত চিত্র দিয়াছেন, তাহা দেখিয়া মনে হয় যেন তিনি বলিতেছেন যে, গৃহ Doll's House এ পরিণত হইলেও, সে গৃহ ভাঙ্গিবার অধিকার কোনও নারীর নাই, যতক্ষণ পর্য্যন্ত না অন্য কোনও ভাল ব্যবস্থা সমাজে সম্ভবপর হয়। তিনটি ভগিনী। বড় দুটীর মধ্যে এঞ্জেলি যৌবনে পতিতা, কেরোলিন চিরকুমারী ; কনিষ্ঠা জুলী,—গৃহিণী। নাটকের শেষ অঙ্কে তিন বোনের দেখা হইয়াছে ; জুলী গৃহত্যাগে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

জুলী। আমি তোমার জন্যে অপেক্ষা কর্‌ছিলুম, কেরোলিন। আমি শীগ্‌গির চলে যাচ্চি, শুন্‌তে পাচ্চি আমার স্বামী আস্‌চেন। আমি তাঁকে আর দেখ্‌তে ইচ্ছে করি না। আমি যাচ্চি।

কেরো। তুমি কি কর্‌বে ?

জু। তুমি যা কর, আমি তাই করব ; কোথাও একটা বাসা ভাড়া করব, আর কিছু কাজ নেব।

কেরো। কি রকম কাজ ?

জু। আমি জানি না,—যা' পাই।

কেরো। অমন কোরো না, জুলী, কোরো না ! (কম্পিত কণ্ঠে) যদি তুমি একটু জান্‌তে !

জু। কি ?

কেরো। একা থাকার যন্ত্রণা।

জু। আমি ভয় করিনে। আমি এত পরিশ্রম করব যে, বসে বসে ভাববার সময় আমার থাকবে না।

কেরো।—তুমি কাজ করবে ! (দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া) যে নারী একাকিনী থাকে, তা'র পক্ষে অর্থ উপার্জ্জন করা সহজ নয়।

জু। বাজে কথা।

কেরো।—আমি ভাল করে জানি ব'লেই বলচি। দোকানে কাজ নিয়ে গেলুম ; তা'রা যে রকম ঘৃণা ও অবজ্ঞাভরে সময়ে সময়ে তাহা প্রত্যাখ্যান করে, সে রকম অবজ্ঞা ত'ারা পুরুষ মানুষকে দেখাতে সাহস করে না। এটা অত্যন্ত সত্য কথা। কারণ আমি দ্বিগুণ অসহায়া, যে হেতু আমি নারী আর আমি কাজের উমেদার।

জু। *কিন্তু অন্ততঃ তোমার নিজের ঘরের মধ্যে তুমি ত স্বাধীন।*

কেরো। স্বাধীন ! (কাষ্ঠহাসি হাসিয়া) সে যদি স্বাধীনতা হয়, তবে আমাকে দাসীত্ব দাও।

জু। আমার বন্ধু বান্ধব থাকবে।

কেরো। তুমি তাই মনে কর ? স্ত্রীলোকেরা তোমার সঙ্গে মিশ্‌বে না, কারণ তুমি স্ত্রী হ'য়েও স্বামীকে ছেড়ে একা বাস কর্‌চ, আর তুমিও

স্ফূর্ত্তিহীন হয়ে থাক্‌বে। আর পুরুষরা? লোকে কি বল্‌বে,—যদি পুরুষরা তোমার সঙ্গে দেখা করতে যায়?

জু। লোকে কি বল্‌বে তা' আমি গ্রাহ্য করি না।

কেরো। তবু নিজেকে বাঁচাবার জন্যে তোমার দরজা'র গোড়া থেকে তাদের হাঁকিয়ে দিতে হবে।

জুলী। তবে তুমি কি পরামর্শ দাও? আমি আমার স্বামীর ঘর কর্‌ব?

কেরো। হায়, জুলী, লক্ষ্মী বোনটী আমার, তুমি আক্ষেপ কর্‌চ যে তুমি যতটা চাও, তোমার স্বামী ততটা তোমাকে ভালবাসেন না। তা'তে আমি কি বল্‌ব, আমি অভাগিনী, য'াকে কোনও পুরুষ কখনও বুকের কাছে টেনে নেয় নি?—যে আমি হাড়ে হাড়ে বুঝতে পারি, আমি যেন একটা জিনিষ একান্ত স্বতন্ত্র, অনাবশ্যক, অপদার্থ, অসম্পূর্ণ! তুমি জান না যে স্ত্রীলোকের পক্ষে সেটা কি ভয়ঙ্কর শূন্যতা।......না, জুলী, আবার তোমার জীবনকে নষ্ট কোরো না। যদি স্বামীর সঙ্গে বাস কর্‌তে না পার, অন্ততঃ আমার দৃষ্টান্ত অনুসরণ কোরো না। আমার মতন হয়ে থাক্‌তে চেষ্টা কোরো না। আমাদের তিন বোনের মধ্যে একজনই যথেষ্ট...

জুলী। তবে, যে-স্বামীকে আমি ঘৃণা করি, আমার খাওয়া পরার জন্যে তার আশ্রয়ে থাকার চেয়ে, আমি ইচ্ছামত অন্য কোনও পুরুষের কাছে আত্মবিক্রয় কর্‌ব।

পতিতা এঞ্জেলী।—তুমি পাগল! পাগল! তোমার স্বামীর সঙ্গে পুনর্মিলিতা হও। সেইটেই তোমার পক্ষে সব চেয়ে ভাল।

জুলী।—সে ত সকলেই বলে। আমি তোমায় বল্‌চি, মিলিত হব না, হব না।

এঞ্জেলী।—তোমার বিবাহিত জীবন যতই খারাপ হোক্, শীগ্‌গির আবার তাই ফিরিয়ে পাবার জন্যে হাহাকার করবে; অথবা কেরোলিনের দারিদ্র্যকে বরণ করতে উৎসুক হবে।

জুলী।—তুমি তাই মনে কর?

এঞ্জেলী।—(উচ্ছ্বাসভরে) তুমি জান না, তুমি বোঝ না জুলী, তাই তুমি অমন করে কথা কচ্চ। হায়, তুমি বোঝ না।

জুলী।—তুমি ত নিজে এ কাজ করেছিলে।

এঞ্জেলী।—হাঁ, আমি করেছি। কিন্তু এর পুনরভিনয় করবার আগে আমি গলায় দড়ি দিয়ে মরতে প্রস্তুত আছি। জুলী, আমি তোর হাতে ধর্‌চি। আমি কি বল্‌ব? কেমন করে তোকে বারণ কর্‌ব? আমার সমস্ত লজ্জার কাহিনী যে তোকে আর কেরোলিনকে বল্‌তে পার্‌চি নে। আমার মুখ দিয়ে সে সকল কথা বা'র করাস নে।

তাহার পরে এঞ্জেলীকে জুলী তাহার পুরাতন ইতিহাস বলিতে বাধ্য করিল। এঞ্জেলী বিদায় লইল। স্বামী আসিলেন। স্বামী স্ত্রী পরস্পরের ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। জুলী বলিলেন—"I was full of romantic ideas. I thought marriage something quite different from what it is"; জুলীর পিতা আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন—"Ah my children, everything comes right when once you make up your mind to be like the rest of the world"; মেয়ে উত্তর করিলেন—'Yes; like the rest of the world. I dreamed of something better. But it seems it was impossible."

এই যে rest of the world-এর মতন হইয়া থাকা, জগৎ সংসারে আর সকলে যেমন আছে সেই রকম হইয়া থাকা, ইহারই বিরুদ্ধে সংস্কারক-

গণ অস্ত্রধারণ করে। কিন্তু যতদিন Something better না হয়, অপেক্ষাকৃত ভাল ব্যবস্থা না হয়, ততদিন পুরাতনের পদ্ধতি ও বিধিব্যবস্থা মানিয়া চলিতেই হইবে। গতিশীলতা, ও স্থিতিশীলতা, জড়ত্ব ও জীবত্ব প্রভৃতি তত্ত্বের ভিতর দিয়া এই সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করা বৃথা।

পাশ্চাত্য জগতে নারী ও পুরুষের বিরোধ শুধু যে ঘরের কোণে প্রকাশ পায় তাহা নহে, অর্থোপার্জ্জনের জন্য কর্ম্মক্ষেত্রে নারী অবতীর্ণ হইয়া অনেক দিন হইতে পুরুষের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে আরম্ভ করিয়াছে। ব্রিও'র 'নারীর সত্ব' নামক নাটক হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিতেছি।

নারী। যদি তোমরা প্রতিদ্বন্দ্বিতা না চাও, তবে তোমাদের মেয়েদের ঘরে রাখ, তাদের ভরণপোষণ কর।

পুরুষ। ঠিক ঐটাইত আমরা চাই ; পুরুষ ওয়ার্কশপ্‌এ কর্ম্মক্ষেত্রে থাক্‌বে, স্ত্রীলোক ঘরে থাক্‌বে।

নারী। স্ত্রী যদি আজকাল ঘরে না থাকে, তা'র কারণ হ'চ্চে পুরুষ থাকে শুঁড়ির বাড়ীতে।

পুরুষ। পুরুষ শুঁড়ির বাড়ী যায়, কারণ তা'র ঘরকন্না কখনও সে ভাল দেখ্‌তে পায় না, সন্ধ্যার পর বাড়ী গিয়ে খাবার পায় না ; আর গৃহিণী স্ত্রীর পরিবর্ত্তে সে পায়—কোনও কারখানায় সমস্ত দিন খেটে খেটে পরিশ্রান্তা একটা মজুরণী।

নারী। তোমরা কি মনে কর স্ত্রীলোকরা আমোদ করবার জন্যে কারখানায় কাজ করতে যায় ? তোমরা কি অনুমান কর না যে তা'রা ঘরের মধ্যে শান্ত জীবন ঢের বেশী পছন্দ করে ?

পুরুষ। তবে তা'রা সেখানে থাক্‌লেই পারে।

নারী। কে তা'দের খাওয়াবে পরাবে ?

পুরুষ। তা'দের স্বামিরা।

নারী। প্রথমতঃ তা'দের স্বামী পাওয়া দরকার। কিন্তু যা'দের স্বামী নেই,—কুমারী, বিধবা, পরিত্যক্তারা? তা'দের অবৈধ পুরুষসঙ্গ করতে বাধ্য করার চেয়ে কোন একটা ব্যবসায়ে লাগিয়ে দিলে ভাল হয় না কি? তা'দের মধ্যে কেউ কেউ পুরুষের সাহায্য ভিক্ষা করা থেকে অব্যাহতি পেতে চায়। তুমি কে দেখ্‌তে পাচ্ছ না যে অনেক স্ত্রীলোকের পক্ষে 'কাজ' মানে 'স্বাধীনতা'? তা'রা কাজ করবার অধিকার চাচ্চে বোলে তুমি কি তা'দের দোষ দিতে পার? তা'রা ঐ অধিকারটুকুর জন্যে লড়াই কর্‌চে।

পুরুষ। আমার মনে হয় না যে, সে অধিকার বাঞ্ছনীয়। নিশ্চয়ই বাঞ্ছনীয় নয়। কঠিন পরিশ্রমের ভিতর দিয়া মনে কর তুমি নারীকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিলে; তা'র হাত থেকে তা'র ছেলেপুলেদের নিয়ে অন্যত্র সেগুলাকে মানুষ করবার ব্যবস্থা কর্‌লে। যখন তুমি তা'কে গৃহস্থের সমস্ত কর্ত্তব্য থেকে বিচ্যুত করে ফেল্‌লে, সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত গার্হস্থ্য স্বচ্ছন্দতা থেকে তা'কে বঞ্চিত করলে; তুমি কেমন কোরে বল্‌তে পার সে আবার ফিরে দাঁড়াবে না, আবার তা'র পুরাণো দাসীত্ব ফিরে চাইবে না,—তা'র গৃহের শান্ত আশ্রয়, তা'র স্বামীর সেবা ও সন্তান পালনের অধিকার সে ফিরে চাইবে না?

স্ত্রী। তুমি কি দেখতে পাচ্চনা যে ঐ জিনিষগুলোই অধিকাংশ স্ত্রীলোক এখন চাচ্চে? তোমরা যেমন চাও, আমরাও তেমনি চাই যে স্ত্রীলোকরা ঘরে থাকে। কিন্তু সেটা তোমরা কেমন কোরে সম্ভবপর করবে? এখন মদে যে টাকা উড়িয়ে দেওয়া হয়, প্রায় তত টাকা মেয়েরা কারখানায় বেতনস্বরূপ উপার্জ্জন করে। সুতরাং আসল সমস্যা হচ্চে মদ্যপানাসক্তিটাকে নষ্ট করা। কিন্তু সমাজের মধ্যবিত্ত গৃহস্থরা তা'র কোনও উপায় করবে না, কারণ শুঁড়ির ভোট তারা চায়; ঠিক ঐ কারণে

তোমার মত সোশ্যালিষ্ট নেতারাও কিছু করবে না। যা দাঁড়িয়েছে, সেটা তোমাদের মেনে নিতে হবে। প্রত্যেক সভ্য দেশের গাঁয়ে ও সহরে বাড়ীর পুরুষ মদ্যাসক্ত হ'লে সেই বাড়ী থেকে অন্ততঃ একজন নারী এসে কর্ম্মক্ষেত্রে তোমাদের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে দাঁড়াবে; আপিসে কারখানায় দোকানে তোমাদের পাশে গিয়ে বস্‌বে। তোমরা নারীকে গৃহিণীরূপে চাও না; আর যেহেতু সে কুলটা হ'তে চায় না, অগত্যা তা'কে তোমাদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা কর্‌তে হবে। তাদের কাজ করবার শক্তি তোমাদের চেয়ে বেশী, তা'রা মাতাল নয়, এই জন্যে সেই নারীরা তোমাদের জায়গা অধিকার করবে।

এই যে নারী ও পুরুষের দ্বন্দ্ব পাশ্চাত্য সমাজকে বিক্ষোভিত করিতেছে, তাহাদের সাহিত্যেও যে ইহার রেখাঁপাত হইবে, তাহাতে আর বিস্ময়ের কি আছে। কিন্তু এই সমস্ত সমস্যা আমাদের সমাজকে চঞ্চল করিতেছে কি না, তাহা সকলেরই ভাবিয়া দেখা উচিত। যে যে কারণে পাশ্চাত্য সমাজে নারী ও পুরুষ বিচিত্র, স্বাধীন, স্বতন্ত্র ও কর্ম্মক্ষেত্রে পরস্পরবিরোধী হইয়া দাঁড়াইয়াছে; সেই সমস্ত কারণপরম্পরা বিশেষভাবে অনুধাবন করা কর্ত্তব্য। কেন নারী ঘর ছাড়িয়া বাইরে আসিয়া পুরুষের সঙ্গে অহর্নিশ দ্বন্দ্ব করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে; পুরুষের স্বামিত্বকে উপেক্ষা করিয়া নিজের স্বত্বের উপর আত্মপ্রতিষ্ঠ হইতে প্রয়াস পাইতেছে; মদের ভাঁটি ও ফ্যাক্টরিগুলো কেমন করিয়া মানুষকে ঘর-ছাড়া করিল; এই ঘরে-বাইরের সমস্যা কেবলমাত্র economic কি না, তাহা মাঝে মাঝে আলোচনা করায় ক্ষতি কি? ঐ economic শব্দের মৌলিক তাৎপর্য্য যদি গার্হস্থ্য ও পৌর বিধিসমষ্টিকে বুঝায়, তাহা হইলে সেই বিধি-ব্যবস্থার ভিতর হইতে কেন নর ও নারী দ্বন্দ্ব করিতে করিতে রাস্তায় বাহির হইয়া পড়িল, তাহা বুঝিতে চেষ্টা না করিয়া, আমাদের সাহিত্যে যদি পাশ্চাত্য সমাজের

ব্যক্তিগত বিদ্রোহের প্রতিচ্ছবি ফুটাইয়া তুলিবার চেষ্টা করা হয়; আচার-বিনয় নিয়ন্ত্রিত ব্রাহ্মণ্যসমাজে উদ্দাম ব্যক্তিত্ব জাগাইয়া দিয়া 'জড়ত্ব' হইতে 'জীবত্বের' দিকে একটা ধাক্কা দেওয়া হয়; তাহা হইলে হয়ত নর-নারী ঘর ভাঙ্গিতে পারে, কিন্তু উল্টা দিক হইতে আর একটা প্রচণ্ড শক্তির আঘাত না পাইলে আবার তাহারা পরস্পরের পাশাপাশি আসিয়া দাঁড়াইবে কি? আবার তাহারা নীড় বাঁধিবে কি? এইরূপে নর-নারীকে প্রলয়ঙ্করী শক্তির ক্রীড়ণক করিয়া অদৃষ্টদেবতা আমোদ পাইতে পারেন, কিন্তু আমরা সেই অবস্থায় পৌছাইবার জন্য সাধনা করি কেন? উদ্দাম স্বাধীনতার প্রবৃত্তিকে প্রত্যেক সমাজ নানাপ্রকারে সংযত করিবার চেষ্টা করিয়াছে। বঙ্গসমাজে আচার-বিনয়-বিদ্যা প্রভৃতি কুললক্ষণ দেখিয়া নাসিকা কুঞ্চিত করিলে চলিবে কেন? আচারকে শ্রেষ্ঠ আসন দিয়া বৌদ্ধযুগের অবসান-কালে নবজাগ্রত ব্রাহ্মণ্যসমাজ আত্মরক্ষা করিতে যদি সমর্থ হইয়া থাকে, তবে এখনও তাহা আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকি কেন? এই প্রশ্ন উটিয়া থাকে। কিন্তু গৌড়ীয় ব্রাহ্মণ্যসমাজ হাঁফ্ ছাড়িতে পারিল কই? দীর্ঘ ছয় শত বৎসর ধরিয়া মুসলমানের অধিকারের মধ্যে সে কেমন করিয়া জীবন ধারণ করিল, আপনাকে স্বতন্ত্র রাখিল, সে কথা ত একটু ভাবিয়া দেখিতে হইবে। গৃহী সন্ন্যাসী বৌদ্ধ কোথায় গেল, তাহার চিহ্নমাত্রও রহিল না; কিন্তু সনাতন ব্রাহ্মণ্য সমাজ টিকিয়া রহিল ত! একবার একটা প্রবল ভাবের বন্যা আসিয়াছিল। জ্ঞানবৈরাগ্যের বিভূতি মাখিয়া বৈষ্ণব-প্রেম বাঙ্গালীকে মাতাইয়াছিল; বাঙ্গালী গৃহস্থ-জীবন নূতন রসে মজিল; কিন্তু আচারভ্রষ্ট হইয়া সমাজ কেন্দ্রচ্যুত হইল না; বন্ধনমুক্ত নর-নারী একেবারে নেড়া-নেড়ীর দল গড়িয়া বাহির হইল না। কিন্তু তা'র পরেই কি সে সমাজ দুই দণ্ড স্থির হইয়া নিজের কথা ভাবিবার সময় পাইল? য়ুরোপীয় সভ্যতার সংঘর্ষ হইতে নিজেকে দূরে রাখিবার জন্য সে নানা-

প্রকারে চেষ্টা করিতে লাগিল। আজও সে চেষ্টার অবসান হয় নাই। যাঁহারা বলেন—এত চেষ্টার কি দরকার ছিল? না হয়, লুপ্ত হইত; তবুও এই পঙ্গুত্বের বড়াই কর কেন?—তাঁহাদের উত্তরে বলিব,—পঙ্গুত্বের গৌরব করিব কেন? ব্রাহ্মণ্য সমাজ বৌদ্ধ সমাজের মত লুপ্ত হইলেই কি মানবের ইতিহাসের গৌরব বাড়িত? কে বলিল যে, সে সমাজ আপনার চারিদিকে অচলায়তনের অভ্রভেদী প্রাচীর তুলিয়া বহির্জগতের সহিত সম্বন্ধ ছিন্ন করিয়া বহুযুগ ধরিয়া জড়ত্বপ্রাপ্ত হইয়াছে। বৈদিক ও ব্রাহ্মণ্য সাহিত্য রচনা করিয়া যদি ব্রাহ্মণ লুপ্ত হইত, তাহা হইলে ক্ষোভের বিষয় ততটা হইত না। এত যুগ-যুগান্তর ধরিয়া সে যে বন্ধুর পথ অতিক্রম করিয়া চলিয়া আসিয়াছে; বৌদ্ধকে নিজের দলে টানিয়া আনিয়া, মুসলমানের কাছে আত্মসমর্পণ না করিয়া, য়ুরোপীয় সভ্যতার স্রোতে ভাসিয়া না গিয়া, সে এতদূর পথ চলিয়া আসিয়াছে,—ইহাই কি জড়ত্বের লক্ষণ? আবার যখন চিরকুমার ডাক্তার রায় মহাশয় বাঙ্গালী গৃহকে সম্প্রতি Doll's House বলিয়া কটাক্ষ করিয়াছেন, তখন মনে হয়, কোথায় এমন কি লক্ষণ দেখা গেল যে, হঠাৎ বাঙ্গালী নরনারী বিবাহের সাত পাকের মধ্যে ঘোরপাক খাইয়া পরস্পরের স্বত্ব লইয়া বোঝাপড়া করিতে বসিয়াছে? যদি Doll's House-ই হয়,—ব্রাহ্মণ্য-সমাজস্থ বাঙ্গালীর ঘরের পুতলটি কে? নারী, না পুরুষ?

নারীজীবনের এই পুতুল খেলার প্রবৃত্তিটাকে অস্বীকার করিবার জো আছে কি? য়ুরোপে স্বাধিকার-প্রমত্তা "নোরার" দিন চলিয়া গিয়াছে। এই যুদ্ধ বিপ্লবের ঘোরপাকে পড়িয়া নারী আবার বিবাহের সাত পাকের মধ্যে স্বেচ্ছায় ধরা দিতে রাজি হইয়াছেন। উল্টাদিক হইতে একটা প্রচণ্ড শক্তির ধাক্কা আসিয়া আবার নর-নারীকে পাশাপাশি দাঁড় করাইতেছে। স্বনামখ্যাতা কাউণ্টেস্ অভ ওয়ার্বিক বলিতেছেন

—"এই মহাবিপ্লবে নারী আবার পুরুষের অত্যন্ত কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন ; এখন আর তাঁহার বিবাহে আপত্তি নাই ; জননী হইয়া শুধু যে তাঁহারা নিজের জীবনকে সফল করিবেন, তাহা নহে ;—তাঁহারা মনে রাখিবেন যে, তাঁহাদের স্থিতি গতির উপর সমগ্র পাশ্চাত্য শ্বেতজাতির জীবনমরণ নির্ভর করিতেছে ; য়ুরোপের এই প্রকাণ্ড নরমেধ যজ্ঞের পরে একটা অত্যন্ত জটিল race problemএর সমাধান তাঁহাদিগকে করিতে হইবে।" নারী আবার সেই পুতুলের ঘর সাজাইয়া খেলিতে চান। কবিবর হেমচন্দ্রের ভাষা মনে পড়িতেছে ; নারী যেন বলিতেছেন—

মন দিয়ে খেল নাথ,— ফিরে হবে বাজি মাৎ
সেই খেলা আবার খেলিব ;
সেই পুঁজি সেই পণ সেই প্রাণ সেই মন
প্রাণনাথ সকলি সে দিব।

য়ুরোপে নারী আবার এই Doll's Houseএর গৃহিণী হইতে চান। মিসেস্ আলেক টুইডি লিখিতেছেন—আমি নিজে গৃহ ভালবাসি ; গৃহের সমস্ত আস্‌বাব যেন আমার জীবনের সঙ্গে অবিচ্ছিন্নভাবে সম্বদ্ধ। গৃহই আমদের জীবনের কেন্দ্র।.. নারী ও পুরুষের সাহচর্য্যই এখনকার মূলমন্ত্র ; বিরোধ ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা নহে। এই যুদ্ধবিপ্লবের মধ্যে আমাদের অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে। যাহা মুখে ভাল লাগিত না, এখন তাহা ভাল লাগে। আগে আমি রাঁধিতে জানিতাম না ; কি আহাম্মকই ছিলাম। এখন আমি রন্ধনকার্য্যে নিপুন।—We have got to live up to ideals. Home life is an idyll ; everything should be done to make it beautiful and its surroundings worthy. Our home is our pivot....Co-operation is now the

password of the sexes, not antagonism.…Life is changed for all of us. I used to say I hated porridge. I used to say I never would or could cook. It shows what a fool I was. War taught me to like the first, and become quite proficient at the second—even to making pastry in an air-raid. ইনি প্রেম ও বিবাহ-বন্ধনের চিরন্তন বিরোধের তর্ক তুলিতেছেন না। ফিওডোর সলোগবের কথা পূর্ব্বেই উদ্ধৃত করিয়াছি,—'প্রেম জগৎকে বলিতেছে, বিবাহে আমার চরম সার্থকতা ?' 'না, না, না'; সে বাঁশরীর স্বরে বলিতেছে—'না, না, না'। রহস্যময় প্রজাপতি বলিতেছেন,—হাঁ, হাঁ, হাঁ; এই হাঁ-এর ভিতরে একটা বিদ্রূপ প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে।' নারী ও পুরুষের বিচিত্র সম্বন্ধের আসল নিরাবরণ সত্য কোথায় ?

এইখানে শেষ করি। যাঁহার রচনাবলী পাঠ করিয়া আমার হৃদয়ের তারগুলি সুরে বেসুরে বাজিয়া উঠিয়াছে, তিনি সেই নিরাবরণ সত্যের অনুসন্ধানে ব্যাপৃত আছেন দেখিয়া প্রীতিলাভ করিলাম বটে; কিন্তু তাঁহাকে মৃদুভাবে, হয়ত রূঢ়ভাবে কয়েকটা কথা বলিয়া লইলাম। তাঁহার 'মেটার্লিঙ্ক'প্রভৃতি অনেকগুলি উপাদেয় প্রবন্ধ সম্বন্ধে কিছুই বলা হইল না। কিন্তু আপাততঃ তিনি লিখিয়া যাউন, আর আমরা পড়িতে থাকি ;—তাঁহার সঙ্গে আমাদের এই সম্বন্ধটুকু থাকিলেই যথেষ্ট হইবে।

পৌষ, ১৩২০।

বিহারীলাল

স্বর্গীয় কবি বিহারীলাল চক্রবর্ত্তি-বিরচিত গ্রন্থাবলীর দ্বিতীয় খণ্ড তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক সম্পাদিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। এই পুস্তকখানি হাতে করিলে আধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্যের একটি বিস্মৃতপ্রায় অধ্যায়ের কথা মনে পড়িয়া যায়। কবির জ্যেষ্ঠপুত্র যে এতদিন পরে ভগ্নস্বাস্থ্য হইয়াও এই ভাবে পিতৃতর্পণে প্রয়াসী হইয়াছেন, ইহা দেখিয়া বাস্তবিকই আনন্দ হয়।

অবিনাশচন্দ্র যখন কচি শিশু, তখন তিনি তাঁহার পিতার হৃদয়ে কতখানি স্থান অধিকার করিয়াছিলেন, তাহার যথেষ্ট পরিচয় এই পুস্তকের স্থানে স্থানে পাওয়া যায়। 'ঝটিকা সম্ভোগ' নামক কবিতায় দেখিতে পাই যে ঝড় উঠিয়াছে ; রুদ্ধকক্ষে কবি, কবিজায়া ও নিদ্রিত শিশু অবিনাশচন্দ্র ; কবি বলিতেছেন—

এই যে প্রেয়সী তুমি বসেছ উঠিয়ে,
চুপ কোরে থাক, বড় বহিতেছে ঝড়,
অবিন্ এখনো বেশ আছে ঘুমাইয়ে,
চমকিয়া উঠে পাছে করে ধড়ফড়।

* * *

এ ভয় কেবল নয় আপনার তরে,
যেই আমি চেয়ে দেখি অবিনের পানে,
বুকের ভিতর অগ্নি ওঠে ছ্যাঁৎ ক'রে,
একেবারে কিছু আর থাকে না ক' প্রাণে।
বাছারে হৃদের ছেলে অবিন্ আমার,

কিছুই জান না যাদু কি হয় বাহিরে.
ঘোরঘটা কোরে ঝড়ী শিয়রে তোমার,
গর্জ্জিয়া রাক্ষসী যেন বেড়াইছে ফিরে।

ইহারই একটু পূর্ব্বে কবিজায়া শিশুকে ক্রোড়ে করিয়া সুপ্তা ছিলেন; সেই রুদ্ধ-কক্ষে কবি একাকী জাগ্রত; বাহিরে প্রবল ঝড়; কবি বলিলেন,—

তবু আহা প্রেয়সীর কোল আলো করি,
ঘুমায় আমার যাদু অবিনাশ মণি!
দেখোরে পবন এই উগ্রমূর্ত্তি ধরি,
করো না বাছার কাণে কোলাহল ধ্বনি!

"প্রিয়তমা" নাম্নী কবিতার গোড়াতেই দেখিতে পাই—

ওরে অবিনাশ, বাছারে আমার,
ননীর পুতুল দুধের ছেলে,
স্নেহেতে মাখান কোমল আকার,
নয়ন জুড়ায় সমুখে এলে।

* * *

ম'রে যাই লয়ে বালাই বাছারে,
আকুলি ব্যাকুলি কেন অমন!
আমি ভালবাসি যেমন তোমারে'
তুমিও আমারে বাস তেমন?

পিতাপুত্রের এই ভালবাসা পুত্রের প্রথম বয়সেই পর্য্যবসিত হয় নাই। কবি তাঁহার ছেলেটির হাত ধরিয়া তাঁহাকে সাহিত্য-ক্ষেত্রে তাঁহার নিজের পার্শ্বে দাঁড় করাইলেন। ব্যাপারটি কম মধুর নহে। আজ সে কথা স্মরণ করিলে আমাদেরই মনে পুলক-সঞ্চার হয়। কবি বিহারীলালের পশ্চাতে শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার বড়ালের চিত্তে তখন সবেমাত্র

কুহকিনী কল্পনার ইন্দ্রজালময়ীছবি
অন্তরে অন্তরে
প্রতিপলে নবমুর্ত্তি নবীন অমৃতধারা
ছুটিছে লহরে !
জাগ্রত সুখের স্বপ্ন, স্বর্গের নন্দন ছায়া
সুখে ভাসিছে !

তখন সবেমাত্র শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিহৃদয়নির্ঝরের স্বপ্ন ভঙ্গ হইয়াছে ; তাঁহার চারিদিকের জগৎ সহসা রূপান্তরিত হইয়া গেল।

"সহসা আজি এ জগতের মুখ
নূতন করিয়া দেখিনু কেন ?
একটি পাখীর আধখানি তান
জগতের গান গাহিল যেন !
জগৎ দেখিতে হইব বাহির,
আজিকে করেছি মনে,
দেখিব না আর নিজেরি স্বপন
বসিয়া গুহার কোণে !
আমি—ঢালিব করুণা-ধারা !
আমি—জগৎ প্লাবিয়া বেড়াব গাহিয়া
আকুল পাগল পারা।
কেশ এলাইয়া ফুল কুড়াইয়া,
রামধনু আঁকা পাখা উড়াইয়া,
রবির কিরণে হাসি ছড়াইয়া,
দিবরে পরাণ ঢালি !
শিখর হইতে শিখরে ছুটিব,

ভূধর হইতে ভূধরে লুটিব,
হেসে খল খল, গেয়ে কল কল,
তালে তালে দিব তালি।
তটিনী হইয়া যাইব বহিয়া,
যাইব বহিয়া, যাইব বহিয়া,
হৃদয়ের কথা কহিয়া কহিয়া
গাহিয়া গাহিয়া গান,
যত দেব' প্রাণ, ব'হে যাবে প্রাণ,
ফুরাবে না আর প্রাণ !
এত কথা আছে, এত গান আছে,
এত প্রাণ আছে মোর,
এত সুখ আছে, এত সাধ আছে,
প্রাণ হয়ে আছে ভোর !"

এত আশা লইয়া রবীন্দ্রনাথের নির্ঝরিণী পাষাণকারা ভেদ করিয়া বাহির হইলেন ; কবিসখা অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী সাগর-সঙ্গতা "অভিমানিনী নির্ঝরিণীর" প্রাণের কথা শুনিলেন—

মহান্ জলধিজলে প্রাণ ঢেলে দিব ব'লে
সুদূর পর্ব্বত হ'তে আসিনু বহিয়া,
পুরাতে প্রেমের সাধ, না গণিয়া পরমাদ
কত বাধা কত বিঘ্ন দাপঠে ঠেলিয়া
এই ত সাগরজলে মিশিনু আসিয়া !
কিন্তু—কিন্তু—তবে কেন, আশাতে নিরাশ হেন,
কিছুই আশার মত হ'ল না ত হায়,—
যাহার আশ্রয় পেলে, থাকিব রে হেসে খেলে,

কইরে ! সে করে না ত ভ্রূক্ষেপ আমায়।

*　　　*　　　*

পর্ব্বতে মায়ের কোলে, ছিনু যবে শিশুকালে,
কে জানিত ভাগ্যে ছিল হেন অভিশাপ,
হ'ল সার অশ্রুঢালা, নিরাশ মরমজ্বালা,
দিবা নিশি কুলু কুলু আকুল বিলাপ।

*　　　*　　　*

তবে কি মায়ের কোলে, উজানে যাইব চ'লে,
সুখ সাধ, সুখ আশা করি বিসর্জ্জন ?
সহিতে পারি না আর, প্রণয়েতে অত্যাচার,
মরমে ঢাকে না আর জ্বলন্ত যাতনা।

তাঁহাদের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত যেন তাঁহার জীবনের ধ্রুবতারার সন্ধান পাইয়া বলিতেছেন,—

জীবনযামিনী শেষে
যাইব নবীন দেশে,
হেরিব নবীন ঊষা গগনে ;
কুতূহলে মেলি আঁখি,
হরষে চাহিয়ে থাকি,
তুমি সে প্রভাত তারা উদিবে নয়নে !

নগেন্দ্রবাবু যখন নবীন ঊষা ও প্রভাত-তারার কল্পনায় বিভোর, তখন নীহারিকা কেমন করিয়া শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ সেনের "জীবনের মূল ধরি" নাড়া দিয়া গেল ;—

তুষার অঙ্গুলি দিয়া মর্ম্মস্থান কাঁপাইয়া
শিরোদেশে স্থিরনেত্রে রজনী আমার,

পড়িছে নিঃশ্বাস মুখে, শূন্য এ উদাস বুকে,
আঁধার আঁধার তার করিছে সঞ্চার !
সেই আঁধারের কোলে, হৃদয় পড়িল ঢুলে,
রজনীর রাজ্যে আমি করিনু প্রবেশ ;
উদাস অনিল ধীরে, কি মন্ত্র বলিল মোরে,
জাগিনু গেল না তবু নিদ্রার আবেশ।

ইহাদিগের পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইলেন শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী। তিনি গান গাহিতে চাহেন, কিন্তু ভয় হয়,

পাছে কেহ হাসে কথা শুনে,
পাছে কেহ উপহাস করে,
একটি হাসির উপেক্ষায়
একেবারে যাই যে গো ম'রে।

নিভৃতে আপনার হৃদয়ের বিজন কক্ষে বসিয়া কবি বলিতেছেন,—

ধীরে ধীরে অতি ধীরে গাও গো !
আমার কানের কাছে, আমার প্রাণের মাঝে
ধীরে ধীরে অতি ধীরে গাও গো !
গাও তুমি বিরামের গান,
গাও তুমি মরণের গান,
শুনি আমি ধীরে ধীরে ধীরে
চিরতরে মুদিয়া নয়ান।
কুসুমের কানে কানে শীতের দুরন্ত বায়
জান নাক কি যে গান গায় !
যে গান শুনিলে পরে, দিশেহারা ফুলগুলি
একেবারে শুকাইয়া যায় ;

জান যদি সেই গান, জান যদি সেই তান
ধীরে ধীরে অতি ধীরে গাও গো!
আমার কানের কাছে, আমার প্রাণের মাঝে
ধীরে ধীরে অতি ধীরে গাও গো।

ইতিমধ্যে তাঁহার পিতা আসিয়া তাঁহার অবসাদগ্রস্ত হৃদয়কে ঝাঁকাইয়া সজীব করিবার প্রয়াস পাইলেন। পুত্র কবিতা লেখেন, পিতা তাহার উপরে এক একটি motto বসাইয়া দেন। আবার হয় ত একটি কবিতার প্রথমাংশটি অবিনাশচন্দ্র রচনা করিলে, বিহারীলাল তাহা শেষ করিতেন; উভয়ের রচনা সুন্দর খাপ খাইয়া যাইত! দৃষ্টান্ত-স্বরূপ "মায়াদেবী" কবিতাটির একটু উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।—

(১)

সাগর-তরঙ্গে নাচিয়া বেড়াই
দুরন্ত ঝটিকা-বালারে খেলাই,
কখন আকাশে কখন পাতালে
নিমেষে চলিয়া যাই;
ঘোর ঘোরতর দুর্দ্ধর্ষ সমরে
কাঁপে রণাঙ্গন বীরপদভরে,
এক হুহুঙ্কারে স্তব্ধ চরাচর,
হরষে দেখিতে পাই।

(২)

হুঙ্কারে বিদরে অনন্ত আকাশ,
ছুটিয়া পালায় দুর্দ্দান্ত বাতাস,
কোটি কোটি সূর্য্য ভেঙে চুরমার

কে কোথা ছড়িয়ে পড়ে ;
বীর শৃঙ্গ সব হিমালয় হতে
ব্যতিব্যস্ত হয়ে ছোটে শূন্যপথে,
আকুল ব্যাকুল ধায় উভরায়
জীমূত প্রলয় ঝড়ে।

(৩)

অলকা অমরা কাঁপে থরথরি,
চন্দ্রলোক ভেঙে পড়ে ঝরঝরি,
শূন্যে শূন্যে ধরা ঘুরিতে ঘুরিতে
কোথায় চলিয়া যায় ;
প্রলয় পিনাক ঘোর ঘন রব,
ভয়ে জড় সড় যক্ষ রক্ষ সব ;
ধেই ধেই ধেই নাচিয়া বেড়াই
দৃক্‌পাত করি কায় ?

এতদূর পর্য্যন্ত লিখিয়া অবিনাশচন্দ্র ছাড়িয়া দিলেন ; বিহারীলাল কলম ধরিলেন,

(৪)

দিগ্‌ দিগঙ্গনা আড়ষ্টের প্রায়,
বিকট দামিনী কট মট চায়,
ঘোর ঘর্ঘর উদগ্র অশনি
পদাগ্রে পড়িছে লুটে ;
হো হো ! পৃথিবীতটে তিষ্টিতে পারে না,
ব্রহ্মাণ্ড জুড়িয়া উগারিছে ফেনা

লাফায়ে লাফায়ে পাগল সাগর
আকাশে চলেছে ছুটে।

(৫)

ঘোর কোলাহল, গর্জ্জে নীল জল,
তুলিব অম্বরে দেহ টলমল,
ছড়াইয়া দিব কাল' কেশরাশি
বিজলী বেড়াবে তায় ;
জ্বলন্ত তারকা মাল্লিকা গলায়,
উরজে লুটায়ে উরসে গড়ায়,
ধায় ধূমকেতু দীঘল অঞ্চল
গোমুখী নির্ঝর তায়।—ইত্যাদি।

এমনই করিয়া বিহারীলাল তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্রকে সাহিত্য-ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত করিলেন ; আজ সেই পুত্র পিতৃতর্পণ করিতে বসিয়াছেন।

কিন্তু শুধু বিহারীলালের গ্রন্থাবলী প্রকাশিত করিলেই কি তাঁহার আত্মার পরিতৃপ্তি হইবে ? উত্তরাধিকার-সূত্রে তিনি যে কবিপ্রতিভাকে লাভ করিয়াছিলেন, তাহার সম্যক্ বিকাশ হইল কই ? তাঁহার কবি-সহচরেরা সকলেই কিছু না কিছু কাজ করিয়াছেন। অক্ষয়কুমার বড়ালের যে কবিতার কএকটি ছত্র উপরে উদ্ধৃত হইল, তাহার একস্থানে দেখিতে পাই—

একটি তরঙ্গ আজি হয়েছিল অনুকুল
হয়েছে মিলন!
একটি তরঙ্গ রোষে আসিবে,—পড়িব দূরে
সহস্র যোজন।
এই স্বপনের দেখা এই স্বপনের কথা
এখনি ফুরাবে।

অনন্ত আঁধারাকাশে কক্ষভ্রষ্ট তারাটুকু
এখনি লুকাবে।

মিলন হইয়াছিল। এখন উভয়ের মধ্যে সহস্র যোজনেরও অধিক ব্যবধান। মিলনের দিনে বাঙ্গালীর পর্ণকুটীরে ঝিল্লীমুখর সন্ধ্যায় কবির শঙ্খ বাজিয়াছিল, আজ তিনি প্রৌঢ় বয়সে কর্ম্মক্লান্ত জীবনের সন্ধ্যায় অনন্ত আঁধার-আকাশে কক্ষভ্রষ্ট লুপ্ত তারাটুকুর জন্য চঞ্চল না হইয়া আর একবার "এষা"র সহিত পুনর্মিলনে'র প্রতীক্ষায় শান্ত হইয়া দিন গণিতেছেন।

আর রবীন্দ্রনাথের কবিতা-নির্ঝরিণী?—স্বপ্নভঙ্গের পর যে উল্লাসে নৃত্য করিয়া সে বাহির হইয়া পড়িয়াছিল, আজও কি তাহার পর্য্যবসান হইয়াছে? ওগো এখনও—

এত কথা আছে, এত গান আছে,
এত প্রাণ আছে মোর,
এত সুখ আছে, এত সাধ আছে,
প্রাণ হয়ে আছে ভোর!

হায়, আজ যদি অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী জীবিত থাকিতেন! আজ মহামানবত্বের সাগর-সঙ্গমে রবীন্দ্রনাথের নির্ঝরিণীর কথা যদি তিনি কাণ পাতিয়া শুনিতেন! শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত ও শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ সেন তাহা শুনিতেছেন; শ্রীযুক্ত অবিনাশ চন্দ্র চক্রবর্ত্তীও শুনিতেছেন। নগেনবাবু ও প্রিয়নাথ বাবু সাময়িক গদ্য সাহিত্যে যশস্বী হইয়াছেন। কিন্তু অবিনাশ সাহিত্যক্ষেত্র হইতে বহুদূরে সরিয়া পড়িয়াছিলেন; আজ তাঁহার স্বর্গীয় পিতার কবি-প্রতিভার জয়পত্র ললাটে বাঁধিয়া আবার তিনি সাহিত্য-প্রাঙ্গণে অবতীর্ণ; কিন্তু আমার বড় আপশোষ হয় যে, এই গ্রন্থাবলীর প্রকাশকও যে এক সময়ে সুকবি বলিয়া পরিচিত হইয়াছিলেন, তাহার

কোনও সংবাদই আজকালকার পাঠক-পাঠিকাদের রাখিবার উপায় নাই।

তাই বলিতেছিলাম যে, এই পুস্তকখানি হাতে করিলে আধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্যের একটি বিস্মৃতপ্রায় অধ্যায়ের কথা মনে পড়িয়া যায়।

এইবার এই গ্রন্থ সম্বন্ধে কিছু বলিতে চাহি। ভূমিকায় লেখা আছে, "ইহাতে বঙ্গসুন্দরী, নিসর্গসন্দর্শন, বন্ধুবিয়োগ, প্রেমপ্রবাহিনী, স্বপ্নদর্শন ও সঙ্গীতশতক এই ছয়খানি পুস্তক সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। বঙ্গ সুন্দরী-কাব্যের প্রথম সর্গের নাম 'উপহার'। কাহাকে উপহার?

(২)

গত ৩রা কার্ত্তিক (১৩২০) স্বর্গীয় কবি বিহারীলালের আবাল্যসুহৃদ্ পূজ্যপাদ আচার্য্য শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের সহিত দেখা করিতে গিয়াছিলাম। কএকটি কথার পর পণ্ডিত মহাশয় বলিলেন, —"বেহারীর কবিতাগুলির নূতন সংস্করণ তাহার ছেলেরা বাহির করিয়াছে; তাহাতে আমার একটি সার্টিফিকেট আছে। বোধ হয় তোমরা বুঝিতে পার নাই। অবিনাশের শরীর খারাপ থাকার দরুণ সম্পাদকীয় অধ্যক্ষতা ব্যাপারের কতকটা অসদ্ভাব রহিয়া গিয়াছে। এই দেখ, বইয়ের ১১ পৃষ্ঠায় আমি কি লিখিয়া রাখিয়াছি।" বইখানি আমার হাতে দিলেন; দেখিলাম বড় বড় অক্ষরে এই টিপ্পনীটুকু তিনি স্বহস্তে লিখিয়া রাখিয়াছেন—

এই সখা তাঁহার বাল্যকালের বন্ধু কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য। এই কএকটি পদ্যপঙ্‌ক্তি কৃষ্ণকমল নিজের certificate এর মত জ্ঞান করেন এবং value করেন। বেহারীর পদ্য যদি

স্থায়ী হয়, কৃষ্ণকমলের নামটাও টেঁকে যাবে, এই লোভে কৃষ্ণকমল এই টিপ্পনীটি সংযোজন করিয়া রাখিলেন।

টিপ্পনীটুকু পাঠ করিয়া আমি বলিলাম—"আপনি এ কথা আগে বলেন নাই কেন?" তিনি হাসিয়া উত্তর করিলেন—"সব কথা কি সব সময়ে মনে আসে? আচ্ছা, তুমি একবার কবিতাটি পড় দেখি!" আমি পড়িতে লাগিলাম—

প্রিয়তম সখা সহৃদয়!
প্রভাতে অরুণ উদয়,
হেরিলে তোমার পানে,
তৃপ্তি দীপ্তি আসে প্রাণে,
মনের তিমির দূর হয়।
আহা কিরে প্রসন্ন বদন!
তারা-যেন জ্বলে দুনয়ন;
উদার হৃদয়াকাশে,
বুদ্ধি বিভাকর ভাসে,
স্পষ্ট যেন করি দরশন।
অমায়িক তোমার অন্তর,
সুগম্ভীর সুধার সাগর;
নির্ম্মল লহরীমালে,
প্রেমের প্রতিমা খেলে,
জলে যেন দোলে সুধাকর।
সুধাময় প্রণয় তোমার,
জুড়াবার স্থান হে আমার;
তব স্নিগ্ধ কলেবরে,

আলিঙ্গন দিলে পরে,
উলে যায় হৃদয়ের ভার।
যখন তোমার কাছে যাই,
যেন ভাই স্বর্গ হোতে পাই ;
অতুল আনন্দ ভরে
মুখে কত কথা সরে,
আমি যেন সেই আর নাই।
নূতন রসেতে রসে মন,
দেখি ফের্ নূতন স্বপন ;
পরিয়ে নূতন বেশ,
চরাচর সাজে বেশ,
সব হেরি মনের মতন।
ফিরে আসে সেই ছেলেবেলা,
হেসে খুসে করি খেলা দেলা,
আহ্লাদের সীমা নাই,
কাড়াকাড়ি ক'রে খাই,
ব্রজে যেন রাখালের মেলা।
নিরিবিলে থাকিলে দুজন,
কেমন খুলিয়া যায় মন ;
ভোর হয়ে বসে রই,
অন্তরের কথা কই,
কত রসে হই নিমগন।
আ ! আমার তুমি না থাকিলে,
হৃদয় জুড়ায়ে না রাখিলে,

নিজ কর করবাল
নিবাতো প্রাণের আলো,
ফুরাত সকল এ অখিলে।
তুমি ধাও আপনার ঝোঁকে,
সুদূর "দর্শন" সূর্য্যালোকে ;
যার দীপ্ত প্রতিভায়,
তিমির মিলায়ে যায়,
ফোটে চিত্ত বিচিত্র আলোকে।
পোড়ে যার প্রখর ঝলায়,
কত লোক ঝলসিয়া যায় ;
তুমি তায় মনসুখে,
বেড়াও প্রফুল্লমুখে,
দেবলোকে দেবতার প্রায়।
আমি ভ্রমি কমল-কাননে,
যথা বসি কমল-আসনে,
সরস্বতী বীণা-করে,
স্বর্গীয় অমিয় স্বরে,
গান গান সহাস আননে।
করি সে সঙ্গীত-সুধা পান,
পাগল হইয়ে গেছে প্রাণ ;
দৃষ্টি নাই আসে পাশে,
সম্মুখেতে স্বর্গ হাসে,
ভুলে আছে তাতেই নয়ান।
পরস্পর উল্টতর কাজে,

পরস্পরে ব্যথা নাহি বাজে,
চোখে যত দূরে আছি,
মনে তত কাছাকাছি,
ঈর্ষার আড়াল নাই মাঝে।
বুদ্ধি আর হৃদয়ে মিলন,
বড় সুশোভন, সুঘটন ;
বুদ্ধি বিদ্যুতের ছটা,
হৃদয় নীরদ ঘটা,
শোভা পায়, জুড়ায় দুজন।
হেরি নাই কখন তোমার
পদের অসার অহঙ্কার ;
নিস্তেজ নচ্ছার যত,
পদগর্ব্বে জ্ঞান হত,
ঠ্যাকারেতে হাসায় দোধার।
তোষামোদ করিতে পারনা,
তোষামোদ ভালও বাসনা,
নিজে তুমি তেজীয়ান,
বোঝ তেজীয়ান মান ;
সাধে মন করে কি মান না ?
দাঁড়াইলে হিমালয় পরে,
চতুর্দ্দিকে জাগে একত্তরে,
উদার পদার্থ সব,
শোভা মহা অভিনব,
জনমায় বিস্ময় অন্তরে।

প্রবেশিলে তোমার অন্তর ;
মাণিকের খনির ভিতর,
চারিদিকে নানা স্থলে,
নানাবিধ মণি জ্বলে,
কি মহান্ শোভা মনোহর !
শুনিলে তোমার গুণগান,
আনন্দে পূরিয়ে ওঠে প্রাণ,
অঙ্গ পুলকিত হয়,
দুনয়নে ধারা বয়,
ভাসে তায় প্রফুল্ল বয়ান।
ওহে সখা সরল সুজন !
করি আমি এই নিবেদন,
যে ক'দিন প্রাণ আছে,
থেকো তুমি মোর কাছে,
ফাঁকি দিয়ে ক'র না গমন।

পণ্ডিত মহাশয় বলিলেন, "এই দ্বিতীয় খণ্ডে লিখিত অধিকাংশ কবিতাই বাস্তবিক এক এক ব্যক্তিবিশেষকে উপলক্ষ করিয়াই রচিত হইয়াছিল। 'বন্ধুবিয়োগ' কবিতাটিতে কবি নিজেই সেই সকল ব্যক্তির নাম লিখিয়া দিয়াছেন ; তন্মধ্যে কৈলাস, পূর্ণচন্দ্র এই দুই বন্ধুর বিষয়ে কবি নিজে যাহা লিখিয়াছেন তদ্ভিন্ন অন্য পরিচয় দিবার বড় কিছু নাই ; কিন্তু বিজয় নামক বন্ধুটির সম্বন্ধে কিছু পরিচয় দেওয়া বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

"সেকালের অনেকেই জানেন যে মুর্শিদাবাদের নবাবের ভূতপূর্ব্ব দেওয়ান প্রসন্ন নারায়ণ দেব কলিকাতার একজন মান্যগণ্য ব্যক্তি ছিলেন।

বিজয় তাঁহারই জ্যেষ্ঠ পুত্র। অল্পবয়সেই তাঁহার মৃত্যু হয়। আমি বেহারীর মুখে বিজয়ের বিশেষ গুণকীর্ত্তন ভূয়োভূয়ঃ শুনিয়াছি। যদিও বড় মানুষের ছেলে, তথাপি ধনের অহঙ্কার তাহার বিন্দুবিসর্গ ছিল না; ইহা ব্যতীত ধনী সন্তানদিগের যৌবনে যে সকল 'আয়েব' ঘটিয়া থাকে, তাহার লেশমাত্র বিজয়ের স্বভাবে কখনও প্রকটিত হয় নাই। অত্যন্ত দুর্ভাগ্যের বিষয় যে এরূপ একটি ধনীসন্তান অল্পবয়সে লোকলীলা সম্বরণ করিলেন।

"এই বইখানিতে 'স্বপ্নদর্শন' নামক একটি গদ্য রচনা আছে। রচনাটি পাঠ করিলে পাঠকের প্রতীতি হইতে পারিবে যে কবি বিহারীলাল রীতিমত গদ্যের অনুশীলন করিলে একজন উন্নত লেখক হইতে পারিতেন।

"বেহারীর কবিতার চমৎকার বিশিষ্টতা সম্বন্ধে তোমাকে পূর্ব্বে যাহা বলিয়াছি, তাহা ত তুমি তোমার "পুরাতন প্রসঙ্গে" সন্নিবেশিত করিয়াছ। ইংরাজ সাহিত্যে পোপ কবির আবির্ভাবের পর কবিতা-সাম্রাজ্যে যে একটা পেশাদারি ভাব বদ্ধমূল হইয়া আসিতেছিল, ক্র্যাব ও কাউপারের আবির্ভাবে সেইটি খণ্ডিত হইল; পরে কীট্‌স্, বায়রণ্, শেলী, ওয়ার্ডস্‌-ওয়ার্থ্ এই পেশাদারি ভাবের খণ্ডনব্যাপারের চূড়ান্ত করিয়া দেন। আমার মনে হয় যে, বঙ্গকবিতারাজ্যে বেহারীর আবির্ভাব কতকটা তদ্রূপ। পেশাদারি কবিতার লেশমাত্র তাঁহার প্রতিভাতে ছিল না। যাহা তিনি নিজে দেখিতেন, অনুভব করিতেন, যেন কোন এক দুর্দ্দম প্রবৃত্তি তাঁহাকে সেইগুলি কবিতাকারে লিপিবদ্ধ করিতে প্রবর্ত্তিত করিত। যে শব্দটি সম্পূর্ণ-রূপে তাঁহার মনের ভাবের প্রখরতাব্যঞ্জক হইত, এবং আপনা হইতেই তাঁহার মনে জাগিয়া উঠিত, সেই শব্দটি ভাষা হউক, অপভাষা হউক, সংস্কৃত হউক অপ্রভ্রংশ হউক, তিনি প্রয়োগ করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। অথচ তাঁহার শ্লোকগুলি পড়িয়া দেখ, এমন খাঁটি বাংলা আজকাল কুত্রাপি পাইবে

না। বিদ্যাসাগর মহাশয় ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল হইতে 'হেথায় ত্রিলোক-নাথ বলদে চড়িয়া' ইত্যাদি কবিতাটি আবৃত্তি করিয়া গদ্‌গদ হইয়া বলিতেন 'দেখ দেখি, কেমন ঝরঝরে বাংলা!' বেহারীর কবিতা বিষয়েও আমরা তদ্রূপ বলিতে পারি, এরূপ ঝরঝরে বাংলা বড়ই বিরল, অথচ ভাবগুলি সম্পূর্ণ নূতন ধরণের। 'সঙ্গীতশতকে'র মধ্যে এমন গান অনেক আছে, যাহার নিসর্গবর্ণনা এত চমৎকার যে ভাবুকব্যক্তিমাত্রই উল্লাসে পুলকিত হইবেন।

"'বঙ্গসুন্দরী' নামক কাব্যের মধ্যে যে কয়েকটি মহিলাকে উপলক্ষ করিয়া কবি পদ্য রচনা করিয়াছেন, তাঁহাদিগের মধ্যে হয় ত কেহ স্বসম্পর্কীয়া, কেহ কেহ বা অদ্যাপি জীবিত আছেন; তাঁহাদের বিশেষ পরিচয় প্রকাশ্যরূপে দেওয়া এখন উচিত মনে করি না; তদ্বিষয়ে আলোচনা করা এখন বিহিত হইবে না; আর কবিতাগুলির চমৎকারিতা উপলব্ধি করিবার জন্য সে পরিচয়ের আবশ্যকতাও নাই।

"'নারীবন্দনা' কবিতাটি ব্যক্তিবিশেষমূলক নহে। সর্ব্বসাধারণ্যে নারীমাত্রের প্রতি এই বন্দনা সঙ্গত হইবে। আমার মনে হয় যে কোঁৎ (Comte) যদি এইটি পাইতেন, তাহা হইলে তাঁহার ধ্রুব-ধর্ম্মের গাথা-সমূহমধ্যে (hymns) ইহাকে তিনি সর্ব্বপ্রথম ও সর্ব্বোচ্চ স্থান দিতে অগ্রসর হইতেন।"

পৌষ, ১৩২০।

রামেন্দ্রসুন্দর

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর মৃত্যুতে শুধু যে আমাদের দেশের একটা বিষম ক্ষতি হইল, তাহা নহে; সমগ্র মানব-সমাজ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া পড়িল। মৃত্যুর কয়েকদিন পূর্ব্বে তাঁহার শয্যাপার্শ্বে বসিয়া আমি বড় জোর করিয়া বলিয়াছিলাম—'আপনি চিন্তিত হবেন না; আপনার এখন মৃত্যু হ'লে চল্‌বে না। "ভারতবর্ষে" প্রবন্ধের উপর প্রবন্ধ সাজিয়ে আপনি যে জিনিষ গড়ে তুল্‌চেন, তা' এই সমস্ত ভারতবর্ষে আর কেউ শেষ কর্‌তে পারবে না; সে জিনিস অসমাপ্ত রেখে সরে পড়া চল্‌বে না।' আমার আগ্রহাতিশয্য দেখিয়া, তাঁহার স্বভাবতঃ উজ্জ্বল চক্ষুর দীপ্তি যেন মৃত্যুঞ্জয়-ললাট-বহ্নির মত আসন্ন-মৃত্যু-কালিমাকে অপসারিত করিয়া প্রোজ্জ্বল হইয়া উঠিল। অধরের কোণে ঈষৎ হাসির রেখা যেন দেখা দিল। তাঁহার হাস্য সুন্দর, তাঁহার বাক্য সুন্দর,—হায় রামেন্দ্রসুন্দর!

'বিচিত্র-প্রসঙ্গে'র কথা তাঁহার মনে পড়িতেছিল। ডাক্তারের দিকে ফিরিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—'আচ্ছা, বল দেখি, এই ব্যায়রামের মধ্যে যখন সমস্ত দেহ-যন্ত্র ব্যাধিগ্রস্ত ও অবসন্ন, তখন মাথাটা এত পরিষ্কার হয় কেন?' উৎকট রোগের মধ্যে কেমন করিয়া তাঁহার মুখ হইতে 'বিচিত্র প্রসঙ্গ'-কথা শুনিয়া লইয়াছিলাম, তাহা অনেকেই জানেন। তাঁহার বাক্য সুন্দর,—সর্ব্বজনপ্রিয় তিনি—মাধুর্য্য-ধারায় তাঁহার বন্ধুগণের চিত্তলোক অভিষিক্ত করিয়াছিলেন।

আমি বলিলাম—"ভারতবর্ষে'র Series এর মধ্যে আপনি যেখানে এসে দাঁড়িয়েছেন, সেটা ত একটা Jumping-off ground; একটি

লাফে আপনি বেদান্ত-তত্ত্বের মাঝখানে গিয়ে পড়বেন। এমন কোরে আধুনিক বিজ্ঞানের আবিষ্কৃত পন্থাগুলি অবলম্বন কোরে সটান্ বেদান্তের সিংহদ্বারে এসে পৌছান,—এটা যে সম্ভবপর হোতে পারে, বোধ হয় কেউ কখনও ভাব্তে পারে নি। এতদিনে ঐ কাজ শেষ হয়ে যেত; কিন্তু আপনি বৈদিক যজ্ঞ নিয়ে পড়লেন,—হুড়মুড় কোরে অতগুলো প্রবন্ধ রচনা করলেন। মজা এই যে, ও-প্রবন্ধগুলিও আপনি ছাড়া আর কেউ লিখ্তে পারতেন না। বিচিত্র-প্রসঙ্গের সময় আপনার চিন্তা-তরঙ্গ যে দিকে বেগে যেতে আরম্ভ করলে, ঐ বৈদিক প্রবন্ধগুলি ঠিক যে তা'র পরিনতি, তা'নয়—ওর পরে আরোও আপনার বল্বার অনেক ছিল!—যজ্ঞের ভিতরকার কথা বলা বাকী রয়েছে,—সে কথাও আপনাকে বল্তে হবে। কিন্তু ঐ Jumping-off ground এর কথা কিছুতেই ভুলতে পারিনা।" রামেন্দ্রবাবু বলিলেন—'দেখুন, কতদূর কি হয়। সেবার ত সেরে উঠ্লুম; এবার কি হয়, দেখুন। ঠিক বলেছেন; বেদান্তে নামি নামি কোরে এখনও নেমে পড়িনি;—সব গুছিয়ে এনেছি।' সব গুছিয়ে এনেছেন! রামেন্দ্রসুন্দরের মুখ ফোটে—ফোটে ফোটেনা। আজ সে মুখ চিরদিনের জন্য মৌন হইয়া গেল।

তিনি কি কি কাজ অসমাপ্ত রাখিয়া চলিয়া গেলেন, তাহার হিসাব করিতে বসিলে, আক্ষেপের সীমা থাকে না। আমাদের দেশে তাঁহার মত স্বাধীন চিন্তয়িতা অত্যন্ত বিরল। স্বদেশের অতীত ইতিহাসের কথা তিনি বিশেষ শ্রদ্ধার সহিত আলোচনা করিতেন। সভ্য মানব-সমাজের অতীত ইতিহাসের গুপ্ত মর্ম্ম কথাটুকু বলিবার ইচ্ছা তাঁহার খুব প্রবল ছিল। জীবতত্ত্ব হইতে আরম্ভ করিয়া মিসর, হিব্রু, গ্রীক, রোমকের ইতিহাসের ভিতর দিয়া ভারতবর্ষে আসিয়া পড়িতে হইবে, এই বাসনার বশবর্ত্তী হইয়া তিনি আলোচনা আরম্ভ করিলেন। কিন্তু মধ্য পথে হঠাৎ থামিয়া

পড়িলেন। এই দ্বিতীয় পর্য্যায় বিচিত্র-প্রসঙ্গে'র রচনার ভাষা আমার বটে, কিন্তু প্রথম স্তবকের সমস্ত মালমসলা তিনি নিজে সংগ্রহ করিয়া, ধারাবাহিক ভাবে নিজের বক্তব্য ধীরে ধীরে বলিয়া যাইতেন; আমি তাঁহার পদপ্রান্তে উপবেশন করিয়া অবহিত চিত্তে তাঁহার কথা শ্রবণ করিয়া নোট করিয়া লইতাম।

বাল্যকাল হইতে তিনি ইতিহাস পড়িতে বড় ভালবাসিতেন। এণ্ট্রান্স পরীক্ষা দিবার পূর্ব্বে তিনি গ্রীণ্, হিউম্, গিবন্ রচিত বড় বড় ইতিহাস পড়িয়া ফেলিয়াছিলেন। আবার কান্দিস্কুলে অধ্যয়ন করিতে হইয়াছিল বলিয়া গণদর্পণরচয়িতা পণ্ডিত মহাশয়ের নিকটে সংস্কৃতভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করিবার সুযোগ তাঁহার ঘটিয়াছিল। এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় তিনি ও আমার পূজ্যপাদ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত জানকীনাথ ভট্টাচার্য্য বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম স্থান অধিকার করিলেন। এই রাম-জানকীর অপূর্ব্ব সম্মিলনে রিপণ কলেজ কিছুদিন পরে ধন্য হইয়া গেল। সাতাশ বৎসর পরে জানকীর হাতে কলেজের সমস্ত ভালমন্দের ভার অর্পণ করিয়া রাম চলিয়া গেলেন। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত অধ্যাপকসঙ্ঘ আর কি পূর্ব্বের মত সাহিত্যচর্চ্চায় আনন্দ লাভ করিতে পারিবেন?

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সঙ্গে তাঁহার কি সম্বন্ধ ছিল, তাহা সাহিত্যানুরাগী বাঙ্গালীমাত্রেই জানেন। আচার্য্য শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় যখনই তাঁহাকে চিঠি লিখিতেন, তখনই তাঁহাকে 'সাহিত্যপরিষদের একমাত্র সারথী' বলিয়া অভিহিত করিতেন। রবীন্দ্রনাথও এই সারথ্যের কথা বেশ জোরের সহিত তাঁহার অভিনন্দন পত্রে উল্লেখ করিয়াছিলেন। কিছুদিন পূর্ব্বে দ্বিজেন্দ্রবাবু সঙ্কটাপন্ন পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া রামেন্দ্র বাবুকে শয্যাপার্শ্বে ডাকাইয়া আনিয়া বলিয়াছিলেন,—'রামেন্দ্র বাবু, এবার আমি বোধ হয় বাঁচ্‌বনা; সাংখ্য-বেদান্তের কাছে জর্ম্মন দর্শনের ঋণের কথাটা

ত আমার এখনও শেষ করা হোলো না ; আমি না থাকলে কে আর ও সব কথা লিখবে ?' আমাদের দেশের সৌভাগ্য যে, অশীতিপর বৃদ্ধ আচার্য্য দ্বিজেন্দ্রনাথ রোগমুক্ত হইয়া তাঁহার মানসপ্রসূত রত্নরাজিতে বঙ্গ-সাহিত্য অলঙ্কৃত করিতেছেন। আর গভীর পরিতাপের বিষয় এই যে, পঞ্চান্ন বৎসর অতিক্রম করিতে-না-করিতে ত্রিবেদী মহাশয় বঙ্গ সাহিত্যকে বঞ্চিত করিয়া চলিয়া গেলেন।

একদিন তাঁহার মনে অনেক বিষয়ে সংশয় ছিল। ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম, পাপ ও পুণ্য, Legality ও Morality ইত্যাদির গোলকধাঁধার মধ্যে ঘুরিয়া-ঘুরিয়া অবশেষে তিনি উপনিষদের স্তরে উঠিয়া খানিকটা হাল্কা বোধ করিলেন। কলেজের অবসরকালে কথা-প্রসঙ্গে একবার তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম—'ছান্দোগ্য উপনিষদে যে ঘোর আঙ্গিরস ঋষির কথা আছে, পুরাণে কিম্বা অন্য কোথাও ঐ ঋষির নাম পাওয়া যায় কি ? তিনি যে দেবকী-নন্দন বাসুদেবকে অমৃতের আস্বাদ দিয়াছিলেন, সেই দেবকীনন্দন বাসুদেবের সঙ্গে গীতার বাসুদেবের কোনও সম্বন্ধ আছে কি ?' ত্রিবেদী মহাশয় উত্তর দিলেন—'অন্য কোথাও ত ঘোর আঙ্গিরস ঋষির নামের উল্লেখ পাই নাই ; তবে আমি কিন্তু ঐ দেবকীনন্দন বাসুদেবের সঙ্গে গীতার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ দেখাব। মনে রাখবেন—উপনিষদঃ গাবঃ দোগ্ধা গোপালনন্দনঃ ; একদিন আমি ঐটে অবলম্বন কোরে Legality ও Moralityর মূল সূত্রে পৌঁছবার চেষ্টা কর্‌ব। বেশ বড় কোরে অনেক-গুলি প্রবন্ধ লিখ্‌তে হবে।' দু-এক স্থলে অল্পবিস্তর প্রাসঙ্গিক আলোচনা ব্যতীত ভাল করিয়া এসম্বন্ধে তাঁহার কিছুই লেখা হইল না।

এমন অনেক জিনিসই তাঁহার লিখিবার ইচ্ছা ছিল ; কিন্তু লেখা হইল না। বাঙ্গালা সাহিত্যকে পুষ্ট করিবার জন্য আগ্রহ তাঁহার খুব বেশী ছিল। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার মৈত্রেয় যখন রামেন্দ্রবাবুর

একটি প্রবন্ধ জর্ম্মণ-ভাষায় অনুবাদ করিয়া পাণ্ডুলিপিখানি দেখিয়া দিবার জন্য ত্রিবেদী মহাশয়ের নিকটে পাঠাইয়া দেন, তখন জর্ম্মণ-ভাষানভিজ্ঞ রামেন্দ্রবাবুর সকৌতুক চাহনি দেখিয়া আমাদের গাম্ভীর্য্য রক্ষা করা কঠিন হইয়াছিল। জর্ম্মণির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দার্শনিক পত্রিকায় অনুবাদটি প্রকাশিত হইলে পর, উক্ত পত্রিকার পরিচালকবর্গ অনুবাদকের নিকটে পঁচিশ কপি পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। মৈত্রেয় মহাশয়ের ইচ্ছা ছিল, ত্রিবেদী মহাশয়কে আগাগোড়া জর্ম্মণ ভাষায় রূপান্তরিত করিয়া ফেলেন। তাহাও হইল না। তাঁহার বিষয়ে লিখিতে বসিয়া কেবলই মনে পড়ে, কত কি হওয়া সম্ভবপর ছিল, কিন্তু হইল না।

(২)

যেদিন শ্রীমান্ সুবোধচন্দ্র "মানসী"র নবীন পরিচালক-বর্গ সমভি-ব্যাহারে রিপণ কলেজে রামেন্দ্রবাবুর সমক্ষে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে কাগজে লিখিবার জন্য পীড়াপীড়ি করিয়াছিলেন, তখন "মানসী" সহায়-সম্পত্তি-হীনা ক্ষুদ্রকলেবরা ছিল বটে, কিন্তু সে একাকিনী সাহিত্যের আসরে কোমর বাঁধিয়া রবীন্দ্রনাথের স্বপক্ষে সাহিত্যরথ, দ্বিজেন্দ্রলালের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়া দাঁড়াইয়াছিল। পাঠকপাঠিকার সহানুভূতি থাকিবে কিনা, সে দিকে না তাকাইয়া সে এই কার্য্যে অগ্রসর হইয়াছিল। তাই ভয় ছিল, পাছে রামেন্দ্রবাবু তিরস্কার করিয়া তাঁহাদিগকে ফিরাইয়া দেন। কিন্তু ত্রিবেদী মহাশয় স্মিতমুখে তাহাদিগকে বিদায় দিলেন। তাহার পর হইতে "মানসী" তাঁহার প্রসাদলাভে বঞ্চিত হইত না।

কিন্তু রামেন্দ্রবাবুর লেখার অভ্যাস বড় কমিয়া গিয়াছিল। তাঁহাকে যদি বলিতাম—'একটা ভাল করিয়া কিছু লিখুন', তিনি হাসিয়া উত্তর দিতেন—'লিখ্‌ব কি ? সব কথাই ত কেউ না কেউ বলে ফেলেছে ;

নতুন করে বলবার কিছু আছে ব'লে ত মনে হয় না।' কিন্তু এমন দিন আসিল যখন তাঁহার এই কথা স্মরণ করাইয়া দিয়া তাঁহাকে একটু লজ্জিত করিতে পারিয়াছিলাম।

প্রতিভার বিদ্যুত চমকাইল; কিন্তু ঝঞ্ঝাবাতের মধ্যে। যখন তিনি অনর্গল নূতন কথা শুনাইলেন, তখন তিনি অত্যন্ত কঠিন পীড়ায় রোগ-শয্যায় শয়ান। একদিন আক্ষেপ করিয়া বলিলেন—'দেখুন, যখন শরীর ভাল ছিল, তখন ভাব্‌তাম সব কথাই বলা হয়ে গেছে, কেউ না কেউ ব'লে ফেলেছে। এখন এই বিছানায় শুয়ে শুয়ে মনে হচ্চে, আমিও কিছু নতুন কথা বলতে পারতাম। অনেক পড়েছি ও ভেবেছি, কিন্তু এখন যেন মনে হচ্চে কতকগুলো ইতিহাসের ও দর্শনের সমস্যার নতুন ব্যাখ্যা দিতে পারি। তাই যেন একটু আপশোষ হয়।' তাঁহার সে আক্ষেপ স্থায়ী হইতে দিলাম না। প্রশ্নের পর প্রশ্ন করিয়া তাঁহার মুখ হইতে প্রথম পর্য্যায়—'বিচিত্র-প্রসঙ্গ' কাহিনী শুনিয়া লইলাম। সেই সমস্ত মাল মসলা লইয়া আমি নিজের ভাষায় কয়েকটি প্রবন্ধ রচনা করিয়া তাঁহাকে শুনাইয়া, যথাসম্ভব মার্জ্জিত করিয়া পুস্তকাকারে প্রকাশ করিয়াছিলাম।

রবীন্দ্রনাথের গদ্যপদ্য রচনা যখনই তিনি পাঠ করিতেন, তখনই তিনি আনন্দে চঞ্চল হইয়া উঠিতেন। ঐ খানে তাঁহার সঙ্গে আমার বড় মিল হইত। তাঁহার সতীর্থ আবাল্যসুহৃদ অধ্যাপক ক্ষেত্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় আমাদের বিশ্রম্ভালাপে বিরক্তি প্রকাশ করিয়া বলিতেন—'কিহে, পয়ার হচ্ছে নাকি?' বাঙ্গালা কাব্যসাহিত্যের নামে তিনি নাসিকা কুঞ্চিত করিতেন। রামেন্দ্রবাবুর অনুরোধে তিনি রবিবাবুর 'পতিতা' পড়িয়া আনন্দের আবেগে কবিবরকে একখানা বেনামী পত্র লিখিয়া ফেলিলেন। হু হু করিয়া রবীন্দ্র-সাহিত্যের মধ্য দিয়া চলিয়া গিয়া যে দিন ত্রিবেদী মহাশয়ের প্ররোচনায় 'অভয়ের কথা' লিখিয়া "মানসী"তে প্রকাশ করিলেন, সেদিন বোধ

হয় বাঙ্গালা-সাহিত্য-সেবীরা উপলব্ধি করিতে পারিলেন যে, বেদান্ততত্ত্ব কেমন সরস করিয়া জনসাধারণকে বুঝান যাইতে পারে। রামেন্দ্রবাবুর গৃহে আমার পূজ্যপাদ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ কয়েকজন সাহিত্যিকের বৈঠক বসিত। তাঁহারা নিজ নিজ প্রবন্ধ ত্রিবেদী মহাশয়কে না শুনাইয়া ছাপাখানায় পাঠাইতেন না। অধ্যাপক ক্ষেত্রমোহন সেই আসরে আমাদিগকে তাঁহার 'অভয়ের কথা' ও 'ঠাকুরাণীর কথা' শুনাইয়াছিলেন। রবিবাবুর 'মৃত্যুর পরে' কবিতাটি পড়িতে পড়িতে রামেন্দ্রবাবু যেন আত্মসম্বরণ করিতে পারিতেন না।

গুঞ্জরি করুণ তান, ধীরে ধীরে কর গান,
বসিয়া শিয়রে,
যদি কোথা থাকে শেষ, জীবন স্বপ্নের লেশ,
তাও যাক্‌ মরে—

ইত্যাদি আবৃত্তি করিতে করিতে তাঁহার কণ্ঠস্বর কাঁপিয়া উঠিত। আজ তাঁহার ও ক্ষেত্রমোহনের মৃত্যুর পরে অতীতের স্মৃতির সৌরভটুকু লইয়া আমাদের দিন গণিয়া যাওয়া ছাড়া আর কিছু আছে বলিয়া মনে হয় না।

মৃত্যুর পূর্ব্বে তাঁহার শেষ বাক্যালাপ হইয়াছিল—রবিবাবুর সঙ্গে। কবিবর চলিয়া গেলে পরে তিনি ক্রমশঃ তন্দ্রাভিভূত হইয়া পড়িলেন; আর তাঁহার জ্ঞানসঞ্চার হইল না।

স্বদেশের ও বিদেশের নানা শাস্ত্র আলোচনা করিয়া, যতই দিন যাইতে লাগিল, ততই ব্রাহ্মণ্য সভ্যতার প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা ক্রমশঃই বাড়িয়া গেল। ইদানীং তাঁহার রচনা পাঠ করিয়া রিপণ কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ আচার্য্য শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য মহাশয় বিস্ময় প্রকাশ করিয়া বলিতেন—রামেন্দ্রবাবু কেমন করিয়া বৈদিক যুগের কথা, বিশেষতঃ যজ্ঞের দার্শনিক

তত্ত্ব এমন সুন্দর ভাবে বলিতে পারিতেছেন? আমি যখন কলেজে কাজ করিতাম, তখন তাঁহাকে প্রায় নাস্তিক বলিয়া স্থির করিয়াছিলাম; এখন তিনি হার্ব্বার্ট স্পেন্সর হইতে অনেক দূরে চলিয়া গিয়াছেন।

এই শ্রদ্ধায় যখনই আঘাত লাগিত, তখনই তিনি চঞ্চল হইয়া উঠিতেন; নিভৃতে অন্তরঙ্গ বন্ধুদিগের নিকটে তাঁহার বেদনা জানাইতেন। রাষ্ট্রীয় বিষয় সম্বন্ধে রবিবাবুর সঙ্গে তাঁহার মতের খুব মিল ছিল; কিন্তু সামাজিক ও পৌরাণিক অনেক বিষয়ে উভয়ের মধ্যে আকাশ পাতাল ব্যবধান ছিল। তথাপি কখনও কাগজে কলমে রবিবাবুর মতের প্রতিবাদ করিবার ইচ্ছা তাঁহার হইত না। 'ভারতবর্ষের ইতিহাসের ধারা' পাঠ করিয়া তিনি সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই। স্যর প্রফুল্লচন্দ্রের 'বাঙ্গালীর মস্তিষ্কের অপব্যবহার' প্রবন্ধও তাঁহার ঠিক পছন্দসই হয় নাই। কিন্তু তাই বলিয়া কবি ও বৈজ্ঞানিক হিসাবে উঁহাদিগের প্রতি রামেন্দ্রবাবুর শ্রদ্ধার তিলমাত্র ব্যত্যয় হয় নাই।

রাষ্ট্রীয় মতের কথা বলিতেছিলাম। অনেকে বোধ হয় জানেন না যে ভাঙ্গা বাঙ্গালা-দেশকে জোড়া দিবার জন্য যখন প্রথম আন্দোলনের সূত্রপাত হইল, তখন কাহার মাথায় রাখিবন্ধন ও অরন্ধনের কল্পনা প্রথম জাগিয়াছিল। একটি রবিবাবুর অপরটি রামেন্দ্রবাবুর মস্তিষ্ক হইতে উদ্ভূত। রবিবাবুর, রামেন্দ্রবাবুর ও হীরেন্দ্রবাবুর তীক্ষ্ণ ধীশক্তি সে সময়ে কেমন করিয়া স্বদেশের কল্যাণে নিয়োজিত হইবার জন্য মিলিত হইয়াছিল, তাহা আমাদের দেশের আধুনিক ইতিহাসের সামগ্রী হইয়া গিয়াছে। একটী নূতন গান রচনা করিয়া রবীন্দ্রনাথের আনন্দ সম্পূর্ণ হইত না, যদি তাহা অচিরে রামেন্দ্রসুন্দরকে তিনি না শুনাইতে পারিতেন। আবার রবিবাবুর উত্তেজনায় রামেন্দ্রবাবু যে 'বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রতকথা' রচনা করিয়াছিলেন, তাহা বাঙ্গালা ভাষায় একটি classic বলিয়া পরিগণিত হইতে পারিত; কিন্তু

কেন জানিনা, তদানীন্তন কলিকাতার পুলিশ কমিশনর রামেন্দ্রবাবুকে পুস্তকখানির প্রচার বন্ধ করিবার আদেশ দিলেন। রবিবাবুর সে সময়ের অনেক গানও আর শোনা গেল না। এমনি করিয়া ভালমন্দের ভিতর দিয়া সুখে দুঃখে আনন্দে বিষাদে রবীন্দ্রনাথ ও রামেন্দ্রসুন্দর বাঙ্গালীকে সত্যের পথে, ঐক্যের পথে লইয়া চলিয়াছিলেন। রামেন্দ্রবাবু বলিতেন যে, চৈতন্যের বৈষ্ণব movementএর পরে বাঙ্গালা দেশে এমন ভাব বিপ্লব বোধ হয় আর কখন হয় নাই। সেই জাতীয় জাগরণের উৎসবে তাঁহার শক্তিকে নিয়োজিত করিবার জন্য তাঁহার প্রাণে যে ব্যাকুলতা ছিল, তাহা তিনি কাহারও নিকট গোপন করিতেন না। প্রতি বৎসর ৩০শে আশ্বিন তাঁহার স্বগ্রামে গৃহে গৃহে 'বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রতকথা' পঠিত হইত। পুস্তকখানির প্রচার বন্ধ হইয়া গেলে অনেকেই একটা মস্ত অভাব অনুভব করিয়াছিলেন।

এই স্বদেশপ্রীতি বাল্যকাল হইতে তাঁহার মজ্জাগত হইয়াছিল। তাঁহার পিতা গোবিন্দসুন্দর নানা বিষয়ে জ্যেষ্ঠপুত্রের চিত্ত-বৃত্তিকে সজাগ করিয়া দিয়াছিলেন। জীবনে রামেন্দ্রসুন্দর কখনও একখানি পাশ্চাত্য উপন্যাস পড়েন নাই। কিন্তু ছেলেবেলায় একবার স্কুলের প্রাইজ লইয়া বাড়ীতে ফিরিয়া আসিলে পরে তাঁহার পিতা তাঁহাকে একখণ্ড দুর্গেশনন্দিনী উপহার দিয়ছিলেন। এই ঘটনার উল্লেখ করিয়া রামেন্দ্রবাবু বলিতেন, —সে বয়সে দুর্গেশনন্দিনীর ভিতর কোনখানটা আমার খুব ভাল লেগেছিল জানেন? গজপতি বিদ্যাদিগ্‌গজের আহারের ব্যাপারটা।' বঙ্কিমের সমস্ত উপন্যাস তিনি একে একে পড়িয়া ফেলিলেন। পিতা গোবিন্দসুন্দর সম্বন্ধে রামেন্দ্রবাবু এইরূপ লিখিয়া গিয়াছেন—'সংস্কৃত শ্লোক রচনায় বাবার অসামান্য পটুতা ছিল। দ্রুতগতিতে মধুর পদবিন্যাস করিয়া বিবিধ ছন্দে শ্লোক রচনা করিতেন। স্বাস্থ্যাভাবে স্কুল পরিত্যাগে বাধ্য হওয়ার পরেও সংস্কৃত শিক্ষায় পরীক্ষার্থীর ন্যায় আগ্রহ ছিল। শেকস্‌পীয়রের

Pericles, Prince of Tyre অবলম্বন করিয়া একখানি সংস্কৃত কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। তদ্ভিন্ন ভারতবর্ষের মুসলমানরাজত্বের ইতিহাস সংস্কৃত শ্লোকে ছন্দোবন্ধ করেন।...বাবা একখানি বাঙ্গালা উপন্যাস লিখিয়াছিলেন। উপন্যাসের নাম দিয়াছিলেন 'বঙ্গবালা'। কয়েক ছত্র পয়ারে উহার ভূমিকা লিখিয়াছিলেন; তাহার প্রথম কয়ছত্র উদ্ধৃত হইল:—

বাঙ্গালীর রণবাদ্য বাজে না বাজে না।
বঙ্গদেশে নাহি হয় সমর ঘোষণা ॥
রণক্ষেত্রে বীরমদে মত্ত হতজ্ঞান।
হয় নাই বহুদিন বাঙ্গালী সন্তান ॥
এবে বঙ্গ জনস্থান নিতান্ত নীরব।
কোনদিকে নাহি আর কোন কলরব ॥
রজনীতে আলোচনা—দুরূহভাবনা।
রাজ রক্ষা হেতু চিন্তা, সাম্রাজ্য বাসনা ॥
এ সকল কষ্টকর কার্য্য বাঙ্গালীরে।
প্রবৃত্ত হইতে আর না হয় সংসারে ॥

'এই উক্তি তাঁহার হৃদয়ের অন্তঃস্থল হইতে বাহির হইয়াছিল। স্বদেশের কথা কহিবার সময় তাঁহার কণ্ঠস্বরের বিকৃতি ও লোমহর্ষণ ঘটিত। স্বভাবপ্রদত্ত মেঘমন্দ্রস্বরে উদ্দীপনার ভাষায় তাঁহার অষ্টম বর্ষীয় জ্যেষ্ঠপুত্রটির মনে স্বদেশভক্তি সঞ্চারিত করিবার জন্য কতই না প্রয়াস পাইতেন। গণিতে, বিজ্ঞানে, বিশেষতঃ সিদ্ধান্ত জ্যোতিষে তাঁহার স্বাভাবিক অনুরক্তি ছিল। ইংরাজী না জানিয়াও জ্যোতিষশাস্ত্রে গভীর অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়াছিলেন। বঙ্গদেশের দুর্ভাগ্যক্রমে সেই অসাধারণ ধীশক্তি যথোচিত ফলোৎপাদনে অবকাশ পায় নাই। সর্ব্ববিধ শারীরিক ও মানসিক শক্তির তিনি উপাসনা করিতেন। এই শক্তি যে আধারে অবস্থিত দেখিতেন,

তাহার কোন দোষ সহজে তাঁহার চোখে পড়িত না। সর্ব্ববিধ ক্ষুদ্রতা, কপটতা ও সঙ্কীর্ণতা ভয়ে তাঁহা হইতে দূরে থাকিত। পারমার্থিক বিষয়ে তিনি নিগুর্ণ ব্রহ্মবাদী ছিলেন। ঈশ্বরের তুষ্টি ও রুষ্টির সম্ভাবনায় বিশ্বাস করিতেন না। কোনরূপ কুসংস্কার তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারিত না। আচার বিষয়ে শাস্ত্রীয় নিয়ম যথাসাধ্য অক্ষরে অক্ষরে পালন করিতেন। নিত্য কর্ম্মের অনুষ্ঠানে ও ব্রতোপবাসাদি কৃচ্ছ্রসাধনায় এদিকে অত্যন্ত মনোযোগী হইয়া পড়িয়াছিলেন। কিন্তু শাস্ত্রীয় আচার-বিরোধী নব্য শিক্ষিত সম্প্রদায়ের কথনও নিন্দা করিতেন না। তাঁহাদের কর্ম্মপরতা ও উত্তম ও স্বদেশানুরাগ তাঁহার প্রীতি আকর্ষণ করিত। তিনি কস্মিন কালে কাহারও নিন্দা করেন নাই। তাঁহার কেহ শত্রু ছিল না।

'১২৮৭সালে গ্রামের ভদ্রলোকদিগকে লইয়া অভিনেতৃ সম্প্রদায় গঠিত হয়। ব্যয়বিধান করিয়া সাজসরঞ্জাম আনান হইল। 'দ্রৌপদীনিগ্রহ' (অভিনয়ের নিমিত্ত বাবার রচিত ক্ষুদ্র নাটক) ও 'বেণীসংহারে'র অভিনয় হয়। ১২৮৮ সালের বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ মাসে নবনির্ম্মিত রঙ্গমঞ্চে 'অশ্রুমতী' ও 'কৃষ্ণকুমারী'র অভিনয় হইল। বাবা অভিমন্যুবধ অবলম্বন করিয়া একখানি নাটক লিখিয়া শেষ করিয়াছিলেন। তাহার অভিনয় আর ঘটিল না।' আষাঢ় মাসের মাঝামাঝি তেত্রিশ বৎসর বয়সে গোবিন্দসুন্দরের মৃত্যু হইল। তাঁহার কনিষ্ঠভ্রাতা উপেন্দ্রসুন্দরও তেত্রিশ বৎসর বয়সে ইহলোক পরিত্যাগ করেন। বংশটিতে ইদানীং স্বল্পায়ু পুরুষের আবির্ভাব ও তিরোভাবের অনুক্রম দেখিয়া রামেন্দ্রসুন্দর চল্লিশে পদার্পণ করাটাই যেন একটা মস্ত ব্যাপার বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন। পিতামহ কৃষ্ণসুন্দর ছত্রিশ বৎসর পূর্ণ হইতে না হইতেই কালগ্রাসে পতিত হইয়াছিলেন। প্রপিতামহ বলভদ্র পঁয়ত্রিশ বৎসর একমাস জীবিত ছিলেন।

পিতা গোবিন্দসুন্দরের সঙ্গে পুত্র রামেন্দ্রসুন্দরের চরিত্রগত

মিল দেখিলে বুঝিতে পারা যায়, পিতার নিকটে পুত্র কতটা ঋণী ছিলেন। যজুর্ব্বেদান্তর্গত মাধ্যন্দিনশাখাধ্যায়ী জিঝোতিয় ব্রাহ্মণবংশীয় রামেন্দ্রসুন্দর যে যৌবনের শেষাশেষি হইতে একেবারে বৈদান্তিক হইয়া গিয়াছিলেন, এই-টাই সব চেয়ে মজার কথা; দেখিতেছি তাঁহার পিতাও যৌবনেই নির্গুণ ব্রহ্মবাদী ছিলেন। জিঝোতীয় ব্রাহ্মণেরা কনৌজিয়া বা কান্যকুব্জ শ্রেণীর অন্যতম শাখা বলিয়া পরিচিত। ইঁহাদের সম্বন্ধে রামেন্দ্রবাবু লিখিয়াছেন —'ফতেসিংহ মধ্যে যে কয়েক ঘর জিঝোতীয় আছেন, তাঁহাদের উপাধি দীক্ষিত, ত্রিবেদী (তেওয়ারি) চতুর্ব্বেদী (চৌবে,) দ্বিবেদী (দুবে,) বাজপেয়ী, উপাধ্যায় ও মিশ্র। জমিদার বা লাখেরাজ ভূসম্পত্তি ও কৃষি হইতে ইঁহাদের জীবিকা চলে। যাজন কার্য্য সকলেই পরিত্যাগ করিয়াছেন। কনৌজিয়া ও মৈথিলী ব্রাহ্মণ হইতে ইঁহারা পুরোহিত গ্রহণ করেন। উপনয়ন ও বিবাহ ব্যতীত প্রায় সকল বিষয়েই ইঁহারা বঙ্গদেশ প্রচলিত ধর্ম্মশাস্ত্রের ব্যবস্থা ও বঙ্গদেশ প্রচলিত আচারব্যবহার গ্রহণ করিয়াছেন। ভাষা ও পরিচ্ছদে এখন সকলেই বাঙ্গালী; বিবাহাদি মাঙ্গলিক কার্য্যে আচারানুষ্ঠান ভিন্ন কোন বিষয়েই পশ্চিম দেশের চিহ্ন পাওয়া যায় না।' কোনও চিহ্ন পাওয়া যায় না বটে; কিন্তু ইদানীং প্রতিবৎসর কনৌজি ব্রাহ্মণগণের সামাজিক সম্মিলনে যোগ দিবার জন্য নিমন্ত্রণ পত্র রামেন্দ্রবাবুর নিকটে আসিত। সেই হিন্দুস্থানী সমাজের নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে পারিতেন না বলিয়া তিনি দুঃখিত হইতেন।

রামেন্দ্রসুন্দর কায়মনোবাক্যে বাঙ্গালী হইয়া গিয়াছিলেন। কলিকাতায় থাকিয়া বঙ্গভারতীর সেবায় জীবন উৎসর্গ করিতে হইবে,—পঠদ্দশাবসানে কলেজ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইতে না হইতেই ইহাই তাঁহার জীবনের লক্ষ্য হইয়া দাঁড়াইল। প্রেসিডেন্সী কলেজের প্রিন্সিপ্যাল তাঁহাকে ডাকিয়া বলিলেন, 'মহীশূর রাজ্যে বাঙ্গালোরে তুমি যাইবে কি? সেখানকার

কলেজের প্রিন্সিপ্যাল লম্বা ছুটি লইয়া দেশে যাইতেছেন। তুমি তাঁহার স্থানে কাজ করিবে, আর মানমন্দিরের (observatory) তত্ত্বাবধান করিবে; ঐ কাজে তোমার পাকা হইয়া যাইবার সম্ভাবনা খুব বেশী; আশা করি তুমি অসম্মত হইবে না। এখন কোনও উত্তর চাইনা; বাড়ী যাও; বিবেচনা করিয়া উত্তর দিও। আমার ইচ্ছা তুমি ঐ কাজটি লও।' কিন্তু রামেন্দ্রসুন্দরের ইচ্ছা অন্যরূপ। এই সময়ে রিপণ কলেজে তাঁহাকে লইয়া যাইবার জন্য লোক আনা গোনা করিতে লাগিল। তিনি কলিকাতা ত্যাগ করিলেন না।

এইরূপে তাঁহার কলিকাতা থাকার ব্যবস্থা না হইলে সাহিত্যের অথবা শিক্ষার অথবা পরিষদের প্রকৃতি কেমন দাঁড়াইত, তাহা বলা কঠিন। সে আলোচনায় কোন ফল নাই। ক্রমে তাঁহার চরিত্র-মাধুর্য্যে অনেকেই তাঁহার দিকে আকৃষ্ট হইলেন। কলেজে পড়িবার সময় তিনি বাঙ্গালায় প্রবন্ধ রচনা করিতে আরম্ভ করেন। তিনি বলিতেন—'প্রথম প্রথম কালীপ্রসন্ন ঘোষের ভাষা আমাকে একেবারে অভিভূত করে ফেলেছিল; তাঁর মত গমগমে ভাষায় না লিখ্‌লে মনের ভাব ভাল করে প্রকাশ করা যায় না, এই ধারণা আমাদের মনে বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছিল; সেই মোহপাশ থেকে নিজেকে মুক্ত কর্‌তে আমার অনেক সময় লেগেছিল। ক্রমশঃ দেখ্‌লাম যে আমি যে সব কথা বল্‌তে চাই, তা' ও-ভাষায় চল্‌বে না; আমার মনের ভাব প্রকাশ করবার জন্যে উপযুক্ত ভাষা গড়ে তুলতে হোলো। আমি 'নবজীবনে' একটা লেখা পাঠিয়ে দিই; ভয়ে ও লজ্জায় তা'তে নিজের নাম দিইনি। অক্ষয় সরকার কেমন করে কিন্তু আমার নাম জান্‌তে পারলেন; আমাকে উৎসাহিত করবার জন্যে প্রবন্ধটি একটু মার্জ্জিত করে কাগজে বা'র করলেন। আমার উৎসাহ বেড়ে গেল। সাহিত্য -ক্ষেত্রে লোক চেন্‌বার ক্ষমতা অক্ষয় সরকারের আশ্চর্য্য রকমের ছিল।

দেখুন না, রবিবাবু যে ভবিষ্যতে বাঙ্গালা সাহিত্যকে উজ্জ্বল করবেন, একথা তিনি যেমন বুঝতে পেরেছিলেন ও 'ভাই হাততালি' প্রবন্ধে সকলকে বলেছিলেন, তেমনটি বোধ হয় বঙ্কিমবাবু ছাড়া আর কেউ পেরেছিলেন কিনা, সন্দেহ। পারেন নি।'

রামেন্দ্রসুন্দরের জীবনের কোনও অংশের কিছুমাত্র পরিচয় যিনি পাইয়াছেন, তিনিই মুগ্ধ হইয়া গিয়াছেন। তিনি বলিতেন—'দেখুন, সুরেশ সমাজপতির অনেক দোষ থাকতে পারে; কিন্তু ওর কতকগুলো এমন গুণ আছে, যার জন্যে বাস্তবিকই আমি ওকে ভালবাসি। আমি কিছুতেই ভুলতে পারবনা সে কেমন করে দীনেশ সেনকে সাহিত্য ক্ষেত্রে দাঁড় করিয়ে দিলে। দীনেশ তখন একেবারে নিঃস্ব, সহায়হীন, সামান্য স্কুল মাষ্টার; সম্পত্তির মধ্যে তার হাতে ছিল 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে'র পাণ্ডুলিপিখানি। দীনেশকে সঙ্গে করে সুরেশ কলকাতা সহর ঘুরলে; শেষে বেলা বারটার সময় বাসায় এসে ধর্না দিয়ে পড়ল;—বইখানি যেমন করে হোক্ ছাপিয়ে দিতেই হবে, নইলে সে জলস্পর্শ করবে না। একটু সবুর করতে বল্লুম; আচ্ছা, হবে' ইত্যাদি কোনও কথাই সে শুনতে চায় না। কি করি; তখনই বেরিয়ে গিয়ে সান্যাল কোম্পানীর সত্বাধিকারীর সঙ্গে দেখা করে বইখানি ছাপাবার ব্যবস্থা করে বাড়ী ফিরলুম। সুরেশ আশ্বস্ত হয়ে উঠে গেল।" রামেন্দ্রবাবু এই ঘটনাটি এমন করিয়া বিবৃত করিলেন, যেন এব্যাপারে তাঁহার কৃতিত্ব কিছুমাত্র ছিল না; কেবলমাত্র সমাজপতির একান্ত চেষ্টাই প্রশংসনীয়।

কত সাহিত্যিক ছোট বড় ব্যাপারের সহিত তিনি অল্প বিস্তর জড়িত হইয়া পড়িয়াছিলেন তাহার হিসাব নিকাশ লইবার বোধ হয় সময় আসিয়াছে। বারেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির কর্ণধার কুমার শরৎ কুমারের কথা বলিবার সময় তাঁহার কণ্ঠস্বর স্নেহার্দ্র হইয়া আসিত, হাস্যোজ্জ্বল চক্ষুতারকা

ক্ষণেকের জন্য স্নিগ্ধ গম্ভীর ভাব ধারণ করিত ;—আমার কেবলই মনে হইত, এই অগাধ অচঞ্চল বাৎসল্যরসে অভিষিক্ত হইয়া শরৎ কুমার ধন্য হইয়া গিয়াছেন। রিপন কলেজের নবীণ ও প্রবীন অধ্যাপকদিগের মধ্যে বাঙ্গালা সাহিত্যে প্রীতি জন্মাইবার জন্য তিনি একটি অধ্যাপক-সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠিত করিয়া নিজে পথ দেখাইয়া তাঁহাদের হাত ধরিয়া চলিয়াছিলেন। তাঁহার এই সঙ্ঘ-প্রীতি খুব ঢিলেঢালা রকমের ছিল। সঙ্ঘ নহিলে প্রথমটা পাঁচ জনকে সজাগ করার সুবিধা হয় না ; কিন্তু পাছে সঙ্ঘটাই fetish হইয়া দাঁড়ায়, এই ভয়ে তিনি কখনই কাগজে কলমে এই সঙ্ঘের জন্য কোনও নিয়মাবলী লিপিবদ্ধ করিতে দেন নাই ; সকল প্রকার যন্ত্রবদ্ধ ব্যবস্থা প্রণালীর বিরুদ্ধে তিনি দৃঢ়ভাবে দাঁড়াইয়াছিলেন। তাঁহার সাহিত্য -পরিষদ—প্রীতির কথা তুলিয়া অনেক সময়ে তাঁহাকে লজ্জা দিবার চেষ্টা করা হইত ; কিন্তু যিনি অক্লান্তভাবে কলেজের ও পরিষদের কাজ চালাইয়া সাহিত্যসেবা করিতেন, তাঁহার লজ্জা হইবে কেন ? 'আমার বঁধুয়া আন্ বাড়ী যায় আমারি আঙ্গিনা দিয়া'—এ আক্ষেপ কলেজের কিম্বা পরিষদের হইত না ; কারণ রামেন্দ্রসুন্দরের প্রীতির ধারা উভয়ের উপর সমান ভাবে বর্ষিত হইয়াছিল। সেই প্রীতির কণামাত্র যিনি পাইয়াছেন, তিনি কখনই তাহা বিস্মৃত হইবেন না।

সমাপ্ত।